বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার

[খণ্ড : ১৫ ও ১৬]

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মুফতী মাহমূদুর রহমান
প্রিন্সিপ্যাল, বাইতুল আমান
মাদরাসা-মসজিদ কমপ্লেক্স
আদাবর, ঢাকা

মুফতী শাফি বিন নুর
দাওরা সমাপন
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী এন্ড নুর রিয়েল স্টেট,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

সম্পাদনা

মাওলানা মোহাম্মদ মুহিউদ্দীন
দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দারুল উলুম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



প্রথম প্রকাশ	নভেম্বর : ২০১৬
প্রকাশক	মাওলানা শহীদুল ইসলাম দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল	০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭
স্বত্ব	প্রকাশককর্তৃক সংরক্ষিত
বর্ণবিন্যাস	পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ	দি ব্রাইট, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : 500 /- ত্র

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-১৫

- কুরআন ও তাঁর বাহক /২৬
- ইসলামের মর্যাদা /৬৮
- মুসলমানিত্বের মূল্য /১০০
- পাশবিক, মানবিক ও ঈমানি জীবন /১২০
- সহনশীলতা /১৪৪
- বরকত ও বরকতের উপকরণ /১৮০
- ইসলামি শিক্ষার নির্যাস /২০৮

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-১৬

- নবীজির আগমন /২৪২
- বোধ ও বুদ্ধির আলোকরশ্মি /২৭৪
- নবীজির আদর্শই সর্বোত্তম জীবনরীতি /৩০৪
- ইল্‌ম ও জ্ঞানে বড় হও /৩৪৬
- সাফল্যের পাঁচ মূলনীতি /৪০০
- দোরঙা আচরণ ছেড়ে দাও /৪২৬
- গাছে লুকায়িত রহস্যাবলি /৪৪৮

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-১৫

কুরআন ও তাঁর বাহক /২৬
মহব্বতের দাবি /২৬
সম্বোধনে মহব্বতের প্রকাশ /২৭
নবীজির প্রতিরোধ সুনির্দিষ্ট পন্থায় /২৭
প্রিয়র প্রিয়তম আলোচনা /২৮
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি
আম্বিয়া কেরামের ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি /২৯
আল্লাহপ্রদত্ত অসংখ্য নেয়ামতরাজি /৩০
উত্তম চরিত্রের আলোচনা /৩১
মহৎ অনুগ্রহের আলোচনা /৩১
বিশ্বজগতের রহমত /৩১
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
অস্তিত্বের বরকত কাফেরদের জন্য /৩২
নবীজির অনুসরণের মহত্ত্ব /৩২
আল্লাহর সাহায্যের আলোচনা /৩৩
উপহাসকারীদের শেষ পরিণাম /৩৪
পাগল আখ্যাদানকারীদের ভর্ৎসনা /৩৪
সান্ত্বনার বাণী /৩৫
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষার বর্ণনা /৩৬
প্রেমাস্পদের তত্ত্বাবধানে থাকার স্বাদ /৩৭
সবচেয়ে বড় সুসংবাদ /৩৮
হাশরে সম্মানের উপযুক্ত কে হবে? /৩৮
নবীজির মে'রাজের আলোচনা /৩৯
আল্লাহপ্রদত্ত উপঢৌকনের বর্ণনা /৪০
শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের বর্ণনা /৪১
অবয়বের বর্ণনা /৪১

বরকতময় চোখের আলোচনা /৪২
বরকতময় কানের আলোচনা /৪২
বরকতময় জিহ্বার আলোচনা /৪২
বরকতময় বক্ষের বর্ণনা /৪৩
পিঠের আলোচনা /৪৪
বরকতপূর্ণ হাতের আলোচনা /৪৫
বরকতময় পদযুগলের আলোচনা /৪৫
মোবারক পোশাকের আলোচনা /৪৬
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
ঘরের আলোচনা /৪৬
পরিবারের আলোচনা /৪৬
পরিবারবর্গের সতীত্বের আলোচনা /৪৭
চার মেয়ের আলোচনা /৪৭
ছেলেদের আলোচনা /৪৭
আহলে বাইতের আলোচনা /৪৮
মসজিদে নববীর আলোচনা /৪৮
নামাযীদের আলোচনা /৪৮
মেহমানদের দাওয়াতের আলোচনা /৪৯
নিকটাত্মীয়দের আলোচনা /৪৯
ইল্‌মে নববীর আলোচনা /৪৯
সুন্দর বাক্‌শক্তির বর্ণনা /৫০
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
নম্রতার আলোচনা /৫১
ধৈর্য ও সহনশীলতার আলোচনা /৫১
লজ্জার আলোচনা /৫১
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
শিষ্টাচারের আলোচনা /৫২
নবীর তারবিয়াতের আলোচনা /৫২
ক্ষমা ও ছাড় দেওয়ার আলোচনা /৫২
আল্লাহর কাছে সোপর্দ হওয়ার আলোচনা /৫৪
জিহাদের আলোচনা /৫৫
প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্যের বর্ণনা /৫৫
দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির আলোচনা /৫৫

পালাক্রমিক কাজের আলোচনা /৫৫
অবসর সময়ের আলোচনা /৫৬
রাসূলের উম্মতের আলোচনা /৫৬
কুরআনের ভাষ্যমতে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার পদ্ধতি /৫৬
সমগ্র জাহানের প্রিয় ব্যক্তির ভালোবাসার আলোচনা /৫৭
রাসূল প্রেমিক কারা? /৫৮
আলোকজ্জ্বল জীবনের শপথ /৫৯
প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ /৬০
পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে রাসূলের আলোচনার গুঞ্জরণ /৬০
রাসূলের পূর্ণ সন্তুষ্টি /৬২
হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানীকর্তৃক নবীর প্রশংসা /৬৩
খাজা মাযহার জানে জানাঁ (রহ.)-এর নবীস্তুতি /৬৩
কুরআনের আয়াতের সাথে নবী জীবনের বিস্ময়কর মিল /৬৪

ইসলামের মর্যাদা /৬৮
মানবদেহ বিরোধপূর্ণ জিনিসের সমষ্টি /৬৮
পারিবারিক জীবনে বিরোধপূর্ণ জিনিসের সমষ্টি /৬৯
দুই জিনিসের মাঝে জোড়া সৃষ্টির দুনিয়াবি নিয়ম /৭০
ইসলাম দুটি হৃদয়ের মাঝে একাত্মতা ঘটায় /৭১
ইসলাম একটি অপ্রত্যাশিত মহান নেয়ামত /৭২
গাছের শুকনা ভঙ্গুর ডালে পাখির বাসা দীর্ঘস্থায়ী হয় না /৭৩
সোনাকে সোনাই মনে করতে হয়– পিতল নয় /৭৩
আল্লাহর প্রতি ঈমানের কল্পনা /৭৪
নিউইয়র্কে সাতশত পাগলাগারদ : হেতু কী? /৭৪
আল্লাহতে বিশ্বাসের ফলাফল /৭৫
মাতাপিতা নিয়ে চিন্তা /৭৭
বিধর্মীদের কাছে মায়ের অবস্থান /৭৭
ইসলামে মায়ের মর্যাদা /৭৮
বৈবাহিক জীবনের গুরুত্ব /৭৮
পারস্পরিক ভালোবাসার বিনাশ /৭৮
এক ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজারের অক্ষম অবস্থা /৭৯
আরেক ইঞ্জিনিয়ারের প্রলাপ /৭৯
ইসলামের শিক্ষা /৮০

কল্যাণকামিতা ও আন্তরিকতার গুরুত্ব /৮০
গ্রাহকদের কল্যাণ কামনা /৮১
বিক্রেতার কল্যাণ কামনা /৮১
এক অপরিচিত আগন্তুকের কল্যাণকামিতা /৮১
দোকানদারদের মাঝে পারস্পরিক কল্যাণকামিতা /৮২
কাফেরদের কাছে কল্যাণকামিতা /৮৩
কাফেরদের কুকুর-বিড়াল পোষণ /৮৩
লজ্জাশীলতা ও পবিত্র জীবনের গুরুত্ব /৮৪
পার্টিগুলোতে আত্মমর্যাদার অপমৃত্যু /৮৫
সত্য বলার গুরুত্ব /৮৫
ইসলামের বিজয় /৮৬
নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার গুরুত্ব /৮৭
তিন সাহাবির আত্মদানের ঘটনা /৮৮
আবুল হাসান নূরী (রহ.)-এর আত্মদানের ঘটনা /৮৮
কাফের সোসাইটির একটি নমুনা /৮৯
ইসলামি সোসাইটির একটি নমুনা /৯০
তাবেয়ীনদের সময়কার বিস্ময়কর কাহিনি /৯০
৮. এখলাসের গুরুত্ব /৯২
সাহাবায়ে কেরামের যামানার একটি ঘটনা /৯২
দুই সতীনের ইখলাস /৯৩
এক ফকিরের ইখলাস /৯৪
এক দয়াবান হাজীর ইখলাস /৯৫
হৃদয়ের আকুতি /৯৬
ইসলামই সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা /৯৭

মুসলমানিত্বের মূল্য /১০০
ইসলামের বরকতসমূহ /১০০
এক স্টোরের রিটার্ন পলিসি /১০১
সম্পর্কের মান রক্ষা করা চাই /১০৩
এ কেমন দীনদারি? /১০৪
শিশুদের সাথে উত্তম আচরণ /১০৫
ইসলাম বন্ধুত্ব শেখায় /১০৫
অশুভ আচরণের প্রতিদান উত্তম আখলাক /১০৬

দুনিয়া হবে শান্তির উদ্যান যদি হয় এমন /১০৬
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /১০৭
ইসলামি শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব /১০৮
স্ত্রীর রূঢ় আচরণ বরদাশত করার কারণে /১০৯
একটি নাজুক মাসআলা /১১১
স্ত্রীকে মা-বাবার সাথে কথা না বলতে দেওয়ার কাহিনি /১১২
সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির আদেশ /১১২
এক কুমারীর স্বামীনির্বাচন /১১৩
কাকে বলে স্ত্রীর গোলামি? /১১৪
প্রয়োজনীয় এই বিয়ষটির প্রতি গুরুত্ব প্রদান /১১৪
অন্তর জয় করে নিয়েছে /১১৫
আউলিয়া কেরামের বেশের প্রতি সম্মান /১১৬

পাশবিক, মানবিক ও ঈমানি জীবন /১২০
মানুষের সম্মান বৃদ্ধি /১২০
সঠিক পথের দিশা /১২০
মানুষের জীবনের ধরন তিনটি /১২২
চাহিদা পুরণে জীবজন্তুর অবস্থা /১২৩
নফসের রাজত্ব /১২৫
সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ /১২৫
খাবারের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যপ্রীতি /১২৬
খাবারের প্লেটে মহিষের মাথা /১২৭
খাবারের টেবিলে ঐতিহাসিক ভবন /১২৮
বিস্ময়কর এক সালাদ /১২৯
আইসক্রীমে বত্রিশ প্রকারের স্বাদ /১২৯
ফার্নিচারের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যপ্রীতি /১২৯
ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে সৌন্দর্যপ্রীতি /১৩০
এক পাকিস্তানি ব্যবসায়ীর ঘর /১৩০
তাজমহল এবং বিস্ময়কর গোসলখানা /১৩০
সমাজবদ্ধতার সৃষ্টিগত জযবা /১৩১
২. মানবিক জীবন /১৩২
মানবিক জীবন উত্তম; তবে... /১৩২
বিবেকের রাজত্ব /১৩৩

৩. ঈমানি জীবন /১৩৪
ঈমানি জীবনের চারটি মৌলিক গুণ /১৩৫
শ্রেষ্ঠত্বের একটি অপূর্ব নিদর্শন /১৩৬
জীবনভর অক্ষম ব্যক্তিদের সেবা /১৩৭
মুসাফিরের সাথে উত্তম আচরণ /১৩৭
ঈমানের পরিচয় /১৩৮
আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ/১৩৯
আল্লাহর জন্য দান করা /১৩৯
আল্লাহর জন্য কাউকে না দেওয়া ১৪০

সহনশীলতা /১৪৪

تحمل-এর আভিধানিক অর্থ /১৪৪
'সহনশীলতা' কাকে বলে? /১৪৫
আল্লাহ তা'আলার حليم ও عليم নামের তাৎপর্য /১৪৫
মন্দ আচরণের জবাব উত্তম কথা দ্বারা দেওয়ার শিক্ষা /১৪৭
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মসরংবণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত /১৪৯
অধীনদের ব্যাপারে সহনশীলতা /১৫০
স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সহনশীলতা /১৫১
তায়েফবাসীর জন্য বদদু'আ করতে অস্বীকৃতি /১৫২
দাঁত মোবারক শহীদ হওয়ার পরেও দু'আ /১৫৩
দুশমনের জন্য গম সরবরাহের আদেশ /১৫৪
মেয়ের হত্যাকারীদের ক্ষমা /১৫৫
সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে ক্ষমা /১৫৬
বিষ প্রয়োগকারী মহিলার ক্ষমা /১৫৮
আবুজাহলের ছেলেকে ক্ষমা /১৫৮
আবু সুফিয়ানের ক্ষমার ঘোষণা /১৫৯
হিন্দাকে ক্ষমা /১৫৯
ওয়াহ্শির ক্ষমা /১৬০
ওছমান ইবনে তালহার ব্যাপারে সহনশীলতা /১৬১
মক্কাজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা /১৬২
পশুত্ব ছাড়ুন, মানবতা বাস্তবায়িত করুন /১৬২
মতবিরোধকে শত্রুতার হাতিয়ার বানানো যাবে না /১৬৪

দশ জিনিস দশ জিনিসকে প্রতিরোধ করে /১৬৪
হযরত গঞ্জেবখ্শ লাহোরি (রহ.)-এর ঘটনা /১৬৬
হযরত আবুল হাসান খিরকানির দৃষ্টান্তমূলক ধৈর্য /১৬৭
হযরত মির্জা মাযহার জানেজানাঁ কীভাবে ওলী হলেন? /১৬৭
সাধারণ কাজের বিনিময়ে ক্ষমা /১৬৯
এক বুযুর্গের সহনশীলতা /১৬৯
এক মহিলার সহনশীলতা ১৭০
অভিযোগ আর অভিযোগ /১৭০
খাজানাসমূহের চাবি /১৭১
একটি উপদেশপূর্ণ ঘটনা /১৭২
ধৈর্যের একটি বড় ফায়েদা /১৭৩
একটি অমূল্য রতন /১৭৩
এগারোটি জিনিসের বাস্তবায়ন এগারোটি জিনিসের মাধ্যমে /১৭৩
অজ্ঞ লোকের ক্ষমা /১৭৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্যের আরেকটি দৃষ্টান্ত /১৭৬
বনী ইসরাঈলের এক হৃদয়গ্রাহী ঘটনা /১৭৭

বরকত ও বরকতের উপকরণ /১৮০
বরকতপূর্ণ জীবনব্যবস্থা /১৮০
বরকতের সঠিক অর্থ /১৮০
ভূমিতে বরকত /১৮০
বাইতুল্লাহ শরীফে বরকত /১৮১
হজ ও ওমরায় বরকত /১৮২
বকরির মাঝে বরকত /১৮২
যায়তুনের বরকত /১৮৩
মুমিনের উচ্ছিষ্টের বরকত /১৮৪
নবীয়ে রহমতের লোকমার বরকত /১৮৪
তাহনীকের মধ্যে বরকত /১৮৫
সুস্থতার মাঝে বরকত /১৮৫
ইল্মের মাঝে বরকত /১৮৬
সময়ে বরকত /১৮৬
স্মৃতিশক্তিতে বরকত /১৮৯
রিযিকে বরকত /১৯০

বরকতের উপকরণ /১৯৬
বরকত হারিয়ে যাওয়ার কারণসমূহ /২০০
যখন বাদশাহর নিয়ত পরিবর্তন হয় /২০০
ভালো নিয়তের ফলে কোটিপতি! /২০১
বরকতের ফয়সালা /২০১
বরকত লাভের দু'আসমূহ /২০৩

ইসলামি শিক্ষার নির্যাস /২০৮
কে কাকে নছিহত করবে /২০৯
নছিহত ও ছিদ্রান্বেষণ /২০৯
ইমাম জা'ফর সাদেক (রহ.)-এর নছিহত /২১০
ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর নছিহত /২১০
প্রথম হাদীছের ওপর পর্যালোচনা /২১১
নিয়তের গরমিলের কারণে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত /২১২
আমল আর ফে'ল-এর মাঝে পার্থক্য /২১৩
জান্নাতে মর্যাদা আমলের ওপর ভিত্তি করে /২১৩
কেয়ামতের দৃশ্যাবলির বিশ্লেষণ /২১৪
খারাপ নিয়তের ক্ষতি /২১৭
আমল একটি নেকি একাধিক /২১৭
আমলের ভিত্তি কীসের ওপর /২১৮
আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর /২১৮
ফকীহদের মতবিরোধে উম্মতের জন্য আসানি /২১৮
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর কথা /২২০
নিয়তের তিনটি অবস্থা /২২১
আমল কীভাবে প্রতিদানযোগ্য হয় /২২১
হযরত সুলতান বাহু (রহ.)-এর নিকট নিয়তের তাৎপর্য /২২৩
দ্বিতীয় হাদীছ : অনর্থক বিষয় পরিহার করা /২২৪
কলম ভাঙার সাথে-সাথে জিকরে ইলাহী শুরু /২২৫
সূর্যকে থামিয়ে সময় নিয়ে নাও /২২৫
খাওয়ার সময়ও দীনের খেদমত /২২৫
শুকনো ছাতুর খাওয়ার কারণ /২২৫
যে শ্বাস গাফলতের, সেই শ্বাস কাফের /২২৬
জীবনের ভরসা কী? /২২৬

পদব্রজের সময়ও অধ্যয়ন /২২৬
আল্লামা ইবনে আছীরের অভ্যাস /২২৭
বাথরুমেও শিক্ষার চিন্তা /২২৭
কূপের দেওয়ালে লেখার মাধ্যমে শিক্ষা /২২৭
ইমাম মুহাম্মদের শিক্ষাদান ব্যস্ততা /২২৮
দৌড়ে-দৌড়ে ইল্‌ম শিক্ষার দৃষ্টান্ত /২২৮
ভিখারীর বেশে ইল্‌ম অর্জন /২২৮
বিশ বছর যাবত সুযোগ হয়নি /২৩০
তৃতীয় হাদীছ : অন্যের রুচির মূল্যায়ন করা /২৩০
একটি হৃদয়গ্রাহী সন্ধি/২৩১
মাওলানা আব্দুল মালেক সিদ্দিকী (রহ.)-এর খোদাভীতি /২৩২
বিশর হাফী (রহ.)-এর বোনের তাক্‌ওয়া /২৩৩
মুসলমান কে? /২৩৪
মুখ হাতের আগে কেন? /২৩৫
অধিকার ক্ষুণ্ন করা হতে দূরে থাকো /২৩৬
উক্ত পাঁচটি হাদীছ শরীয়তের সারাংশ কীভাবে? /২৩৬
মানুষের অসৎ স্বভাবের পরিচয় /২৩৬
বেলায়াতের পথে বাধা /২৩৭
যখন ধরা পড়ব, তখন আল-আমীন, আল-হাফীজ /২৩৮

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে যুলফিকার-১৬

নবীজির আগমন /২৪২
পুরস্কারের পূর্বে পরীক্ষা /২৪২
তিন মহান ব্যক্তিবর্গের পরীক্ষা /২৪৪
১. হযরত আব্দুল মুত্তালিবের পরীক্ষা /২৪৪
হযরত আব্দুল্লাহর পরীক্ষা /২৪৬
৩. মা আমেনার পরীক্ষা /২৪৮
প্রকাশ হতে লাগল আশ্চর্যসব দৃশ্য ও অবস্থা /২৪৯
ইহুদিদের উৎকণ্ঠা /২৪৯
জন্মলগ্নের বৈশিষ্ট্যাবলি /২৫০
কেসরার স্বপ্ন ও ব্যাখ্যা /২৫০
১৪টি গম্বুজ ধসে যাওয়ার রহস্য /২৫১
তারকার সেজদা করার রহস্য /২৫১
একজন হৃদয়বান প্রেমিকের প্রণয়সুলভ কথা /২৫১
নবীজি এতিম কেন /২৫২
এতিম হয়ে গেলেন অন্য এতিমের আশ্রয়স্থল /২৫৪
নবীজির জন্মের সপ্তম দিনে /২৫৪
শিশু মুহাম্মাদকে কোলে নিতে নারীদের আগমন /২৫৪
লালন-পালনে হযরত হালিমা নির্বাচিতা /২৫৬
রবের দানে হালিমার কোলে মুহাম্মাদ /২৫৭
মায়ের দু'আর ফসল /২৫৮
উচ্চে রাখো মুহাম্মাদকে /২৬০
হালিমার দুঃখের দিন কেটে গেল /২৬০
নবীজি এক স্তনের দুধই গ্রহণ করতেন /২৬২
সৌন্দর্য ও সুকুমার বৃত্তির অপার বিস্ময় /২৬৩
শিমার মমতামাখা শ্লোক /২৬৪
মা আমেনার কোলে ফিরে যাওয়া /২৬৫
নিঃস্ব হওয়ার রহস্য /২৬৫
اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى আয়াতের মর্মকথা /২৬৬
ইসলামে এতিমের মর্যাদা /২৬৮
শিমার একটি সম্মানজনক কাহিনি /২৬৮

বোধ ও বুদ্ধির আলোকরশ্মি /২৭৪
আকলে সালীম : সুস্থমস্তিষ্ক একটি অপ্রত্যাশিত নেয়ামত /২৭৪
আকলের কারণেই মানুষ মহিষকে নিয়ন্ত্রণে রাখে /২৭৫
মানবমস্তিষ্কের কারিশমা /২৭৫
গোশতের নানান খাবার /২৭৬
পুরো একটি ভুনা গরু /২৭৬
সবজিতে গোশতের ব্যবহার /২৭৭
আরবদের সুস্বাদু খাবার /২৭৭
হস্তির তামাশা /২৭৭
হাতির ফুটবল খেলা /২৭৯
হাতির ছবি অঙ্কন /২৭৯
পশু-পাখিদের কীর্তি /২৭৯
কারাটের মোকাবেলায় একটি বানর /২৮০
এক আজব ও দুর্লভ ডেইরি ফার্ম /২৮০
ডলফিন মাছের আশ্চর্য খেলা /২৮১
মানবজ্ঞানের গৌরব : মানবপ্রকৃতির গৌরব /২৮২
বিষাক্ত মক্ষিকা থেকে রক্ষা পাওয়ার এক আশ্চর্য পন্থা /২৮২
মানবমস্তিষ্কের দক্ষতা /২৮৪
ভাবনার দুই প্রান্ত /২৮৪
মানব ব্যক্তিত্বে গবেষণার প্রভাব /২৮৫
'মিষ্টিছাড়া' তরমুজ /২৮৫
সমস্যায় পড়লে ভিন্ন পথ অন্বেষণ করুন /২৮৬
যেমন চিন্তা তেমন কথা /২৮৭
মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষায় চিন্তাচেতনার প্রভাব /২৮৮
দাম্পত্যজীবনে চিন্তাচেতনার প্রভাব /২৯০
নিজের অযোগ্যতার প্রমাণ দেওয়া /২৯২
রাগ অযোগ্যতার আলামত /২৯৩
পিতা-পুত্রের চিন্তাচেতনা /২৯৪
সফল জীবনের রহস্য /২৯৫
ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তির মনোবল /২৯৫
অটোমেটিক সেলাই মেশিন /২৯৬
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেই আশার আলো /২৯৭
ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা শত্রুকে জয় করা যায় /২৯৮
ক্ষতিকে লাভে পরিণত করার ক্ষমতা /২৯৯
হৃদয় জগতে বিপ্লব /২৯৯
নাবীয়ে রহমতের রহমতসূলভ দৃষ্টিভঙ্গি /৩০১

নবীজির আদর্শই সর্বোত্তম জীবনরীতি /৩০৪
গুণকীর্তনকারীর দলে নাম লেখানোর তামান্না /৩০৪
বিশ্বসেরা ব্যক্তিদের অপূর্ণ জীবন /৩০৫
মানবতার ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন /৩০৬
নতুন আঙ্গিকে সীরাতে নববীর অধ্যয়ন /৩০৭
সুন্নাতে নববীর দুই শাখা /৩০৮
শয়ন করার সম্ভব্য অবস্থা চারটি /৩০৯
শয়ন করার উত্তম পদ্ধতি /৩১৩
রৌদ্রস্নান ও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ /৩১৩
মেদ কমানোর বৈজ্ঞানিক পন্থা /৩১৫
পেট ভরেছে কিনা সিদ্ধান্ত নেয় মস্তিষ্ক /৩১৫
পাকস্থলিকে ডাবল কষ্ট দেবেন না /৩১৭
মেনে না নিয়েই সুন্নাহর ওপর আমল চলছে /৩১৮
চোখের মণির চিকিৎসা /৩১৮
মেসওয়াক ও আধুনিক বিজ্ঞান /৩১৯
অপরিচ্ছন্ন মুখে রোগ সৃষ্টি হয় /৩১৯
ঘাড় মাসেহ করার স্বাস্থ্যগত উপকার /৩২০
উজুর অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে আমাদের উপকারসমূহ /৩২
উজুতে ডায়াবেটিস রোগীর উপকার /৩২২
একজন নোবেলবিজয়ীর বিপরীত বুঝ /৩২৩
নেককার বান্দাদের চেহারার ঔজ্জ্বল্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ /৩২৪
সিরকা ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা /৩২৫
যাইতুনের তেলও বিস্ময়কর চিকিৎসা /৩২৬
গবেষণায় আমাদের দুর্বলতা /৩২৭
আজওয়া খেজুরের উপকারিতা এবং অজানা কথা /৩২৮
নবীয়ে রহমতের নামে রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছি /৩৩০
তেজের সঙ্গে চলার শারীরিক উপকার /৩৩১
হালকা ব্যায়াম ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ /৩৩২
নতুন চাঁদদর্শন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা /৩৩৪
নামাযের রাকাতসমূহ ও বিজ্ঞানের গবেষণা /৩৪০

ইল্‌ম ও জ্ঞানে বড় হও /৩৪৬
কিতাবুল্লাহর সংরক্ষক /৩৪৬
নিয়তের গুরুত্ব /৩৪৭
ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়তের শাখা-প্রশাখা /৩৪৯

নিয়ত্যের শ্রেষ্ঠত্ব আমলের ওপর /৩৪৯
নিয়তের গরমিল আমলকে বরবাদ করে দেয় /৩৫০
নেক আমলের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব /৩৫১
ইল্‌মে গভীরতা অর্জনে সহায়ক তিনটি বিষয় /৩৫৪
অন্তরের সাক্ষ্যদান /৩৫৪
তাক্‌ওয়ার গুরুত্ব /৩৫৫
বরকত অর্জন ও তাক্‌ওয়া /৩৫৬
জমিনের সৌন্দর্য ও তাক্‌ওয়া /৩৫৭
লেনদেন ও তাক্‌ওয়া /৩৫৭
সাবধানতা অবলম্বন করা-ই তাক্‌ওয়া /৩৫৮
বিনয় /৩৫৮
বড় হওয়ার পথ ও পদ্ধতি /৩৫৯
ফকিরি শান নিয়ে ইসলামের ওকালতি /৩৬১
দারুল উলূম দেওবন্দের তালিবুল ইল্‌মের বিনয় /৩৬২
৩. যুহ্‌দ বা দুনিয়াবিমুখতা /২৬৩
যুহ্‌দ কাকে বলে /৩৬৪
অল্পে তুষ্ট হওয়ার ফযীলত /৩৬৪
সমস্ত গুনাহের মূল /৩৬৫
ওলামায়ে কেরামের রিযিকের ধারা /৩৬৫
খোদাপূজা অন্য এক বিষয় /৩৬৬
ভালো শিক্ষকের দুটি গুণ /৩৬৭
হযরত আলী (রাযি.)-এর ইখলাস /৩৬৭
হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর ইখলাস /৩৬৮
ইখলাসের গুরুত্ব /৩৬৯
খাঁদযুক্ত আমল আল্লাহর পছন্দ নয় /৩৬৯
হীরা ও ইখলাসের মূল্যে পার্থক্য /৩৬৯
মুফতী মুহাম্মদ হাসান ও ইখলাস /৩৭০
মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-এর ইখলাস /৩৭১
আমাদের নষ্ট আমলের বিনিময়ে জান্নাত /৩৭৩
ভ্রুতিযুক্ত সওদা /৩৭৩
রিয়ার কারণে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে হয় /৩৭৪
তালিবুল ইল্‌মদের যোগ্যতা তৈরির পদ্ধতি /৩৭৫
হযরত শাইখুল হিন্দ এবং ইল্‌মে জ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা /৩৭৫
মাওলানা ইয়াহয়া এবং ইল্‌ম ও জ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা /৩৭৬
মাওলানা নূর মুহাম্মদ পুন্টুবি এবং ইল্‌ম ও জ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা /৩৭৬
ইল্‌মি কাজে মগ্ন থাকা /৩৭৮

ইসলামের খেমতের প্রেরণা ও উদ্যম /৩৭৮
একটু চিন্তা করুন /৩৭৮
তাক্ওয়া ও খোদাভীতি /৩৮২
আল্লাহর নৈকট্য কীভাবে অর্জিত হয়? /৩৮২
وَرَعٌ (ওরা')-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ /৩৮৪
নেকির পরিচয় /৩৮৪
তিনটি অমূল্য কথা /৩৮৫
উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং হুসনে আখলাকের গুরুত্ব /৩৮৭
দুই শব্দে দীনের পূর্ণ কথা /৩৮৮
ইলসামের সারাংশ /৩৮৮
তিনটি বিস্ময়কর বিষয় /৩৮৮
সতর্কতার স্তর /৩৮৯
সতর্কতার সঙ্গে আমল করার মর্ম /৩৮৯
সতর্ক জীবন কীভাবে? /৩৯০
বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির পথ পরিহার করুন /৩৯১
তাক্ওয়ার শাব্দিক বিশ্লেষণ /৩৯১
কাজেকর্মে তাক্ওয়া অবলম্বন /৩৯২
গুনাহ্ পরিত্যাগ করার ফযিলত /৩৯৪
ইল্ম ও মাআরিফের বারিধারা /৩৯৬
তাক্ওয়ার কারণে বিনিময়ে প্রবৃদ্ধি বাড়ে /৩৯৬

সাফল্যের পাঁচ মূলনীতি /৪০০
আল্লাহর ওয়াদা /৪০০
জীবনের সারনির্যাস /৪০১
এক. ইল্ম অনুযায়ী আমল /৪০১
ইল্ম আছে তবু ধৈর্যহারা /৪০২
জানা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনার মধ্যে দুর্বলতা /৪০২
জানে তবু অন্য নারীতে চোখ তোলে /৪০৩
মাতাপিতার অবমূল্যায়ন /৪০৩
পানির অপচয় /৪০৪
জেনেশুনে মিথ্যে বলা /৪০৪
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /৪০৫
ইল্মে ওপর আমল না করার কারণ /৪০৬

আবর্জনা যদি মানুষের উপকার করত, তাহলে ... /৪০৬
দুই. বড়দের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়া /৪০৮
নসীহতের মর্মকথা /৪০৮
তরুণ যুবকদের অবাধ্য আচরণ /৪০৯
তিন. গুনাহের কারণে ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা /৪১১
সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা /৪১২
আজ আমেলদের দুয়ারে মানুষ /৪১৪
মুসিবত থেকে আত্মরক্ষা পাওয়ার পথনির্দেশ /৪১৫
ইস্তিগফার করবে সব সময় /৪১৬
ভুল না হলেও ইস্তেফগার করবে /৪১৬
চার. নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা /৪১৬
শুকরিয়া বিষয়ে তিন ব্যক্তির ঘটনা /৪১৭
নেয়ামত বেশুমার : দান অগণিত /৪২০
একে অন্যের মূল্যায়ন করবে /৪২০
ইংরেজদের একটি নীতি /৪২১
পাঁচ. মৃত মানুষ থেকে শিক্ষা নেয়া /৪২২
মায়ের মৃত্যুও আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হয় না /৪২২
বকরির মায়ের কল্যাণ কামনা /৪২২

দোরঙা আচরণ ছেড়ে দাও /৪২৬
ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে اِئْتُوْا শব্দ /৪২৬
وَاْ-এর কঠিনতা /৪২৭
বাস্তবতার আয়নায় আমাদের স্বরূপ /৪২৮
সবচেয়ে খারাপ রোগ /৪৩৫
খায়ের খাহীর নামই দীন /৪৩৬
অন্যকে নিজের ওপর প্রধান্যদান /৪৩৬
আমরা যখন সত্যিকার মুসলমান ছিলাম /৪৩৮
মুসলমানদের চালচলনে খায়েরখাহীর নিদর্শন /৪৩৮
ইসলামের সমুন্নতি /৪৩৯
বহুরূপী মানুষটি আমাদের চেয়েও উত্তম /৪৪১
নেসবতে মুহাম্মাদীর ফিকির /৪৪২
মাফ চাওয়ার আগেই মাফ করে দিল /৪৪৩
তোমার নেসবত থাকুক সালামাতে /৪৪৪

গাছে লুকায়িত রহস্যাবলি /৪৪৮
স্বাধীন মানুষের অবসর নেই /৪৪৮
প্রাকৃতিক পাঠশালা /৪৪৯
গাছে লুকানো রহস্যাবলি /৪৪৯
গাছ কেন মাটিতেই অঙ্কুরিত হয়? /৪৪৯
মাটিতে বীজ বপণ করার রহস্য /৪৪৯
একটি বীজের আত্মত্যাগে মানবের জন্য পয়গাম /৪৫০
গাছ হবে– গুল্ম নয় /৪৫১
গাছের শেকড় বহু নিচে প্রোথিত থাকে /৪৫১
দিনে ও রাতে গাছের বর্ধন /৪৫১
ঢাকনা ভেঙে গাছ উদগত হয় /৪৫২
গুনাহ তো শূন্য লতার মতো /৪৫২
শেকড়ের দৃষ্টান্ত তাহাজ্জুদের সাথে /৪৫২
গাছের আগায় সাপ ঝোলা /৪৫৩
গাছের মধ্যে তরুণ যুবকের জন্য রয়েছে বিশেষ বার্তা /৪৫৩
সস্তা জিনিস নিয়ে দামীটা দান করা /৪৫৫
হেমন্তের দিনে গাছগাছালির পয়গাম /৪৫৫
একেক ফলের একেক দাম; কী রহস্য তাতে? /৪৫৬
গাছ পুড়ে-পুড়ে নীরবে কী বার্তা শোনায়? /৪৫৭
বৃষ্টির দ্বারা গাছ সজীব হওয়ার মাঝে আমাদের শিক্ষা /৪৫৭
ফুল ও গুনাহের ওজনে সাদৃশ্য /৪৫৮
স্বজন্মা গাছ /৪৫৮
গাছের সাথে কথোপকথন /৪৫৮
শরীয়ত ও সুন্নাহের অনুসারী হয়েই বেঁচে থাকুন /৪৬০
চন্দনের সুগন্ধ কাঠের বার্তা /৪৬০
ফুলের পাঁপড়িগুলো পিষে যাওয়ার মাঝে বার্তা /৪৬১
একে অন্যের মূল্যায়ন করবে /৪৬১
ফুলের সাথে কাঁটা থাকবে : তবে কেন অভিযোগ /৪৬২
একটি মূল্যবান বাণী /৪৬২
গাছের ফলদানে উত্তম আখলাকের সবক /৪৬৩

খুতুবাতে যুলফিকার

পঞ্চদশ খণ্ড

কুরআন ও তাঁর বাহক

'আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীবকে কী মর্যাদা দিয়েছেন, আল্লাহ নিজেই বলছেন, হে প্রিয় নবী–

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

'আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী
সময় অপেক্ষা শ্রেয়।'

এটা এমন সুসংবাদ যা ভাষায় প্রকাশ করার শব্দ নেই। দুনিয়াতে বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারীদের উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু সাথে-সাথে অপমানের প্রহর গুনতে হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সুসংবাদও মিলেছে যে, হে নবী! আপনি যে উন্নতির সোপানে পদার্পণ করেছেন, তার আর পিছুটান নেই। সময় গড়িয়ে যতই সামনে অগ্রসর হবেন, ততই আপনার সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধিই হতে থাকবে।'

কুরআন ও তাঁর বাহক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ـ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

রবিউল আউয়াল মাস নিজের সাথে অনেক স্মরণীয় বিষয়কে সম্পৃক্ত করেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জন্ম এ-মাসে এবং মৃত্যুও এ-মাসে হয়েছে। এমনিতে তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী আলোচনা হতেই থাকে। কিন্তু এ-মাসে স্মরণীয় কাজটি নতুন উদ্যোগে অধিক সংখ্যায় হয়।

মহব্বতের দাবি

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরা পৃথিবীর প্রিয় বানিয়েছেন। মহব্বতের দাবি হলো, প্রেমাস্পদের আলোচনা সর্বদা হতে থাকবে। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা হয়, যার কারণে তার কথাবার্তায় অনেক সময়ই নিজের সন্তানের আলোচনা থাকে। আপনি তার কাছে যতটুকু সময় ব্যয় করবেন, সে কোনো-না-কোনোভাবে নিজ সন্তানের আলোচনা তুলবেই। এ-কারণে আল্লাহ তা'আলার কথার মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং আজকে আমরা দেখব, কুরআনে কারীমের দৃষ্টিতে তাঁর বাহকের স্থান কী, যাতে তাঁর মহব্বত আমাদের অন্তরে এসে যায়। আমার মতো একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এ-ব্যাপারে কথা বলা অত্যন্ত দুরুহ কাজ। যোগ্য ব্যক্তিগণ বলেছেন–

ہزار بار بشویم دہن ز مشک وگلاب

ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

'যদি আমি নিজের মুখকে মেশ্‌ক ও গোলাপ দ্বারা হাজারবার ধুই, তথাপিও হে রাসূল! আপনার নাম নেওয়া আমার জন্য বেয়াদবি।'

যাঁর প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যত করেছেন, তাঁর প্রশংসা আমি কী করব।

ইমাম আবু সবর (রহ.) বলেছেন–

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَيْسَ لَهُ

حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

'আল্লাহ তা'আলার হাবিবের মর্যাদা ও যোগ্যতার কোনো সীমা নেই। কোন মুখে আমি তাঁর গুণের বর্ণনা দেব। এতদ্‌সত্ত্বেও গুণাগুণ বর্ণনাকারীদের তালিকায় নাম উঠাতে সকল মুমিনের অন্তরের ইচ্ছা।'

একটু যদি কুরআনে মাজীদ খুলে চিন্তা করা যায় যে, এতে আমাদের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সম্বোধনে মহব্বতের প্রকাশ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে বিভিন্ন নবীকে সম্বোধন করেছেন তাদের নাম নিয়ে। যেমন– হে আদম! হে নূহ! হে যাকারিয়া! হে ইবরাহীম! হে মূসা! হে ঈসা! হে দাউদ! হে ইয়াহয়া! কিন্তু যেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করেছেন, সেখানে নাম উচ্চারণের মাধ্যমে করেননি। বরং তাঁর গুণাবলির মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করেছেন। যেমন– আল্লাহ বলেছেন, হে নবী! হে রাসূল! হে মুয্‌যাম্মিল! হে মুদ্দাছছির! এই সম্বোধনই বলে দেয়, আল্লাহ তাঁর প্রিয় ব্যক্তিকে কতটুকু মর্যাদার আসীনে সমাসীন করেছেন।

নবীজির প্রতিরোধ সুনির্দিষ্ট পন্থায়

আম্বিয়ায়ে কেরাম যখনই দুনিয়াতে এসেছেন, তখন এমন কিছু লোকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যাদের অন্তর পাথরের ন্যায় পাষাণ হয়ে থাকে।

তারা বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে যায়। তারা নবীদের ওপর বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে থাকে। যখনই নিজ সম্প্রদায় অপবাদের কাদা ছোড়ে, তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীদের মুখ দিয়ে তার প্রতিউত্তর করেন। জাতি যখন বলেছে, তুমি ভ্রষ্ট, তখন নবী প্রতিউত্তরে বলেছেন–

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلَالَةٌ

'হে আমার সম্প্রদায়! আমি ভ্রষ্ট নই।'[১]

জাতি যখন বলেছে, তুমি নের্বোধ তার প্রতিউত্তর নবী এভাবে দিয়েছেন–

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ

'হে! আমার জাতি আমি নের্বোধ নই।'[২]

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরও তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু লোক অপবাদ দিয়েছে। উদাহরণত, এক লোক বলেছে, এ তো পাগল। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে উত্তর না করিয়ে স্বয়ং নিজেই তার জবাব দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন–

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ۔ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ۔

'হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনি আপনার রবের অনুগ্রহে পাগল নন।'[৩]

চিন্তা করলে বুঝে আসবে, এখানে আল্লাহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করেছেন।

প্রিয়র প্রিয়তম আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যখন নবীদের আলোচনা করেছেন, তখন সর্বাগ্রে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করেছেন। যদিও তিনি সবার শেষে আগমন করেছেন।

শুনুন, কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৬১
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৬৭
৩. সূরা আল ক্বালাম : আয়াত ১-২

'স্মরণ করো, যখন আমি নবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারয়ামতনয় ঈসার নিকট হতেও'।[৪]

উক্ত আয়াতে কারীমায় অন্য নবীদের আলোচনা করার পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করেছেন। হযরত ওমর (রাযি.) যখন উক্ত আয়াত শুনেছেন, তখন হর্ষোল্লাসে তিনি বলতে লাগলেন, হে নবী! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনাকে আল্লাহ তা'আলা কত মর্যাদা দিয়েছেন! যদিও আপনি শেষ নবী হয়ে সকলের পরে আগমন করেছেন; কিন্তু যখনই আল্লাহ অন্যান্য নবীদের আলোচনা করেছেন, তখনই আপনার আলোচনা সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আম্বিয়া কেরামের ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য নবীদের থেকে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার নিয়েছেন, যার বর্ণনা কুরআনে হাকীমে এভাবে এসেছে–

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

'এবং আল্লাহ যখন নবীগণ থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুটি নিয়েছিলেন যে, আমি যদি তোমাদের কিতাব ও হেকমত দান করি, তারপর তোমাদের নিকট কোনো রাসূল আগমন করে, যে তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সমর্থন করে, তবে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তার সাহায্য করবে।'[৫]

আল্লাহ বললেন–

أَأَقْرَرْتُمْ

তোমরা একথা স্বীকার করছ কি?[৬]

---

৪. সূরা আহযাব : আয়াত ৭

৫. সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : আয়াত ৮১

৬. প্রাগুক্ত : আয়াত ৮১

وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي

এবং আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত এ দায়িত্ব গ্রহণ করছ কি?[৭]

সকল নবী তার প্রতি উত্তর করেছেন–

قَالُوا أَقْرَرْنَا

তারা বলেছিল, আমরা স্বীকার করে নিয়েছি।[৮]

قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

আল্লাহ বললেন, তবে তোমরা (একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে) সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম।[৯]

উক্ত আয়াতে 'রাসূল' দ্বারা আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই উদ্দেশ্য। আল্লাহু আকবার!

আল্লাহপ্রদত্ত অসংখ্য নেয়ামতরাজি

আল্লাহ তা'আলা মানুষদের এত নেয়ামত দিয়েছেন, যা গণনা করে আমরা কখনও শেষ করতে পারব না। আল্লাহ বলেন–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

'তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে তা গণনা করতে পারবে না।'[১০]

বাস্তবেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের অগণিত নেয়ামত দান করেছেন। কিন্তু কোনো নেয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের খোঁটা দেননি। কখনও এভাবে বলেননি যে, আমার বান্দারা, আমি তোমাদের চক্ষুদ্বয় দিয়েছি, জ্ঞান দিয়েছি, পানি দিয়েছি, বাতাস দিয়েছি, আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত কোনো নেয়ামতেরই খোঁটা দেননি। কিন্তু একটি নেয়ামত এমন ছিল যে, মনে হয় সেটি দিয়ে আল্লাহর নিজেরই তৃপ্তি এসেছে, এমনকি সে ব্যাপারে তিনি খোঁটা দিয়ে বসেছেন।

---

৭. প্রাগুক্ত : আয়াত ৮১
৮. প্রাগুক্ত : আয়াত ৮১
৯. প্রাগুক্ত : আয়াত ৮১
১০. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৪

আল্লাহ বলেছেন–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا

'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের জন্য তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন।'[১১]

উত্তম চরিত্রের আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৎ চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন–

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ

'নিশ্চয় আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।'[১২]

মহৎ অনুগ্রহের আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহ তা'আলার বড়ই অনুগ্রহ ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার আলোচনা কুরআনেও স্থান দিয়েছেন এবং বলেছেন–

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

'হে আমার প্রিয়! আপনার ওপর আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে।'[১৩]

বিশ্বজগতের রহমত

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

'আমি আপনাকে বিশ্বজাহানের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।'[১৪]

جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپالے
جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے

---

১১. সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ১৬৪
১২. সূরা আল-কালাম : আয়াত ৪
১৩. সূরা নিসা : আয়াত ১১৩
১৪. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৭

اسے اور کیا نام دے گا زمانہ

وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے

যিনি অপরাধীকে নিজ আঁচলে আশ্রয় দেন।
যিনি দুশমনের আঘাতেও তাদের আশীর্বাদ দেন।
তাঁকে কোন নামে স্মরণ করবে কাল?
তিনি রহমত নয় তো আর কিছু।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্বের বরকত কাফেরদের জন্য

আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতের আলোচনাও কুরআনে করেছেন। তিনি বলেন–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

'আপনার উপস্থিতিতে আল্লাহ তাদের আযাব দেবেন না।'[১৫]

প্রেক্ষাপট এই ছিল যে, কাফেররা এসে বলত, আমরা আপনার রাসূল হওয়াকে বিশ্বাস করি না। যদি আপনি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে কেন আমাদের ওপর আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হয় না? কিন্তু আল্লাহর নবীর উপস্থিতিতে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসেনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উক্ত আলোচনা-ই করেছেন যে, হে আমার প্রিয় বন্ধু! আল্লাহ তাদের তখন পর্যন্ত আযাব দেবেন না; যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে থাকবেন। তাঁর পবিত্র উপস্থিতির বরকত এত বেশি ছিল যে, আল্লাহ কাফেরদের থেকেও আযাব উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আজকের এ দিনেও যার জীবনে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত থাকবে এবং যে-সম্প্রদায়ের মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা থাকবে, তার বরকতে আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তিকে এবং ওই সম্প্রদায়কে আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

নবীজির অনুসরণের মহত্ত্ব

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড়ত্ব দেখুন। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

---

১৪. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৩

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

'যে-ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করল, সে বস্তুত আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করল।'[১৬]

আল্লাহর রাসূলের মর্যাদা ও বড়ত্ব দেখুন। নবীর অনুসরণকে আল্লাহর নিজের অনুসরণ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

اطاعت نبی کی ہے اطاعت خدا کی

منزل من اللہ پیام اللہ اللہ

'নবীর অনুসরণই আল্লাহর অনুসরণ, মর্যাদাও আল্লাহর, বার্তাও আল্লাহর।'

আল্লাহর সাহায্যের আলোচনা

আল্লাহ তাঁর হাবীবের সাহায্যকারী ও তার কার্যাদি সম্পাদনকারী ছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا

'আল্লাহর ওপর ভরসা করুন এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠ অভিভাবক।'[১৭]

দুনিয়াতে যদি কেউ মামলায় জিতে, তাহলে সে বলে, আমার উকিল অনেক বিজ্ঞ ছিলেন। আর যার উকিল স্বয়ং আল্লাহ হন, তার তো সফলতা পদচুম্বন করবে। এজন্য মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সমস্ত প্রশংসা একক সত্তার, যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং নিজেই দুশমনদের পরাস্ত করেছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কেমন প্রশংসা করেছেন।

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ

'ওই আল্লাহ, যিনি নিজ সাহায্যের মাধ্যমে আপনাকে শক্তিশালী করেছেন।'[১৮]

---

১৬. সূরা নিসা : আয়াত ৮০

১৭. সূরা আহযাব : আয়াত ৪৮

১৮. সূরা আনফাল : আয়াত ৬২

উপহাসকারীদের শেষ পরিণাম

যারা আল্লাহর নবীর সাথে উপহাস করত, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন–

হে আমার প্রিয় বন্ধু!

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

'আপনার উপহাসকারীদের জন্য আমিই যথেষ্ট।'[১৯]

আপনার চিন্তা করতে হবে না। আমিই আপনার পক্ষ হতে তাদের লাঞ্ছিত করব। ইতিহাস তার সাক্ষী আছে। আবুজাহলের শেষ পরিণতি কী ঘটেছে? আবুলাহাবের পরিণতি দেখুন। উতবা ও শাইবার পরিণতি দেখুন। নাপাক ওলীদের পরিণতি দেখনু। এরা ওই সমস্ত লোক, যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে উপহাস করত। পরিশেষে তাদের কত খারাপ পরিণত ঘটেছে!

পাগল আখ্যাদানকারীদের ভর্ৎসনা

এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগল আখ্যা দিল। আল্লাহ তার ওপর এত বেশি গোস্বা হলেন, যার আলোচনা আল্লাহ কুরআনে করেছেন। বিষয়টি মনে হয় এমন যে, কেউ কারও মায়ের সন্তানকে গালি দিয়েছে আর তার প্রতিউত্তরে মা কিছুই বলেনি। বরং নীরবতাকে পুঁজি করে, তার রাগ ঠান্ডা-ই হয় না। তার মন চায়, আমি গালিদাতাকে এমন কিছু বলি, যাতে তার শিক্ষা হয়ে যায়, যাতে ভবিষ্যতে এমন কথা বলার দুঃসাহস না হয়। এমনকি যে-ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগল আখ্যা দিয়েছে, তার উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেছেন–

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ

'আপনি শপথকারী হীন চরিত্রের লোকের অনুসরণ করবেন না।'[২০]

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

চোগলখোরের।[২১]

---

১৯. সূরা হুজুরাত : আয়াত ৬২
২০. সূরা আল-কলাম : আয়াত ১০
২১. সূরা আল-কলাম : আয়াত ১১

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ

ভালো কাজে বাধা সৃষ্টিকারী ব্যক্তির।

مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধীর।[২২]

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

সর্বোপরি যে রূঢ় মেজাজের অধিকারী ও জারজ সন্তান।[২৩]

আল্লাহু আকবার! সর্বশেষ বললেন, সে তো জারজ সন্তান। তার এক কথার প্রতিউত্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কত কথা বললেন। এতে অনুমান করা যায়, নবীর দুশমনদের ওপর আল্লাহ কত বেশি রাগান্বিত হন।

সান্ত্বনার বাণী

অন্য দিকে আল্লাহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বললেন, হে আমার প্রিয় বন্ধু! আপনার দুশমনরা ষড়যন্ত্র করে, যাতে আপনি ব্যথিত হন। আপনি তাদের কথায় ব্যথিত হবেন না।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

এবং (হে নবী) আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আপনার ধৈর্য তো আল্লহরই সাহায্যে হবে। আপনি কাফেরদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে, তার কারণে কুণ্ঠিত এবং মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আল্লাহ তাদেরই সাথী, যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।[২৪]

যে-ব্যক্তির উক্ত আয়াতের সাথে নূন্যতম সম্পর্ক আছে, তার উক্ত আয়াত পাঠে আনন্দ অনুভূত হবে যে, আল্লাহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত ভালোবাসার সাথে সান্ত্বনা দিয়েছেন, যা পড়ে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। এজন্য কুরআন ধীরে-ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে।

---

২২. সূরা আল-কলাম : আয়াত ১২

২৩. সূরা আল-কালাম : আয়াত ১৩

২৪. সূরা নাহল : আয়াত ১২৭

আল্লাহ বলেন–

كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ

হে আমার প্রিয়! এজন্য যে, আপনার অন্তর যাতে প্রশান্তি লাভ করে।[২৫]

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ

(হে নবী) সেই সময়কে স্মরণ করুন, যখন কাফেররা ষড়যন্ত্র করছিল যে, তারা আপনাকে বন্দি করবে।

أَوْ يَقْتُلُوكَ

অথবা হত্যা করবে।

أَوْ يُخْرِجُوكَ

অথবা দেশান্তর করবে।

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ

তারা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল। আর আল্লাহও কৌশল ঠিক করছিলেন।

وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

বস্তুত আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কুশলী।[২৬]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষার বর্ণনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। আল্লাহ কুরআনে তারও বর্ণনা দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন–

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

(হে নবী) আল্লাহ আপনাকে সকল মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।[২৭]

অর্থাৎ– যে অসৎ উদ্দেশ্যে আপনার নিকট আসতে চাইবে। আপনার প্রতিপালক আপনাকে রক্ষা করবেন।

---

২৫. সূরা ফুরকান : আয়াত ৩২
২৬. সূরা আনফাল : আয়াত ৩০
২৭. সূরা মায়েদা : আয়াত ৬৭

فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے

وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

প্রদীপ হয়ে যার রক্ষা করবেন খোদা।
ওই আলো কি নিভিবে কখনও যা জ্বালিয়েছেন স্বয়ং খোদা।

প্রেমাস্পদের তত্ত্বাবধানে থাকার স্বাদ

তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– হে আমার মাহবুব! আপনি সদা আমার তত্ত্বাবধানেই থাকেন। এটা এমন এক কথা, যার প্রেম সম্পর্কে জানা আছে, সে বোঝে, প্রিয়ার তত্ত্বাবধানে সর্বদা থাকা কত আনন্দের বিষয়। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন–

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

(হে নবী) আপনি আল্লাহর আদেশের ওপর অবিচল থাকুন। কেননা, আপনি আমার তত্ত্বাবধানে আছেন।[২৮]

হযরত আয়েশা যখন উক্ত আয়াতটি শুনলেন, তখন বললেন, হে আল্লাহর প্রিয় দোস্ত! আল্লাহ আপনাকে কত সম্মান দিয়েছেন, যে আল্লাহ নিজে বলছেন, আপনি তার তত্ত্বাবধানে আছেন। আল্লাহু আকবার!

آنکھوں میں بھر گئی ہیں قیامت کی شوخیاں

دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں

চোখের মধ্যে ভরে গেছে কেয়ামতের লম্পঝম্ফ। কারণ, সে দু-চারটা দিন একজনের দৃষ্টিতে সময় পার করেছিল।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো পুরো জীবনই আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے

وہ اپنی خوبی و قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے

অর্থ : বন্ধুর চোখ যারই ওপর পতিত হয়, তাকেই রহস্য বানিয়ে দেয়। নিজের সৌন্দর্য ও ভাগ্যের জন্য তিনি তো অভিমান দেখাবেনই।

---

২৮. সূরা নাজম : আয়াত ৪৮

সবচেয়ে বড় সুসংবাদ

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীবকে কী মর্যাদা দিয়েছেন, আল্লাহ নিজেই বলছেন, হে প্রিয় নবী–

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

আপনার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।

এটা এমন সুসংবাদ যা ভাষায় প্রকাশ করার শব্দ নেই। দুনিয়াতে বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারীদের উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু সাথে-সাথে অপমানের প্রহর গুনতে হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সুসংবাদও মিলেছে যে, হে নবী! আপনি যে উন্নতির সোপানে পদার্পণ করেছেন, তার আর পিছুটান নেই। সময় গড়িয়ে যতই সামনে অগ্রসর হবেন, ততই আপনার সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধিই হতে থাকবে।

হাশরে সম্মানের উপযুক্ত কে হবে?

আল্লাহ তাঁর বন্ধুর কেয়ামত দিবসের অবস্থার বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেছেন–

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাঁর নবীকে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের অপমানিত করবেন না।[২৯]

কোনো মা তার সন্তানকে অন্য মানুষের সামনে এমন কথা বলেন না, যাতে সন্তানের মানহানি হয়। আল্লাহর তাঁর বন্ধুর সাথে মহব্বত ছিল। এজন্য তাঁকে এমন সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, কেয়ামত দিবসে আপনাকে ও আপনার উম্মতের প্রতি ঈমানদার যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

এখন একটি ছোট্ট কথা বুঝে নিন। যদি কোনো মায়ের কাছে তার সন্তানের ছবি ইত্যাদি থাকে, যা সে পরিচয়পত্র বা পাসপোর্টে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তুলেছে, আপনি যদি উক্ত সন্তানের মাকে বলেন, আপনি এ ছবিটা চুলায় দিয়ে দিন, তখন মা এমন করতে অস্বীকার করবে এবং সাথে-সাথে বলবে, আমি আমার সন্তানকে চুলায় কীভাবে ফেলব? সন্তানের প্রতি মায়ের যদি এতো গভীর ভালোবাসা হয়, যার কারণে সন্তানের ছবি আগুনে ফেলতে

---

২৯. সূরা তাহরীম : আয়াত ৮

পারে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতো ভালোবাসেন যে, কেউ যদি তাঁর হাবীবের আকার-আকৃতি ধারণ করে এবং তার ন্যায় সুন্নতি লেবাস ও আমল ধারণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও কেয়ামত দিবসে তার ছবি জাহান্নামে ফেলবেন না।

নবীজির মে'রাজের আলোচনা

আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে সাক্ষাতের জন্য নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। সেটাকে মে'রাজ বলে। তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ বলেন, এতটুকু কাছে গেছেন যে,

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔

তারপর সে নিকটে এল এবং ঝুঁকে গেল। এমনকি দুই ধনুকের দূরত্ব পরিমাণ কাছে এসে গেল; বরং তার চেয়েও বেশি নিকটে।[৩০]

আল্লাহর বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত পথ অতিক্রম করেছেন। পরিশেষে তার এমন স্থানে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে, যা বুঝশক্তির ঊর্ধ্বে এবং দুই ধনুকের মিলন থেকেও কম নহে।

তারপর অন্যত্র বললেন–

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

সত্য কথা হলো, তিনি তাঁর প্রতিপালকের বড়-বড় নিদর্শনের মধ্যে হতে বহু কিছু দেখেছেন।[৩১]

সশরীরে তাঁর আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ হয়েছে। এটা একমাত্র তারই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, আল্লাহ তাঁকে মে'রাজ নসিব করেছেন। তাঁকে ডেকে জান্নাত-জাহান্নাম দেখিয়েছেন। এর কারণ কী? এর অনেক কারণ থাকতে পারে, তার মধ্য হতে একটি কারণ এটাও যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেয়ামত দিবসে তাঁকে সুপারিশ করতে হবে। আর নিজেরই রাস্তা জানা নেই, সে অন্যকে কীভাবে পথপ্রদর্শন করবেন? স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখি যে, কেউ যদি তার মাতাপিতাকে হজ করাতে চায়, তাহলে প্রথমে সে নিজে হজ করে আসে, যাতে সে নিয়মনীতি সম্পর্কে ধারণা নিতে

---

৩০. সূরা নাজম : আয়াত ৮-৯

৩১. সূরা নাজম : আয়াত ১৮

পারে। তারপর পরবর্তী বছর তার মাতাপিতাকে নিশ্চিন্তে হজ করাতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তা'আলা মে'রাজ এ-কারণে করিয়েছেন যে, তিনি তাঁর মাহবুবকে বোঝাতে চেয়েছেন, হে আমার প্রিয় নবী! আপনি জান্নাত-জাহান্নাম পুলসিরাত স্বচক্ষে দেখুন। তারপর যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে, তখন আপনার উম্মতের ব্যাপারে সুপারিশ করতে কোনো ধরনের ভয়ভীতি থাকবে না। সুবহান্নাল্লাহ!

تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا

میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

তোমার মে'রাজ তো ছিল লওহ্ ও কলম পর্যন্ত,

আর আমার মে'রাজ হলো তোমার কদম পর্যন্ত।

আল্লাহ আমাদের তাঁর প্রেমাস্পদের পূর্ণ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আল্লাহপ্রদত্ত উপঢৌকনের বর্ণনা

আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে অসংখ্য উপঢৌকন দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন–

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি।[৩২]

কাওছার দ্বারা উদ্দেশ্য 'সৌভাগ্যের ভান্ডার'। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীবকে সৌভাগ্যের ভান্ডার দান করেছেন। উক্ত خیر کثیر এর ওপর ওলামায়ে কেরাম অনেক কিতাব রচনা করেছেন। উক্ত خیر کثیر এর তাফসীর কী?

وجل مقدار ما ولیت من رتب

وعذا ادرك ما اولیت من نعم

আল্লাহ হাবীবের যে মর্যাদার আসন মিলেছে, তা অনেক সুবিশাল এবং যে সমস্ত নেয়ামত মিলেছে, তাও বিবেকের ঊর্ধ্বে।

---

৩২. সূরা কাউছার : আয়াত ১

এটা এমন বিষয়, যার বর্ণনা কুরআনে শুধু মৌলিকভাবে উল্লেখ করেছে। এখন আমরা সামনে অগ্রসর হই।

শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের বর্ণনা

কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন অঙ্গের আলোচনাও স্থান পেয়েছে। যেমন– মা তার সন্তানের কখনও চোখের বর্ণনা দেয়। আবার কখনও বাচনভঙ্গির বর্ণনা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর হাবীবের বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা কুরআনে দিয়েছেন। সে কেমন সত্তা, যার সাথে আল্লাহর এতো ভালোবাসা। তাঁর অঙ্গসমূহের আলোচনা কুরআনে দেখুন, যাকে আল্লাহ্ সৌন্দর্যের আঁধার বানিয়েছেন।

অবয়বের বর্ণনা

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ

(হে নবী) আমি আপনাকে আপনার চেহারাটি বারবার আকাশের দিকে উঠতে দেখছি।[৩৩]

এখন তার বিস্তারিত বর্ণনা শুনুন। যার সাথে ভালোবাসা ও প্রেমের সম্পর্ক। মন চায় তার সাথে বারবার সম্পর্ক গড়ার। বান্দা সম্পর্কের বাহানা খোঁজে। যতই সাক্ষাৎ লাভ হয়, তা নিতান্তই কম মনে হয়। যেমন– অনেক নবীর কাছে আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এসেছেন। কারও কাছে এক ডজনবার কারও কাছে কয়েক ডজনবার। কারও কাছে কয়েক শতবার। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চল্লিশ হাজারবার এসেছেন এবং জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন আল্লাহর রাসূলের কাছে এতো ভালো লাগে (কেননা আল্লাহর পক্ষ হতে সংবাদ নিয়ে আসে।) যে, তিনি তাঁর অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অপেক্ষার প্রহর গুনতেন, এ-কারণে তার অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনি যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তখন আমি আপনার চেহারা ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখি।

---

৩৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৪

বরকতময় চোখের আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় চোখের বর্ণনাও কুরআনে স্থান পেয়েছে।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ

তাদেরকে (কাফেরদেরকে) দুনিয়ার যে সমস্ত নেয়ামতরাজি দিয়েছি, তার দিকে তাকাবেনও না।[৩৪]

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চক্ষুর আলোচনা কুরআনে করেছেন যে, হে আমার হাবীব! কাফেরদের যে সমস্ত নেয়ামতরাজি দেওয়া হয়েছে, তার দিকে আপনি চোখ তুলেও তাকাবেন না। কিন্তু উক্ত আয়াতে চক্ষুর আলোচনা তো হয়ে গেছে। তা তো ভালোবাসার কারণেই ছিল। অনুরূপ যে অঙ্গই ভালো লাগে, তারই আলোচনা আল্লাহ করেন।

বরকতময় কানের আলোচনা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কানের আলোচনাও কুরআনে স্থান পেয়েছে।

যেমনটি কাফেররা বলেছে–

وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ

এবং তাঁর সম্পর্কে বলে, সে তো আপাদমস্তক কান। বলে দাও, তোমাদের জন্য যা মঙ্গলজনক, সে তারই কান।[৩৫]

বরকতময় জিহ্বার আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জিহ্বার আলোচনাও কুরআনে রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন–

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

(হে রাসূল) আপনি এ কুরআনকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য আপনার জিহ্বা নাড়িয়ো না।[৩৬]

---

৩৪. সূরা তোয়া-হা : আয়াত ১৩১
৩৫. সূরা তাওবা : আয়াত ৬১
৩৬. সূরা কিয়ামাহ : আয়াত ১৬

বরকতময় বক্ষের বর্ণনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বক্ষের আলোচনাও কুরআনে স্থান পেয়েছে। যেমন বলেছেন–

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

আমি কি আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করিনি?[৩৭]

সুবহানাল্লাহ! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ মোবারকের আলোচনা হচ্ছে।

এখন একটি সূক্ষ্ম কথা শুনুন। প্রেম-ভালোবাসার একটি দিক এই হয় যে, কেউ কাউকে ভালোবাসল। এমতাবস্থায় বিবেচনার দিক একদিকে হয়ে থাকে। আরেকটি এও আছে যে, সে নিজে কাউকে ভালোবাসে, তখন প্রেমাস্পদের সাথে আচরণ ভিন্ন হয় এবং পরিভাষায় এজন্য দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়–

১. সালেক।

২. মাজযুব।

আপনি দেখবেন, যারা আপনার সাথে মহব্বত রাখে, তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যে, সে যদি বলে, আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই, তখন আপনি তাকে ঠিকানা দিয়ে বলে দেন, হ্যাঁ ভাই আপনি বাড়িতে এসে সাক্ষাৎ করুন। আর কিছু বন্ধু এমন হয়, আপনার সাথে যার অনেক দিন পর সাক্ষাৎ, তখন আপনি তার হাত ধরে বলেন, আসো আমি তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। প্রথম বন্ধুকে ঠিকানা দিয়ে দেওয়া, আর দ্বিতীয় বন্ধুকে হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে যেমন পার্থক্য, ঠিক সালেক আর মাজযুবের মধ্যে এমন পার্থক্য।

হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে মিলিত হতে চেয়েছেন, যার আলোচনা আল্লাহ কুরআনে করেছেন।

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا

যখন মূসা আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তুর পাহাড়ে এল।[৩৮]

---

৩৭. সূরা ইনশিরাহ : আয়াত ১

৩৮. সূরা আ'রাফ

উক্ত আয়াতে মূসা (আ.)-এর আল্লাহর সাক্ষাতের তুর পাহাড়ে আসার আলোচনা এসেছে। আর যেখানে নবী আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলিত হওয়ার আলোচনা হয়েছে, সেখানে আল্লাহ একথা বলেননি যে, সে এসেছে, বরং বর্ণনা এভাবে এসেছে–

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান।[৩৯]

কেম যেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যাওয়ার কাজটি আল্লাহ নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে দু'আ চেয়েছেন এ-ভাষায়–

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে দিন।[৪০]

তিনিও আল্লাহর নবী। আল্লাহর সাথে তাঁর কথোপোকথন হয়েছে। কিন্তু তাঁর চাওয়াতে হয়েছে। আর এখানে দু'আর কোনো আলোচনা নেই। বরং আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

হে আমার প্রিয় হাবীব! আমি কি আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করিনি?

এতে অনুমান করা যায়, আল্লাহর কাছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত মর্যাদা রয়েছে।

পিঠের আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের আলোচনাও কুরআনে হাকীমে রয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۔

আমি আপনার থেকে অপসারণ করেছি সেই ভার, যা আপনার কোমর ভেঙে দিচ্ছিল।[৪১]

---

৩৯. সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ০১

৪০. সূরা ত্বহা : আয়াত ২৫

৪১. সূরা ইনশিরাহ : আয়াত ০২-০৩

বরকতপূর্ণ হাতের আলোচনা

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুর মুবারক হাতের আলোচনাও করেছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

(হে রাসূল!) আপনার হাতের কাছে যারা বায়আত গ্রহণ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর বায়আত গ্রহণ করেছে। তাদের হাতের ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে।[৪২]

বাহ্যিকভাবে তাদের বায়আত আল্লাহর রাসূলের হাতে ছিল। কিন্তু বাস্তব অর্থে আল্লাহ বলেছেন, বায়আত আল্লাহর হাতে ছিল। ভাগ্যবান ওই সমস্ত লোক, যাদের হাত এমন বড় ব্যক্তিত্বের হাতে লেগেছে।

আমার দিন লুকিয়ে আছে কোন রজনীতে আর রজনী লুকিয়ে আছে কোনো সত্তার ভেতরে।

আমার জীবন একটি রহস্যে ঘেরা, কোন রহস্য আছে আমার সত্তায়।

আমি যেখানে আটকে গেছি, সেখানে পড়তে-পড়তে সমাধান হয়ে গেছে।

আমি ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পেরেছি, আমার হাতে অন্য কারও হাত রয়েছে।

ওই সমস্ত মহামনীষীরা কত সৌভাগ্যশালী, যাদের হাত আল্লাহর কব্জায় এসেছে।

বরকতময় পদযুগলের আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক পদযুগলের আলোচনাও কুরআনে এসেছে। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন–

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا

আপনি সেখানে কখনও দাঁড়াবেন না।[৪৩]

অর্থাৎ– আপনি ওই স্থানে পা ফেলবেন না। যেখানে আপনাকে পা রাখাতে বারণ করা হয়েছে।

---

৪২. সূরা ফাতাহ্ : আয়াত ১০

৪৩. সূরা তাওবা : আয়াত ১০৮

মোবারক পোশাকের আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাকের আলোচনাও কুরআনে আছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

আপনি আপনার পোশাককে পাক-পবিত্র রাখুন।[৪৪]

নবীজির মাথা হতে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঙ্গের আলোচনা আল্লাহ্ কুরআনে করেছেন। তারপর যে পোশাকে রাসূল আচ্ছাদিত হতেন, তার আলোচনাও কুরআনে স্থান পেয়েছে।

কবি বলেছেন, হে প্রিয়! আপনি যে পোশাক পরিধান করেছেন, এ পোশাকে আপনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়নি, বরং আপনার পরিধান করায় পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের আলোচনা

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ঘরের আলোচনাও কুরআনে আছে। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ

নিশ্চয় যারা আপনাকে ঘরের বাইরে থেকে ডাকে।[৪৫]

এখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ঘরের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

পরিবারের আলোচনা

নবীজির পরিবারস্থ লোকদের আলোচনাও কুরআনে রয়েছে। তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য মানুষের স্ত্রীদের মতো নয়।[৪৬]

---

৪৪. সূরা মুদ্দাছির : আয়াত ০৪

৪৫. সূরা হুজরাত : আয়াত ৪

৪৬. সূরা আহযাব : আয়াত ৩২

অর্থাৎ– আল্লাহর কাছে তোমাদের অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে। বরং অন্যত্রে আল্লাহ বলেছেন–

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

নবীপত্নীগণ তোমাদের মা।[৪৭]

শুধু কুরআনে আলোচনা এনেই ক্ষান্ত করেননি, বরং তাদেরকে মায়ের মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছেন।

পরিবারবর্গের সতীত্বের আলোচনা

তারপর তাদের সতীত্বের আলোচনা কুরআনে রয়েছে–

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

তোমার পবিত্রতা, ইহা প্রকাশ্য অপবাদ।[৪৮]

চার মেয়ের আলোচনা

নবী আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়েদের আলোচনাও কুরআনে আছে–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ

হে আমার প্রিয় নবী! আপনি আপনার স্ত্রী ও মেয়েদের বলে দিন।[৪৯]

ছেলেদের আলোচনা

দেখুন, আল্লাহর রাসূলের ছেলের আলোচনা কুরআনে স্থান পেয়েছে।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ

মুহাম্মদ তোমাদের কারও পিতা নয়।[৫০]

উক্ত আয়াতে কেমন যেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ইবরাহীমের আলোচনাও স্থান পেয়েছে, যে ছোট বেলায়ই মহান আল্লাহর সানিধ্যে চলে গেছেন।

---

৪৭. সূরা আহযাব : আয়াত ০৬
৪৮. সূরা নূর : আয়াত ১৬
৪৯. সূরা আহযাব : আয়াত ৫৯
৫০. সূরা আহযাব : আয়াত ৪০

আহলে বাইতের আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারস্থ লোকদের আলোচনাও করা হয়েছে কুরআনে। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

হে নবী পরিবার (আহলে বাইত)! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে মলিনতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে এমন পবিত্রতা দান করতে, যা সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হবে।[৫১]

মসজিদে নববীর আলোচনা

তারপর দেখুন, মানুষের ঘরে অবস্থান হওয়ার পর বেশি ওঠা-বসা মসজিদে হয়। এ-কারণে ঘরের আলোচনার পর মসজিদের আলোচনা কুরআনে এসেছে।

ইরশাদ হয়েছে–

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাক্ওয়ার ওপর স্থাপিত হয়েছে, সেটাই তোমার দাঁড়ানোর বেশি হকদার।[৫২]

নামাযীদের আলোচনা

তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধুদের আলোচনাও কুরআনে এসেছে।

ইরশাদ হচ্ছে–

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপসে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র।[৫৩]

তাদের বিশেষ গুণের আলোচনা করলেন আর বললেন, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপসে অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

---

৫১. সূরা আহযাব : আয়াত ৩৩

৫২. সূরা তাওবা : আয়াত ১০৮

৫৩. সূরা ফাতাহ : আয়াত ২৯

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی نرم
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

তুমি হয়েছ বৃষ্টির ফোঁটার ন্যায়, রেশমের মতো কোমল,
যুদ্ধক্ষেত্রে হয়ে যায় মুমিন ইস্পাতকঠিন।

মেহমানদের দাওয়াতের আলোচনা

আল্লাহর রাসূলের কাছে মেহমান আসত আর তারা খানাও খেত। উক্ত দাওয়াতের আলোচনাও রয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا

যখন তোমরা খাবার শেষ করবে, তখন ঘরে চলে যাও।[৫৪]

নিকটাত্মীয়দের আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম আত্মীয়দের আলোচনাও কুরআনে রয়েছে। ইরশাদ করেছেন–

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ছাড়া।[৫৫]

এতে অনুমান করা যায়, আল্লাহ কুরআনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করার পাশাপাশি তাঁর সাথে সম্পর্কীয় লোকদের আলোচনাও করেছেন।

ইল্‌মে নববীর আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র-মর্যাদার আলোচনাও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

---

৫৪. সূরা আহযাব : আয়াত ৫৩
৫৫. সূরা শুরা : আয়াত ২৩

এবং তোমাকে এমনসব বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছেন, যা তুমি জানতে না।[৫৬]

এবং অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

قُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।[৫৭]

সুন্দর বাক্‌শক্তির বর্ণনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর বর্ণনা শক্তির আলোচনাও কুরআনে এসেছে। ইরশাদ হয়েছে–

হে আমার প্রিয় হাবীব!

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

আপনি লোকদের নিজ প্রতিপালকের দিকে ডাকুন হেকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে।[৫৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় এমন এমন আকর্ষণ ও মাধুর্য ছিল যে, যে-ই শুনত, সাথে-সাথে তার অন্তরে তা গেঁতে যেত, হৃদয় তাকে গ্রহণ করে নিত। জনৈক কবি কতই-না সুন্দর বলেছেন!

وہ شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی ● تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی

অর্থ : সেই মিষ্টিমধুর কথা হে আমার মক্কি-মাদানি প্রিয়তম!
তোমার ঠোঁট গলে ঝরেছে (মুক্তাদানার মতো) আমার মাদানি প্রিয়!

تیرا پھلاو بہت ہے تیرا قامت ہے بلند ● تیری چھاوں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی

অর্থ : তোমার বিস্তার বিপুল, তোমার অবয়ব সমুন্নত
তোমার ছায়াও ঘন-গাঢ় হে মক্কি-মাদানি!

نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم ● تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی

অর্থ : প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা তোমার অস্তিত্বের কাছে চিরঋণী
তুমি ধনীর দুলাল ধনী আমার প্রিয় মক্কি-মাদানি!

---

৫৬. সূরা নিসা : আয়াত ১১৩
৫৭. সূরা ত্বাহা : আয়াত ১১৪
৫৮. সূরা নাহল : আয়াত ১২৫

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নম্রতার আলোচনা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নম্রতার আলোচনা কুরআনে এসেছে। আল্লাহ বলেন–

যদি আপনি পাষাণ হতেন, তাহলে আপনার আশপাশের লোকেরা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যেত।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন আকর্ষণশক্তি দেওয়া হয়েছে যে, যে-ই তাঁর কাছে আসত, সে-ই তাঁর অনুরক্ত হয়ে যেত।

ধৈর্য ও সহনশীলতার আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্য ও সহনশীলতার আলোচনা কুরআনে এসেছে।

আল্লাহ বলেন–

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আপনার ধৈর্য তো আল্লারই সাহায্যে হবে।[৫৯]

লজ্জার আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জা-শরমের আলোচনাও কুরআনে রয়েছে।

আল্লাহ বলেন–

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ

তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে (তোমাদের তা বলতে) সংকোচ বোধ করে।[৬০]

অর্থাৎ– তিনি লজ্জায় কোনো কথা বলেন না। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে এমন লজ্জা দেখতাম, যা মদীনার কুমারী মেয়েদেরও মাঝে দেখা যেত না। আল্লাহ তাঁকে এমন লজ্জাশীল চক্ষু দান করেছেন।

---

৫৯. সূরা নাহল : আয়াত ১২৭

৬০. সূরা আহযাব : আয়াত ৫৩

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্টাচারের আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্টাচারের বর্ণনাও কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই সাহাবায়ে কেরামদের বুঝিয়েছেন, তাঁরা যেন তাঁর প্রিয় হাবীবের আদবের প্রতি খেয়াল রাখে। আল্লাহ বলেন–

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

হে মুমিনগণ! (কোনো বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে আগ বেড়ে যেয়ো না।[৬১]

আরও বলেন–

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

তোমরা তার সামনে তোমাদের আওয়াজকে উঁচু করো না।

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

তোমরা তোমাদের স্বরকে নবীর স্বরের ওপর উঁচু করো না। যদি কর, তাহলে কী হবে?

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

তোমাদের অজান্তে তোমাদের কর্ম বাতিল হয়ে যাবে।[৬২]

উক্ত আয়াতের দ্বারা একথাই বুঝে আসে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সামান্যতম অশুভ আচরণ আল্লাহর বরদাস্ত নয়। এজন্য আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদবের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া উচিৎ।

নবীর তারবিয়াতের আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে শাসনও করেছেন। সে আলোচনাও কুরআনে করেছেন।

---

৬১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ০১

৬২. সূরা হুজুরাত : আয়াত ০২

তিনি বলেন–

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ

(হে নবী)! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৬৩]

অন্যত্র বলেছেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

হে নবী! আল্লাহ যে-জিনিস আপনার জন্য হালাল করেছেন, আপনি নিজ স্ত্রীদের খুশি করার জন্য তা হারাম করছেন কেন? আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬৪]

দেখুন, কীভাবে কুরআনে শাসনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে!

ক্ষমা ও ছাড় দেওয়ার আলোচনা

আল্লাহর প্রিয় নবীর পক্ষ হতে ক্ষমা ও ছাড় দেওয়ার আলোচনাও কুরআন মাজীদে রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

সুতরাং তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমার দু'আ করুন।[৬৫]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত ক্ষমার গুণ বহু ঊর্ধ্বে ছিল। তিনি যখন মক্কা জয় করেন, তখন সেখানে এক লোক ছিল ওছমান ইবনে ত্বালহা। সে বাইতুল্লাহর চাবির রক্ষক ছিল। তার কাছে বাইতুল্লাহর চাবি ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, ওছমান! চাবি দাও। তখন ওছমান চাবি তাঁর কাছে সোপর্দ করল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর দরজা খুললে ভেতরে প্রবেশ করলেন। সাহাবিদের উপস্থিতিতে সেখানে নামায আদায় করলে। যখন তিনি বের হচ্ছিলেন, তখন সাহাবিদের মধ্যে যারা বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন– যেমন হযরত আবুবকর (রাযি.), হযরত ওমর, হযরত ওছমান (রাযি.), হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রাযি.)। এরা সবাই খুব কাছেই ছিলেন। তাদের সকলের মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, আল্লাহর হাবীব

---

৬৩. সূরা তাওবা : আয়াত ৪৩

৬৪. সূরা তাহরীম : আয়াত ১

৬৫. সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ১৫৯

বাইতুল্লাহর দরজা বন্ধ করবেন আর চাবি আমাদের ঈমানদারদের মধ্য হতে কাউকে দেবেন। কোনো কাফেরকে তো আর দেবেন না। যদি কোনো ঈমানদারকে দেন, তাহলে আমারই যেন সৌভাগ্য হয়। এজন্য খুব কাছে-কাছে ছিলেন। দুনিয়ার নিয়মও এই যে, কারও যদি কোনো ক্ষমতা অর্জিত হয়, তখন সে তার নিকটতম লোকদেরকেই দিয়ে থাকে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর দরজা বন্ধ করলেন। পুনরায় ওছমানকে ডাকলেন এবং বললেন, ওছমান! স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, যখন আমি মক্কা হতে পবিত্র মদীনায় গমনে ইচ্ছুক ছিলাম। তখন আমার খুব ইচ্ছা হয়েছিল, বাইতুল্লাহর ভেতরে প্রবেশ করব আর সেখানে আল্লাহর ইবাদত করব। আমি তখন তোমাকে বলেছিলাম, ওছমান! বাইতুল্লাহর দরজা খুলে দাও।

কিন্তু তুমি খুলতে অস্বীকার করেছিলে এবং আমি তোমাকে বলেছিলাম, ওছমান! এমন একটি সময় আসবে, যে-ক্ষমতায় এখন তুমি রয়েছে, আমি হব ওই ক্ষমতার অধিকারী। আর আমি যে-অবস্থার শিকার, তুমি ওই অবস্থার শিকার হবে। দেখো, আমার আল্লাহ আজ সেই কথার বাস্তব রূপ দেখিয়েছেন। আজকে চাবি আমার হাতে আর তুমি শূন্য হয়ে আছ। কিন্তু ওছমান! আমি তোমার সাথে এমন আচরণ করব না, যা তুমি আমার সাথে করেছ। আমি চাবি তোমাকে ফেরত দিচ্ছি। আর তা কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশীয় লোকদের হাতেই থাকবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্র দেখে ওছমানের চোখে পানি চলে এল এবং সে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

ক্ষমা করা, মার্জনা করা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ গুণ ছিল।

আল্লাহর কাছে সোপর্দ হওয়ার আলোচনা

আল্লাহর হাবীবের অসহায়ত্বের বর্ণনাও কুরআনে এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ

আমি আমার বিষয় আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করছি।[৬৬]

---

৬৬. সূরা মুমিন : আয়াত ৪৪

জিহাদের আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদের বর্ণনাও কুরআনে আছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمٰى

(হে নবী)! আপনি যখন তাদের ওপর মাটি নিক্ষেপ করছিলেন, তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।[৬৭]

প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্যের বর্ণনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য কী? এ বিষয়টিও কুরআনে কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ـ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ـ

হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর আদেশে মানুষকে আহ্বানকারী ও আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে।[৬৮]

দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির আলোচনা

আল্লাহর প্রিয় হাবিবের দুশ্চিন্তা-পেরেশানির আলোচনাও কুরআন মাজীদে এসেছে। আল্লাহ বলেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

(হে রাসূল!) তারা ঈমান আনছে না এই দুঃখে আপনি আত্মবিনাশী হয়ে যাবেন নাকি![৬৯]

পালাক্রমিক কাজের আলোচনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালাক্রমিক কাজের আলোচনাও কুরআনে এসেছে।

---

৬৭. সূরা আনফাল : আয়াত ১৭

৬৮. সূরা আহযাব : আয়াত ৪৫-৪৬

৬৯. সূরা শু'আরা : আয়াত ৩

ইরশাদ হয়েছে–

كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

(আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি) সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে।[৭০]

যার কারণে পুরো পৃথিবীতে যেমনিভাবে আল্লাহর প্রভূত্ব রয়েছে, তেমনি রাসূলের রেসালাতও রয়েছে।

অবসর সময়ের আলোচনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবসর সময়ের আলোচনাও আল্লাহ পাক কুরআনে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ.

আপনি যখনই অবসর হবেন, তখন নিজেকে পরিশ্রান্ত করুন এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগী হোন।[৭১]

রাসূলের উম্মতের আলোচনা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের আলোচনাও কুরআনে এসেছে। ইরশাদ হয়েছে–

أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

আর এভাবেই আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত করেছি, যেন তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষ্যদাতা হও।[৭২]

কুরআনের ভাষ্যমতে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার পদ্ধতি

আল্লাহ বলেন–

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

হে নবী! তাদের বলে দিন, যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।[৭৩]

---

৭০. সূরা সাবা : আয়াত ২৮
৭১. সূরা ইনশিরাহ : আয়াত ৭, ৮
৭২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৩
৭৩. আলে-ইমরান : আয়াত ২১

এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুউচ্চ মর্যাদার কথা উপলব্ধি করা যায়।

এক বুযুর্গ বলেন, আমি ছেলেবেলায় মাদরাসায় পড়তে যেতাম। একটি গলি ছিল, যা অতিক্রম করলে এক বৃদ্ধা মহিলা আমাকে দেখেই তার ঘরে নিয়ে যেত এবং বিভিন্ন খাবারদাবার দিত এবং আমাকে খুব মহব্বত করত। কখনও-কখনও খরচের জন্য কিছু টাকা-পয়সাও দিত। আর সব সময় বলত, 'বাবা! আমার বাড়িতে আবার এসো।'

বুযুর্গ বলেন, আমি ওই সময় ছোট থাকায় কয়েক দিন পরেই তার বাড়িতে চলে যেতাম। আর যখনই যেতাম তখনই তিনি আমাকে খুব আদর আপ্যায়ন করতেন। এক দিন বুড়িমাকে বললাম, 'মা! আপনি আমাকে এত ভালোবাসেন কেন? আমাকে খাবার খাওয়ান, আদর যত্ন করেন, টাকা দেন। এগুলো কেন করেন? একথা শুনে মহিলার চোখে পানি চলে এল এবং বলল, আমার একটা ছেলে ছিল, যে দেখতে অবিকল তোমার মতো ছিল। কিন্তু আমার ছেলেটা হারিয়ে যায়। যখন তুমি আমার সামনে আস, তখন তোমাকে দেখলে আমার ছেলের কথা স্মরণ হয়ে যায় এবং যখন তোমাকে খাওয়াই, তখন আমার কল্পনায় আসে, আমি যেন আমার ছেলেকেই খাওয়াচ্ছি।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, উক্ত মা যেমন নিজের বাচ্চার মতো হওয়ায় এ ছেলেকে আদর-যত্ন করেছে তেমনিভাবে কেউ যদি নিজের আপদামস্তক রাসূলের সুন্নতের দ্বারা সাজিয়ে নেয়– চলাফেরায়, কথাবার্তায়, কাজে-কর্মে মোটকথা সকল কাজে যে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ করবে, সে যখন কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, আল্লাহ তাকে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং অপার অনুগ্রহ করবেন।

সমগ্র জাহানের প্রিয় ব্যক্তির ভালোবাসার আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার কথাও কুরআনে কারীমে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন–

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

মুমিনদের পক্ষে নবী তাদের নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়।[৭৪]

---

৭৪. সূরা আহযাব : আয়াত ৫

অর্থাৎ– তারা নিজেদের অপেক্ষা রাসূলকে বেশি ভালোবাসত। নিজেকে এতটুকু মহব্বত করত না যতটুকু রাসূলকে করত। আর বাস্তবতাও এই যে, যদি কারও নবীর প্রতি এই পরিমাণ ভালোবাসা না থাকে, তবে তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। এ-কারণেই তো নবীজি ইরশাদ করেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার মাতাপিতা, সন্তানাদি এবং সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হব।

জনৈক ব্যক্তি বলেন–

عجب چیز ہے محبت عشق شاہ مدینہ
یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ
ہے معمور اس عشق سے جسکا سینہ
اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا

মদিনার বাদশাহর ভালোবাসা কী আশ্চর্য এক জিনিস।
প্রকৃত ভালোবাসার শোভা এতেই পাওয়া যায়।
যার অন্তর এই ভালোবাসা দ্বারা আবাদ থাকল।
জীবন, মরণ তার সার্থক হলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এমন ভালোবাসার গৌরব দান করুন। আমীন।

রাসূল প্রেমিক কারা?

হাদীছ শরীফে এসেছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করছিলেন। দু'আয় তিনি প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে আমার আন্তরিক লোকদের সাথে দ্রুত মিলিয়ে দাও।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হযরত ছাওবান দু'আ শুনছিলেন। দু'আ শেষ হলে রাসূলের খেদমতে হাজির হয়ে তিনি বললেন, হে আল্লাহর দোস্ত! আমি আপনার একজন নগণ্য গোলাম। সব সময় আপনার খেদমতে রত থাকি। আপনি কাদের ব্যাপারে দু'আ করছিলেন যে,

'হে আল্লাহ! আমাকে আমার ভালোবাসার লোকদের সাথে মিলিয়ে দিন।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ছাওবান! তুমি আমার একজন সাহাবি। আমাকে অনেক ভালোবাস। আমি তোমার ভালোবাসার মূল্যায়ন করি। কিন্তু ছাওবান! তুমি তো জিবরাঈলের আগমন প্রত্যক্ষ করেছ। আমাকে দেখেছ, কুরআনের অবরতণ দেখেছ, আল্লাহর সাহায্য আসতে দেখেছ, ছাওবান তোমার ভালোবাসারও অনেক মূল্য আছে। কিন্তু যখন কেয়ামত ঘনিয়ে আসবে, তখন এমনসব লোক হবে, যারা আমাকে দেখেনি। তারা শুধু ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মাহফিলে বসবে এবং তাদের থেকে আমার কথা শুনবে আর আমার প্রতি তাদের এমন ভালোবাসা সৃষ্টি হবে যে, যদি তাদের ক্ষমতা থাকত, তবে নিজেদের সন্তানদের বিক্রি করে দিয়ে হলেও আমার দর্শন লাভ করত। আমি সেই সব লোকদের জন্য অধীর অপেক্ষায় আছি এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাকে ওই প্রেমিকদের সাথে দ্রুত মিলিয়ে দেন।

এ-কারণে তারা অনেক সৌভাগ্যবান, যাদের অন্তর রাসূলের ভালোবাসায় ভরপুর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্যই এই দু'আ করে গেছেন।

আলোকজ্জ্বল জীবনের শপথ

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতপূর্ণ জীবনের শপথ করে বলেছেন–

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

তোমার জীবনের শপথ! প্রকৃতপক্ষে ওইসব লোক নিজেদের মত্ততায় বুঁদ হয়ে আছে।[৭৫]

রাসূলের বরকতপূর্ণ জীবন ফুলের চেয়েও পবিত্র ও সুবাসিত ছিল। তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ ও নিখুঁত। এ-কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা রাসূলের উজ্জ্বল জীবনের শপথ করেছেন।

বরকতপূর্ণ শহরের কসম

আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহরেরও কসম করেছেন।

---

৭৫. সূরা হিজ্‌র : আয়াত ৭২

আল্লাহ বলেন–

لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ۔

আমি শপথ করছি এই শহরের। আর তুমি এই শহরের বাসিন্দা।[৭৬]

এর দ্বারা রাসূলের প্রতি আল্লাহর মহব্বতের মাত্রা অনুমান করা যায়। কতটুকু ভালোবাসা থাকায় রাসূলের জীবন নিয়ে শপথ করেছেন এবং যে এলাকায় বসবাস করেছেন, সেই এলাকার নামে শপথ করেছেন।

প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

আমি আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি।[৭৭]

এই সমুন্নত আলোচনার বিষয়টি স্পষ্ট হয় যখন আমরা রাসূলের স্মরণস্থলের প্রতি লক্ষ্য করি। যেমন– রাসূলের স্মরণ আযানের মধ্যে, ইকামাতের মধ্যে, নামাযে এবং পবিত্র কুরআনের মধ্যে। এর দ্বারাই অনুমিত হয় যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্মরণকে কত সমুন্নত করেছেন।

পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে রাসূলের আলোচনার গুঞ্জরণ

আপনারা দেখে থাকবেন, আমাদের দেশে যখন ফজরের আযান হয়, তখন সর্বপ্রথম পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলোতে আযান শুরু হয় এবং দশ পনেরো মিনিট পর পশ্চিম দিকের শহরগুলোতে আযান শুরু হয়। আগ-পর মিলিয়ে এভাবে প্রায় আধা ঘণ্টার মতো পুরো দেশজুড়ে ফজরের আযান ধ্বনিত হতে থাকে। প্রথমে একটি মসজিদে। তারপর অন্যটিতে। তারপর অপর আরেকটিতে।

আমাদের দেশে যখন সূর্য ওঠে, তখন ইন্দোনিশায়, মালয়েশিয়া ও সেগুলোর অন্তরগত দ্বীপগুলোতে সুবহে সাদিকের পরে আযান শুরু হয়। যখন সেখানে ফজরের সময় শেষ হয়ে যায়, তখন সেগুলোর পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়। ধরে নিই, ওই দেশগুলোতে আধা ঘণ্টা ধরে আযান হয়। যখন সেখানে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তখন

---

৭৬. সূরা বালাদ : আয়াত ১-২
৭৭. ইনশিরাহ : আয়াত ৪

এর পূর্বের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায় এবং সেসখানকার মুসলমানরা আযান শুরু করে দেয়। তারপর সেখানে যখন সূর্য উদিত হয়, তখন এর পূর্ববর্তী দেশগুলোতে ফজরের সময় হয় এবং আযান শুরু হয়ে যায়। তো যেখানে-যেখানে সূর্যে আগে ডোবে, সেখানে ফজরের সময় আগে চলে আসে এবং মানুষ আযান দেওয়া শুরু করে দেয়। আযান হতে-হতে এক সময় আমাদের পাকিস্তানে ওয়াক্ত হয়ে যায় এবং আযান শুরু হয়ে যায়। তারপর পাকিস্তানের পশ্চিমে অবস্থিত সংযুক্ত আরব আমিরাতে এক ঘণ্টার ব্যবধানে আযান শুরু হয়। সৌদি আরবে শুরু হয় দুই ঘন্টার ব্যবধানে। যদি আরেকটু সামনে আগাই, তবে আরও ব্যবধানে পাওয়া যাবে।

ইউরোপ আর আমাদের মাঝে পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধান। আর মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মাঝে প্রায় ৮-১০ ঘণ্টার মতো ব্যবধান।

উপরের আলোচনা দ্বারা এই বিষয়টি জানা গেল যে, এক দিক থেকে আযানের ধারা শুরু হয় এবং সেখানকার অধিবাসীরা আযান দিয়ে নামায পড়ে। তারপর এর পূর্ববর্তী এলাকায় ওয়াক্ত হয় ও আযান দেওয়া হয়। তারপর তার পূর্ববর্তী এলাকায় ওয়াক্ত শুরু হয়। এভাবে চলতে চলতে প্রায় ৮-১০ ঘণ্টার মতো পুরো বিশ্বের মাঝে ফজরের আযান হতে থাকে।

যখন পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ফজরের আযান হয়, তখন প্রাচ্যের দেশগুলোতে যোহরের আযান চলতে থাকে। আর সেখানে যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে এখানে (প্রাচ্য) আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। সেখানে আছরে ওয়াক্ত শুরু না হতেই এখানে মাগরিবের সময় হয়ে যায়। তারপর সেখানে যখন মাগরিবের সময় হয়, তখন এখানে ঈশার সময় হয়ে যায় এবং আযানও হতে থাকে। তারপর প্রাশ্চাত্যে ঈশার ওয়াক্ত হওয়ার সাথে-সাথে প্রাচ্যে ফজরের সময় হয়ে যায় এবং আযানও শুরু হয়ে যায়।

কাজেই এর দ্বারা এই বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, পুরো পৃথিবীতে কোনো একটি মুহূর্ত মুসলমানের আযানের মধ্যে সুউচ্চ স্বরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ এবং প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণবিহীন অতিক্রান্ত হয় না।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

হে প্রিয় হাবীব! আমি আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি।

نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے
وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے
وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں
جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کے نام آئے
بروز حشر جب نفسا نفسی سماں ہوگا
وہاں وہ کام آئینگے جہاں کوئی نہ کام آئے

একে-একে নবীগণ এলেন। অবশেষে এলেন নবীদের ইমাম,
তিনি দুনিয়াতে আল্লাহর শেষ বার্তা নিয়ে এলেন।
এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি একজন মানুষ।

কিন্তু তাশাহহুদ-আযান যেটিই দেখ না কেন খোদার নামের পরে তার নামই দেখতে পাবে।

হাশরের দিন যখন সবাই ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! বলতে থাকবে,
তিনি সেখানে কাজে আসবেন যেখানে সবাই ব্যর্থ হবে।

রাসূলের পূর্ণ সন্তুষ্টি

শুনুন! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– হে প্রিয় হাবীব!

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অচিরেই আপনার রব আপনাকে এমন দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।[৭৮]

কোনো দাতা কাউকে যদি আঁচল ভরে দান করে, তখন দানপ্রাপ্ত লোকটি আঁচল পুরো হতে দেখেই হয়েছে, হয়েছে বলতে থাকে। এখানেও উদ্দেশ্য এমনই। হে প্রিয়! আপনাকে এত বেশি দান করব যে, আপনি হয়েছে, হয়েছে; আর লাগবে না বলতে থাকবেন।

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামগণকে বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আমাকে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট

---

৭৮. সূরা দোহা : আয়াত ৫

করবেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা শুনে রাখো, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আল্লাহ তা'আলা সকল নবীকে এমন একটি দু'আ করার অধিকার দিয়েছেন, যা করলেই নিঃসন্দেহে কবুল হয়ে যাবে। জনৈক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! আপনাকেও কি সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে? নবীজি বললেন, হ্যাঁ। আমাকেও দেওয়া হয়েছে। সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! আপনি কি সেই দু'আটি করেছেন? রাসূল বললেন, না। বরং আমি একে হাশরের দিনের পুঁজি হিসেবে রেখে দিয়েছি। সেদিন আমি দু'আ করব এবং আমার উম্মতের প্রত্যেক গুনাহগারকে নিয়ে জান্নাতে যাব। সুবহানাল্লাহ!

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানীকর্তৃক নবীর প্রশংসা

আমাদের আকাবিরগণ এমন অর্থবহ কথা দ্বারা রাসূলের প্রশংসা করেছেন যে, এক কথায় প্রশংসার চূড়ায় পৌঁছে গেছেন এবং প্রশংসা পূর্ণ করে দিয়েছেন। রাসূলের প্রশংসা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী বলেছেন, আমি আল্লাহর ইবাদত তো এজন্য করি যে, তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রব।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, হযরত এক কথার মাঝেই হাম্‌দ ও নাতের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। একথা দ্বারা যেমনিভাবে আল্লাহর প্রশংসা হয় যে, তিনি নবীজির রব, তেমনিভাবে রাসূলেরও প্রশংসা হয়ে যায় যে, তিনি আল্লাহর ইবাদত করেন রাসূলের রব হওয়ার কারণে।

খাজা মাযহার জানে জানাঁ (রহ.)-এর নবীস্তুতি

আমাদের এই নকশবন্দিয়া সেলসেলার এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত খাজা মাযহার জানে জানাঁ (রহ.)। তিনি একটি কবিতার মধ্যেই নবী প্রশংসার বিশাল সমাবেশ ঘটালেন। তিনি বলেন,

خدا در انتظار حمد مانیست محمد چیشم براہ ثنا نیست

خدا مدح آفریں مصطفیٰ بس محمد حامد حمد خدا بس

مناجاتے اگر باید بیان کرد یہ بیتے ہم قناعت می تواں کرد

আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন,
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের গুণকীর্তণের
মুখাপেক্ষী নন।
রাসূলের প্রশংসার জন্য তো আল্লাহই যথেষ্ট,
আল্লাহর প্রশংসার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যথেষ্ট।
যদি তোমরা কোনো আবেদন করতে চাও,
তবে একটি কবিতা আকারে সেটি পেশ করো।

কবিতাটি হলো–

محمد از تو می خواہم خدا را
خدایا از تو حب مصطفیٰ را

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য চাই। হে আল্লাহ! আপনার কাছে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা চাই।

কুরআনের আয়াতের সাথে নবী জীবনের বিস্ময়কর মিল

হযরত কারী তৈয়্যব (রহ.) কুরআনের আয়াতের সাথে রাসূলের পবিত্র জীবনের মাঝে এক বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি বলেন, যখন কুরআন মাজীদ পড়ি, তখন মনে হয়–

* আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির আয়াতগুলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থার আলোচনা।

* সৃষ্টি সম্পর্কীয় আয়াতগুলো নবীজির প্রমাণ ও যুক্তির আলোচনা।

* আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার আয়াতগুলো নবীজির একাগ্রতার আলোচনা।

* চারিত্রিক পরিশুদ্ধির আয়াতগুলো নবীজির মহত্ত্বের আলোচনা।

* স্নেহ-ভালোবাসার আয়াতগুলো নবীজির সৌন্দর্যের আলোচনা।

* ক্রোধের আয়াতগুলো নবীজির বড়ত্বের আলোচনা।

* সত্য বিকাশিত হওয়ার আয়াতগুলো নবীদর্শনের আলোচনা।

* আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার আয়াতগুলো নবীজির ধ্যানের আলোচনা।

* দুনিয়াবিমুখতার আয়াতগুলো নবীজির সাধনার আলোচনা।

* হাশরের দিনের অবস্থাসম্বলিত আয়াতগুলো নবীজির আত্মজিজ্ঞাসার আলোচনা।

* সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আয়াতগুলো নবীজির মৃত্যুর আলোচনা।

* সত্য প্রতিষ্ঠার আয়াতগুলো নবীজির মরেও অমর হওয়ার আলোচনা।

* জান্নাতের নেয়ামতরাজির আলোচনার আয়াতগুলো নবীজির আগ্রহের আলোচনা।

* জাহান্নামের শাস্তির আয়াতগুলো নবীভীতির আলোচনা।

* পুরস্কারের আয়াতগুলো নবীসৌহার্দের আলোচনা।

* প্রতিশোধের আয়াতগুলো নবীজির ভারাক্রান্ত হওয়ার আলোচনা।

এ-কারণেই তো কুরআন এক দিক থেকে যেমন আল্লাহর কালাম, অপর দিক থেকে নবীচরিত্রও বটে। আল্লাহ যেন আমাদের নবীপ্রেমের গৌরব দান করেন এবং তার পরিপূর্ণ অনুসরণের তাওফীক দেন। আমীন।

ما انا عدحت محمدا بمقالتی

لكن عدحت مقالتی بمحمدا

আমার কথা দ্বারা নবীজির কোনো প্রশংসাই হয়নি।

বরং আমি নবীজির কথা আলোচনার দ্বারা নিজের কথাকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করেছি।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ইসলামের মর্যাদা

'প্রায়ই দেখা যায়, আমরা টেনশন ফিল করি যে, আমরা মুসলমান কি-না। আমরা একটু চিন্তা-ফিকির করি যে, ইসলাম আল্লাহর কত বড় নেয়ামত। আমাদের একথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমাদের নিকট স্বর্ণ আছে, কিন্তু কাফের বে-ঈমানরা তাদের অপপ্রচারের দ্বারা একে পিতল বলে সাব্যস্ত করতে চায়। এমনটি কখনও হওয়ার নয়। দুর্বল হওয়া এক কথা আর স্বর্ণের মালিক হওয়া আরেক কথা। আমাদের কমপক্ষে এতটুকু বুঝতে হবে যে, কাফেরদের জন্য কী শাস্তি আর দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছে। যদি এতটুকু না বুঝি, তাহলে মানুষ দীন থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। দীনের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হবে। বলবে, এ কেমন জীবনবিধান আমাদের দেওয়া হয়েছে।'

ইসলামের মর্যাদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ آخر : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

মানবদেহ বিরোধপূর্ণ জিনিসের সমষ্টি

মানবদেহ আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এক অপূর্ব সৃষ্টি। এ হলো বিভিন্ন অঙ্গের সমষ্টি। একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব, প্রতিটি অঙ্গ স্বীয় অবস্থা ও বৈশিষ্টের দিক থেকে অপরটা থেকে ভিন্ন। বলা যায়, এই দেহ বিরোধপূর্ণ অঙ্গের সমষ্টি। উদাহরণস্বরূপ আমরা চোখকে নিতে পারি। এই অঙ্গ দ্বারাই শুধু দেখা যায়; বাকি কোনো অঙ্গ দ্বারা এই শক্তি লাভ করা যায় না। কান দ্বারা শুনি। শরীরের আর কোনো অঙ্গ দ্বারা শ্রবণশক্তি লাভ করা যায় না। এর সাথে রয়েছে পুরো দেহের সাথে বৈপরীত্ব। জিহ্বা দ্বারা কথা বলা যায়– অন্য কোনো অঙ্গের মাঝে এই ক্ষমতা নেই। এর সাথেও রয়েছে পূর্ণ দেহের বৈপরীত্ব।

সারকথা, মানবদেহ এমনসব অঙ্গের সমষ্টি, যার প্রতিটি স্বীয় স্বকীয়তা ও প্রকৃতির দিক দিয়ে অপরটি থেকে একেবারেই ভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা এই বিরোধপূর্ণ সমষ্টির মাঝে এক মহান নেয়ামত দান করেছেন, যার নাম আত্মা। এই আত্মার মাধ্যমেই সকল অঙ্গ এক হয়ে যায় এবং সেগুলোর মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হয়। এই আত্মা-ই সেগুলোর মাঝে সমন্বয় ঘটায়। আর সকল অঙ্গ এক হয়েই একটি দেহের নির্ধারিত সময় শেষ হয়। দেহের

মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গগুলো এক হয়ে কাজ করতে থাকে। যদি কখনও মাথাব্যথা ওঠে, তখন পা ডাক্তারের কাছে যেতে অস্বীকার করে না। বলে না, এটা তো আমার সমস্যা নয়– এটা মাথার সমস্যা।

তো এক মাথাব্যথার দ্বারা পুরো দেহ ব্যথাতুর হয়ে যায়। পা ডাক্তারের কাছে চলে যায়। ব্যথা বেশি হলে চোখ পানি ঝরাতে থাকে। আর পূর্ণ শরীরটা-ই অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হয়। যার কারণে ঘুম হারাম হয়ে যায়। যেন এক অঙ্গের চিন্তা সকল অঙ্গের চিন্তা এবং একটি অঙ্গের আনন্দ প্রতিটি অঙ্গের আনন্দ। এর কারণ একটাই যে, সকল অঙ্গ এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে। সবগুলোর মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হয়ে গেছে। আর এটা একমাত্র আত্মার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। যদি এখন শরীর থেকে রূহ বের হয়ে যায়, তবে প্রতিটি অঙ্গ অপরটার জন্য অপরিচিত হয়ে যাবে। যার প্রাণ চলে গেছে, তার মুখ খুলে ছুরি দিয়ে যদি তার দাঁত উপড়ে ফেলা হয়, তবে চক্ষু অশ্রু ঝরাবে না। আত্মরক্ষার হস্তও সঞ্চালিত হবে না। পা-ও দৌড়াবে না। কারণ, এগুলোর একটার অপরটার সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, যে জিনিসের মাধ্যমে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা নির্গত হয়ে গেছে।

পারিবারিক জীবনে বিরোধপূর্ণ জিনিসের সমষ্টি

উল্লিখিত দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে আমরা যদি নিজেদের ঘরের প্রতি লক্ষ করি, তবে দেখতে পাব, আমাদের ঘর এমনসব সদস্য নিয়ে গঠিত, যার প্রতিটি স্বীয় অবস্থাভেদে অপরটা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন– যিনি বাবার অবস্থানে আছেন, তিনি এই অবস্থানের দিক থেকে অন্য সব সদস্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই অবস্থান অন্য কারও নেই। যিনি মায়ের স্থানে আছেন, তিনিই শুধু মা– অন্য কেউ নন। এমনিভাবে বোন বোনের স্থানে, ভাই ভাইয়ের স্থানে। কেউ কারও স্থান অর্জন করতে পারে না।

মোটকথা, এই সকল সদস্য নিজের অবস্থা হিসেবে অপর সব সদস্য থেকে পৃথক। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এদের মাঝে এমন একটি নেয়ামত দান করেছেন, যার কারণে এই সকল সদস্য এক হয়ে কাজ করে। যেমন– আত্মার কারণে শরীরের সকল অঙ্গ এক হয়ে কাজ করে। আর সেই নেয়ামতের নাম 'ইসলাম'। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের মধ্যে ইসলাম থাকবে, ততক্ষণ তাতে স্নেহ, ভালোবাসা সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, নিজের ওপর অপরকে প্রাধান্যদান সবকিছুই পাওয়া যাবে। একজনের খুশি সবাই ভাগ করে নেবে। একজনের দুঃখে সবাই

দুঃখিত হবে। সবাই দেহের ভিন্নতা সত্ত্বেও এক আত্মা হয়ে থাকবে। আর যখনই এই দীন ঘর থেকে চলে যাবে, তখন দেখা যাবে ঘর থেকে ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি সব বিদায় নিয়েছে। ঘৃণা, অবজ্ঞা আর রেষারেষি বাসা বেঁধেছে ঘরের মাঝে। পরস্পরের মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে যে, এক সাথে বসে খাওয়াও ঘৃণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদি কোনো দেহে প্রাণ না থাকে, তবে মুখের হাওয়া বন্ধ করে যদি নাক দিয়ে পেটের ভেতর পাম্প দেওয়া হয়, তবে কি ওই দেহ কোনো দিন জীবন লাভ করবে? কখনও না। এমনিভাবে যদি কোনো ঘর থেকে দীন চলে যায়, বদদীনি ঢুকে পড়ে, তবে মানবরচিত নীতিমালার আশ্রয় নিয়ে ঘরের মাঝে কখনওই প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করা যাবে না।

যেমনিভাবে 'প্রাণ' দেহের মাঝে জীবন আনে, সঞ্চালন সৃষ্টি করে, তেমনিভাবে দীন আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রাণ সৃষ্টি করে। তাকে সজীব, সতেজ করে। বাহু যদি চিন্তা করে, আমি শরীর থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন হয়ে যাব; অন্য কোনো অঙ্গের অসুস্থতার কষ্ট নিজের ঘাড়ে নেব না, নিজের ভালো নিজের মাঝেই থাকবে, তবে বাহুর এই চিন্তা কি ঠিক হবে? না, এ ঠিক হবে না। তার জীবন শরীরের সাথেই কাটাতে হবে। যদি শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়, সে তার প্রাণ হারাবে। তাকে পোকামাকড় চুষতে থাকবে। গলির কুকুর-বিড়াল সেটাকে ছিড়ে খাবে। এমনিভাবে যদি ঘরের কোনো সদস্য এমন চিন্তা করে যে, মা-বাবার সাথে থাকলে আমি বন্দিত্বের শিকার হব, স্বাধীনতা হারাব আর সেই ভাবনামতে ঘর ছাড়ে, তবে তার অবস্থাও ওই বাহুর মতো হবে। সে মানবরূপী শয়তানের সহজ শিকারে পরিণত হবে। জীবন তার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সবকিছু সে হারাবে।

দুই জিনিসের মাঝে জোড়া সৃষ্টির দুনিয়াবি নিয়ম

একথাটি আমি আপনাদের সামনে জোর গলায় বলতে চাই যে, আল্লাহ দুনিয়ার মাঝে দুটি জিনিসের জোড়া সৃষ্টির জন্য তৃতীয় আরেকটি জিনিস তৈরি করে দিয়েছেন। উদাহরণত–

* দুই ইটের মাঝে জোড়ার জন্য সিমেন্ট সৃষ্টি করেছেন। এখন আমরা দুই ইটের মাঝে সিমেন্ট দিলে একদম এক হয়ে যায়। এখন যদি উভয়টাকে পৃথক করতে চান, ভেঙে যাবে; তবু পরিপূর্ণভাবে পৃথক হবে না।

* কিন্তু দুটি কাগজকে একত্র করতে চাইলে সেখানে সিমেন্ট কোনো কাজে আসবে না। যদি এর জন্য গাম ব্যবহার করা হয়, উভয়টা মিলে যাবে।

* যদি কাপড়ের দুটা টুকরা একত্র করতে হয়, তবে সেখানে সিমেন্টও কোনো কাজে আসবে না, গামও কোনো কাজে আসবে না। বরং এজন্য সুঁই-সুতা ব্যবহার করতে হবে এবং এর মাধ্যমেই উভয়টা এক হয়ে যাবে।

* আমরা যদি দুই টুকরা কাঠ এক করতে চাই, তবে সেখানে সিমেন্ট গাম, সুঁই-সুতা কোনোটাই কাজে আসবে না। আল্লাহ এর জন্য পেরেকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পেরেক দিয়ে দুটোকে এক করা যায়।

* কিন্তু যদি দুইটা লোহা এক করতে চান, তবে উপরের কোনোটা দ্বারাই কাজ নিতে পারবেন না। আল্লাহ এজন্য বৈদ্যুতিক ঝালাইয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এখন এর মাধ্যমে উভয়টা এক হয়ে যায়।

ইসলাম দুটি হৃদয়ের মাঝে একাত্মতা ঘটায়

আপনি যদি প্রশ্ন করেন, যদি দুটি হৃদয়কে এক করতে হয়, তবে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে? আমি উত্তরে বলব, 'ইসলাম'। ইসলামই পারে উভয় অন্তরকে এক করে দিতে। হ্যাঁ, দুজন যদি পরিপূর্ণ দীনের ওপর চলতে থাকে, আল্লাহ উভয়ের মাঝে একাত্মতা সৃষ্টি করে দেন। ফলে উভয় হৃদয়ে পারস্পরিক ভালোবাসার আবির্ভাব ঘটে। কুরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের অন্তরে অব্যশই পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।[৭৯]

ঘৃণা, ক্রোধ, হিংসা এগুলো তো তখনই সৃষ্টি হয়, যখন দীনের ওপর চলার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা হয়। আমরা তো নামে মুসলমান, বাস্তবতা হলো নিজের খেয়াল-খুশির পূজা করি, যার ফলে যে-মহব্বত আমাদের মাঝে হওয়া দরকার ছিল, তা হয়ে ওঠে না। আল্লাহ ইরশাদ করেন– হে রাসূল!

لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

যদি আপনি পৃথিবীর সব উজাড় করে দিতেন তবুও তাদের মাঝে ভালোবাসা, সম্প্রীতি তৈরি করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তা করে দিয়েছেন। সৃষ্টি করে দিয়েছেন তাদের মাঝে একাত্মতা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য।[৮০]

---

৭৯. সূরা মারয়াম : আয়াত ৯৬

৮০. সূরা আনফাল : আয়াত ৬৩

যে-ঘরের মধ্যে পরিপূর্ণ দীন থাকবে, সেই ঘরের সদস্যদের মাঝে পারিবারিক সম্পর্ক অনেক সুদৃঢ় হবে। তখন কোনো বাবাকে এসে বলতে হবে না, হুজুর! ছেলেটার কী যে হলো? এক সাথে বসে খানা খেতে চায় না। হুজুর! ছেলেমেয়েরা খুব ঝগড়াটে; তাদের মাঝে পারস্পরিক মিল নেই। আর যখনই এমন কিছু শোনা যাবে, বুঝতে হবে, কোথাও-না-কোথাও দীনের ব্যাপারে ত্রুটি হচ্ছে, কোনো একটা জায়গায় গরমিল হয়ে গেছে, যার ফলে যে-ভালোবাসা থাকার কথা ছিল, সেই ভালোবাসা বিদায় নিয়েছে।

যদি কোনো স্বামী বলে, স্ত্রীর কাছ থেকে যেমন ভালোবাসা আশা করি, তেমন পাই না। আর স্ত্রীরও ওই কথাই বলে, তবে একথাই বুঝে নিতে হবে যে, তারা দীনের কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে ত্রুটি করছে। যদি উভয় দিকে দীনের ওপর পরিপূর্ণ আমল করা হয়, তবে কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার আবির্ভাব ঘটবে, প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হবে।

ইসলাম একটি অপ্রত্যাশিত মহান নেয়ামত

এই দীন আল্লাহর এক মহান নেয়ামত। আল্লাহ বলেন–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ তোমাদের জন্য আমি দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, পূর্ণ করে দিয়েছি তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকেও এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছি।[৮১]

এ-কারণেই ইসলাম আল্লাহর এক মহান নেয়ামত। জীবন পরিচালনার সবচেয়ে উত্তম পন্থা। এর চেয়ে উত্তম কোনো পন্থা পৃথিবীর বুকে নেই। সম্পদ দ্বারা দেহ কেনা যায়; কিন্তু মন কেনা যায় না। কেনা যায় না তার ভালোবাসা। সম্পদের দ্বারা কারও তোষামোদের ভাগী হওয়া যায়। কিন্তু কোনো হৃদয়ের অংশীদার হওয়া যায় না। কারণ, ভালোবাসার সম্পর্ক তো দীনের সাথে। দীন থাকলে ভালোবাসার উন্মেষ ঘটবে। দীন চলে গেলে ভালোবাসাও হারিয়ে যাবে।

আর দীনের মাধ্যমেই আল্লাহ অন্তরকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবেন। তখন দুনিয়াতে জান্নাতের স্বাদ অনুভূত হবে।

---

৮১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩

গাছের শুকনা ভঙ্গুর ডালে পাখির বাসা দীর্ঘস্থায়ী হয় না

বর্তমানে প্রায়ই শুনে থাকবেন, এখন পৃথিবীতে সভ্যতার লড়াই চলছে। এর অর্থ কী? অর্থ একটাই যে, এক দিকে রয়েছে ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন, ইসলামের কৃষ্টি-কালচার, যা মানুষকে জীবন পরিচালনার উত্তম পদ্ধতি শেখায়। আর অপর দিকে কাফেরদের নিকট রয়েছে Man-made laws (মানবরচিত নীতিমালা), জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যাকে তারা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে যাবে। মানুষ মনে করছে, জীবন পরিচালনার এই দুই পদ্ধতির মাঝে লড়াই চলছে।

তবে বাস্তবতা হলো, এখন দুনিয়াতে দুটি রীতি দৃষ্টিগোচর হবে। একটি হলো ঈমানদারদের কাছে থাকবে আল্লাহপ্রদত্ত মুহাম্মাদী রীতিনীতি। এটি নিয়েই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব। এই পদ্ধতিই মানুষকে পার্থিব ও পারলৌকিক সফলতার পথ দেখায়। আর দ্বিতীয়টা হলো কাফেরের কাছে থাকা 'জীবনপদ্ধতি' যাকে তারা Hit and tril methad বলে অভিহিত করছে। অর্থাৎ– তাদের মাথায় যখন কোনো নীতিমালা উদয় হয় এবং তারা মনে করে, জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য, তখন একে নীতিমালার মাপকাঠিতে এনে জীবনপরিচালনার পদ্ধতিতেই ঠুকে দেয়। এখন এই বিষয়টিই প্রতীয়মান হয় যে, গাছের শুকনা ভঙ্গুর ডালে পাখির বাসা কখনওই দীর্ঘস্থায়ী হয় না, মজবুত হয় না।

সোনাকে সোনাই মনে করতে হয়– পিতল নয়

আজ এখানে আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকজন আমার সামনে বসা। আল্লাহ আপনাদের মেধার প্রাচুর্য দিয়েছেন। জাগতিক শিক্ষায় আপনারা শিক্ষিত। আপনারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। বিভিন্ন সোসাইটির মালিক আপনারা। আপনারা যখন ইসলামের এই সকল বিষয় শুনতে পান, তখন এই ভেবে তৃপ্তি পান যে, আমরা মুসলমান। না; এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমদের চিন্তা করতে হবে ইসলাম নিয়ে। বুঝতে হবে, ইসলাম আল্লাহর কত গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত। এই বিশ্বাস আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল থাকতে হবে যে, আমাদের হাতে সোনা আছে।

কিন্তু কাফেররা স্বীয় শক্তির ওপর ভর করে তাকে পিতল সাব্যস্ত করতে চায়। আর সেটা কখনও হওয়ার নয়। শক্তির কমতি এক জিনিস, স্বর্ণের অধিকারী হওয়া ভিন্ন জিনিস। আমাদের কমপক্ষে বুঝতে হবে, কী শান্তি ও

দুর্ভাগ্য কাফেরদের জন্য অবধারিত। এতটুকু না বুঝলে আমরা হতাশা ও হীনম্মন্যতার শিকার হব। আমাদের মনে মিথ্যা সংশয় সৃষ্টি হবে। প্রশ্ন জাগবে, এ কেমন জীবনবিধান, যা আমাদের দেওয়া হয়েছে এবং দীনের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হবে।

তো আমি আপনাদের সামনে এমন কিছু বিষয় পেশ করব, যার দ্বারা আপনার জীবন-নীতির সঠিকতা ও ভুল এবং কোন পদ্ধতি গ্রহণীয় আর কোনটা বর্জনীয় বুঝতে পারবেন। মনোযোগসহকারে শুনুন।

১. আল্লাহর প্রতি ঈমানের কল্পনা

ইসলাম আমাদের ঈমান শিক্ষা দেয়। আমদের কল্পনা করতে শেখায় যে, আমাদের একজন প্রভু আছে, যার হাতে আমাদের সৃষ্টি, যার সামনে হাশরের ময়দানে আমাদের দাঁড়াতে হবে। ভালো করলে পুরস্কার ও সফলতার ভাগীদার হব আর মন্দ করলে শাস্তির সম্মুখীন হব। এই কল্পনা এমন আশ্চর্য একটি বিষয় যে, এর দ্বারাই জীবনের অনেক-অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান বেরিয়ে আসে।

আপনারা একটু চিন্তা করুন। একটি মেয়ের বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের কয়েক মাস পরই তার স্বামী এক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেল। আর সে এই যুবতি বয়সেই বিধবা হয়ে গেল। বলুন! দুনিয়াতে তার চেয়ে আর বেশি কে দুঃখী হতে পারে? কিন্তু যদি সে মুসলমান হয়, তবে আপনি তাকে সান্ত্বনা দিতে গেলে আপনাকে উত্তরে সে বলবে 'এটা আল্লাহর ইচ্ছা।' আর তার এই উত্তরের অর্থ হলো, সে তার সকল বোঝা অন্য কারও ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে চিন্তা মুক্ত হয়ে গেছে। একজন কাফের যে-দুশ্চিন্তার শিকার হয়, সেই দুশ্চিন্তা তার নেই।

নিউইয়র্কে সাতশত পাগলাগারদ : হেতু কী?

একবার এক বিদেশি আমাকে জিজ্ঞেস করল, পাকিস্তানে কটা পাগলাগারদ আছে? আমি বললাম, চার-পাঁচটা; বড়জোর দশটা। লোকটার দেশ, শহর কিছুই আমার জানা ছিল না। সে আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি জানেন, নিউইয়ার্কে এমন সাতশত মেডিকেল আছে, যেখানে শুধু পাগলের চিকিৎসা হয়। শুনে আমি যারপরনাই আশ্চর্য হলাম। চিন্তা করলাম, এমনটি কীভাবে হলো? এক শহরেই সাতশত পাগলাগারদ! আর আমাদের দেশে বড়জোর দশটা। লোকটি বলল, এই ব্যবধান কেন জানেন? বললাম, না।

তখন লোকটা বলল, এর কারণ হলো, আমরা মুসলমান। আমরা আল্লাহর ইবাদাত করি। তারই ধ্যানে মগ্ন থাকি। আমাদের কেউ বিপদের শিকার হলে তা কেবল আল্লাহও কাছে সোপর্দ করে। তার মুখে উচ্চারিত হয় 'আল্লাহর চাওয়াতেই এমন হয়েছে।' এতে হাহুতাশের কিছুই নেই। আর সেখানে কেউ যদি কোনো বিপদের শিকার হয়, কারও যদি ব্যবসায় লোকসান হয়, সে সকল পেরেশানি, দুশ্চিন্তা নিজের মাথায় চাপিয়ে নেয়। সে আসফসোস করতে থাকে, হায়! কেন এত টাকা ব্যবসায় খাটালাম। কেনইবা বাজারদরের প্রতি তাকাইনি। কত ভুল করলাম। আমার এখানে ত্রুটি, সেখানে ত্রুটি। এ-ধরনের নানা দুশ্চিন্তা তার মাথায় কাজ করতে থাকে। আল্লাহর কাছে নিজ সমস্যা সোপর্দ করার কোনো বিষয় নেই, যার কারণে বিষণ্নতা একসময় তাকে পাগল করে তোলে। আর এ কারণে এক শহরেই সাতশত মেন্টাল হসপিটাল।

চিন্তা করুন, কত মহান নেয়ামত এই আল্লাহ-বিশ্বাস। এখানে কারও যদি লোকসান হয় বা একান্ত প্রিয়জনকে হারায়, তখন মুখে উচ্চারিত হয় 'এটাই আল্লাহর চাওয়া।' এর বিরোধিতার শক্তি কারও নেই। সে তার পুরো চিন্তার ভার আরেকজনের কাছে এভাবে সঁপে দিয়ে নিজে চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! এক ঈমানের নেয়ামতের দ্বারা মানুষ পাগলামি থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

আল্লাহতে বিশ্বাসের ফলাফল

এই আল্লাহ-বিশ্বাসই মানুষকে সৎকর্মের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করার শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমার একবার আমেরিকার এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়। তো আমি যখন সেখানকার ইমাম ও খতীবের সামনে বসে খানা খাচ্ছিলাম, তিনি বললেন, আমি এখানে প্রতি রবিবার জেলখানায় যাই এবং জেলখানার আসামি ও সেখানকার লোকদের দীনের দাওয়াত দিই। এর কারণ হলো, এখানকার স্থানীয় প্রশাসন এই বিষয়টি অনুধাবন করেছে যে, অপরাধীরা শাস্তির মাধ্যমে ঠিক হয় না; বরং আরও বেশি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। হ্যাঁ, যদি কোনো অপরাধী দীনের ওপর এসে যায়, তবে তার জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়। জীবনস্রোত অন্য দিকে বইতে থাকে। এই অনুভূতির কারণে স্থানীয় প্রশাসন যেকোনো ধর্মের লোককেই জেলখানার অপরাধীদের ধর্মশিক্ষার বিষয়টি অনুমোদন করে দেয় এবং অপরাধীদের ভালো হয়ে সুন্দর জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দেয়।

আমি তার কাছে আবেদন জানালাম, আপনার দেখা এ ধরনের কোনো আনন্দায়ক ঘটনা থাকলে আমাকে একটু শোনান। তিনি বললেন, হযরত! কত যে এমন ঘটনা আছে! বলতে গেলে তো অনেক সময়ের প্রয়োজন। এমনিতেই নামাযের সময় হয়ে গেছে। তাই আপনাকে ছোট্ট একটা ঘটনা শোনাই। তিনি বলতে লাগলেন, একলোক গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় এলে আমি তার কাছে দীনের দাওয়াত পেশ করি এবং অল্প দিনেই সে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। আমি তার নাম রাখি আলী। এখন আমি তাকে দীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দিই। আর এভাবেই আমাদের মাঝে অনেক হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। আমরা একে অপরের অনেক নিকটতম হয়ে যাই।

কয়েক মাস যাওয়ার পর আমরা নিজেদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো শোয়ার করতে থাকি। একদিন তাকে প্রশ্ন করি, আলী ভাই! ইসলাম আনার পূর্বের অবস্থা এবং পরের অবস্থার মাঝে তুমি কী ব্যবধান প্রত্যক্ষ করেছ? এ প্রশ্ন শুনে তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। আমি অনুতপ্ত হলাম। চিন্তা করলাম, আমার এমন প্রশ্ন বোধহয় ঠিক হয়নি। বললাম, তোমার ভালো না লাগলে পরে এক সময় শুনব। সে বলল, না ভাই! আমি আপনাকে এখনই বলছি। সে বলতে শুরু করল, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলাম। আমি হিংস্র এক মানুষ। বলতে গেলে মানবরূপী একটা পশু ছিলাম। আমি মানুষ হত্যা করে মজা পেতাম। যখন লাশটাকে ছিন্নভিন্ন করতাম, তখন আমি নাচতাম। আমি এ-জীবনে নিরপরাধ, নির্দোষ ছত্রিশজন মানুষ খুন করেছি। যেখানে যখনই কাউকে হত্যার সুযোগ পেতাম, হত্যা করতাম। তারপর ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিতাম। আমি এত বেশি হিংস্র ছিলাম যে, তাদের মৃত ছিন্ন দেহ দেখে নাচতে শুরু করতাম। এই ছিল আমার ইসলামপূর্ব অবস্থা।

ইসলামের ছায়ায় আসার পর আপনি আমাকে আল্লাহর সন্ধান দিয়েছেন, কেয়ামত সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং সেদিনের বিচার, শাস্তি, পুরস্কার এই সব বিষয় জানিয়েছেন। এই এক চিন্তাই আমার জীবনে এমন পরিবর্তন এনেছে। এখন আমি কামরা থেকে বের হয়ে কোথাও যেতে চাইলে কোনো পোকামাকড় পায়ের তলে পড়ে মারা যায় কি-না এ-ব্যাপারেও সতর্ক থাকি। আর এটাই হলো ইসলামের শিক্ষা। এরই নাম ঈমান। এরই মাধ্যমে ছত্রিশ খুনের আসামির জীবনে এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে যে, তার মধ্যে পোকামাকড়

মরার ব্যাপারেও সচেতনতা এসে গেছে। এটা ইসলামেরই ফল। সুবহানাল্লাহ! ইসলাম কত বড় নেয়ামত।

২. মাতাপিতা নিয়ে চিন্তা

এটা ১৯৭২ সালের কথা। আমার পরিচিত একজন প্রফেসর ছিল। নাম ড. ইকবাল আলী। একবার তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাপারে লেকচার দিচ্ছিলেন। এ-সময় তিনি বলেন, আমি অমুক শহরে পি. এস. ডি করেছি। সেখানে থাকাকালে এক বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম। তার সিকিউরিটি বলল, স্যার! আপনার হসপিটাল থেকে ফোন এসেছে। আমাদের অনেকের অবস্থা হলো, যখনই কোনো হসপিটালের ফোন আসে, জিজ্ঞেস করে বসে কী হয়েছে? চিন্তার কোনো বিষয় নয় তো? তো যখন তার ফোনে কথা বলা শেষ হলো, তখন বললাম, কিছু হয়েছে কি? সে উত্তরে বলল, 'তেমন কোনো বিষয় না।' আমি নাছোড়বান্দার মতো আবার প্রশ্ন করলাম, বলো না কী হলো? তখন সে বলল, আমার বাবা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ডাক্তার ফোন করে জানাল, তিনি মারা গেছেন, ডেটও শেষ হয়ে গেছে; এখন কী করব? তো আমি বলে দিলাম, আপনি লাশদাফন কোম্পানির কাছে বডিটা দিয়ে দেন। বিলের পরিমাণ জানিয়ে দেবেন। প্রফেসর সাহেব বললেন, তার কথা শুনে আমি খুব বিস্মিত হলাম। এটা কি কখনও কল্পনা করা যায় যে, একটা ছেলে পিতা মারা যাওয়ার পর তার চেহারাও সে দেখতে নারাজ?

বিধর্মীদের কাছে মায়ের অবস্থান

'কানেকটিকাট' আমেরিকার একটি প্রদেশ। সেখানকার এক মা তার ছেলের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পেশ করল। মিডিয়া সেটাকে সম্প্রচার করল। পূরা পৃথিবী তা দেখেছে ও শুনেছে। মা বলেন, আমার স্বামী মারা গেছে। আমার প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের সাথে আমি থাকি। আমার অভিয়োগ হলো, আমার ছেলে একটি কুকুর পালত। প্রতিদিন তিন থেকে চার ঘন্টা সে কুকুরের সাথে কাটায়। তার খাওয়াদাওয়া সব কিছুই করায়। জগিং করার জন্য সাথে নিয়ে যায়। আর আমি তার মা, আমার মনে চায় তাকে এক নজর দেখি। কিন্তু পুরো দিন সে একটিবারের জন্যও আমার কাছে আসে না। তো আদালতের কাছে আমার আবেদন, আদালত যেন তাকে আমার সামনে কিছুক্ষণ সময় হলেও থাকার আদেশ দেন। ছেলেটাও উকিলের আশ্রয় নিয়েছে, মাও নিয়েছে। আর সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী বিচার চলতে থাকে।

শেষে জজ রায় ঘোষণা করেন– 'ছেলের বয়স যেহেতু আঠারো আপ, সে পরিণত বয়স্ক। কুকুরের Laibility এর দায়িত্ব তার। কুকুরের খাবারদাবার, নিরাপত্তার বিষয় তাকেই ভাবতে হবে। যেহেতু সে ঘরে পোষা জানোয়ারের আশ্রয় দিয়েছে আর যেহেতু তার বয়স আঠারো পেরিয়ে গেছে, তাই মায়ের লালনপালন তার দায়িত্বে নেই। যদি মায়ের প্রয়োজন হয়, তিনি প্রশাসনের আশ্রয় নিতে পারেন। প্রশাসন তাকে 'বৃদ্ধাশ্রমে' নিয়ে যাবে। তার যাবতীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা করবে। ছেলের কোনো দায়িত্ব মায়ের প্রতি নেই।

ইসলামে মায়ের মর্যাদা

আপনি একটু চিন্তা করুন। একটি সভ্যতা মা-বাবার জন্য এমন অবস্থানই নির্ধারণ করেছে। আর ইসলামকে দেখুন। কী মর্যাদা দিয়েছে মা-বাবাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যদি কোনো সন্তান মা-বাবার প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে একবার তাকায়, আল্লাহ তাকে একটি হজ বা ওমরার ছওয়াব দেবেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! কেউ যদি বারবার তাকায় তার কী প্রতিদান? হুজুর ইরশাদ করেন– সে বারবার হজ বা ওমরার ছওয়াব পেতে থাকবে। আপনারা শিক্ষিত লোক। একটু ভাবুন, এই দুটি জীবনব্যবস্থার মাঝে কত ব্যবধান। উভয়টার মাঝে যদি উৎকৃষ্টতার স্তর যাচাই করা হয়, তবে ইসলাম কুফরি শিক্ষা থেকে কত উপরে ও এগিয়ে থাকবে।

৩. বৈবাহিক জীবনের গুরুত্ব

বৈবাহিক জীবনের ব্যাপারে ইসলামের একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। আর কুফরিরও একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

পারস্পরিক ভালোবাসার বিনাশ

বিধর্মীদের জীবনের চিত্র হলো, বৈবাহিক জীবনের বাইশটি বছর স্ত্রী স্বামী থেকে পৃথক থাকে। বাইশ বছরের এসোসিয়েশনের পর যদি স্বামী সিগারেট খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে সে স্ত্রীর কাছ থেকে সিগারেট ধার করে নিয়ে খাওয়ার অধিকার লাভ করে। পরবর্তী কালে আবার তাকে সেটা শোধও করতে হয়। আর এই অবস্থা স্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। স্ত্রীর সিগারেট খাওয়ার প্রয়োজন হলে নিজের কাছে না থাকলে স্বামীর কাছ থেকে ধার নিয়ে পরবর্তী কালে তা শোধ করে। অনুমান করুন, সেখানে বাইশ বছরের

এসোসিয়েশনের মাধ্যমে এতটুকু সম্পর্কই তৈরি হয়। বুঝতে হবে, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার কোনো ঘ্রাণও নেই। সেখানে তালাক এত বেশি হারে ঘটে যে, তারা বিবাহ করা-ই বর্জন করেছে।

এক ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজারের অক্ষম অবস্থা

এটা ওই সময়ের কথা, যখন আমি একটা প্রজেক্টে ম্যানেজারের পদে কাজ করতাম। আমরা কিছু মেশিন আমদানি করি। সেগুলোর 'ইনসটায়েশনের' জন্য সাথে একজন ইঞ্জিনিয়ারও ছিল। যেহেতু সে বহিরাগত ছিল, তাই তার সাথে আমার 'কোয়ার্ডিনেশনের' কাজ ছিল। একবার বসে পারস্পরিক আলোচনার প্রাক্কালে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, আপনার সন্তান কজন? আমি সংখ্যা বললাম। তারপর আমিও তাকে পাল্টা প্রশ্ন করে বসি, আপনার সন্তান কজন? জবাব যা দিল, শুনে আমি যারপরনাই পেরেশান হলাম। সে বলল, ভাই আমি তো এখনও বিয়েই করিনি; সন্তান আসবে কোত্থেকে? জিজ্ঞেস করলাম, বয়স কত? বললেন, ৫২। আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম, এ বয়সের একটি লোক তো বিয়ে করে নাতি-পুতির মুখও দেখে যায় আর আপনি এখনও বিয়েই করেননি। কোনো সমস্যা ছিল নাকি? সে আগে বেড়েই বলতে থাকল, When you can gat milk from markat you do not need to have cow in your house?

অর্থাৎ– যেহেতু অনায়াসে মার্কেটে দুধ পাওয়া যায়, তাই অযথা কষ্ট করে ঘরে গরু পালার কী প্রয়োজন?

এটাই কাফেরদের কালচার। এটাই তাদের প্রকৃতি। একজন শিক্ষিত লোক এমন ধারণাই রাখে বিয়ের ব্যাপারে। সে মূর্খ নয়; বরং একজন ইঞ্জিনিয়ার আর তার সভ্যতা তাকে এই অশালীন জীবনের দিশা দেয়।

আরেক ইঞ্জিনিয়ারের প্রলাপ

একবার আমাদের কারখানায় 'স্টীম বয়লারের' প্রয়োজন দেখা দেয়। আমরা এ উদ্দেশ্যে এক আফ্রিকান ইঞ্জিনিয়ারকে দু-মাসের জন্য কারখানায় নিয়ে আসি। একদিন সে আমাদের স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে বসে খোশগল্প করছিল। এমনিতেই কিছু যুবক একত্র হলে অনেক রস করা হয়। তো একজন খুব মজাক করে বলল, আপনি এসেছেন আজ পঁচিশ দিন হতে যাচ্ছে। আপনার ফ্যামিলির কী অবস্থা? স্ত্রী কি আপনাকে মিস করছেন না।

আরেকজন বলে উঠল, তোমাকে এখানে বেশ কিছু দিন থাকতে হবে। স্ত্রী কি এতদিন তোমার অপেক্ষা করবে? নাকি পরপুরুষের সাথে পাড়ি জমাবে? কথা শুনে সে মুচকি হেসে বলল–

Women are just like buses. if you miss one, take an other.

অর্থাৎ– মহিলারা হলো বাসের মতো। যদি একটা মিস করি, তবে অন্যটা পেয়ে যাব।

ইসলামের শিক্ষা

একজন শিক্ষিত লোকের স্ত্রীর ব্যাপারে এমন বক্তব্য। তাদের সমাজে স্ত্রীকে এমনই মনে করা হয়। আর দেখুন, ইসলাম কী বলে স্ত্রীর ব্যাপারে। ইসলামে কত ঊর্ধ্বে স্ত্রীর মর্যাদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সদস্যদের কাছে উত্তম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, যদি স্বামী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেয় আর স্ত্রীও হাসে, তাহলে আল্লাহও তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন।

আপনারা পারিবারিক জীবনের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ও অনৈসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি উভয়টাই প্রত্যক্ষ করলেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, ইসলাম আমাদের বৈবাহিক জীবন কাটানোর কত উত্তম শিক্ষা দিয়েছে। এর চেয়ে উত্তম আর কোনো পদ্ধতি হতে পারে না।

৪. কল্যাণকামিতা ও আন্তরিকতার গুরুত্ব

ইসলাম আমাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

'দীন মঙ্গল কামনার নাম।'

অর্থাৎ– যে-ব্যক্তির মাঝে দীনদারি থাকবে, সে সর্বদা অপরের কল্যাণই চাইবে। হিংসা-বিদ্বেষ তার মাঝে থাকবে না। এটি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। যেন দীনের অপর নাম কল্যাণকামিতা। আমাদের আকাবিরগণ পরস্পরের প্রতি কত আন্তরিক ছিলেন অনুমান করার জন্য কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করছি।

গ্রাহকদের কল্যাণ কামনা

ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.) একবার জোহরের পরেই দোকান বন্ধ করে বাড়ির পথে হাঁটতে থাকেন। পথে এক লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে জিজ্ঞস করল, দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাচ্ছেন কেন এই অবেলায়? তিনি উত্তরে বললেন, আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত বৃষ্টি আসবে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। এই অন্ধকারের কারণে এখন কাষ্টমার কাপড়ের ভালো মন্দ বুঝতে পারবে না। এ-সময় যেন কেউ কাপড় কিনে ধোঁকা না খায় তাই দোকান বন্ধ করে বাড়ির পথ ধরেছি।

বিক্রেতার কল্যাণ কামনা

বিক্রেতার প্রতি ক্রেতার আন্তরিকতার একটি ঘটনা শোনাই। এক সাহাবি একবার ১০০০ (এক হাজার) দেরহাম দিয়ে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। ঘোড়াটি কিনে এনে বাড়িতে বেঁধে রাখেন। পরদিন তাঁর এক বন্ধু বাড়িতে আসেন। ঘোড়াটি দেখেই তিনি বলে উঠলেন, এটা তো খুব ভালো ঘোড়া। ১৫০০ দেরহামের কম এর দাম নয়। একথা শুনে সাহাবি নিজেকে খুব অপরাধী মনে করলেন এবং পরদিন আরও ৫০০ দেরহাম নিয়ে বিক্রেতাকে বললেন, আপনি এই ৫০০ দেরহামও নিয়ে যান। এটা আপনার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু আপনার সেই অনুমান নেই। আমার বন্ধু বলেছে, এর মূল্য ১৫০০ দেরহাম। তাই আপনাকে আমি আরও ৫০০ দেরহাম দিয়ে যাচ্ছি।

এক অপরিচিত আগন্তুকের কল্যাণকামিতা

যখন বাগদাদ ইসলামের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়, তখন কাফেররা এক লোককে সেখানে এই বলে পাঠায় যে, গিয়ে তাদের চালচলন দেখে এসো এবং লক্ষ করো তাদের মাঝে এমন কী আছে, যার কারণে চার দিকে তাদের জয়ধ্বনি শোনা যায়। যেখানেই তারা যায় সেই এলাকা তাদের পদানত হয়ে যায়। তারা বাগদাদে এল আর বাগদাদ তাদের হাতে চলে

গেল। এর হেতু কী? সেমতে ওই লোকটি বাগদাদে এল। এক সময় ক্ষুধা পেলে সে এক হোটেলে ঢুকল। তার সাথে অন্য একজন লোক ছিল। সেও খানা খাচ্ছিল। মাঝে-মাঝে তার দিকেও তাকাচ্ছিল। লোকটি ভাবল, আমি এখানে নতুন দেখে হয়তো লোকটি আমাকে দেখছে। খানা খেয়ে যখন লোকটি বিল পরিশোধ করতে গেল, তখন ক্যাশিয়ারকে বিলের কথা জিজ্ঞেস করল। ক্যাশিয়ার তখন বলে উঠল, আপনার বিল তো আপনার পাশে বসা লোকটা পরিশোধ করে দিয়েছে। বিষয়টা আপনাকে বলেনি এজন্য যে সে আপনার কাছ থেকে সামান্য ধন্যবাদটুকুও পেতে চায় না; বরং নিজের পরিপূর্ণ বদলা আল্লাহর কাছেই চায়।

শুনে তো লোকটি হয়রান! সে ভাবতে থাকল, এরা মেহমানের এত সম্মান করে!

দোকানদারদের মাঝে পারস্পরিক কল্যাণকামিতা

তারপর লোকটি একটু সামনে অগ্রসর হলো। হঠাৎ তার কিছু একটার প্রয়োজন দেখা দিল। দোকানদারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার কাছে ওই জিনিসটা আছে কি? দোকানদার বললেন, আপনি জিনিসটা এত টাকায় নিতে পারেন। লোকটি এক পিছ দিতে বলল। কিন্তু পরক্ষণেই দোকানদার তাকে প্রস্তাব করল, ভাই! আপনি এই জিনিসটা একই দামে সামনের দোকান থেকে নিতে পারবেন। দয়া করে আপনি সেখান থেকেই নিন। লোকটা ওই দোকানে গিয়ে জিনিসটা ক্রয় করে নিল। হঠাৎ তার মাথায় চিন্তা এল, দোকানদাররা তো কাষ্টমারকে কখনও এভাবে ফিরিয়ে দেয় না। লোকটা আমাকে ফিরিয়ে দিল কেন?

লোকটি প্রথম দোকানদারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার কাছে কি জিনিসটা নেই? নাকি থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে বিক্রি করেননি? জবাবে দোকানদার বলল, জিনিসটা আমার কাছে আছে। লোকটি বলল, তবে আমাকে দেননি কেন? তখন দোকানদার জবাব দিল, ভাই! আজ আমার অনেক বিক্রি হয়েছে এবং খুব লাভও হয়েছে, যা দিয়ে আমার স্ত্রী-সন্তানের আজকের প্রয়োজন মিটে যাবে। কিন্তু ওই দোকনদারের আজ একটি কাষ্টমারও মিলেনি। তাই চেয়েছি, আপনি যেন জিনিসটা তার কাছে থেকেই কিনেন। তারও কিছু লাভ হোক, যার দ্বারা তার পরিবার চলার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কী আশ্চর্য! দুই দোকানদারের মাঝে এমন আন্তরিকতার একমাত্র দৃষ্টান্ত ইসলামেই খুঁজে পাওয়া যায়।

কাফেরদের কাছে কল্যাণকামিতা

এই কল্যাণকামিতার শিক্ষা কুফরি দেয় না। কাফেররা কারও কোনো উপকার করলে তাতে নিজের স্বার্থ অবশ্যই ঠিক রাখে, যার কারণে গরিবরা সংকটাপন্ন হলে, তাদের আশ্রয় নিলে, তাদের সুদের ওপর ঋণ দেওয়া হয়। আর একেই তারা সাহায্য, সহযোগিতা ইত্যাদি নামে চালিয়ে দেয়। নাউযুবিল্লাহ। কত নীচু মানসিকতা পুষে থাকলে এমন কাজ করতে পারে? তারা এ ক্ষেত্রে শর্ত জুড়ে দেয় যে, এ কাজটি আমাদের কোম্পানির মাধ্যমে হতে হবে, যেন এর লাভ তাতেই আসে। এই হলো কাফেরদের আন্তরিকতা আর কল্যাণকামিতা।

কাফেরদের কুকুর-বিড়াল পোষণ

একবার আমার বিদেশি এক জাদুঘরে যাওয়া হয়। সেখানে দেওয়ালের মাঝে এক আশ্চর্যজনক লেখা পাঠ করলাম। তারা লিখে রেখেছে, পৃথিবীকে দরিদ্রতামুক্ত করতে হলে প্রতি বছর এত বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন। আর ইউরোপে এত বড় অংকই কুকুর ও পোষ্য প্রাণীর পেছনে প্রতি বছর খরচ করা হয়। তাদের বিড়াল-কুকুরের জন্য তারা এই পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করে। কিন্তু একবারও দারিদ্র্য বিমোচনের চিন্তা তাদের মনে উদয় হয় না। কারণ কী? কারণ, তারা তো এই আন্তরিকতা (প্রাণীর প্রতি) আল্লাহকে খুশি করার জন্য করে না। বরং তাদের উদ্দেশ্যে কত ভয়ানক। তারা বলে, তোমরা আমাদের তলে থাকো, আমরা তোমাদের ওপরে থাকব। এটাই তো প্রকৃত সুন্দর জীবন।

চিন্তা করে দেখুন, ইসলাম আমাদের কেমন আন্তরিকতা শেখায় আর কত ভালোবাসার কথা আমাদের মনে গাঁথে। এর নামই হলো ইসলাম। কাজেই খুব ভালো করে ভাবুন, জীবন পরিচালনার এই দুই পদ্ধতির মাঝে উৎকৃষ্টতা, অগ্রগন্যতা ও মহানুভবতা কোন পদ্ধতির মাঝে আছে? কোথায় আছে মানবতা, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার শিক্ষা। কাফেরদের নিকট আছে সুদের লেনদেন। এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে নিয়ে নেওয়ার লেনদেন।

৫. লজ্জাশীলতা ও পবিত্র জীবনের গুরুত্ব

ইসলামের শিক্ষা : ইসলাম আমাদের লজ্জা ও বিনম্রতাপূর্ণ জীবনের শিক্ষা দেয়। এ-ব্যাপারে মহান পরোয়ারদেগারের নির্দেশ এসেছে। মাহরাম (যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয) এবং গায়রে মাহরামের (যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হারাম) বিষয় এতে বর্ণিত হয়েছে। নির্দেশ হলো, প্রতিটি লোক তার পারিবারিক জীবন নিয়ে তুষ্ট থেকে দিনাতিপাত করবে। অন্যের সম্মান রক্ষা করে চলবে। কারও সম্ভ্রম তার দ্বারা নষ্ট হবে না। কারও ইজ্জতের প্রতি সে চোখ তুলেও তাকাবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ

লজ্জা ঈমানের একটি বড় অংশ।[৮২]

ইসলামের শিক্ষা হলো, তুমি কারও দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না, যাতে তোমার অন্তরে কোনো খারাপ চিন্তার উদয় না হয়।

বিধর্মী তথা কুফরি শিক্ষা : লজ্জার ব্যাপারে কুফরি শিক্ষা হলো, Shyness is a sickness অর্থাৎ– লজ্জা হলো একটি ব্যাধি। সেখানে কোনো মুসলমান ছেলে স্কুল শিক্ষিকার সাথে যদি মাথা নিচু করে কথা বলে, তখন বলা হয় লজ্জা একটি ব্যাধি। চোখে চোখ রেখে কথা বলো। ছেলেদের এগুলোই শেখানো হয় সেখানে। সেখানে পোশাক-পরিচ্ছদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এর কুফল কুফরি শক্তি আজ হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে। সেখানকার বিদ্যালয়গুলো যদি কেউ ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাকের করুণ অবস্থা দেখে, সে হতভম্ব না হয়ে পারবে না। অজান্তেই তাকে বলতে হবে, এমন পোশাকে এরা কীভাবে মিলেমিশে জীবন যাপন করছে?

পার্টিগুলোতে আত্মমর্যাদার অপমৃত্যু

সেখানে অনেক পার্টি হয়। সেখানে যৌথ 'ড্যান্স' হয়। সরাসরি তারা নগ্নতায় লিপ্ত হয়। সেখানকার কালচার হয় স্ত্রী ঘরে কারও বউ আর দৈহিকভাবে অন্য কারও ভোগের পাত্র। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সেখানে বিচ্ছিন্নতার সম্পর্ক। নিজেদের কিচেনের খরচ আলাদা-আলাদা তুলে একত্র করে। দুজন

---

৮২. আল-হাদীস

সন্ধ্যায় নাইটক্লাবে যায়। সেখানে স্বামী পর নারীর সাথে আর স্ত্রী পরপুরুষের সাথে রাত কাটায়। সেখান থেকে উভয় সকালে ফিরে আসে।

একটু ভাবুন! ইসলাম পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনের কি গাইডলাইন আমাদের দেয়। এখানে বৈবাহিক জীবনে লজ্জার কথা আছে। আছে সম্ভ্রম রক্ষার শিক্ষা। আর কাফেরদের বৈবাহিক জীবনের চিত্র দেখুন। কত বেহায়াপনা, নোংরামি তাদের মাঝে কাজ করছে, যার কারণে তারা পরের সামনে উলঙ্গ হওয়াকে সাধারণ বিষয় মনে করে। তারা প্রকাশ্যে যৌনচাহিদার চরিতার্থ করে। একজন প্রকৃত মনুষত্ববোধের অধিকারী ব্যক্তি তাদের জীবনচিত্র দেখলে অকপটে একথাই বলবে– "এটা কখনও মানুষের জীবন হতে পারে না। এটা পশুত্ব ও ঘোড়া-গাধার জীবন।

৬. সত্য বলার গুরুত্ব

ইসলামের শিক্ষা : ইসলাম আমাদের সত্যবাদিতার শিক্ষা দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের শিক্ষা নিয়ে।[৮৩]

আর উত্তম চরিত্রের প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সত্য বলো, সততার সাথে লেনদেন করো।

এখন আমরা সত্য বলি না। এটা আমাদেরই ত্রুটি। আমরাই এর জন্য দায়ী। কিন্তু দীনের শিক্ষায় কোনো ঘাটতি বা কমতি নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুমিন আর কিছু হোক না হোক সে কখনও মিথ্যাবাদী হতে পারে না।'

ইসলামের বিজয়

ইন্ডিয়ায় 'কান্ধলা' নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে একটি ফ্লাট নিয়ে এক মুসলমান ও হিন্দুর ঝগড়া। এটা তাদের ব্যক্তিগত একটি বিষয় ছিল। কিন্তু মুসলমান বলল, যদি ওই জায়গা আমার হয়, তবে আমি এতে মসজিদ নির্মাণ করব। তখন সেখানকার মুসলমানরা একথা শুনে তার সমর্থক ও সঙ্গী হয়। আর হিন্দুরা ওই হিন্দুর পক্ষে চলে যায়। বিষয়টা অনেক জটিল আকার

---

৮৩. আল-হাদীস

ধারণ করে এবং আদালত পর্যন্ত গড়ায়। যখন মামলা শোনানির পালা এল, তখন উভয় পক্ষের অনেক লোক কোর্টে উপস্থিত। জজ কাফের ছিলেন; কিন্তু খুব বিজ্ঞ এবং সমজদার লোক ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, মামলাটি অনেক জটিল। রায় এদিক-সেদিক হলে খুনাখুনি শুরু হয়ে যাবে। যার কারণে সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করার চিন্তা করলেন। এজন্য তাদের উভয়ের সামনে তিনি প্রস্তাব করলেন, যদি আমরা আলোচনার মাধ্যমে একে সমাধান করি, তবে কেমন হবে? তখন হিন্দুরা বলে উঠল, মুসলমানদের একজন বড় আলেম আছেন; তাঁকে উপস্থিত করে আমরা তার থেকে সাক্ষ্য নেব। তিনি যদি মুসলমানদের পক্ষ নেন, তা হলেও আমরা মেনে নেব। জজ বললেন, এটি একটি খুব ভালো পদ্ধতি জটিলতা নিরসন করার জন্য। এই বলে পুনরায় মামলার তারিখ ঘোষণা করলেন।

মুসলমানরা তো বেজায় খুশী। আর যাহোক তিনি তো একজন মুসলমান। আল্লাহর ঘর নির্মাণের ভালোবাসা তার অন্তরেও আছে। তিনি তো একথাই বলবেন যে, এ জায়গা মুসলমানদের। সুতরাং এটা তাদের দিয়ে দেওয়া হোক যেন তারা মসজিদ নির্মাণ করতে পারে। আর হিন্দুরা বলল, যদি আমাদের হয়, তাহলে আমরা এতে মন্দির বানাব। কিন্তু যিনি সাক্ষ্য দেবেন, তিনি একজন মুসলমান। তিনি কি আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন? তারা খুব বিপাকে পড়ে গেল। যে-হিন্দু ওই আলেমের কথা বলেছিল, তাকে তারা যা-তা বলতে লাগল। তাকে বলা হলো, তুমি এমনটা কেন বললে? জান না সে মুসলমান? একজন মুসলমান হিসেবে সে যে কী বলবে এটা সবার কাছেই স্পষ্ট।

কিন্তু লোকটি নিরুত্তর। কোনো জবাব দিল না। অবশেষে প্রতীক্ষিত দিনটি এসে গেল। আদালতে প্রচণ্ড ভিড় জমল। ইংরেজ জজ আলেমকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, জমিটা কার? মুসলমানের, না হিন্দুদের। আলেম হলেন মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলভী (রহ.)। তখন মুসলমানরা খুব আমোদ অনুভব করতে লাগল। তাদের ধারণা ছিল, মুফতী সাহেব তাৎক্ষণিকভাবেই বলে দেবেন, এটা মুসলমানদের জমি। কিন্তু মুফতী সাহেব বললেন, জজ সাহেব, আপনি আমার কাছে এ-ব্যাপারে সাক্ষ্য চাইলে আমি বলব, এই জমি হিন্দুদের। জজ আবার জিজ্ঞেস করলেন, হিন্দুরা এখানে মন্দির বানাতে চাইলে তারা কি সেই অধিকার লাভ করবে? মুফতী সাহেব বললেন, জমি যেহেতু তাদের, তাই তারা সেখানে যা বানাক না কেন সেটা তাদের ইচ্ছা। সেটা মন্দির হোক বা ঘর অথবা অন্য কিছু।

তাঁর কথা শুনে তো মুসলমানরা হতবাক্। কিন্তু ইংরেজ জজ সেদিন ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় একটি রায় দিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন– 'আজকের এই মামলায় যদিও মুসলমানরা হেরেছে; কিন্তু ইসলাম জিতে গেছে। জজের সিদ্ধান্ত শুনে হিন্দুরা বলতে লাগল, জজ সাহেব! আপনি তো আপনার সিদ্ধান্ত দিলেন। এবার শুনুন আমাদের সিদ্ধান্ত। আমরা এই মহান সত্য ধর্মের সত্যতায় অভিভূত হয়ে আজ কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। আমরা সবাই মিলে উক্ত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করব।

ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق

ہمیں رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

শত ভয় থাক না কেন সত্য হলো সঙ্গের সাথী,

পৃথিবীর সূচনা থেকে এটাই হলো সাধু-দরবেশদের রীতি।

৭. নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার গুরুত্ব

আরেকটি বিষয় চিন্তা করুন। আমরা যখন একসাথে অনেকজন থাকি। তখন অন্যের খাতিরে আমাদের অনেক কিছুই করতে হয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে إِيْثَار বলা হয়। আমি ইংরেজী ভাষায় বহু খোঁজাখুঁজির পরও إِيْثَار-এর একটি শব্দও পাইনি। আমার বুঝতে বাকি রইল না, তাদের মধ্যে যদি এই إِيْثَار থাকত, তবে তারা এর জন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করত। তাদের মধ্যে এটি নেই। এর জন্য শব্দ আসবে কোত্থেকে? কিন্তু ইসলাম এই মহান গুণের শিক্ষা দেয়। إِيْثَار এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিজের প্রয়োজন বাদ দিয়ে অপর ভাইয়ের প্রয়োজনকে আগ্রাধিকার দেওয়া। এটি ইসলামেই রয়েছে। কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন–

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

তারা নিজেদের প্রয়োজনের ওপর অপর ভাইয়ের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে যদিও তারা নিজেরা হয় দুর্দশাগ্রস্ত।[৮৪]

---

৮৪. সূরা হাশর : আয়াত ৯

তিন সাহাবির আত্মদানের ঘটনা

তাবুক যুদ্ধের প্রসিদ্ধ ঘটনা। এক সাহাবি বর্ণনা করেন, তাবুক যুদ্ধে আমার এক ভাই অংশ নেয়। যুদ্ধের শেষ সময়ে আমি একটি মশকে করে কিছু পানি নিয়ে তার উদ্দেশে রওনা হই। যদি তাকে শেষ মুহূর্তেও পাই তবে যেন তার মুখে একটু পানি তুলে দিতে পারি। আমি গিয়ে তাকে একস্থানে পড়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে দেখলাম। সে পানি-পানি বলে শব্দ করছে। যখন পানি তার মুখে দিতে গেলাম, তখন আরেকজন পানি-পানি বলে আওয়াজ দিল। আমার ভাই তখন মুখটা বন্দ করে ফেলল। আমাকে ওই ব্যক্তির কাছে গিয়ে পান করাতে বলল। আমি যখন তার কাছে যাই, তখন আরেকজন পানি-পানি বলে আওয়াজ করল। তখন দ্বিতীয় লোকটি মুখ বন্ধ করে ফেলল এবং আমাকে তৃতীয় লোকটির কাছে যেতে বলল। আমি তার কাছে গিয়ে দেখি, তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। এবার দ্রুত দ্বিতীয়জনের কাছে আসি। দেখি, তিনিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। আমি তখন আমার ভাইয়ের কাছে দৌড়ে আসি। দেখি ততক্ষণে তিনিও পরলোকগমন করেছেন।

সুবহানাল্লাহ! অন্যকে কতটুকু প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা থাকলে মৃত্যুর চরম কঠিন মুহূর্তেও নিজের প্রচণ্ড পিপাসা থাকা সত্ত্বেও আরেকজনের পিপাসা নিবারণের মতো বিস্ময়কর কাহিনির জন্ম দিতে পারে। এর দৃষ্টান্ত শুধু ইসলামই পেশ করতে পারে। পৃথিবীর কোথাও এর নজির নেই। আর এটাই হলো ইসলামের শিক্ষা। এরই নাম ইসলাম।

আবুল হাসান নূরী (রহ.)-এর আত্মদানের ঘটনা

হযরত আবুল হাসান নূরী (রহ.) একজন মহান বুযুর্গ ছিলেন। তিনি একটি ফতোয়া দিয়েছিলেন, যা তৎকালীন শাসকের বিরুদ্ধে চলে যায়। শাসক তাঁকেসহ তাঁর দশজন সাথীকে গ্রেপ্তার করে আনার নির্দেশ দেন এবং তাদের হত্যার নির্দেশ দিলেন। সে তাঁদের হত্যার জন্য উন্মুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করল। যখন হত্যার জন্য তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন শাসক দেখল, নূরী (রহ.) সবার আগে। তারপর তার একজন শাগরেদ, তারপর অন্য একজন। শাসকের নূরী (রহ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। সে চাচ্ছিল, হযরতকে রেখে অন্য কাউকে হত্যা করবে। কিন্তু আবুল হাসান (রহ.) সবার আগে; তাই তাঁকে ছাড়া অন্যদের হত্যা সম্ভব নয়। সে হুকুম করল, এখানে

বিন্যাস ঠিক হয়নি; অন্য জায়গায় নিয়ে যাও। কিন্তু ঘটল এর পুরোপুরি উল্টো ঘটনা। সেখানেও তিনি এগিয়ে।

এবার পুনরায় আদশে দিল, তাদের এখানে নিয়ে আস। এখানেও সেই একই অবস্থা। নূরী (রহ.) সবার আগে। শেষে শাসক নূরী (রহ.)কে ডেকে বলল, হযরত! আমি চাচ্ছি, আপনাকে জীবিত রেখে অন্য কাউকে হত্যা করব; কিন্তু তিনবারেই দেখেছি, আপনি সবার আগে হত্যার জন্য প্রস্তুত। এমনটি করার কারণ কী? ইচ্ছা করেই করছেন, না-কি অনিচ্ছা সত্ত্বে। নূরী (রহ.) বললেন, এমনটি আমি ইচ্ছা করেই করছি। শাসক প্রশ্ন করলেন, কেন করছেন? জবাব যা এল, তা হলো এই– আমি এমন করছি, যাতে আপনার জল্লাদ আমাকে হত্যা করতে যত বিলম্ব করবে, আমার সাথীরা ততটুকু সময় হলেও জীবন লাভ করতে পারবে। আমার আগে যেন তাদের শিরোচ্ছেদ না হয়। সুবহানাল্লাহ!

এমন কোনো দৃষ্টান্ত ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

তো আপনারা এখানে ইসলামের শিক্ষা দেখলেন। এখানেও আপনারা জীবন পরিচালনার উভয় পদ্ধতির মাঝে ওজন করে দেখবেন। একটির মধ্যে শুধু আত্মদান আর আত্মদান। আরেকটার মধ্যে এর অর্থবহ কোনো শব্দই নেই। আর সেটা হলো কুফরির শিক্ষা।

কাফের সোসাইটির একটি নমুনা

আমাদের পরিচিত এক শিক্ষিত লোক ইংল্যান্ডে থাকত। এখান থেকে একবার তার মামা তার সাক্ষাতে সেখানে যায়। তাদের বাড়িতে অনেক আমের বাগান ছিল। যাওয়ার সময় তার মা আমের একটি ঝুড়ি মামার হাতে দিলেন ছেলের জন্য। মা অনেক বেশি দরদী ছিলেন। ছেলেকে নিজহাতে কিছু না দিতে পারলে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। তো মামা যখন আমগুলো নিয়ে ভাগিনার কাছে গেল, তখন ভাগিনা মায়ের পাঠানো আমগুলো মামা ও পরিবারের সকলকে নিয়ে খেল। কিছু তার আশপাশের প্রতিবেশীদেরও দিল। কিছুক্ষণ পর দরজায় করাঘাত হলো। দরজা খুললে দেখা গেল উভয় পাশের প্রতিবেশী দরজায় দাঁড়ানো। ভাগিনা জিজ্ঞেস করল, আপনারা কী জন্য এলেন। তারা বলল, আহমদ সাহেব! আপনি যে আম দিয়েছেন তা খুব সুস্বাদু। আমরা অনেক ইনজয় করেছি। কিন্তু আপনি তো আমাদের বিলের পরিমাণটা বললেন, না। এখন এসেছি তা জেনে পরিশোধ করার জন্য।

দেখুন, তাদের ধ্যান-ধারণা, তাদের প্রকৃতি। কাউকে যেকোনো বদলা ছাড়াই কিছু দেওয়া যায় এমন চিন্তাও তারা করতে পারে না। এই হলো তাদের কালচার। তারা কাউকে কিছু গিফ্‌ট করার আগে নিজের স্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখে। স্বার্থহীনভাবে কোনো কিছু করার মানসিকতা তাদের মাঝে নেই বললেই চলে।

ইসলামি সোসাইটির একটি নমুনা

এবার ইসলামে আত্মদানের আরেকটি ঘটনা আপনাদের শোনাচ্ছি। আজ থেকে প্রায় তেইশ বছর আগের ঘটনা। একবার এক সাহেব কাবুল সফর করেন। সেখান থেকে আসার সময় তিনি কিছু আনার এবং আরও বিভিন্ন জাতের ফল ক্রয় করে পাকিস্তান আসেন এবং বাড়িতে এসে মায়ের হাতে তুলে দেন। ঘটনাক্রমে ওই দিন দিল্লি থেকে তাদের কিছু আত্মীয় তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে এবং তারা আবার সেদিনই চলে যায়। যাওয়ার সময় সাহেবের মা ছেলেকে বললেন, ফলের ঝুড়িটা তাদের দিয়ে দাও। এরা যখন বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে ঝুড়িটা দিল, তখন ঘরের কাজের বুয়া নিজ সংসারের দুরবস্থতার কথা ওই মায়ের কাছে বলল। তার স্বামী ছিল না। ছেলেগুলো কদিন যাবত না খেয়ে আছে। তার এই অবস্থার কথা শুনে মা তাকে ঝুড়িটা দিয়ে দিলেন। বুয়া তার এতিম ছেলেদের তা খাইয়ে দিল। সুবহানাল্লাহ!

কাবুল থেকে ফল এল লাহোরে। সেখান থেকে গেল দিল্লিতে। আর সেখান থেকে এক মহিলার এতিম বাচ্চাদের খাবারের ব্যবস্থা হলো। আত্মদানের এই শিক্ষা-ই ইসলাম আমাদের দিয়ে থাকে। আমরা একটু গভীর চিন্তা করে দেখি। ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন এবং অনৈসলামিক কালচার এ-দুয়ের কোনটার মধ্যে মানবতা ও মনুষ্যত্বের সঠিক চিত্র পরিলক্ষিত হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই চিত্র ইসলামের মাঝেই পাওয়া যাবে– অন্য কোথাও নয়।

তাবেয়ীনদের সময়কার বিস্ময়কর কাহিনি

তাবেয়ীনদের সময়কার একটি ঘটনা। একলোক এক খণ্ড জমি কিনল। জমি কিনে চাষ করতে গেলে সেখানে সোনাভর্তি একটা কলসি পেল। তখনকার লোকেরা সোনা-চান্দি এভাবেই সংরক্ষণ করত। লোকটা এই সোনাগুলো দেখে পেরেশান হয়ে গেল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই বিক্রেতার

শরণাপন্ন হলো। গিয়ে বলল, ভাই! আমি জমির মাঝে সোনাভর্তি এই কলসিটা পেয়েছি। আমি তো আপনার কাছ থেকে জমি ক্রয় করেছি– কলসি ক্রয় করিনি। কাজেই এটা আপনি নিয়ে যান। বিক্রেতা বলে উঠল, না এটা কখনও হয় না। আমি আপনার কাছে জমি যখন বিক্রি করেছি, সাথে জমির সব কিছুও বিক্রি করেছি। ব্যস, এখন জমি যেমন আপনার; এর মাঝে যা আছে সবকিছুও আপনার। কাজেই এটাও আপনার। আপনি নিয়ে যান। কিন্তু দুজনই নিজ কথার ওপর অনড়। কেউ তা নিতে রাজি নয়। বিষয়টি এক সময় কাজী পর্যন্ত গড়াল।

তো তাদের চিত্র ছিল এটা। আমরাও যদি সত্যিকারার্থে মুসলমান হতাম, তাহলে আমাদের অবস্থাও এমনই হতো। আমরাও এমন ঘটনার সম্মুখীন হলে বলতাম, 'এই হক আমার ভাইয়ের– আমার নয়।' কিন্তু আমরা আমাদের গৌরব হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের মাঝে প্রকৃত ইসলাম নেই, যার ফলে এখন এমন ঘটনা ঘটলে একদল বলবে, এটা আমাদের প্রাপ্য। এর জন্য যা করা দরকার তা-ই করব। রক্তের নদী বইয়ে দেব। আরেক দল বলবে, শরীরের এক বিন্দু রক্ত থাকতে এটা অন্য কারও হতে পারে না। আর কাজী পর্যন্ত গড়ানো; সেটা কল্পনাও করা যায় না।

তো কাজী ছিলেন সায়্যিদুনা কা'ব (রাযি.)। তিনিও এরকম মামলায় পেরেশান। কারণ, তখনকার কাজীরাও অনেক খোদাভীরু ছিলেন। তাঁদের আপাদমস্তক আধ্যাত্মিকতার আলোয় পরিপূর্ণ ছিল। পরে তিনি উভয়ের পরিবার সম্পর্কে খোঁজ নেন। জানতে পারেন, একজনের ঘরে বয়স্ক ছেলে আছে। আরেকজনের ঘরে বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে আছে। হযরত কা'ব (রাযি.) তাদের বললেন, আমার কাছে উত্তম মনে হয়, এই উভয়ে ছেলেমেয়ের মাঝে বিয়ে পড়িয়ে এই স্বর্ণগুলো তাদের উপহার হিসেবে দিয়ে দেওয়া হোক। তোমরা রাজি থাকলে আমি তা করতে পারি।

প্রস্তাবটা তাদেরও মনঃপূত হলো এবং সে অনুযায়ী কাজ হয়ে গেল।

তো একটি জীবনরীতি আমাদের এদিকেই নিয়ে যায়। আমাদের বিশ্বস্ততার শিক্ষা দেয়। আর অন্যটা আমাদের পারস্পরিক দূরত্ব শেখায়। অপরিচিতি সৃষ্টি করে, যেখানে এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর খোঁজ নেয় না, সংকটে, সংগ্রামে এগিয়ে আসে না। আল্লাহ আপনাদেরও বুঝ দিয়েছেন। শিক্ষার আলো দান করেছেন। বিশ্বাস করুন, ইসলামই হতে পারে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা।

৮. এখলাসের গুরুত্ব

ইসলাম ইখলাস (একনিষ্ঠতা) শিক্ষা দেয়। ফলে মানুষ যাই করুক না কেন এজন্য কারও কাছ থেকে কোনো বদলা চায় না, থ্যাংক ইউ পর্যন্ত না। শুধু এক অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কাজ করে। পার্থিব কোনো স্বার্থ তার মাঝে কাজ করে না।

সাহাবায়ে কেরামের যামানার একটি ঘটনা

মাদায়েন বিজিত হওয়ার পর যখন মুজাহিদগণ গনিমতের মাল একত্র করছিলেন, তখন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) ছিলেন এক পাশে বসা। তাঁকে উদ্দেশ করে এক মুজাহিদ এগিয়ে এলেন। তাঁর পরনে ছিল ছেঁড়া জামা। দেখেই মনে হচ্ছে, তিনি খুবই দরিদ্র। জীবনভেলা বহু কষ্টে বইয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাপড়ের সাথে কিছু একটা মেলানো ছিল। এসেই সা'দ (রাযি.)-এর সামনে সেটা পেশ করলেন। বললেন, যুদ্ধের ময়দানে আমি এই কাপড়টি পেয়েছি। সা'দ (রাযি.) কাপড়টি খুলে দেখে জানতে পারলেন, এই কাপড়ের মধ্যে ওই যুদ্ধে শরীক হওয়া কয়েকজন বাদশাহ, সিপাহসালার ও কমান্ডারের মুকুট আছে। সেগুলো মূল্যবান হীরা ও মুক্তাখচিত ছিল, যার একটার মূল্য দিয়ে জীবন পার হয়ে যেতে পারে।

সা'দ (রাযি.) খুবই বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, এই কাপড়টার কথা তো কারও জানা নেই। যদি এই লোকটি কাউকে না জানিয়ে এটি গোপনে নিয়ে যেত আর হীরা-মুক্তাগুলো বিক্রি করে ফেলত, তাহলে সে লাল হয়ে যেতে পারত। বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই তিনি মুজাহিদকে প্রশ্ন করলেন, এই মিয়া! বলো তোমার নাম কী? নামের ব্যাপারে প্রশ্ন শুনে উক্ত মুজাহিদ এক সেকেন্ডও দেরি করলেন না। পিঠ প্রদর্শন করে এই বলে চলে এলেন যে, আমার সময় হয়ে গেছে হে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস। যেই প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য আমি এই মূল্যবান কাপড়টি ফিরিয়ে দিয়েছি, সেই রব আমার নাম জানেন, আমার বাবার নামও জানেন।

সুবহানাল্লাহ!

এ হলো ইসলাম, যে আমাদের ইখলাস শিক্ষা দেয়। আমরা যখন সত্যিকারার্থে মুসলমান ছিলাম, তখন আমাদের নারী-পুরুষ সকলের চিন্তাধারা, সকলের জীবনরীতি একই ছিল। সাধারণত মহিলাদের পারস্পরিক জীবন ঝগড়াটে হয়ে থাকে। কিন্তু তখনকার (সাহাবায়ে কেরামের যমানার)

মহিলারা এমন ছিলেন না। তাঁদের পারস্পরিক জীবন ছিল ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত। একটি ঘটনা শোনাচ্ছি।

দুই সতীনের ইখলাস

জনৈক ব্যবসায়ীর এক অপরূপা সুন্দরী স্ত্রী ছিল। সে দেখতে যেমন সুন্দরী ছিল, তেমনি দীনদারিতেও ছিল পাকা। তার স্বামী ব্যবসায়িক ভিন্ন কাজে এক শহরে যেতেন এবং সেখানে প্রায়ই তার আসা-যাওয়া ও থাকা হতো। একসময় বিবির অনুভব হলো, স্বামীর ওই এলাকাতেই বেশি থাকা হচ্ছে। তাহলে কি সেখানে তিনি দ্বিতীয় কোনো ঘর বানিয়েছেন? সেই সন্দেহের ওপর ভর করে এক আস্থাভাজন ব্যক্তিকে স্বামীর সেখানকার অবস্থা জানার জন্য পাঠাল, যাতে সে তার সঙ্গীদের থেকে তার বিস্তারিত অবস্থা জেনে নেয় এবং বিয়ের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। লোকটি সেখানে গিয়ে ব্যবসায়ী লোকটির বন্ধুদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করল এবং জানতে পারল, ব্যবসায়ী লোকটি সেখানে আরেকটি বিয়ে করেছে। এ শহরে এলে তারই কাছে থাকে।

মহিলা যখন স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হলো, তখন চিন্তা করল, স্বামীকে যদি এ-ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করি, তবে সে অযথাই লজ্জিত হবে অথবা সাফ জানিয়ে দেবে, 'তোমার সাথেও থাকব; তাকেও সময় দেব।' তো কী দরকার আছে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার। স্বামীর মাঝে আর আমার মধ্যকার ভালোবাসা অক্ষুণ্ন রাখলে আমার কী এমন ক্ষতিটা হবে! যেই ভাবা সেই কাজ। স্বামীর সাথে বিষয়টি নিয়ে ক্যাঁচালে গেল না। তার অবগত হওয়ার কথা স্বামীকে বুঝতেই দিল না; বরং পূর্বের ন্যায় ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখল। অথচ তার পুরোপুরিই জানা ছিল, তার স্বামী ওই শহরে গেলে অন্য স্ত্রীর সাথেই থাকে।

আল্লাহর ইচ্ছায় কয়েক মাস যেতে-না-যেতেই স্বামীর মৃত্যু হয়ে গেল। লোকটির সকল সম্পত্তি প্রথম স্ত্রীর কাছেই ছিল। কাফন-দাফন শেষ হলে যখন সম্পত্তি বণ্টনের বিষয় এল, তখন মহিলা নিজের ভাগ আলাদা করে নিল এবং অপর বিবির ভাগও আলাদা করল। যে-লোকটি মহিলাকে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের কথা অবহিত করেছিল, তাকে বলল, কেউ জানে না, আমার স্বামী আরেকটা বিয়ে করেছেন এবং স্বামীর ব্যাপারে লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ক কেউ কিছু বলেনি এবং বিয়ের ব্যাপারেও বলেনি। কিন্তু কেউ না বললে কী হবে? আমি তো জানি তার আরেকটা স্ত্রী আছে। সে তার সম্পদের

ভাগীদার। তার ভাগ যদি আজ আমি না দিই, তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কী জবাব দেব। কাজেই আমি তার সম্পদ খেতে পারি না। যাও এই সম্পদগুলো তার কাছে নিয়ে যাও। লোকটি গিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীকে তার স্বামীর মৃত্যুর খবর দিল এবং তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির কথাও বলল এবং এ-ও জানাল যে, প্রথমা স্ত্রী তোমার ভাগ আলাদা করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি গ্রহণ করো। দ্বিতীয় স্ত্রী তখন বলল, আল্লাহ তার মঙ্গল করুন। সে কতই-না নেককার! তারপর বলল, আপনি এ-সম্পদ তার কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যান। কারণ, আমার স্বামী এক সপ্তাহ আগে আমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। আর এই তালাকের কথা আমি আর আমার আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কাজেই তার সম্পদে আমার কোনো অধিকার নেই। এই সম্পদ তারই। আপনি এটা নিয়ে যান।

এটা কার শিক্ষা? একমাত্র ইসলামের শিক্ষা। দুনিয়ার কেউ প্রকৃত অবস্থা না জানলেও যখন আল্লাহর ভীতি অন্তরে থাকে, তখন একে অপরের হকের প্রতি এমন গুরুত্ব দিতে পারে।

এক ফকিরের ইখলাস

দিল্লির এক মসজিদে এক ইংরেজ মসজিদের কারুকার্য দেখতে এল। সেখানকার যে-ক্যালিগ্রাফার ছিল সে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। তো এই লোকটি যখন মসজিদের সিঁড়ি বেঁয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল, তখন এক ভিক্ষুক এসে তার কাছে হাত পাতল। লোকটি মানিব্যাগ থেকে কয়েকটা টাকা তাকে দিয়ে দিল এবং উপরের দিকে চলে গেল। কিন্তু সে যখন মানিব্যাগ থেকে টাকা দিয়ে তা পকেটে রাখছিল, তখন ব্যাগটা তার অগোচরে নিচে পড়ে গেল। লোকটি মসজিদের কারুকার্য দেখে-দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে যায়।

সেখান থেকে বাড়ি এসে স্ত্রীকে মসজিদের ক্যালিগ্রাফির সৌন্দর্যের কথা বলল। তার স্ত্রীর ক্যালিগ্রাফির ব্যাপারে জ্ঞান ছিল। যার কারণে সে-ও তা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করল এবং পরে একসময় যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখল। রাতে লোকটি মানিব্যাগ হারানোর বিষয়টি আঁচ করতে পারল। তার কিছুতেই মনে পড়ল না, ব্যাগটা কোথায় হারাল। তাতে কয়েকশত টাকা ছিল। সেকালে এ-টাকারও অনেক মূল্য ছিল। তো সে অনেক চিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু চিন্তা করে কী লাভ; যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

পরের সপ্তাহে যখন স্ত্রীসহ আবার মসজিদের কারুকাজ দেখতে এল, তখন দূর থেকে দেখল, গত সপ্তাহের ভিক্ষুকটি তার দিকে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু আজ সে কিছুর জন্য হাত বাড়ায়নি; বরং নিজ থলে থেকে একটা মানি ব্যাগ বের করে ওই ইংরেজকে বলল, নিন, এটা আপনার মানিব্যাগ। আপনার পকেট থেকে গত সপ্তাহে পড়ে গেছে। পেয়ে আমি রেখে দিয়েছি। কাগজ-পত্র, টাকা-পয়সা ভালো করে দেখে নিন। লোকটা মানিব্যাগ খুলে কাগজ-পত্র, টাকা-পয়সা সব ঠিকঠাকই পেল।

এর পরেই তার বিস্ময়ের পালা শুরু হলো। সে ভাবতে থাকল, এই লোকটা ভিক্ষুক, এক-দুই টাকা চেয়ে বেড়ায়। প্রতিদিন আর কটা টাকা-ইবা পায়। কিন্তু সে এত সৎ! ব্যাগভর্তি এত টাকা থাকা সত্ত্বেও সেই টাকা সে নেয়নি। আমাকে না জানিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেও তো পারত। কেন এমন করল? পরে নিজেই প্রশ্ন করে বসল, ভাই! তুমি তো এটা নিজের কাছেই লুকিয়ে রেখে দিতে পারতে আর অনেক টাকাও পেয়ে যেতে। এমনটা কেন করলে? ভিক্ষুক জবাব দিল, একটা বিষয় আমাকে ব্যাগটা ফেরত দিতে বাধ্য করেছে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, কী সেটা? ভিক্ষুক জবাব দিল, আমার মাথায় চিন্তা এল, যদি আজ আমি আপনার এই মানিব্যাগটা নিয়ে যাই, তাহলে কাল কেয়ামতের দিন আপনার নবী হযরত ঈসা (আ.) আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলে খোঁটা দেবেন যে, আপনার উম্মত আমার উম্মতের পয়সা চুরি করেছে। এই চিন্তা হতেই আমি তা আপনার কাছে ফিরিয়ে দিতে মনস্থ হই এবং এখন ফিরিয়ে দিলাম।

দেখুন, এটাই ইসলামের শিক্ষা। ইসলাম এই শিক্ষাই আমাদের দেয়। এখানে একজন ভিক্ষুক এক বেলা যে ঠিকমতো খেতে পায় না তার চিন্তাধারাও এমন। ইসলামই তাকে এই সততা শিখিয়েছে।

এক দয়াবান হাজীর ইখলাস

মিনার ময়দানে এক বৃদ্ধা একটা থলে নিয়ে আপন মনে হাঁটছিলেন। তার সকল প্রকার পাথেয় ওই থলেতেই ছিল। হঠাৎ এক তাগড়া যুবক তড়িৎ বেগে তার থলেটি ছিনিয়ে নিল। লোকটি অসহায় ছিল। তাই ধৈর্য ধারণ করল। আর যুবক কিছু দূর অগ্রসর না হতেই তার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। দৃষ্টির সামনে সব কিছুই অন্ধকার দেখতে পেল। এ অবস্থায় সে সজোরে একটা চিৎকার দিয়ে কান্না আরম্ভ করল। লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কাঁদছ কেন? যুবক বলল, আমি এক বৃদ্ধের থলে ছিনিয়ে এনেছি। হয়তো সে আমাকে বদদু'আ দিয়েছে, যার কারণে আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে

গেছে। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন। তার কাছে আমি ক্ষমা চাইব। লোকেরা তাকে উক্ত বৃদ্ধের কাছে নিয়ে গেল এবং সব ঘটনা খুলে বলে ক্ষমার অনুরোধ জানাল। বৃদ্ধ বলল, আমি তো তাকে চুরি করার সময়েই ক্ষমা করে দিয়েছি। লোকেরা বিস্মিত হলো। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, সে আপনার ব্যাগ নিয়ে গেল আর আপনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন? এই উদারতা আপনার কীভাবে অর্জিত হলো? জবাবে সে যা বলল, শুনে সবাই বিস্মিত হলো। বলল, তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এ-কারণে যে, আমি শুনেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের হিসাব হবে। আমি সেখানে উপস্থিত থাকব। আমার শেষ উম্মতটি জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত আমি জান্নাতে যাব না। তো এখন যদি আমি তাকে ক্ষমা না করি, তবে সে আল্লাহর কাছে ধরা পড়বে। তার হিসাব-নিকাশ হবে। তার জান্নাত প্রবেশ অনেক দীর্ঘ হবে। আর তার কারণে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাতে প্রবেশ দীর্ঘায়িত হবে। আর আমি চাই না, তার জন্য আমার রাসূল এ কষ্টের শিকার হোন। এ-কারণেই আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ!

এটি ইসলামের শিক্ষা। একেই বলে প্রকৃত শিক্ষা।

হৃদয়ের আকুতি

আপনারা এখন অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করুন যে, আমাদের হাতে সোনা আছে। কাফেররা নিজ শক্তি বলে তাকে পিতল সাব্যস্ত করতে চায়। যা কখনও হওয়ার নয়।

তারা লজ্জা ও নম্রতাকে খারাপ বলে আর বেহায়াপনা-অশ্লীলতাকে ভালো বলে চালিয়ে দিতে চায়। তারা স্বার্থের বুলি আওড়ায় আর নিঃস্বার্থকে কটাক্ষ করার হীন চেষ্টা চালায়। ভালোকে খারাপ আর মন্দকে ভালো বানানোর এক বিশাল নগ্ন প্রয়াস তারা চালাচ্ছে।

আলোচিত সাতটি বিষয় যদি আমরা চিন্তা করি এবং এ সকল ক্ষেত্রে ইসলাম ও কুফরকে সামনে রাখি, তবে নিশ্চয়তার সাথে অন্তর থেকে এ আওয়াজ আসবে যে, 'ইসলামই একমাত্র সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা।'

আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি আমাদের মুসলিম পরিবারে জন্ম দিয়েছেন, যেখানে খুব ছোট্ট বেলাতেই কালেমার শিক্ষা পেয়েছি। মা যখন কোলে নিয়ে দোলাতেন, তখন কালেমা পড়তেন। একটু বড় হলে বাবা হাত ধরে মসজিদে

নিয়ে যেতেন। দীন শেখার ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি তাদেরও অনেক অবদান রয়েছে। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে যখন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করি, তখন আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়ায় চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। মাথা নুইয়ে আসে। অন্তরে বিশাল ভাবাবেগে সৃষ্টি হয়।

ইসলামই সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা

হে পরোয়ারদেগার! আপনি আমাদের এই নেয়ামত দান করেছেন। এর শুকরিয়া আদায়ের ভাষা আমাদের জানা নেই। আমাদের তাওফীক দান করুন যেন আমরা এই নেয়ামতের কদর করতে পারি। আমরা ভুল করি, গুনাহ করি আর সেটা নিজেদের দুর্বলতা ও খারাপ মনোভাবের কারণেই। কিন্তু প্রভু! আমরা ইসলামেই সন্তুষ্ট। মুসলমান পরিচয়ই আমাদের গৌরব।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا

'আমি এতে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ আমার প্রভু, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবী, ইসলাম আমার ধর্ম।'

আল্লাহ আমাদের এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মুসলমানিত্বের মূল্য

'একটু চিন্তা করি– কোনো মূর্খ যদি মূর্খতাসুলভ আচরণ করে, তাহলে এটা তার মূর্খতারই পরিচয় দিল। কিন্তু আমি তো তার মতো ওই রকম মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করতে পারি না। কারণ, আমি একজন মুমিন, মুসলমান। সে যা বলে, আমি তা বলতে পারি না। কেউ যদি আমাকে গালি দেয়, তাহলে আমি তাকে পাল্টা গালি দিতে পারি না। আমাদেরকে সর্বদা এসব বিষয়ের প্রতি যত্নবান হতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যেহেতু নবীর সুন্নাতের পথ অবলম্বন করছি, এজন্য আমাদেরকে এর মর্যাদার প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে।'

মুসলমানিত্বের মূল্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ ۔

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۔

ইসলামের বরকতসমূহ

ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। পৃথিবীর প্রত্যেক সদস্যের জন্য এই দীন উপযোগী এবং প্রত্যেকেই তা মানতে বাধ্য। এর শিক্ষা-দীক্ষা এমন সুন্দর যে, কোনো ব্যক্তি যদি সেই শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করে, তাহলে সে সফল হয়ে যাবে। কোনো জাতি যদি এই শিক্ষা আঁকড়ে ধরে এবং তার রঙে নিজেদের রাঙিয়ে তোলে, তাহলে তারা উৎকৃষ্ট ও সফল জাতিতে পরিণত হবে।

সাহাবায়ে কেরাম এই দীন বুকে ধারণ করেই আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁরা যে-দিকেই গিয়েছেন, বিজয় তাদের পদচুম্বন করেছে। এটি সে মহান দীনের বরকত, যা বুকে ধারন করায় আফ্রিকার জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীগুলো সাহাবায়ে কেরামের মিশন সফল করার ক্ষেত্রে ব্যঘাত ঘটায়নি। সেদিন বনের প্রাণীগুলো প্রকৃতির নিয়ম ভেঙে এক অন্য নিয়মে পরিচালিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তি বলেন,

بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسری سے دبے

چند وہ لوگ تھے جو اونٹوں کو چرانے والے

جن کو کافور پر بھی ہوتا تھا نمک کا دھوکہ
وہی لوگ بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والا

অর্থ : তাঁদের এমন শান ছিল যে, কায়সার-কেসরার কাছেও তাঁরা হার মানেননি। ছিলেন তাঁরা গুটিকতক লোক উটের রাখাল। কর্পুর আর নুনের পার্থক্য যারা বুঝতে কষ্ট হতো, তাঁরা হয়ে গেলেন জগতের ভাগ্য পরিবর্তনকারী!

এক স্টোরের রিটার্ন পলিসি

বিদেশে একবার এক আশ্চর্য ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করি। সেখানে অনেক বড় একটি শপিংমল ছিল। এত বড় ছিল যে, ভেতরে ঢুকলে মনে হতো যেন একটা এলাকা। মানুষ ভেতরে হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যেত; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। দোকানের কাষ্টমারও অনেক। হাজার-হাজার। রাত-দিন কেনা-বেচা চলতেই থাকত। আমাদের এক বন্ধু একবার সেই দোকান থেকে একটা জিনিস ক্রয় করল এবং বেশ কিছু দিন সেটা ব্যবহারও করল। পরে তার মনে হলো, এ জিনিসটি টাকা হিসাবে ততটা মানের না বা তাকে অন্য কেউ এই ধারণা দিয়েছিল। তো সে জিনিসটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এল এবং সে বিষয় দোকানের লোকদের অবহিত করলে তারা বলল, কোনো সমস্যা নেই; ফিরিয়ে নিচ্ছি। এমনিতেই আমাদের ইসলামে তো এই নিয়ম আছে। যদি কোনো ক্রেতা কিছু ক্রয় করে পরবর্তী কালে সমস্যা মনে করে যদি ফিরিয়ে দিতে চায়, তাহলে ফিরিয়ে দিতে পারবে। এ-ক্ষেত্রে গ্রহীতার জন্য জান্নাতের সুসংবাদও রয়েছে। এটা তো আমাদের জানা ছিল। কিন্তু এটা জানতাম না যে, কোনো-কোনো ব্যাপারে কাফেররাও পার্থিব লাভের জন্য ইসলামের রীতিনীতির অনুসরণ করে থাকে।

তো যে-লোকটির কাছে ফিরিয়ে দিতে গেলাম, সে বলল, এদিকে আসুন। আমরা তার পিছু নিলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, একটা ভিন্ন সেকশন, যেখানে নিয়মতান্ত্রিক 'রিটার্ন পলিসি' তথা বিক্রিত জিনিস ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেখানে জিনিস ফিরিয়ে দেওয়ার নিয়মনীতি ঝুলিয়ে রেখেছিল। আর সেই সেকশনে দশ-বারোজন লোক 'রিটার্ন পলিসির' কাজে নিয়োজিত। এক জায়গায় একজন বসে-বসে জিনিস ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং ক্রেতাদের পয়সা ফিরিয়ে দিচ্ছে।

প্রথমে একজন তার কাছে গেল এবং বলল, এ জিনিসটি ক্রয় করেছি। কিন্তু এটা ভাঙা পেয়েছি; তাই এটা রেখে দিন। লোকটি তৎক্ষণাৎ তা রেখে দিয়ে টাকা ফেরত দেয় আর এক মিনিটেই তার কাজ শেষ হয়ে যায়। আমরা একটু আশ্চর্যই হলাম যে, জিনিসটি ভেঙেছে কিনা সেটা পরীক্ষা না করেই সে রেখে দিল!

তারপর আরেকজন আগে বাড়ল। লোকটি জিজ্ঞেস করল, কী সমস্যা? সে বলল, এ জিনিসটির রং আমার পছন্দ নয়; তাই ফেরত দিতে এলাম। বলল ঠিক আছে; ফিরিয়ে দিচ্ছি। জিনিস রেখে সে টাকা ফেরত দিল। দেখে আমি আরও আশ্চর্যান্বিত হলাম।

তারপর আরেকজন এগিয়ে গেলে লোকটা সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করল। সে বলল, এই জিনিসটি আমার মনে হয় আমি অনেক বেশি দামে ক্রয় করেছি? এটা রেখে দিন; আমি অন্য জায়গা থেকে কম দামে কিনে নেব। সে তা রেখে টাকা ফেরত দিয়ে দিল। এরপরের সিরিয়াল আমার সেই বন্ধুর। লোকটি জিজ্ঞেস করল, জনাব! আপনি জিনিসটি ফিরিয়ে দেবেন? বন্ধু বলল, এই মেশিনটি আপনাদের এখান থেকে কিনে প্রায় এক মাস ব্যবহার করেছি। কিন্তু ব্যবহার করে যা বুঝেছি, তা হলো এই যে, আমি আমার টাকা যথাস্থানে খরচ করিনি। তাই এটা ফিরিয়ে নিন। লোকটা জিনিসটা নিয়ে যখন দেখল, তখন তার 'পার্টস'ও পূর্ণ ছিল না। আমার বন্ধু তার ঢাকনা ঘরে রেখে এসেছে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, এর ঢাকনা কোথায়? বন্ধু তখন আফসোস করে বলল, ভুলে ঘরে রেখে এসেছি। লোকটি বলল, ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই। এই বলে জিনিসটি নিয়ে টাকা ফেরত দিয়ে দিল। এবার তো আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই। কীভাবে একটা জিনিস এত দিন ব্যবহার হওয়ার পরেও ফিরিয়ে নিতে পারে! আবার কোনো কারণ ছাড়া! সাথে ঢাকনাও নেই!

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। শেষে লোকটাকে বললাম, ভাই রিটার্ন পলিসি যদি এমনই হয়, তাহলে তো বিক্রেতার অবস্থা লাটে উঠবে। একজন একটা জিনিস কিছু দিন ব্যবহার করে বলবে, এটার কালার আমার পছন্দ নয়; ফিরিয়ে নিন। আরেকজন বলবে, আমার স্ত্রী এই বলছে, অন্যজন ভাইয়ের কথা বলবে। আবার আরেকজন বলবে, জিনিসটি ভালো লাগছে না। এমন করতে-করতে তার কিছুই বিক্রি হবে না। বরং তার বেহাল দশা হবে। লোকটা বলল, অবস্থাদৃষ্টে তো এমনই মনে হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা এর উল্টো সাক্ষ্য দেয়। কারণ, যেহেতু এই রিটার্ন পলিসির ব্যবস্থা করা হয়েছে; এখন

ক্রেতাদের মনে এই সান্ত্বনা থাকে যে, এই জিনিসটি ক্রয় করছি; কিন্তু পরে গরমিল হলে আবার ফিরিয়ে দিতে পারব। সমস্যা নেই। আর এ-কারণে কাস্টমার হয় হাজার-হাজার। আর এর মধ্য হতে দশ-বারোজন জিনিস ফিরিয়ে দেয়। তো দশ-বারোজন ফিরিয়ে দিলেও আরও হাজার লোক থেকে আমরা ব্যবসা করতে পারি। আর এখানকার অধিকাংশ মানুষ এতো ব্যস্ত যে, একবার একটা জিনিস ক্রয় করার পর দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দিতে আসবার সময় পায় না। তো অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় 'রিটার্ন পলিসি' এমন হলেও আমাদের ব্যবসায় লোকসান হবে না। যেহেতু ক্রয় করে হাজার-হাজার মানুষ আর ফিরিয়ে দেয় দশ-বারোজন।

তার কথা শুনে আমি ভাবতে লাগলাম, ইসলাম আমাদের ১৪০০ বছর আগে কত সুন্দর নিয়ম শিখিয়ে গেছে যে, ক্রেতা কিছু কিনে ফিরিয়ে দিতে চাইলে তা পারবে। এক্ষেত্রে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় লোকসান হবে। কিন্তু বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা এর পুরোপুরি উল্টো। আর এটাও ভাববার বিষয় যে, ওই হাজার ক্রেতার খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই যে, তারা সব সময়ই জিনিস ফিরিয়ে দিতে আসবে। হ্যাঁ এমনটা শয়ে একজনের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। বাকি সবাই তার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আর এখন যখন শয়ে একজন ফিরিয়ে দিচ্ছে, তো সেই একজনের দেওয়াটা হাজারজনের ক্রয়ের সামনে নিতান্ত তুচ্ছই মনে হয়।

তারপর সে এক আশ্চার্য ধরনের কথা বলল, যা আপনাদের বলতেই হয়, সে বলল, নাম যখন বড় হয়, তখন তার মূল্যও আদায় করতে হয়। যখন কোনো জিনিসের নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তখন সেই প্রসিদ্ধি রক্ষার জন্য এ-ধরনের ছোটখাটো বিষয়গুলো মেনে নিতে হয়।

সম্পর্কের মান রক্ষা করা চাই

এখান থেকে আমার একটা কথা বুঝে আসে। তা হলো, মুসলমানদের একটা নাম আছে– তারা আল্লাহকে মানে এবং নবীর তরিকামতে চলে। তারা দীনদার। আল্লাহর কাছে তাদের সম্মান আছে। মানুষের মাঝে তাদের মর্যাদা আছে, যার কারণে মানুষের সামনে আমরা মুসলমান পরিচয় দিলে তারা এক ধরনের ভিন্ন দৃষ্টিতে আমাদের দেখে। তাই আমাদেরও ইসলাম ও মুসলমানিত্বের মান রক্ষা করা চাই।

মনে হয়, আপনারা আমার কথা পরিপূর্ণ বুঝে উঠতে পারেননি। আমার কথার উদ্দেশ্য হলো, মুমিন কখনও কাফেরের অনৈতিকতার কারণে তার

নীতি হারাতে পারে না। তাকে তার নামের মর্যাদা রক্ষা করতেই হবে। হাদীছ শরীফে এসেছে–

لَا يَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اَنْ يَّجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهَلَ وَفِيْ جَوْفِهِ الْقُرْاٰنُ

কুরআন যার সিনায় বিদ্যমান তার জন্য মূর্খের সাথে মূর্খতায় লিপ্ত হওয়া কখনওই বাঞ্ছনীয় নয়। যেহেতু সে কুরআনের ধারক-বাহক।

ভাইয়েরা আমার! একটু চিন্তা করুন, যদি কোনো মূর্খ ব্যক্তি মূর্খতার পরিচয় দেয়, তবে সেটা তার অবস্থা হিসেবে ঠিক আছে। একজন মূর্খের কাছে কতটুকইবা আশা করা যায়। কিন্তুতার মূর্খতার কারণে আমিও মূর্খ সেজে যাব নাকি? না কখনও নয়। আমি সেই কাজই করব, যা আমার জন্য খাটে, আমার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ-কারণে মুমিনকে বুঝতে হবে তার কী করণীয়। তার মর্যাদা কী? মুমিনের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে না যে, কোনো নির্বোধ লোকের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ আচরণের কারণে সে-ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে। অন্যজন যা বলবে, সে-ও তা বলবে।

যদি কেউ কাউকে গালি দেয়, তবে এর উদ্দেশ্য কি এই যে, সে-ও তাকে গালি দেবে? কুকুর কামড়ালেই কি কুকুরকে কামড়াতে হবে? আমরা তো এটা বলতে পারি না যে, ভাই! সে যদি তোমাকে গালি দেয়, তবে তুমিও তাকে গালি দেবে। তোমার মর্যাদার সাথে কিছু সময়ের জন্য হলেও সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলবে। কারণ, আমরা সুন্নতের অনুসরণ করছি। 'মুত্তাবিউস সুন্নাহ' আমাদের পরিচয়। আর আমাদের এ পরিচয়ের মান রক্ষা করতে হবে।

এ কেমন দীনদারি?

আমরা তো সূফী হয়ে যাই। তালিবে ইল্‌ম হয়ে যাই। কিন্তু প্রকৃত সূফী এবং তালিবে ইল্‌ম তখনই হতে পারব, যখন আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। যদি কারও সাথে ঝগড়া হয়, বুঝতে হবে, আমার তাসাওউফের মাঝে গরমিল রয়েছে। আমার প্রকৃত তালিবে ইল্‌ম হয়ে ওঠা হয়নি। আমি এখনও সবার ছোট। আমিও ওই জাহেলেরই মতো। আমার দীনদারির কোনো মূল্য নেই। দীন আমাদের এমন শিক্ষা কখনও দেয় না। একটু চিন্তা করে দেখুন। আমাদের মাঝে এমন কত লোক আছে, যারা পারিবারিক সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে স্ত্রীকে গালি দেয়, মারধর করে। অনেকে এমনও আছে যে, কারও সাথে ঝগড়া করে তার গীবত শুরু করে দেয়, মন্দ রটায়, অনেক অপবাদ দিতেও দ্বিধা করে না। এটাই কি দীনদারি? এটাই কি দীনের

পরিচয়? না, কখনও না। কান খুলে শুনে রাখুন। মুমিন কখনওই এমন হতে পারে না। এটা তার শানের খেলাফ। ইসলাম তো বলে, তোমার প্রতি কেউ জুলুম করলে তুমি তার বদলা নিতে পারবে। তবে শর্ত হলো, বদলা নিতে গিয়ে তুমি আবার জালেম হতে পারবে না। অর্থাৎ– তুমি যতটুকু জুলুমের শিকার হয়েছ, ততটুকুই বদলা নিতে পারবে। তবে হ্যাঁ, (وَإِنْ تَعْفُوْا) যদি ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহও তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এই শিক্ষাই ইসলাম আমাদের দেয়।

শিশুদের সাথে উত্তম আচরণ

কথিত আছে, এক বুযুর্গ একবার এক ছেলেকে পানিতে ডুবে যেতে দেখলেন। তিনি ছেলেকে পানি থেকে উঠানোর জন্য হাত বাড়ালেন। যখন তার দিকে হাত বাড়ালেন, সে পানি থেকে বুযুর্গের হাতের মধ্যে একটা কামড় বসিয়ে দিল। আর ছেলেটা এমন দুষ্টু ছিল যে, কেউ তার কোনো উপকার করলেও সে তাকে কামড়ে দিত। তো বুযুর্গ তার কামড় খাওয়ার পরেও তাকে উদ্ধারের চিন্তা করতে লাগলেন। পাশের একজন বলল, সে তো আপনাকে কামড় দিয়েছে। ভাগ্যিস! তাড়াতাড়ি হাত উঠিয়েছেন বলে বেঁচে গেছেন। এখন আবার কী নিয়ে চিন্তা করছেন? তাঁকে বাঁচানোর চিন্তা? কেন আপনি তার প্রতি এত উদারতার পরিচয় দিচ্ছেন? সে মরছে মরুক। বুযুর্গ বললেন, মানছি ছেলেটা দুষ্টু। সে তার দুষ্টুমি ছাড়তে পারেনি। কিন্তু আমি? আমাকে তো আল্লাহ ভালো কাজ করার সামর্থ্য দিয়েছেন। আমি কেন ভালো কাজ থেকে বিরত থাকব? এরই নাম দীনদারি। এটিই ইসলামের শিক্ষা।

ইসলাম বন্ধুত্ব শেখায়

ইসলাম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, যদি কেউ তোমার সাথে অশোভনীয় আচরণ করে, তুমি তার সাথে উত্তম আচরণ করবে। এতে সে তোমার বুন্ধ হয়ে যাবে।

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

প্রতিউত্তরে উত্তম কথাই বলো। তাহলে দেখবে, যে তোমার শত্রু, সে খাঁটি বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেছে।[৮৫]

---

৮৫. সূরা হামীম-সাজদা : আয়াত ৩৪

এমন সুন্দর স্বর্গীয় পদ্ধতি আমরা সারা জীবন চিন্তা করেও উদ্‌ঘাটন করতে পারতাম না। এটি আল্লাহর রহমত। এটি নবীর ভালোবাসা। এ-কারণেই আল্লাহ আমাদের এটি শিখিয়ে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা শত চেষ্টা করেও এমন নিয়ম উদ্ভাবন করতে পারতাম না। আমাদের আকাবিরগণ সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন।

অশুভ আচরণের প্রতিদান উত্তম আখলাক

একবার ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এক নাপিতের দোকানে চুল কাটাতে যান। পরনে ছিল সাধারণ পোশাক। নাপিত যখন হযরতকে চুল কাটার জন্য বসাতে গেল, তখন এক বড় লোক সেলুনে প্রবেশ করল। নাপিত ভাবল, আমি এই প্রভাবশালী লোকটির চুল আগে কাটি আর ফকিরেরটা পরে ধরি। তার কাছ থেকে তো আর বেশি কিছু আশা করা যায় না। সেমতে সে ইমাম (রহ.)কে সরিয়ে ওই লোকটিকে আগে বসানোর কথা ইমামকে বলল। শাফেয়ী (রহ.) বললেন, ঠিক আছে, তাকেই আগে দাও। নাপিত ওই লোকটির চুল কাটতে শুরু করল। হুজুর তার খাদেমকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার থলেতে কত দিনার আছে? বলল, তিনশত দিনার। হুজুর বললেন, এগুলো নাপিতকে হাদিয়া দিয়ে দাও। তখন কিন্তু চুল কাটতে এক দিনারের চেয়ে কম লাগত। তারপর হুজুর বললেন, চলো আমরা অন্য দোকানে যাই। আর সেখান থেকে আসার সময় একটা কবিতা বললেন–

عَلَيَّ ثِيَابٌ لَوْ يُبَاعُ جَمِيْعُهَا * بِفَلْسٍ لَكَانَ الْفَلْسُ مِنْهُنَّ أَكْثَرَ

وَفِيْهِنَّ نَفْسٌ لَوْ تُقَاسُ بِبَعْضِهَا * نُفُوْسَ الْوَرٰى كَانَتْ أَجَلَّ وَأَكْبَرَ

আমি এমন পোশাক গায়ে দিয়ে আছি, যার মূল্য এক পয়সাও হবে না। কিন্তু আমার এই পোশাকের ভেতরে এমন এক প্রাণ আছে, যা সৃষ্টিজীবের সকল প্রাণীর প্রাণ থেকে অধিক ভারী।

দুনিয়া হবে শান্তির উদ্যান যদি হয় এমন

আমরা নিজেদের ওঠা-বসায় ও চালচলনে খেয়াল রাখব যেন আমাদের সকল কাজ ইসলাম অনুযায়ী হয় যদিও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা ক্ষতি হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমি ওই ব্যক্তির জান্নাতের যিম্মাদার, যে ঝগড়া পরিহার করে যদিও সে এ ক্ষেত্রে হকের ওপর থাকে।

তো দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামাজিক জীবনে কতটুকু নিরাপত্তার ব্যবস্থা শিখিয়ে গেছেন। যদি আমরা উল্লিখিত নিয়মগুলো মেনে চলি, নিজের জীবনকে সেমতে পরিচালিত করি, তাহলে পুরো দুনিয়া শান্তির উদ্যানে পরিণত হবে। কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো, আমরা নিজেরা অন্যায় করে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হই। আমরা ভুল করেও যদি আরেকজনের সাথে রেষারেষিতে প্রবৃত্ত হই, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমরা কীভাবে মুখ দেখাব?

ভাই! আমরা যদি আমাদের চোহারা সুন্নত দ্বারা সজ্জিত করি, মাথায় সুন্নতের তাজ রাখি, পোশাক সুন্নতের পরিধান করি, তবে আমাদের সে অনুযায়ী কাজও করতে হবে। দাড়ি রাখব, টুপি পরব, পাঞ্জাবি গায়ে দেব আর করব সব অনৈতিক কার্যকলাপ; তা কখনও হতে পারে না।

কোনো দুনিয়াদার কিছু বলতে পারে। কোনো অশিক্ষিত বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু দীনদার কী করবে? কীসে তার খুশি? কোথায় তার আনন্দ? সে কি দুনিয়াদারের সাথে অহেতুক কথায় প্রবৃত্ত হবে। না তা কখনও হওয়ার নয়; বরং সে তো ওই কাজই করবে, যার আদেশ দিয়েছেন মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বড় স্বার্থ রক্ষার্থে তাকে ছোট স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। এ-কথাটিই কাফেররা বুঝতে পারল। দুঃখের সাথে বলতে হয়, মুসলমান আজও বুঝতে পারেনি।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

ইমাম বোখারি (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ ঘটনা। একবার তিনি নৌকায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সাথে ছিল ছয় হাজার দিনার। চলার পথে এক লোকের সাথে পরিচয় হলো। দীর্ঘক্ষণ কথাও হলো। কথায়-কথায় একসময় তিনি তার কাছে থাকা ছয় হাজার দিরহামের কথা লোকটিকে বলে দিলেন। লোকটাও আরেকজনের কাছে বলল। এভাবে বিষয়টা সবার মাঝে জানাজানি হয়ে গেল।

নৌকায় ছিল এক ধুরন্ধর লোক। হঠাৎ সে চিৎকার শুরু করে দিল। বলতে লাগল, আমার একটা থলে চুরি হয়ে গেছে। তাতে ছয় হাজার দিনার ছিল। লোকেরা তার কাছে থলের রং জানতে চাইল। লোকটি বোখারি (রহ.) থেকে আগেই থলের রং জেনে নিয়েছিল। তাই বলল, অমুক রং। তখন

নৌকায় উপস্থিত সবাই বলতে লাগল, সবাইকে তল্লাশি করে দেখা যাক। ইমাম বোখারি (রহ.) চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, লোকেরা যদি তল্লাশি করে আমার কাছে পেয়ে যায়, তাহলে তো নিশ্চিত তারা আমাকে চোর মনে করবে। আর ওই লোক মনে-মনে খুব তৃপ্তি লাভ করছিল যে, যখন বোখারি (রহ.)কে তল্লাশি চালানো হবে, তখন তার থেকে নিয়ে লোকেরা থলেটি তাকে দিয়ে দেবে।

এদিক দিয়ে নৌকা তল্লাশি শুরু হয়ে গেল। একপর্যায়ে লোকেরা ইমাম বোখারি (রহ.)-এর কাছে এল এবং তাকেও তল্লাশি করল। কিন্তু তার কাছে থলেটি পাওয়া যায়নি এবং পুরো নৌকাতে কোথাও সেটা পাওয়া যায়নি। নৌকা কিনারে ভিড়লে ওই লোকটি অনুশোচনা প্রকাশের জন্য বোখারি (রহ.)-এর কাছে এল এবং অনুনয়ের সুরে ক্ষমা চাইল। বলল, হুজুর! আমি আপনার সাথে অনেক বেয়াদবি করে ফেলেছি– ক্ষমা করে দিন। হুজুর বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। এবার লোকটি বলল, হুজুর! ক্ষমা তো করে দিলেন এবার আমাকে বলুন, থলেটা আপনি কোথায় লুকিয়েছেন?

হুজুর বললেন, যখন ঘোষণা দেওয়া হলো যে, তোমার থলে চুরি হয়ে গেছে, তখন আমি বুঝতে পারলাম, তুমি আমাকে চোর সাব্যস্ত করতে চাচ্ছ। তাই আমি গোপনে আস্তে করে নদীতে থলেটি ফেলে দিয়েছি। লোকটা তো হতবাক্। বলে উঠল, ছয় হাজার দেরহামের থলেটা নদীতে ফেলে দিয়েছেন? হুজুর বললেন, হ্যাঁ তা-ই করেছি। যদি তা না করতাম, মানুষ আমার কাছে থলে পেয়ে আমাকে চোর ভাবত। আর তখন কেউ আমার বর্ণনা করা হাদীছ গ্রহণ করত না। আমি এ থেকে চিরতরে বঞ্চিতই থেকে যেতাম। তো নিজেকে হাদীছের এই নেয়ামতের অংশীদার বানানোর জন্য আমি দিনারগুলো নদীতে ফেলে দিয়েছি।

ইসলামি শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব

বর্তমানে আমরা কাউকে যদি এ বলে উপদেশ দেই যে, ভাই! পরিবারের লোকদের সাথে ভালো হয়ে থাকো আর সে সেটা পালন করে, তাহলে দেখা যাবে, আমাদের অনেকেই তাকে স্ত্রীর মুরীদ বলে অভিহিত করবে। স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণের অর্থ যদি হয় স্ত্রীর মুরীদ হওয়া, তবে শুনে রাখুন, এমন মুরীদ হওয়ার জন্য আল্লাহও আদেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো।[৮৬]

অর্থাৎ– তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। অন্যায়, অবিচার ও শোষণের জীবন তাদের সাথে যাপন করা যাবে না। এটা তো আল্লাহর কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে আরও জোর দিয়ে বলেছেন। সেটা কীভাবে? বুঝতে হলে আগে একটি বিষয় আমাদের জানতে হবে। কেউ যখন কোনো বক্তব্য পেশ করে, তখন তার কথার শেষে এমন দু-চারটি কথা বলে দেয়, যা তার পূর্ণ কথার অর্থ বহন করে। এটা আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করে থাকি। এবার আসুন পূর্বের বিষয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন দীন শিখিয়ে গেছেন। আর যখন মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পাড়ি জমানোর সময় ঘনিয়ে এল, তখন তিনি তাঁর উম্মতকে শেষ ওসিয়ত করে গেলেন। আর সেটিই ছিল তার পুরো জীবনের শিক্ষার সারকথা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلتَّوْحِيْدَ اَلتَّوْحِيْدَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

তাওহীদের ওপর অবিচল থাকো এবং তোমাদের অধীনদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তাদের হক আদায় করো। এখন যদি আমরা স্ত্রীর সাথে সদাচরণ ও ভালোবাসার আচরণ করি আর তাকে যদি স্ত্রীর মুরীদী বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে এটা কত দুঃখজনক হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্ত্রীর রূঢ় আচরণ বরদাশত করার কারণে

জনৈক সাহাবির স্ত্রী ছিল খুবই বদমেজাজী ও কটুভাষী। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিরও নিয়ম হলো, দুর্বলদের মুখ চালু আর সবলের হাত চালু। যার কারণে মহিলারা একটু ঝগড়াটে স্বভাবের হয় আর পুরুষদের হাত বেশি চলে। সাহাবি স্ত্রীর এই রুক্ষ স্বভাবের কারণে ভাবনায় পড়ে যান। চিন্তা করতে থাকেন কী করা যায়? অবশেষে একসময় সমাধান খুঁজে পান। তাঁর মনে পড়ে যায় উমর ফারুক (রাযি.)-এর কথা। তিনি জেদী ও কঠিন স্বভাবের মানুষ। যে কাউকে ঠিক করা তার জন্য কোনো বিষয় নয়। সাহাবি

---

৮৬. সূরা নিসা : আয়াত ১৯

তাঁর সাথে গিয়ে পরামর্শ করার মনস্থ করলেন এবং এ আশায় বুক বাঁধলেন যে, তাঁর পরামর্শেই স্ত্রীকে সোজা করা সম্ভব। ব্যস, সেমতে তিনি তাঁর বাড়ির উদ্দেশে রওনা করেন।

বাড়িতে ঢুকেই ঘরের ভেতর উমর (রাযি.)-এর স্ত্রীর কর্কশ ভাষা শুনতে পান। তিনি কী একটা বিষয় নিতে উমর (রাযি.) কে শাসাচ্ছেন আর উমর (রাযি.) ধৈর্যের সাথে সব শুনছেন। প্রতিবাদের কোনো চিহ্নই তার মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এ দেখে তো সাহাবি রীতিমতো হতবাক্। উমর (রাযি.) নিজ বাড়িতে স্ত্রীকে এভাবে সহ্য করেন? তাঁর তুলনায় আমি তো কিছুই না। তাহলে আমি তো আরও বেশি শুনতে বাধ্য। সাহাবি এই চিন্তা নিয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় উমর (রাযি.) দরজা দিয়ে বের হন। বেরিয়ে তাকে সালাম দেন। তারপর কিছু না বলেই চলে যেতে লাগলেন। উমর (রাযি.) প্রশ্ন করেন, চলের যাচ্ছ কেন ভাই? সাহাবি জবাব দিলেন, এসেছিলাম আপনার কাছে। আপনি খুবই জেদী, মেজাজী, শৃঙ্খলা রক্ষাকারী। আপনার কাছ থেকে স্ত্রীর রূঢ় স্বভাব দূর করার জন্য কিছু পরামর্শ চাইব এবং সেটা বাস্তবায়িত করব। কিন্তু দেখছি, আপনি আমার চেয়ে বেশি কথা হজম করছেন। তাই চলে যাচ্ছি। ওমর (রাযি.) শান্তভাবে তাকে বসতে বললেন। তারপর বললেন, দেখো ভাই! এ (আমার স্ত্রী) আমার ঘরের সব কিছু ধুয়ে থাকে। আমার ঘর পরিষ্কার করে থাকে। আমার ভাত পাকায়। আমার সন্তানদের প্রতিপালন করে। আমার স্বার্থে সে এতগুলো কাজ প্রতিনিয়ত সয়ে যাচ্ছে। এখন আমি যদি তার একটু কর্কষ ভাষা শুনতে না পারি, তবে আমি কেমন স্বামী হলাম। কী মানবতা আমার মাঝে আছে? এটা ভিন্ন কথা যে সে নিজের উত্তম আচার-আচরণ ও সদ্ব্যবহারের পরিচয় দিলে সে অনেক নেকি লাভ করবে। তাই বলে তার কাছ থেকে সব সময়ই নিজের স্বার্থসিদ্ধির চিন্তা করা ঠিক নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে-মহিলা নিজের সন্তানের জন্য রাত জেগে থাকে, আল্লাহ তাকে সীমান্ত প্রহরী মুজাহিদের মরতবা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের ঘরের নরম বিছানায় থাকা সত্ত্বেও এই কুরবানির জন্য মুজাহিদের মরতবা দিয়ে দেবেন। সুবাহানাল্লাহ!

অন্য এক হাদীছে এসেছে, যে মহিলারা স্বামীর ঘরের কোনো অগোছালো জিনিস ঘুচিয়ে রাখে, আল্লাহপাক তাকে একটি নেকি দান করেন, একটা (ছগীরা) গুনাহ মাপ করে দেন এবং জান্নাতে একটি জরদা বুলন্দ করেন।

মহিলা স্বামীর ঘরে যে খাবার পাকায়, সে জন্যও তাদের ছওয়াব দেওয়া হয়। কেননা, সে তরকারি পাকালে যদি তাতে এক বাটি পানি এই নিয়তে

বাড়িয়ে দেয় যে, কোনো মেহমান আসতে পারে, তখন প্রয়োজন পড়বে বা এই নিয়তে যে, আজ প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেব। তবে তাকে মেহমানের খাবার পাকানোর ছওয়াব দেওয়া হয়।

এমনিভাবে ঘরের কাপড়চোপড় ধোওয়ার কারণেও তাদের ছাওয়াব দেওয়া হয়। অথচ শরীয়তের পক্ষ থেকে তার ওপর এই যিম্মাদারি নেই।

একটি নাজুক মাসআলা

যদি মহিলাদের ব্যাপারে শরীয়তনির্ধারিত মাসআলা আমরা তাদের বলে দেই, তবে সব খান সাহেব, লাট সাহেবের খবর হয়ে যাবে।

এই যে খানা পাকানো, শরীয়ত তাদের ওপর এটা আবশ্যক করেছে? না কখনও না; বরং তারা এটা করে তাদের উত্তম আচরণের পরিচয় দিচ্ছে।

এই যে কাপড় ধোওয়া। শরীয়তের পক্ষ থেকে এ-ব্যাপারে তাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এটাও তাদের সচ্চরিত্রের কারণে তারা করে থাকে।

আবার দেখুন, সন্তান প্রতিপালন, ঘর ঝাড় দেওয়া, শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত এর কোনোটাই শরীয়ত তাদের ওপর আবশ্যক করে না। কিন্তু তবুও তারা এগুলো করে থাকে তাদের চারিত্রিক উদারতা ও মহত্ত্বের কারণেই।

তো এইসব কাজ স্ত্রী শুধু স্বামীর দিকে, স্ত্রীত্বের দিকে তাকিয়ে করে থাকে। অন্যথায় শরীয়ত তো বলে, যদি স্ত্রী দাবি করে বসে যে, আমি বাপের বাড়িতে যেমন ছিলাম আমার এখানেও সেভাবেই রাখতে হবে, তবে স্বামীর সেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সন্তান হলে যদি বলে ওঠে, তোমার সন্তান তুমি নিয়ে যাও, তুমি তার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করো, আমি তার জন্য এত কিছু সহ্য করতে পারব না। তার জন্য রাত জাগা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সেটা বলার অধিকার তার আছে। যদি স্বামীকে বলে, তোমার ঘর আমি ঝাড় দিতে পারব না। আমি সেই ঘরের মেয়ে, যেঘরে এগুলো কাজের বুয়া করে থাকে। কাজেই তুমি কাজের বুয়ার ব্যবস্থা কর। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, স্বামীকে কাজের বুয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তার জীবন বিয়ের আগে যে মাপকাঠিতে ছিল, সে অনুযায়ী তাকে চালাতে হবে। আর তখনই স্বামী কত ধানে কত চাল বুঝতে পারবে।

সেই বেচারী স্বামীর ভালোবাসা বুকে ধারণ করে, সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে প্রতিটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখে। ঘরের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। আর মিয়া সাহেব, লাট সাহেব শুধু আরামে কেদারা পেতে ভাত গেলেন আর একটু এদিক-সেদিক হলেই বেঁকে বসেন। তারপর কয়েক মাস পর্যন্ত তার সাথে কথা বন্ধ। কোনো খোঁজখবর নেয় না। তাকে ঝুলন্ত এক রশির ন্যায় ছেড়ে দেয়। মনে রাখবেন, তার মা তাকে স্বাধীন অবস্থায়ই আপনাকে দিয়েছে। তারপর আপনি তাকে বন্দি করে রাখবেন। এই অধিকার আপনার নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'তোমরা তাদের ঘরে বন্দি হিসেবে রেখো না।'

স্ত্রীকে মা-বাবার সাথে কথা না বলতে দেওয়ার কাহিনি

আমি এমন লোকও দেখেছি, যে স্ত্রীকে নিজের মা-বাবার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে দেয় না। এক সাহেব তার স্ত্রীকে ৯ বছর পর্যন্ত মা-বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে দেয়নি। এমনকি বছরে শুধু এক-দুবার নিজের মায়ের কাছে নিয়ে আসত। মেয়ের বাবার সাথে আমার হজে দেখা হয়। সে কী কান্না! অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে ফেলেছেন। কেঁদে-কেঁদে আমাকে বললেন, আজ নয় বছর পর্যন্ত মেয়ের মুখ দেখি না। আনার কথা বললে একগুঁয়ের মতো উত্তর দেয়, আমি তাকে এখানে রাখতে চাই; ব্যস। বলুন হুজুর! তার এভাবে মেয়েকে বন্দি করে রাখার কোনো অধিকার আছে কি? সে নয় বছর পর্যন্ত দু-চারবারও তার স্ত্রীকে মা-বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে দেয়নি। নিজে প্রতিদিন নিজের মা-বাবার খোঁজ নেয়, যোগাযোগ করে। কিন্তু ন-বছর হতে যাচ্ছে, একটিবারের জন্যও স্ত্রীকে মা-বাবার সাথে যোগাযোগ করতে দেয়নি। এসব বলে লোকটি অঝোরে কাঁদতে লাগল।

তো এ ছিল এক দীনদার লোকের অবস্থা। এখন যারা ফাসেক-ফাজের তাদের কথা কী বলব? সেই সূফী কি জানে না, এই স্ত্রী হাশরের দিন নিজের অধিকার দাবি করবে? তখন মানুষের সামনে সে লজ্জিত হবে। মানুষ স্বামীর এ-ধরনের আচরণকে ভালো চোখেই দেখে তা কিন্তু নয়। এটা স্ত্রীর ওপর মারাত্মক জুলুম।

সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির আদেশ

ইসলাম মন্দ ব্যক্তির সাথেও উত্তম আচরণের আদেশ দিয়েছে। তবে এটা কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য– কাফেরদের ক্ষেত্রে নয়। মুমিনদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ

'তুমি সম্পর্ক ছেদনকারীর সাথে সম্পর্ক তৈরি করো।'

এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, কাফেরদের সাথেও এমন আচরণ করতে হবে। বরং এই আচরণ শুধু মুমিনদের সাথেই করা হবে। এর উদ্দেশ্য হলো–

- যদি স্ত্রী রাগ করে তুমি তাকে রাগ করতে দেবে না।
- যদি প্রতিবেশী অসন্তুষ্ট হয় তুমি তাকে সন্তুষ্ট করে তুলবে।
- যদি পীরভাই মনে কষ্ট পেয়ে তোমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়, তুমি তার সাথে বেশি-বেশি কথা বলবে।
- যদি তোমার ভাই তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে যায়, তুমি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবে না।

এখন যদি কেউ স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করে, তাকে 'স্ত্রীর মুরীদ' বলা যাবে না। এগুলো অসার ও নিরর্থক প্রলাপ। আমরা এগুলো পরিহার করব। আজ দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমরা মৌলভীরা মহিলাদের এতসব অধিকারের কথা বলে থাকি; কিন্তুমেয়েরা আমাদের মতো দাড়ি-টুপিওয়ালা লোকদের বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের এমন স্বামী চাই না। এমন যদি এদের অবস্থা হয়, তাহলে অন্যরা কি দাড়িওয়ালাদের বিয়ে করতে চাইবে? চিন্তা করুন, তারা কেমন ঘৃণ্য ধারণা রাখে এই মৌলভীদের প্রতি। এমন চিন্তা থাকা কখনওই কাম্য নয়। আমাদের প্রতিটি মা-বোনের চিন্তা তো এমন হওয়া চাই যে, সে কামনা করবে এমন এক পুরুষই যেন তার ভাগ্যে জোটে।

এক কুমারীর স্বামীনির্বাচন

একমেয়ে দীনের কিছু শিক্ষা লাভ করে এবং দীনের ব্যাপারে বেশ ধারণা নেয়, যার কারণে দীনের গুরুত্ব তার অন্তরে বসে যায়। তার বাবা ছিল বড় একজন জমিদার। বাবা তার মেয়েকে এক বড় ঘরের ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়ার মনস্থ করেন। বাবা-মা মেয়েকে বিয়ের কথা বলেন। সাথে ছেলের বিশাল বাড়ি, গাড়ি, ইন্ডাষ্ট্রিজ ও কোম্পানির কথাও শোনায় এবং মেয়েকে সুখের আশ্বাস প্রদান করে। সব শুনে মেয়ে বলে উঠল, বাবা আমার টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই। আমি গাড়ি-বাড়ি চাই না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতমতো জীবন গড়তে চাই। একথা শুনে বাবা তাকে একজন আলেমের সাথে বিয়ে দেয়।

দেখুন, আজ যদি তাকে ওই কোটিপতির সাথে বিয়ে দিত, তবে সে বিলাসবহুল গাড়িতে সবসময় চলতে পারত। কিন্তু যে আলেমের সাথে তার বিয়ে হয়েছে, তার এসব কিছুই নেই। তারপরেও ওই মেয়ে এই আলেমকেই স্বামী হিসেবে পছন্দ করেছে শুধু এই আশায় যে, সুন্নতমতো জীবন গড়বে। আমাদের মা-বোনদের চিন্তাচেতনা তো এমনই হওয়া চাই।

ভাইয়েরা আমার! এ ধরনের মেয়েদের সাথে আমাদের কেমন আচরণ করতে হবে আমাদের সেটা ভাবতে হবে। আমরা যদি ঝগড়ায় মাতি, রেষারেষিতে জড়িয়ে পড়ি, তাহলে লোকে হাসাহাসি করবে। বলবে, এদের তো বাহ্যিকভাবে দীনদার বলে মনে হয়; কিন্তু তাদের ভেতরকার অবস্থা কলহ-বিবাদে ভরা। আর মানুষের এমন মন্তব্য আমাদের ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃখজনক। তাই আমাদের কখনও-কখনও বড় স্বার্থ রক্ষার্থে ছোট স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। ব্যক্তিগত শান্তি সৃষ্টির জন্য স্ত্রীর না হয় একটু বকা শুনলামই তাতে কী?

কাকে বলে স্ত্রীর গোলামি?

'স্ত্রীর গোলামি' কাকে বলে আমাদের বুঝতে হবে। স্ত্রীর গোলামি তো বলা হয় স্ত্রী শরীয়তগর্হিত পথে চলা সত্ত্বেও তাকে বাধা না দিয়ে তার এই চালচলন সমর্থন করা। তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া। কাজেই এমন কাউকেই প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর গোলাম বলতে হবে। কিন্তু কেউ শরীয়তের মানদণ্ড রক্ষা করে স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করলে, তার সাথে হাসি-খুশি থাকলে তাকে স্ত্রীর গোলাম বলা কখনও ঠিক হবে না। সে ক্ষেত্রে এ শব্দের ভুল ব্যবহার হয়েছে বলতে হবে। 'স্ত্রীর গোলামি' বলা যাবে তখন, যখন শরীয়তের প্রতি না তাকিয়ে, সঠিক-ভুল না দেখে সবসময় স্ত্রীর কথা শোনা হবে। কাজেই সুন্নতের ওপর চলা সত্ত্বেও কাউকে কখনও স্ত্রীর মুরীদ বলা যাবে না। সদাচরণ আর স্ত্রীর মুরীদী এক হতে পারে? স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করলে একজন মানুষকে আল্লাহর হুকুম পালন করছে বলতে হবে।

প্রয়োজনীয় এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব প্রদান

আমাদের উচিৎ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখা। সবার সাথেই আমাদের নম্র আচরণ করতে হবে। কেউ খারাপ আচরণ করলেও এর বদলা দেব উত্তম আচরণ দ্বারা। যারা আজকাল বুলি আওড়ায় যে, যারা আমাদের সাথে ভালো আচরণ করবে, আমরা তাদের সাথে ভালো হয়ে উঠব আর যারা

অমানবিকতার পরিচয় দেবে, আমরাও তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেব। আমি বলি, তারা স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ী মহলের রূপ ধারণ করেছে। আমরা মুমিন মুসলমান। মুসলমান ভালো আচরণের বিপরীতে ভালো আচরণ করে থাকে। কেউ খারাপ করলেও মুসলমান খারাপ হতে পারে না। মুমিন ভালো। সে সর্বক্ষেত্রে ভালোরই পরিচয় দেবে।

অন্তর জয় করে নিয়েছে

যে-মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মাথায় আবর্জনা ছুড়ে ফেলত, কী আচরণ ছিল তার সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের? কী উদারতা ও বিশালতার পরিচয় দিয়েছেন নবীজি তার ক্ষেত্রে। তাহলে শুনুন, সেই কাহিনি। মহিলা বাড়িতে একা থাকত। হঠাৎ একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। পুরো মক্কায় তাকে দেখার মতো কেউ ছিল না। তার ছিল না কোনো পুরুষ আত্মীয়। ছিল একটিমাত্র কন্যা, যে চিকিৎসা করাতে অপরাগ ছিল। এ দিকে তার অসুস্থতার কারণে কয়েক দিন পর্যন্ত রাসূলের মাথায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়ে যায়। দয়ার নবী পেরেশান! এ কী ব্যাপার! মহিলা কোথায়! ময়লা কোথায়!

নবীজি মহিলার ব্যাপারে খোঁজ নিতে থাকেন। একপর্যায়ে জানতে পারেন, সে কয়েক দিন ধরে বিছানায় পড়ে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়ির পথে হাঁটেন। দরজার সামনে গিয়ে দরজা নক করেন। বৃদ্ধার মেয়ে ছিদ্র দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পায় আর অমনি সে ঘাবড়ে যায়। দৌড়ে গিয়ে মাকে বলে, মা রোজ তুমি যার মাথায় ময়লা ফেলতে ওই লোকটা আজ আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বড্ড ভয় হচ্ছে মা, না জানি সে আজকে আমাদের প্রাণে মেরে ফেলে। শুনে মহিলাও ঘাবড়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার দরজা নক করেন। এবার বৃদ্ধা মেয়েকে দরজা খুলে দিতে বলল। মেয়েটি দরজা খুলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাদের বাড়িতে কেন এলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তভাবে বললেন, তোমার মা কেমন আছে? শুনেছি তিনি নাকি অসুস্থ? এসেছিলাম যদি তার কোনে খেদমত করতে পারি এই আশায়।

বৃদ্ধা এই কথাগুলো শুনতে পায়। কথাগুলো তার অন্তরে ভীষণভাবে রেখাপাত করে। সে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ভাবতে থাকে, তাঁর সাথে

আমি কেমন আচরণ করলাম আর প্রতিদানে সে আমাকে কী দিল? একসময় সে বলে উঠল, হুজুর! আপনি আমার মন জয় করে ফেলেছেন। দেরি না করে আমাকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে নিন। আল্লাহু আকবার! এটিই কুরআনের শিক্ষা। এটিই নবীর শিক্ষা।

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ

জবাব সেটি দিয়ে দাও, যেটি উৎকৃষ্টতর।

আউলিয়া কেরামের বেশের প্রতি সম্মান

বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগিরের দরবারে বহুরূপী এক লোক ছিল, যে নিজেকে বিভিন্ন আকৃতিতে রূপ দান করতে পারত।

সে অন্যজনের রূপ এমনভাবে গ্রহণ করতে পারত যে, মানুষ বুঝতেই পারত না। কিন্তু তার রূপ পরিবর্তন বাদশাহ আলমগিরের কাছে ধরা পড়ে যেত। সে যখনই রূপ পরিবর্তন করে বাদশাহর সামনে আসত, বাদশাহ তাকে চিনে ফেলতেন। সে একদিন বাদশাহর নিকট পুরস্কার দাবি করল। বাদশাহ বললেন, তোমাকে পুরস্কার দেব তখন, যখন তুমি এমন রূপ ধারণ করবে যে, আমি তোমাকে চিনতে পারব না। একথা শুনে সে চলে গেল। সে চিন্তা করল, বাদশাহ আলমগির ওলীদের খুবই সম্মান করেন। কাজেই আমাকে কোনো ওলীর বেশ ধরতে হবে।

যেমন চিন্তা তেমন কাজ। লোকটা এই চিন্তা করে শহরের বাইরে চলে গেল। তারপর এক ওলীর বেশ ধারণ করল। বড়-বড় দাড়ি, লম্বা একটি তাসবীহ, মাথায় পাগড়ি, বড় একটি জুব্বা, গম্ভীর-গম্ভীর ভাব। সব মিলিয়ে সে পুরোপুরি এক ওলীর মতোই হয়ে গেল। তারপর আস্তে-আস্তে মানুষের মাঝে তার প্রসিদ্ধ লাভ হতে থাকে। দীনি কোনো বিষয় সামনে এলে মানুষ তার দ্বারা দু'আ করায়। একজন-দুজন করতে-করতে একসময় তার দু'আর সিরিয়াল লেগে যায়। এখন সবাই তার কাছে দু'আর জন্য আসে। সেও দু'আ করে দেয়। আর মানুষও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফল পেতে শুরু করে। একসময় তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়, এ লোকটা আল্লাহর এক খাস লোক। সে দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করেন এবং আমাদের সমস্যা সমাধান করে দেন। আর আল্লাহর নিয়ম হলো–

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ

বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখে, আমি তার সাথে তেমনই আচরণ করি।

তো এখন মানুষ তার কাছে আসতে লাগল। বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে দু'আ চাইতে লাগল। যদি কেউ কোনো হাদিয়াও দিত, সে ফিরিয়ে দিত। বলত, আমার এসবের প্রয়োজন নেই। লোকেরা দেখল, সে হাদিয়া নেয় না আবার দু'আও করে, সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়। এসব দেখে তার প্রতি তাদের বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল।

এক সময় তার কথা বাদশাহ আলমগির পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তার দুনিয়াবিমুখতা, আল্লাহর প্রতি আস্থা, তার যিকির-ফিকির এবং ইবাদাত ও আধ্যাত্মিকতার কথা বাদশাহকে খুব প্রভাবিত করল। বাদশাহ এ রকম এক বুযুর্গের যেয়ারতেরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার দেখমত ও দু'আ নেওয়ার ইচ্ছা করলেন এবং এজন্য প্রস্তুতিও নিয়ে নিলেন।

বাদশাহ যাওয়ার সময় তার জন্য দিনারভর্তি একটি থলে হাদিয়া হিসাবে নিয়ে গেলেন। তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার থেকে দীর্ঘক্ষণ উপদেশ শুনলেন। ফিরে আসার পূর্বে তাকে দু'আর অনুরোধ জানালেন। সে দু'আ করল। তারপর যখন ফিরে আসার পালা এল, তখন বাদশাহ তাকে থলেটি হাদিয়া হিসেবে পেশ করলেন। সে বলে উঠল, নানা এর কোনো প্রয়োজন নেই। এটা নিয়ে যাও। বাদশাহ বুঝতে পারলেন, সত্যিই লোকটি দুনিয়াবিমুখ। তারপরও নেওয়ার জন্য কয়েকবার জোর করলেন। কিন্তু সে কিছুতেই নিল না। বাধ্য হয়ে বাদশাহ থলে নিয়ে ফিরে এলেন।

পরদিন বাদশাহ যখন দরবারে বসলেন, তখন ওই বহুরূপী যে দরবেশের বেশ ধরেছিল সে দরবারে উপস্থিত। প্রথমে বাদশাহকে সালাম দিল। বাদশাহও উত্তর দিলেন। তারপর লোকটি বলল, মহামান্য বাদশাহ! আমি তো পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়েছি। বাদশাহ বললেন, কীভাবে? বহুরূপী বলল, আপনি তো আমাকে চিনতে পারেননি। বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, কীভাবে আমি তোমাকে চিনতে পারিনি? বলল, কাল যে-লোকটার সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন, সে তো আমিই ছিলাম। বাদশাহ তো অবাক্। এবার বিস্ময় ঝেড়ে জিজ্ঞেস করল, সে আপনি? লোকটি বলল, জি! আমিই সেই লোক। বাদশাহ এবার আরও আশ্চর্য হয়ে বললেন, তুমি এমন রূপও ধারণ করতে পার? আমি তো বিলকুল চিনতে পারিনি। তারপর উজিরকে আদেশ দিলেন তাকে একশ দিনার দিয়ে দাও।

লোকটা বলল, মহামান্য বাদশাহ, গতকাল আপনি আমাকে হাজার দিনারভর্তি থলে দিতে গেলেন। আজ দিচ্ছেন মাত্র ১০০ দিনার? বাদশাহ বললেন, দেখো, কাল তোমাকে আমি একজন বুযুর্গ হিসাবে হাজার মুদ্রা দিতে চেয়েছিলাম। তুমি চাইলে তো সেটা অনায়াসে নিতে পারতে। কিন্তু তুমি তো নিলে না। লোকটি বলল, সত্যিই কালকে যখন আপনি আমাকে টাকাগুলো দিতে চেয়েছিলেন, তখন আমার মন বলেছিল এগুলো নিয়ে নাও। কিন্তু আমার মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে, যদি আমি এ দিনারগুলো নিয়ে নেই, তাহলে আমার এই বেশের কারণে ওলীদের বদনাম হবে। মানুষ ওলীদের লোভী ভাববে। তাই ওই বেশের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি দিনারগুলো নেইনি।

দেখুন ভাই! একটি লোক ওলীদের পোশাকের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল হলে অর্থের জন্য হন্যে হয়ে ঘোরা সত্ত্বেও হাজার দিনার হাতের নাগালে পেয়েও ফিরিয়ে দিল শুধু ওলীদের বেশের দিকে তাকিয়ে। সে যদি এই পোশাকের এই বেশের জন্য এতটুকু বিসর্জন দিতে পারে, তাহলে কি আমরা নবীর সুন্নতের জন্য এতটুকুও কুরবানি দিতে পারব না। যদি নবীর সুন্নতমতোই জীবন যাপন করি, তবে কি কখনও আমরা মূর্খদের সাথে মূর্খের আচরণ করব? নিজ প্রতিবেশীর সাথে বিবাদে লিপ্ত হব? না তা কখনও হতে পারে না। দুনিয়া অনাচার বৃদ্ধির জন্য নয়; বরং সেগুলো কোথাও পরিলক্ষিত হলে সেটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্যই দুনিয়ার সৃষ্টি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক জীবন যাপনের তাওফীক দান করেন। আমীন।

পাশবিক, মানবিক ও ঈমানি জীবন

'ঈমান মানুষের ভেতর থেকে ভেজালকে নিঃশেষ করে ফেলে। যার ঈমান পরিপূর্ণ হবে, তার মধ্যে কোনো খাদ বা ভেজাল থাকতে পারে না। ঈমান ও মুনাফিকি এ দুটি কখনও একত্র হতে পারে না। ঈমানের হাকীকত তো হলো এই যে, তা মানুষের ভেতর থেকে দ্বিমুখিতা ও মুনাফিকি একদম শেষ করে দেয়। যেমন– শরীয়তের মাসআলা হলো- কেউ যদি শরবত পান করার সময় মদ পান করার নিয়ত করে, ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, তাহলে নিয়তের কারণে তার মদ পান করার গোনাহ হবে।'

পাশবিক, মানবিক ও ঈমানি জীবন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ـ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

মানুষের সম্মান বৃদ্ধি

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির এক অপূর্ব নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছেন।

ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ

'আমি মানুষকে সম্মানিত করেছি।'[৮৭]

আর এই সম্মান শুধু তার জন্যই, যে সত্যিকারার্থে মানুষ। কিন্তু কেউ যদি আকারে ইনসান আর প্রকারে শয়তান হয়, তবে এই সম্মান আদৌ তার জন্য নয়।

সঠিক পথের দিশা

মানুষ সৃষ্টির সময় দুর্বল ও নিস্তেজ এক শিশু থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

---

৮৭. সূরা বনী ইসমাঈল : আয়াত ৭০

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

সত্যিই মানুষের ওপর এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু ছিল না।[৮৮]

তখন সে এক ফোঁটা নাপাক বীর্য ছিল। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। তারপর তাকে এমন করেছি যে, সে শুনে ও দেখে।[৮৯]

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি। এখন সে হয়তো কৃতজ্ঞ হবে অথবা অকৃতজ্ঞ হবে।[৯০]

এখন মানুষের সামনে দুটি পথ খোলা। এক. নেকির রাস্তা, যেটি আল্লাহর ইবাদাতের রাস্তা। দুই. গোনাহের রাস্তা, যা আল্লাহ থেকে দূরে সরার রাস্তা। উভয় পথ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট। এখন যারা নেকির পথে চলবে, তারা হবে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা আর যারা গোনাহের পথে চলবে, তারা হবে শয়তানের দোস্ত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে আদমসন্তান! আমি কি তোমাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নেইনি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করবে না? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৯১]

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

আর আমার বন্দেগি করো; এটিই সঠিক পথ।[৯২]

এখন তাকেই চিন্তা করতে হবে, সে কোন পথে চলবে। সে কি নেকির পথে চলে 'ইবাদুর রহমান'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে, নাকি গুনাহের পথে চলে 'ইবাদুশ শয়তান'-এর মাঝে গণ্য হবে।

---

৮৮. সূরা দাহর : আয়াত ১
৮৯. সূরা দাহর : আয়াত ২
৯০. সূরা দাহর : আয়াত ৩
৯১. সূরা ইয়াছিন : আয়াত ৬০
৯২. সূরা ইয়াছিন : আয়াত ৬১

মানুষের জীবনের ধরন তিনটি

মানুষের জীবনের তিনটি ধরন রয়েছে। ১. পাশবিক জীবন ২. মানবিক জীবন ৩. ঈমানি জীবন।

১. পাশবিক জীবন : আপনারা যদি শিশুদের জীবনের দিকে তাকান, তবে তাদের জীবন কয়েকটি জিনিসের মাঝে সীমাবদ্ধ পাবেন। খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা, দৌড়ানো ইত্যাদিই তার কাজ। এ ছাড়া তার কোনো চিন্তা নেই। নেই চাকরির চিন্তা। না আছে উপার্জনের চিন্তা। না আছে পোশাকের চিন্তা। তাকে খাবারের চিন্তা করতে হয় না। ঘরের চিন্তাও তার ঘাড়ে নেই। সকল চিন্তা থেকে সে স্বাধীন ও মুক্ত। তার ক্ষুধা লাগলে সে কেঁদে ওঠে আর মা তাকে বুকের দুধ খাইয়ে দেয়। চোখে ঘুম এলে কেঁদে ওঠে, মা তার বিছানার ব্যবস্থা করে দেয়। শীত লাগলে কেঁধে ওঠে আর মা তার পোশাকের ব্যবস্থা করে দেয়।

আল্লাহর কি কুদরত যে, একটা শিশুর শুধু কান্নার মাধ্যমেই তার সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেন। সে বলতে পারে না, চাইতে পারে না। একটু কাঁদতে পারে আর এ কান্নার মাধ্যমেই আল্লাহ তার মায়ের অন্তরে এ বিষয়টি ঢেলে দেন যে, শিশুর কিছু প্রয়োজন। মা বুঝতে পারে, সে কিছু চাচ্ছে। তার খাবারের প্রয়োজন। তার শীত লাগছে; বস্ত্রের প্রয়োজন। আর মায়ের অনুমান সব সময় ঠিক হয়ে থাকে। পাঞ্জাবিরা বলে থাকে, 'বোবার কথা বোবার মা বোঝে'। তো আল্লাহ এক কান্নার কারণে ওই শিশুর সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেন। তার সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দেন।

আল্লাহ পাক মাতাপিতার অন্তরে সন্তানের জন্য এত ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন যে, তার একটু কান্নাও সইতে পারে না। কোনো কষ্ট দেখতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, মা প্রচণ্ড ক্ষুর্ধাত। অন্য কামরায় বসে খাবার খাচ্ছে আর এমন সময় বাচ্চা কেঁদে উঠল। তখন মা সব কিছু ছেড়ে তার কাছে ছুটে আসে। কোথায় তার খাবার? কোথায় তার আরাম? কোনো কিছুই তার মনে থাকে না। সে তখন সব ভুলে যায়। বাচ্চার এক আওয়াজ মাকে এভাবে পাগল করে তোলে। আর বাচ্চার কাজ কী? যখন ক্ষুধা লাগে মা খাইয়ে দেয়। ঘুম এলে শুয়ে পড়ে। বাকি সময় খেলাধুলা, দৌড়াদৌড়ির মাঝে কেটে যায়। তার জীবনে কোনো আদেশ-নিষেধ নেই। কোনো বাধাবিঘ্নতা নেই। জীবনের কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে হয় না। সে যেখানে যায়, সেখানেই পায়খানা করে। যে কোলে ঘুমায় সেই কোলে প্রস্রাব করে। একে বলে পাশবিক জীবন।

এখন যদি আমরা অন্যান্য পশু-পাখির দিকে তাকাই, তাহলে আমরা ঠিক এ চিত্রটি তাদের মাঝে দেখতে পাব যে, পশু-পাখিও শিশুর মতো ক্ষুধা লাগলে খায়। গরু ক্ষুদা পেলে ঘাস খায়। সিংহ ক্ষুধা লাগলে কাউকে আক্রমণ করে বসে। ঘুম এলে ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের কোনো বিধিবিধান মেনে চলতে হয় না। ভালো-খারাপের জ্ঞান তাদের নেই। একটি দুধের শিশুর জীবন। তো আমরা পশু-পাখির জীবনের সাথে একটি শিশুর জীবনের মিল খুঁজে পাই।

চাহিদা পুরণে জীবজন্তুর অবস্থা

শিশু যখন একটু-একটু করে বড় হতে থাকে, তখন তার একটা-একটা করে প্রয়োজন বাড়তে থাকে। কারণ, সে একজন মানুষ। তাকে বিভিন্ন ধরনের জিনিসের আশ্রয় নিতে হবে। আল্লাহ তার মাঝে চাহিদা দিয়ে দিয়েছেন। তাকে সেই চাহিদা পূর্ণ করতে হবে। তো যেভাবে মানুষ তার চাহিদা পূরণ করে, জীবজন্তুও সেভাবে তাদের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা, ঘুম যেভাবে মানুষ করে থাকে, অন্যান্য প্রাণীও এসব করে থাকে। কাজেই শ্রেষ্ঠত্ব আর হীনতার জন্য যদি চাহিদা পূরণকে মাপকাঠি বানানো হয়, তাহলে আমরা মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব খুঁজে পাব না। কারণ, এগুলোর প্রত্যেকটি যেভাবে মানুষের মাঝে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনিভাবে অন্যান্য প্রাণীর মাঝেও পাওয়া যায়।

উদাহরণ হিসেবে খাবারের কথা বলা যেতে পারে। এটা মানুষও খায় অন্যান্য, প্রাণীরাও খায়। মানুষ দু-চারটি রুটি খেতে পারে। কিন্তুএকটি হাতি কী পরিমাণ খেতে পারে? উট, মহিষ কী পরিমাণ খেতে পারে? এগুলোর তুলনায় মানুষ কিছুই খায় না। এখন যদি মানুষ দাবি করে বসে, আমি সবচেয়ে কম খাই, তবে বাঘ বলে উঠবে, আমি সপ্তাহে একবার খাই। আর আমরা সপ্তাহে একবার খাওয়ার বিষয়টি কল্পনাও করতে পারি না। এমন করলে আমরা একদম দুর্বল হয়ে পড়ব। না পারব উঠতে, না পারব চলতে। আমাদের দিনেই তিনবার খেতে হয়। আর বাঘ সপ্তাহে একবার খেলেও চলে। কিন্তু আবার মহিষ দিনে ৭৫০ কেজি খাবার খেতে পারে। তো মানুষ না পারে বেশি খেতে, না পারে কম খেতে। কোনোটাই তার দ্বারা হয় না।

এমনিভাবে পিঁপড়া। বর্ণিত আছে, একবার হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এক পিঁপড়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী পরিমাণ খেতে পার? পিঁপড়া উত্তর দিল, 'পুরো বছরে দুটা গম।' সুলাইমান (আ.) বললেন, আমি

তোমাকে পরীক্ষা করব। এই বলে তাকে একটা কৌটার ভেতর ঢুকিয়ে দু-তিনটা গম দিলেন এবং এক বছর পর খুলে দেখলেন, সবকিছু ঠিকঠাক আছে। তার কিছুই হয়নি। সে শুধু দুটি গমই খেয়েছে। সুলাইমান (আ.) তার সত্যবাদিতায় খুব খুশি হলেন। তাকে পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছা করে বললেন, তোমার সত্যবাদিতায় আমি খুব খুশী। বলো তুমি কী চাও? পিঁপড়াটা ছিল খুবই চালাক। সে বলল–

زِدْنِيْ رِزْقًا وَعُمْرًا

পারলে আমার বয়স ও খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন।

সুলাইমান (আ.) তো নিরুত্তর। কারণ, বয়স ও খাবার বৃদ্ধির ক্ষমতা তো তাঁর নেই। তো মানুষের অবস্থা হলো, বেশিও খেতে পারে না, কমও খেতে পারে না।

আসুন দৌড়াদৌড়িতে। এ ক্ষেত্রেও মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পিছিয়ে। ঘোড়া মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত দৌড়াতে পারে। হরিণেরও অবস্থা একই। চিতা; তারও একই অবস্থা। চিতা ঘন্টায় ৯০ কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে। তো বোঝা গেল, মানুষ এ ক্ষেত্রেও দুর্বল।

এবার আসুন বিয়ে-শাদিতে। এ ক্ষেত্রেও মানুষ অত্যন্ত দুর্বল। একজন মানুষ সপ্তাহে এক-দুবার সহবাস করতে পারে। আর অন্যান্য প্রাণী দিনেই কয়েকবার মিলন করতে পারে। খরগোশ ও চড়ুই পাখিকে দেখুন। তো মানুষ এ ক্ষেত্রেও দুর্বল।

আসুন ঘর-বাড়িতে। এ ক্ষেত্রেও মানুষ পিছিয়ে। মানুষ যদি বলে, আমি সুন্দর-সুন্দর ঘর বানাতে পারি, তাহলে মৌমাছি বলবে, আপনার ঘরের চেয়ে অনেক ভালো ঘর আমি বানাতে পারি। আমার কাছে ম্যাপ নেই, ইঞ্জিনিয়ার নেই, শ্রমিক নেই, নেই হাতুড়ি-পেরেক ও অন্যান্য জিনিসপত্র। তবুও আমি এমন সুন্দর-সুন্দর ঘর বানাতে পারি যে, আমার ঘরের প্রতিটি ছিদ্র এক সমান। কোনোটা কোনোটার চেয়ে ছোট-বড় না। বাস্তবতাও এমন। মৌমাছি এমন ঘর বানাতে পারে। দেখলে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। যেমন তার ঘরের ডিজাইন, তেমন তার পরিমাণ।

বাবুই পাখি গাছের বিভিন্ন ডালে বাসা বানায়। তার বাসা এত মজবুত যে, যতই ঝড়-তুফান হোক গাছ ভাঙতে পারে; কিন্তু তার বাসা আপন স্থলে ঠিকভাবেই থাকবে। বিন্দুমাত্র ক্ষয়ক্ষতি হবে না। মানুষ এ-ক্ষেত্রেও পিছিয়ে।

নফসের রাজত্ব

আল্লাহপাক মানুষকে তিনটি নেয়ামত দিয়েছেন।

১. নফস।

২. আকল বা বিবেক।

৩. অন্তর।

নফস হলো চাহিদায় ভরা। বিবেক ভরা খেয়ালে। আর অন্তর ভরা জযবায়। মানুষ শিশুকালে যে জীবন অতিক্রম করে, সেটা থাকে নফসের চাহিদা পূরনের জীবন। ওই সময় মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করে। মা দিতে না চাইলে কেঁদে-কেঁদে আদায় করে। স্বাভাবিক পশুর মতোই থাকে তার জীবন। তার চিন্তায় থাকে, আমি খাব; কিন্তু অন্যরা খেয়েছে কিনা সেটা তার ভাববার সময় নেই। আরেকজনের কান্না দেখে সে-ও কান্না জুড়ে দেয়। অপরের হাতে কিছু দেখলে সেটার জন্য কান্না শুরু করে দেয়। তার কোনো পরোয়া নেই। তখন তার মাঝে এই জযবা কাজ করে যে, আমি আমার চাহিদা পূরণ করব। তার মাঝে নফসের জয়জয়কার থাকে। এখন যদি কারও জীবনের শিশুকাল পেরিয়ে যাওয়ার পরেও শিশুকালে যেমন ছিল, তেমনই থাকে, তাহলে বলতে হবে, সে পাশবিক জীবন যাপন করছে।

সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ

মানুষ যখন শিশুকাল পেরিয়ে একটু বড় হয়, শিক্ষা-দীক্ষা নিতে শুরু করে, তখন আস্তে-আস্তে মানুষের সাথে ওঠা-বসা করতে থাকে, তখন তার মাঝে একটু পরিপক্বতা আসে। আর এ-কারণে তার মাঝে দুটি নতুন বিষয় পরিলক্ষিত হয়–

১. সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ।

২. সামাজিকতার জযবা।

মানুষ তখন থেকেই সৌন্দর্যের প্রতি ধাবিত হতে থাকে, যার কারণে সুন্দর-সুন্দর আকর্ষণীয় জিনিস তার ভালো লাগে। সুন্দরের দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোনো ছেলে বা মেয়েকে দেখে তার চেহারার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়। কারণ, আল্লাহ সব কিছুর মধ্যে একটা সৌন্দর্য দিয়ে দিয়েছেন। স্থান সুন্দর, কাপড় সুন্দর, ঘর-বাড়ি সুন্দর হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি সুন্দর হয়। জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যেকোনো জিনিসের মাঝে সুন্দর বা অসুন্দরের একটা দিক অবশ্যই রয়েছে। আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মাঝে সুন্দরের প্রতি

আকর্ষণ দিয়ে দিয়েছেন, যার কারণে মানুষ যখন একটু বুঝতে শেখে, কিছু শিক্ষা লাভ করে, তখন সে শুধু জিনিস চায় না বরং তার সাথে সৌন্দর্যও চায়। দেখুন, আপনার যদি শীত লাগে, তবে তা থেকে বাঁচতে হবে। এজন্য আপনি পাতাও ব্যবহার করতে পারেন। তা দিয়ে আপনি আপনার সমস্যা সমাধান করতে পারেন। কিন্তু আপনি সেটা করবেন না। পাতায় আপনার চাহিদা পূরণ হবে না। আপনার চাই কাপড়। আবার শুধু কাপড় হলেও চলবে না। আপনি বিভিন্ন ডিজাইন, স্টাইল, এই কোম্পানি, সেই কোম্পানি এগুলো দেখতে-দেখতে অস্থির হয়ে পড়বেন।

তারপর শখের কাপড়টা কিনেই আপনি ক্ষান্ত হবেন না। আপনি যাবেন ট্রেইলারের কাছে। সেলাই করা ছাড়া আপনি কখনও গায়ে দেবেন না। সেলাইয়ের মধ্যে আবার কত ডিজাইন। পাঞ্জাবি। এক ছাটা। শেরওয়ানি। আরও বিভিন্ন ধরনের স্টাইল থেকে আপনি আপনার পছন্দের ডিজাইনটি নির্বাচিত করবেন। তারপর আপনি গায়ে দেবেন। কাপড়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের যত চাহিদা, পুরুষের তার চেয়ে কম। মহিলাদের মন চায় আজ যে কাপড় পরছে, কাল যেন সে ধরনের কাপড় তাদের পরতে না হয়। যার কারণে মহিলারা সব সময় 'কালার মেচিংয়ের' তালাশে থাকে। এর দ্বারা কোন-কোন কালারের পরবে, তা ঠিক করে। একেই বলা হয় 'সৌন্দর্যপ্রীতি'। ফলে যারা ডিজাইনের কাজ করে, তাদের মাথায় নিত্যনতুন সব ডিজাইন উদয় হয়। আজ এক ফ্যাশন, কাল আরেকটা, পরশু অন্যটা। একটার দাম সতেরো হাজার। আরেকটার দাম পঁচিশ হাজার। ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন এমন বৈচিত্রময় অলংকারের আবিষ্কার ঘটায় বলে যারপরনাই আশ্চর্য হতে হয়। এ হলো মানুষের সৌন্দর্যপ্রীতির হাল।

খাবারের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যপ্রীতি

মানুষের খাওয়ার জন্য রুটি, দুধ, লুচি, পানি ইত্যাদিই যথেষ্ট। এতেই তার দিন চলে যাবে। কিন্তু না, মানুষ এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকতে রাজী নয়। তার কথা হলো, আমি এমন খাবার খাব, যা হবে প্রথমত দেখতে সুন্দর, তারপর তার স্বাদও ঠিক থাকতে হবে। আবার দামিও হতে হবে। এই যে সৌন্দর্যপ্রীতি এর কারণে বসার সুযোগ পায় না। যে-সকল পুরুষ ও নারী পাচক, তারা নিজের মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিদিন নতুন-নতুন খাবার উদ্ভাবন করছে।

খাবারের প্লেটে মহিষের মাথা

একবার এক মোগল বাদশাহ এক ইরানি শাহজাদাকে খাবারের দাওয়াত করেন। যখন শাহজাদার আসার সময় হয়ে গেল, বাদশাহ প্রধান খাজাঞ্চিকে ডেকে পাঠালেন এ বলে যে, এক শাহাজাদা আসছে; তোমরা তার জন্য খুব ভালো করে খাবার তৈরি করো। কারণ, এখানে মেহমানের সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন আছে। মেহমান চায়, তোমরা তার জন্য এমন খাবার তৈরি করবে, যা তার জন্য মানসম্মত হবে এবং এর দ্বারা তার ও আমার কী পরিমাণ ভালোবাসা ও ভক্তি আছে, তার পরীক্ষা হয়ে যাবে।

ইরানি শাহজাদা এলে প্রথমে ইয়ার-দোস্তদের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করল। কিছুক্ষণ পরেই খাবারের সময় হয়ে গেল। বাদশাহ খাদেমকে খাবার আনার আদেশ দিলেন। সে এক বিশাল প্লেট নিয়ে এল। প্লেটটি ছিল আবৃত। ওপরটা রংবেরঙের জিনিস দিয়ে সাজানো। দেখলেই মন ভরে যায়। বাদশাহ প্লেটটি শাহজাদার সামনে পেশ করলেন।

ইরানি শাহাজাদাও খুব খুশি হলো। প্লেটটির ডাকনা আস্তে করে উঠাল। উঠানোর পর যে দৃশ্য দেখল, তাতে তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। প্রবল ঘৃণার ছাপ তার চেহারায় ফুটে উঠল। বাদশাহ কৌতূহলী হয়ে প্লেটে কী আছে দেখতে ছুটে এলেন। এসে যা দেখলেন তাতে বাদশাহর মনও খারাপ হয়ে গেল। প্লেটটিতে ছিল মহিষের একটি তাজা মাথা যা থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছিল। এবার বাদশাহ পাচককে ডাকলেন এবং খুব কর্কষ ভাষায় বললেন, তোমাকে কেমন খাবার পাকাতে বললাম আর তুমি কেমন খাবার পাকালে? বলেছিলাম, এমন খাবার পাকাবে, যাতে আমাদের ভালোবাসা ও সৌহার্দের প্রকাশ ঘটে। সেখানে তুমি আনলে আস্ত একটা মাথা। তা থেকে আবার রক্তও ঝরছে। তোমার এ আচরণে মেহমান খুব কষ্ট পেয়েছে। জানি না, সে কি মনে করেছে!

পাচক জবাব দিল, হুজুর! এটা বাস্তবেই খুব সুস্বাদু খাবার। শাহাজাদার যদি নূন্যতম জ্ঞান থাকত, সে তা খেয়ে দেখত। আপনি তাকে দয়া করে একটু খেয়ে দেখতে বলুন। বাদশাহ তো শাহজাদাকে একটু কাছে নিয়ে খেয়ে দেখতে বললেন, শাহাজাদা নিজের খুব কাছে এনে ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করতেই দেখল, এটা বাস্তবেই ভালো খাবারের সমষ্টি। এর চোখের মধ্যে এক স্বাদ, দাঁতের আরেক স্বাদ, মাথায় অন্য এক স্বাদ। যেটা সে রক্ত ভেবেছিল, সেটা ছিল এক জাতীয় সুস্বাদু পানীয়, যা ছিল অনন্য এক সুস্বাদু

জিনিস। ইরানি শাহজাদা যখন খাওয়া শুরু করল, তখন সে বিস্ময়ে হতবাক, চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। খেয়ে পাচকের খুব প্রশংসা করল। তার দক্ষতার খুব গুণ গাইল। সাথে-সাথে এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করল যে, মানুষ এরকম অসাবধারণ খাবার তৈরি করতে পারে?

খাবারের টেবিলে ঐতিহাসিক ভবন

বোম্বাইয়ের এক ব্যবসায়ী একবার তার কয়েকজন বন্ধুকে চায়ের দাওয়াত করল। সব কিছুর আয়োজনের জন্য সে একটি কোম্পানিকে আদেশ দিল। কোম্পানির লোকেরা এ ভোজানুষ্ঠানের জন্য একটা স্থান নির্ধারণ করল এবং সেখানে শামিয়ানা টাঙিয়ে ভোজের ব্যবস্থা করল। মেহমানরা যখন খেতে বসল, তখন তাদের সাথে কাপড় দিয়ে ডাকা একটি টেবিল নিয়ে এল। মেহমানরা যখন কাপড়টি সরালেন, দেখতে পেলেন টেবিলের মধ্যে ভারতের ঐতিহাসিক ভবনগুলো তথা তাজমহল, দিল্লির জামে মসজিদ, গোলশান আরা বেগমের বাগান ও লাল কেল্লা।

মেহমানরা এসব দেখে বলল, আমরা তো জানিই যে আপনারা অনেক ভালো করেই এসব বানাতে পারেন। আপনাদের এগুলো প্রশংসযোগ্য। কিন্তু আমাদের হাতে তো সময় একদম কম। আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। আপনারা তো বলেছেন, চায়ের আয়োজন করবেন। তো চা আনলেই ভালো হয়। তাদের কোম্পানির ম্যানেজার বলে উঠল, জি জনাব! আমরা তো আপনাদের চা-বিস্কুটের আয়োজন করেছি। এগুলো দেখতে মনে হয় ভবন। কিন্তু আপনারা একটু ভালোভালে তাকালে বুঝতে পারবেন, এগুলো বিভিন্ন ধরনের বিস্কুটের অপূর্ব সমাহার। এবার মেহমানরা কাছে গিয়ে আস্তে-আস্তে যখন দেখতে লাগল, তখন দেখল, ভবনের মিনারে মাঝে এক স্বাদ, দরজায় এক স্বাদ। বৈচিত্রময় স্বাদে পূর্ণ। আসলে সেটা ছিল খুব সুস্বাদু এক জাতীয় মিষ্টিদ্রব্য। যাকে তারা ভবনের আকৃতিতে মেহমানের সামনে পেশ করেছে। পরে মেহমানরা তাজমহলও খেয়ে নিল, লাল কেল্লাও খেল এবং গোলশান আরা বাগানের বাগানও খেল। এবার এগুলো খেয়ে তারা বলল, আরে ভাই! আপনারা তো এগুলো সুমিষ্ট জিনিস খাওয়ালেন। একটু লবণ জাতীয় কিছুর আয়োজন করেননি? তখন কোম্পানির লোকেরা বলল, এগুলো নিচে যে ট্রেটা আছে এটা আসলে এক জাতীয় লবণাক্ত খাবার। আপনারা এটা খেয়ে নিন। তখন তারা সেটাও খেয়ে নিল।

বিস্ময়কর এক সালাদ

একবার আমাদের এক দোস্ত তার বাড়িতে কিছু মেহমানকে দাওয়াত করল। উক্ত দাওয়াতে কিছু মহিলাও মেহমান ছিল। বাবুর্চি তাদের কাছে সব খাবার পাঠিয়ে দিল। তারা ছিল অফিসারদের স্ত্রী। একটু পরেই ভেতর থেকে খবর এল, সব খাবার তো পাঠালেন; কিন্তু সালাদ পাঠালেন না। তখন বাবুর্চি তাদের কাছে সংবাদ পাঠাল, আপনারা তো খাবার পাকাতে-পাকাতে বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু কোনটা সালাদ সেটাও বুঝতে পারেননি। আপনাদের সামনে ফুল আকৃতিতে যে রেকাবি দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে পুরোটাই সালাদ। তারা সালাদ এমনভাবে তৈরি করেছে যে, ওটা যে সালাদ কারও বোঝার সাধ্য নেই। ফলে মহিলারা তাদের পছন্দের উপাদান থাকা সত্ত্বেও তাকে স্পর্শ করেনি এই ভেবে যে, এটা হয়তো কোনো একটা মডেল হতে পারে। প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেটা কোনো মডেল ছিল না।

তারপর তারা যখন সালাদ খেল, তখন তারা বাবুর্চির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো। তার যোগ্যতার প্রশংসা করতে বাধ্য হলো। চিন্তা করুন, বাঘ, সিংহ সব সময় কাঁচা গোশত খায়; কিন্তু তাদের এতটুকু জ্ঞান নেই যে, গোস্তের সাথে একটু সবজি দেবে অথবা গোশত ভুনা করবে বা সেটাকে স্যুপ বানিয়ে খাবে। কিন্তু মানুষ এর পুরো উল্টো। তারা এক গোশতকে কত রকম করে কতভাবে খায়।

আইসক্রীমে বত্রিশ প্রকারের স্বাদ

আমাদের এক বন্ধু আইসক্রীমের কাজ করে থাকে। তার দোকানে নাকি বত্রিশ প্রকারের আইসক্রীম আছে। আশ্চর্য! আইসক্রীমের মধ্যে এত প্রকার! এত ধরনের স্বাদ! এসব হলো মানুষের সৌন্দর্যপ্রীতির ফল। মানুষ সব সময় সুন্দর থেকে সুন্দর জিনিস চেয়ে থাকে।

ফার্নিচারের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যপ্রীতি

এই সৌন্দর্যপ্রীতি ফার্নিচারের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে। দেখুন, একটা সময় ছিল যখন মানুষ চৌকিতে ঘুমাত। তারপর এল খাট। তারপর এল বেড। বেডের আবার কত ধরন। তারপর এল ডাবল বেড। এখন তো মানুষ ওয়াটার বেডও বানাতে শুরু করেছে। ওয়াটার বেড কী? ওয়াটার বেড গরুর চামড়া দিয়ে তৈরী এক ধরনের শোওয়ার সিট। এর ভেতরে পানি ভরা। এর

সবচেয়ে সুন্দর যে বিষয়টি রয়েছে, সেটি হলো, মানুষের শরীরের রং যেমন হবে বেডও ঠিক সে-রকম হয়ে যাবে। এর ওপর শুলেই ঘুম আসবে। এর ভেতর যে-পানি আসে, তাকে গরম করার জন্য হিটারের ব্যবস্থা আছে। এখন যত শীতই হোক না আপনি পানি গরম করে তার ওপর ঘুমাবেন। আপনার সামান্য শীতও অনুভব হবে না।

তো দেখুন, যেখানে একটিমাত্র চৌকি ছিল যথেষ্ট, সেখান থেকে মানুষের পছন্দের চাহিদা কতটুকু হলে এমন বেডও তৈরি করা যেতে পারে?

ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে সৌন্দর্যপ্রীতি

বসবাসের জন্য তো মাটির দেওয়াল আর শনের চালই যথেষ্ট ছিল। এতেই জীবন কেটে যেত। কিন্তু-না মানুষ সেখানেই থেমে যায়নি। সৌন্দর্যপ্রীতি তাদের বসে থাকতে দেয়নি। শুরু হয়ে গেল ঘরের উন্নতি। সেখানে থেকে মানুষ আসে টিনের ঘরে। তারপর ইটের দালান। তারপর টাইলস। তারপর শুরু হয় স্টীলের ব্যবহার। তারপর ইস্পাত। তারপর সিসা। যত চেষ্টা আছে, সব ঘরের সৌন্দর্যের জন্য মানুষ ব্যয় করে। এখন একটা বাড়ির কারুকার্য দেখলে তাজ্জব না হয়ে পারা যায় না। কয়েক কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় করা হয় একটা বাড়ির পেছনে।

এক পাকিস্তানি ব্যবসায়ীর ঘর

এক বৃদ্ধ পাকিস্তানের এক বড় ব্যবসায়ীর বাড়িতে যায়। ঘরের মধ্যে পা রেখেই সে বলে ওঠে, এমন সুন্দর ঘর আমি আমার জীবনে দেখিনি। আমার মন চায়, এ ঘরে আজীবন থেকে যেতে। কত সুন্দর করে মালিক বাড়িটা বানিয়েছে? তো মানুষ উত্তম থেকে উত্তমের খোঁজ করছে। সুন্দরের চেয়ে সুন্দর খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তাজমহল এবং বিস্ময়কর গোসলখানা

আপনারা তাজমহলের কথা চিন্তা করুন। একটা লোক তার স্ত্রীর জন্য এত ভালোবাসার পরিচয় দিল! তার জন্য সে তাজমহল নির্মাণ করল, যাকে বর্তমানে 'ওয়ান্ডার অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড' বলা হয়। মিশরের বাদশাহরা তাদের ব্যক্তিত্ববানদের কবরের ওপর পিরামিড তৈরি করল। এটাও ওয়ান্ডার অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড। মানুষ কী না বানাচ্ছে, এই দালান-কোঠা বানানোর দ্বারা মানুষ শিল্পের সুনিপুণতার প্রকাশ ঘটাচ্ছে।

একবার তাজমহল দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানকার দুটি জিনিস আমাকে খুব অবাক করল। ১. যে পাথর দিয়ে তাজমহলের নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলো একেকটা চার ফুট, আট ফুট লম্বা। যিনি আমাদের দেখাচ্ছিলেন, তার হাতে ছিল একটা টর্চলাইট। লাইটটি পাথরের ওপর মারতেই মনে হলো, প্রতিটি পাথর যেন গোলাকৃতির লণ্ঠন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। আল্লাহ কোত্থেকে তার জন্য এই পাথরের ব্যবস্থা করে দিলেন! আর ওই চার ফুট, আট ফুট পাথরের ভেতর আবার নানা প্রকৃতির খোদাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলোর একটাকে আরেকটার সাথে এমনভাবে ফিট করা হয়েছে যে, উভয়ের মাঝে যে জোড়া আছে, তাও অনুভূত হয় না।

এর সামনে আছে মমতাজ মহল। তার জন্য তিনি একটা গোসলখানা বানিয়েছেন। তা দেখেও বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। তিনি এর ভেতর ছোট সিসা এমনভাবে ফিট করেছেন যে, যদি আপনি একটি বাতি সেখানে জ্বালান তাহলে সেটা হাজার বাতির রূপ ধারণ করবে। আপনি বুঝতেই পারবেন না, হাজারটা বাতি জলছে, নাকি একটা।

সমাজবদ্ধতার সৃষ্টিগত জযবা

জ্ঞান ও পরিপক্বতা মানুষের ভেতর এক তো সৌন্দর্যপ্রীতি সৃষ্টি করেছ। দ্বিতীয়ত, তাকে সমাজবদ্ধতা শেখায়। সমাজের প্রতি তাকে ধাবিত করে, যার কারণে সে একা থাকতে পারে না, একা খেতে পারে না। যখন খায় তখন সে চায় তার সাথে তার বাবা-মা এবং সংসারের অন্য সদস্যরাও যেন শরিক হয়। সৃষ্টিগতভাবেই এর স্বভাব আল্লাহ তার মাঝে দিয়ে দিয়েছেন। এখন খেতে গেলে কয়েকবার করে সন্তানকে ডাকে, স্ত্রীকে ডাকে। সবাই মিলে এক সাথে খেতে চায়। অথচ উপার্জন করেছে সে। ঘাম ঝরেছে তার। কষ্ট সহ্য করেছে সে। তবুও তার মন চায়, যারা কষ্ট করেনি তারাও যেন তার সাথে খায়। সে নিজ উপার্জিত পয়সা একা সাবাড় করতে চায় না। অন্যের কারণে অনেক সময় নিজেই খায় না। এ যে একটা ভালোবাসার বিষয়। এটা সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ মানুষের মাঝে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ এই গুণের কারণেই অপরের সুখে-দুঃখে শরীক হয়। অন্যের কষ্ট ভাগ করে নেয়। যদি কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে পায়ে কাঁটা বিধে চিৎকার দিয়ে কাঁটা খুলতে বসে যায়, তবে সে তার সাহায্যে দৌড় দেয়। কাঁটা খুলতে চেষ্টা করে। এগুলো কেন করে? এজন্যই যে, আল্লাহ তার মাঝে সমাজবদ্ধতার স্বভাব দিয়ে দিয়েছেন।

২. মানবিক জীবন

এ হলো দুটি স্বভাব– সৌন্দর্যপ্রীতি ও সমাজবদ্ধতা। পৃথিবীর যত সৌন্দর্য আর বাহার মানুষ এর কারণে উপভোগ করে থাকে। এই দুটি স্বভাবের ফল হলো এ দুনিয়াকে অনেক আপন মনে হওয়া। এর সৌন্দর্য মনকাড়া। আর এ দুই স্বভাবের সমন্বয়ে অতিবাহিত করা জীবনকেই বলা হয় 'মানবিক জীবন'।

প্রথম যে-জীবন, সেটা ছিল পশুত্বের জীবন। খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা, দৌড়াদৌড়ি সেই জীবনের কাজ। নিজের চাহিদা পূরণই সেখানে মুখ্য। সেখান থেকে যখন মানুষ একটু সামনে আগায়, তখন তার মাঝে জ্ঞানের পরিপক্বতা সৃষ্টি হয়। আর জ্ঞানের পরিপক্বতার কারণে তার মাঝে সৌন্দর্যপ্রীত ও সমাজপ্রীতির স্বভাব সৃষ্টি হয়। আর এ দুয়ের মাধ্যমেই মানুষ পৃথিবী আবাদ করে। এখন ঘর বানালে সেটা ফুল দিয়ে সাজায়। নানান রকম লেখা, ক্যালিগ্রাফিতে পূর্ণ করে। হরেক রকমের রং লাগায়। আবার মার্বেল ফিট করে। কত রকম জিনিস দ্বারা একটা ঘরকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করে। বলা যায়, সৌন্দর্যপ্রীতি ও সমাজপ্রীতি পুরো পৃথিবীকে আবাদ করে ফেলে। আর সমাজপ্রীতির কারণে মানুষ চায় আমি যেমন সুখে আছি, আমার ভাই-প্রতিবেশীরাও তেমন সুখে থাকুক। সে এর খোঁজ নেয়, ওর খোঁজ নেয়। সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার একটা জযবা তার মাঝে কাজ করে। আর একেই বলে 'মানবিক জীবন'।

মানবিক জীবন উত্তম; তবে...

মানবিক জীবন পশুত্বের জীবনের চেয়ে হাজার গুণে ভালো। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে হ্যাঁ, এর দ্বারাই একজন মানুষের পূর্ণতা অর্জিত হয় না। কিছুটা হলেও মানুষ অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ, মানুষ যখন অন্যের সাহায্য করবে, তখন সে চাইবে সাহায্যপ্রাপ্ত লোকটা যেন তার গুণ গায়। মানুষের মাঝে তাকে তুলে ধরে। তার প্রসিদ্ধির চেষ্টা করে। সাহায্যের কথা যেন বলে বেড়ায়। অনেক সময় সাহায্যপ্রাপ্ত লোকটির ওপর সাহায্যকে হাতিয়ার বানিয়ে কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চায়। মোটকথা, সে সাহায্য করবে। সমাদর করবে। বন্ধুত্বের হাত বাড়াবে। তবে নিজের স্বার্থও সেখানে বাসা বাঁধবে। সে চাইবে তার গুণগান, তার প্রশংসা এবং নিজ কর্তৃত্বও প্রভাব। নিজের শক্তির প্রয়োগ। তো মানবিক জীবনে ভালো বটে; কিন্তু তাতে পূর্ণতা নেই।

বিবেকের রাজত্ব

প্রথম যে-পাশবিক জীবন, তাতে মানুষ প্রকৃতির পূজা করে। আর মানবিক জীবনে বিবেকের প্রভাব রয়েছে, যার কারণে সেখানে অর্থ ও স্ত্রী এদুয়ের পূজা হয়ে থাকে। আপনারা আজকের সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, পুরো পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে, হয় অর্থের কারণে, নয় নারীর কারণে। সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা আর কষ্ট-ক্লেশের লক্ষ এই দুটো জিনিসই। যেকোনো জাতির পরিশ্রমের পেছনে হয় এ উদ্দেশ্য আছে যে, আমার সম্পদ হবে আর স্টাটাস উন্নত হবে। আমি স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপন করব। অথবা দেখা যাবে, উদ্দেশ্য কোনো নারীকে পাওয়া, তার ভালোবাসা অর্জন করা।

ফল এ দাঁড়াল যে, পশুত্বের জীবনে মানুষের মাঝে চাহিদা পূরণের স্পৃহা কাজ করে থাকে। আর মানবিক জীবনে কাজ করে সম্পদ ও নারীর পূজা। আপনারা যদি অমুসলিমদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন, তাদের মাথায় এ বিষয়টি কাজ করে যে, আমার সম্পদ চাই, নারী চাই। যে করেই হোক আমাকে এ দুটো অর্জন করতেই হবে। এতে সে কারও পরোয়া করে না, কারও ধার ধারে না। প্রথম জীবনে চাহিদার পূজা ছিল, যার কারণে বলা হলো, তাতে প্রবৃত্তির রাজত্ব চলে আর মানবিক জীবনে আছে জ্ঞানের রাজত্ব। এর ওপর ভিত্তি করে মানুষ তার জীবন সাজায়। নিজের আনন্দের সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত করে। এসবের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য দুটো। নারী আর অর্থ। এখন বলা যায়, মানবিক জীবনে নারী আর অর্থের পূজা চলে।

আজ অমুসলিমরা যে-জীবনকে উত্তম মনে করে, তা হলো মানবিক জীবন। এ-জীবনের পূর্ণতা সমাজের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। সমাজ যে-নীতি নির্ধারণ করে দেয়, সেই অনুযায়ী সবাই চলতে থাকে। যদিও মানবরচিত সেই নীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। উদাহরণস্বরূপ– একটি পার্লামেন্টের সকল সদস্য হাতে তালি দিয়ে বিল পাশ করল, পুরুষের সাথে পুরুষের বিয়ে বৈধ। তারা একে একটা নীতির রূপ দিল। অথচ, এটা নিকৃষ্টতায় পশুত্বকেও হার মানায়। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

তুমি যদি অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করতে যাও, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ভ্রষ্ট করে ফেলবে।[৯৩]

---

৯৩. সূরা আন'আম : আয়াত ১১৬

তো সামাজিকতার ফলাফল দাঁড়াল, মানুষ এমন-এমন নিয়ম উদ্ভাবন করে, যা আল্লাহর দেওয়া আদেশের বিপরীত, যার কারণে মানবিক জীবনের সবচেয়ে বড় পয়েন্ট সমাজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ-জীবনে সবচেয়ে বড় পর্যায় হলো, মানুষ অপরের সাহায্য করবে। তবে কিছু স্বার্থের বিনিময়ে। আজ পৃথিবীতে বড়-বড় রাষ্ট্রগুলো ছোট-ছোট রাষ্ট্রকে সাহায্য-সহযোগিতা করে ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে। তবে সুদ নিয়ে। কী আশ্চর্য কথা। নেয় সুদ আবার তাকে নাম দিয়েছে সহযোগিতা। দেখুন, আকল মানুষকে কীভাবে ধোঁকা দিচ্ছে। এটাই হলো মানবিক জীবন।

৩. ঈমানি জীবন

মানুষের জীবনের তৃতীয় প্রকারটি হলো ঈমানি জীবন। ইসলামি জীবন মানবিক জীবনের অনেক ঊর্ধ্বে। কারণ, এর মাধ্যমে মানুষের অন্তর তার নিজের ওপর শাসন চালায়। প্রথম জীবনে প্রবৃত্তির শাসন। দ্বিতীয় জীবনে আকলের শাসন আর তৃতীয় জীবনে অন্তরের শাসন। এই অন্তরের মাঝে আল্লাহ জযবার প্রাচুর্য দিয়েছেন, যার কারণে এই অন্তরেই আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর বড়ত্বের কথা তাতে বসে যায়। আর এই প্রকারের জীবনকেই বলা হয় ঈমানি জীবন, কুরআনি জীবন, ইসলামি জীবন।

মানুষ যখন এ-জীবনে পদার্পণ করে, তখন সে সবচেয়ে উত্তম জীবন যাপন করতে থাকে। কারণ, এ-জীবনে সে মানুষের সেবা করে বিনিময় চায় না, সাহায্য করে প্রশংসা দাবি করে না। একথাটিই বলে গেছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম–

يٰقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

হে আমার সম্প্রদায়! এজন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না।

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ

আমার বিনিময় দেবেন আমার আল্লাহ।

এ-জীবনে মানুষের অন্তর প্রকৃতপক্ষে তার ওপর শাসন করে থাকে, রুল জারি করে। আর যখন ওই অন্তর ঠিক হয়ে যায়, তখন মানুষ বাস্তবিকই মনুষ্যত্বের জীবন যাপন করে। তার সামনে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের

এক মহান লক্ষ্য, যার কারণে সে অপরের উপকার করে; কিন্তু বদলা চায় না। অন্যের সাহায্যে হাত বাড়ায়; কিন্তু বিনিময় চায় একমাত্র আল্লাহর কাছে। মানুষের কাছ থেকে তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই।

ঈমানি জীবনের চারটি মৌলিক গুণ

এই ঈমানি জীবনের দ্বারা মানুষের চারটি গুণ অর্জিত হয়। হাদীছে এসেছে–

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ

যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসে আবার কারও সাথে শত্রুতা পোষণ করে; কাউকে দান করে আবার কাউকে ফিরিয়ে দেয়, তবে সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করল।

১. আল্লাহর মহব্বত : আল্লাহর ভালোবাসা কাকে বলে? আল্লাহর ভালোবাসা বলা হয়, মানুষ একে অপরকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে। এই ভালোবাসা হবে সকল প্রকার চাহিদার ঊর্ধ্বে। এতে থাকবে ইখলাস ও নিষ্ঠা। এমন ভালোবাসার কিছু দৃষ্টান্ত দেখুন–

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করলেন, তখন আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব তৈরি করে দিলেন। এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন এত মজবুত ছিল যে, একজনের দুটা ঘর থাকলে একটা অপর ভাইকে দিয়ে দিয়েছেন। নিজের সম্পত্তি দুই ভাগ করে এক ভাগ নিজে রেখেছেন, এক ভাগ ভাইকে দিয়েছেন। তাঁদের ইখলাস এত উঁচু পর্যায়ের ছিল। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে তাঁদের কথা আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

তারা ছিল একে অপরের জন্য দয়ালু।[৯৪]

আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের ভালোবাসার গুণকীর্তন করেছেন। কতটুকু নিষ্ঠা, কতটুকু স্বার্থহীনতা থাকলে আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করতে পারেন। তাঁদের ভালোবাসার কথা পড়ে মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়।

---

৯৪. সূরা ফাতাহ : আয়াত

শ্রেষ্ঠত্বের একটি অপূর্ব নিদর্শন

হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর খেলাফতকালের ঘটনা। একবার ওমর (রাযি.) খলীফার দরবারে উপস্থিত হলে এক জায়গায় এমন কিছু অক্ষম ও বৃদ্ধ লোকদের নাম দেখতে পান, যারা ছিল অপরের মুখাপেক্ষী। অন্যের সেবা তাদের প্রয়োজন ছিল। সেখানে এক বৃদ্ধার নামও লেখা ছিল। কিন্তু তার খাদেমের কথা লেখা ছিল না। ওমর (রাযি.) মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমি-ই এর খেদমত করব।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওমর (রাযি.) পরের দিন বুড়ির বাড়িতে হাজির হলেন। তাকে কাজের কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, রাতের আঁধারে কে যেন এসে সব কাজ করে দিয়েছে। তার কাজ ছিল বাইরে থেকে পানি আনা, ঘরদোর পরিষ্কার করা। ওমর (রাযি.) বুড়িকে জিজ্ঞেস করলেন, বুড়িমা! লোকটার নাম কী? বুড়ি বলল, বাবা! আমি তো তার নাম জানি না। কখনও জিজ্ঞেসও করিনি। এবার প্রশ্ন করলেন, তবে লোকটা কে? বুড়ি জবাব দিল, বাবা! আমি তো তাকে কখনও দেখিইনি। সে যখন আসে আমাকে পর্দার ভেতরে চলে যেতে বলে। তারপর সব কাজ সেরে সে যাওয়ার সময় আমাকে বলে যায়। তখন আমি পর্দা থেকে বেরোই।

হযরত ওমর (রাযি.) তার বাড়ি থেকে চলে এলেন। পরদিন আবার গেলেন। বুড়ি বলল, বাবা! সব কাজ তো এক লোক এসে করে দিয়েছে। ওমর (রাযি.) ফিরে গেলেন। পরের দিন ঈশার নামায পড়েই তার বাড়ির দিকে রওনা দিলেন এবং বাড়ির একটা ঝোঁপের মধ্যে চুপটি মেরে বসে গেলেন। রাত যখন গভীর হলো, চার দিক নীরব হয়ে গেল, তখন দেখতে পেলেন, একটা লোক খালি পায়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে বুড়ির ঘরের দিকে। যখন একটু কাছে এলেন, ওমর (রাযি.) প্রশ্ন করলেন, কে আপনি? লোকটি জবাব দিল, আমি আবুবকর। ওমর (রাযি.) আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আপনি এসেছেন বুড়ির খেদমতের জন্য? আপনার পায়ে জুতা নেই কেন? আবুবকর জবাব দিলেন, জুতা পায়ে দেইনি এ কারণে যে, যদি পায়ে জুতা থাকে আর আমি হেঁটে আসি, তবে রাতের বেলা পায়ের আওয়াজে কারও ঘুম ভেঙে যেতে পারে। সুবহানাল্লাহ!

কেমন মানবপ্রেম! এর নাম ঈমানি জীবন। এর কারণে একটি লোক অন্যের সেবা করে। আবার তাকে গোপনও রাখে। কাউকে জানতে দেয় না। আবার মানুষের নিদ্রার প্রতি এভাবে খেয়ালও রাখে। সুবহানাল্লাহ!

জীবনভর অক্ষম ব্যক্তিদের সেবা

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাযি.) দেখতে খুবই সুশ্রী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খুব সুন্দর দেহ দিয়েছিলেন। তিনি যখন মারা যান, তখন গোসলদাতা গোসল দিতে গিয়ে তার কাঁধে একটি কালো দাগ দেখতে পান। সে এর হেতু খুঁজে পেল না। পরে পরিবারের লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারাও অজ্ঞতা প্রকাশ করল। এর কয়েক দিন পর এলাকার দুর্বল ও ঘরে পড়ে থাকা মানুষগুলোর চিৎকার শোনা যায়। তারা চিৎকার করে বলছে, সেই লোকটি কোথায় গেল, যে প্রতিদিন আমাদের পানি এনে দিত? তখন সবাই বুঝতে পারল, ওই লোকটি ছিলেন হযরত যাইনুল আবেদীন (রাযি.)। তাঁর মৃত্যুতে আজ এদের এই আহাজারি। কীভাবে নিজের খেদমতকে লুকিয়ে রেখেছেন! পরিবারের লোকেরাও বিষয়টি আঁচ করতে পারেনি। সুবহানাল্লাহ!

এটি ঈমানি জীবনের চিত্র। এখানে মানুষ অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হবে। তার সাহায্যে ছুটে যাবে। প্রাণ উজাড় করে অপরকে ভালোবাসবে আর উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি।

মুসাফিরের সাথে উত্তম আচরণ

একবার ওমর (রাযি.) চিন্তা করলেন, সবসময় তো রাতভর শহরের লোকদের খোঁজখবর নেই। আজ শহরের বাইরে গিয়ে সেখানকার লোকদের খোঁজ নেব। সে অনুযায়ী তিনি রাতে বেরিয়ে পড়লেন এবং মদিনার আবাদি ছেড়ে গ্রামে ঢুকে পড়লেন। সেখানে তিনি একটি তাঁবু দেখতে পেলেন। তাকে উদ্দেশ করে সামনে অগ্রসর হলে একটা লোককে বিষণ্ন মনে তাঁবুর সামনে বসা পেলেন। ওমর (রাযি.) তার কাছে গিয়ে কুশল বিনিময় করলেন। লোকটাকে বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি উত্তর দিল, ভাই! আমার স্ত্রী তাঁবুর ভেতর প্রসববেদনায় ছটপট করছে। খাওয়ার মতো কিছু নেই। আমি এখানে মুসাফির। কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। শুনে ওমর (রাযি.) সাথে-সাথে সেখানে থেকে উঠে বাড়িতে চলে এলেন এবং কিছু আটা ও তরকারি নিয়ে স্ত্রীকে সাথে করে ওই তাঁবুর দিকে ছুটলেন।

সেখানে পৌঁছে স্ত্রীকে তাঁবুর ভেতর মুসাফির লোকটির স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নিজে মুসাফির লোকটির সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। লোকটি ওমর (রাযি.) কে জিজ্ঞেস করল, ভাই! তুমি কি কখনও আমীরুল মুমিনীনকে দেখেছ? তিনি তো অনেক বিলাসি জীবন যাপন করছেন। তার কোনো জিনিসের পরোয়া করতে হয় না। যা ইচ্ছা তা-ই

করে। কিন্তু প্যাঁচে পড়ল আমাদের মতো নিরীহ জনতা। তাদের শান্তি নেই। সুখ নেই। এ ধরনের নানান কথা সে বলছিল। আর ওমর (রাযি.) কান পেতে শুনছিলেন। একটু ভেতর থেকে ওমর (রাযি.)-এর স্ত্রী আওয়াজ দিলেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার বন্ধুকে সুসংবাদ দিন, তার ছেলে হয়েছে। লোকটা আমীরুল মুমিনীন! ডাক শুনতেই বুঝে ফেলল, সে তাঁর সাথেই কথা বলছে। সে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেল। খুব ভয় পেল। ওমর (রাযি.) তাকে অভয় দিলেন এবং পর দিন তার ছেলেক নিয়ে খলিফার দরবারে হাজির হতে বললেন। সে তার ছেলেকে নিয়ে যথারীতি দরবারে উপস্থিত হলে ওমর (রাযি.) তার দৈনিক ভাতার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এই হলো ইসলামি জিন্দেগি।

ঈমানের পরিচয়

ঈমান মানুষের ভেতরের জঞ্জালগুলো খুটে-খুটে দূর করে দেয়। যার মাঝে পরিপূর্ণ ঈমান থাকবে তার থেকে জঞ্জাল বিদায় নেবে। ঈমান আর মুনাফিকি কখনও একত্র হতে পারে না। ঈমানের কাজই হলো মানুষ থেকে যত ভেজাল, কপটতা, প্রতারণা সব কিছু দূর করে দেবে। শরীয়তের একটি মাসআলা হলো, যদি কেউ শরবত খাওয়ার সময় এই নিয়ত করে যে, আমি মদ পান করছি, তবে তার মদ খাওয়ার গুনাহ হবে। ফোকাহায়ে কেরামদের ফতোয়া একথারই ওপর। কারণ–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'সব আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'[৯৫]

ফোকাহায়ে কেরাম এ-ও লিখেছেন, যদি কেউ স্ত্রীর সাথে সহবাস করার সময় এই নিয়ত করে যে, আমি ওই মেয়ের সাথে যিনা করেছি, তবে তার যিনার গুনাহ হবে। কারণ, তার নিয়ত খারাপ। আর ঈমানের দৌলত দ্বারাই মানুষের নিয়ত পরিশুদ্ধ হয়। তখন অন্তর ঠিক হয়ে যায়, কথা ঠিক হয়, কাজও ঠিক হয়। সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। কাজেই প্রকৃত ঈমানের দৌলত অর্জন করতেই হবে আপনাকে।

---

৯৫. বোখারি শরীফ

আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ

আল্লাহর জন্য কারও সাথে শত্রুতা পোষণ করা এটিও ঈমানদারের মাঝে থাকতে হবে। সে শত্রুতা পোষণ করলে সেটাও আল্লাহর জন্যই করবে। একবার আলী (রাযি.) এক কাফেরকে যুদ্ধাবস্থায় মাটিতে ফেলে তার বুকে ওপর চেপে বসেন। তখন কাফের লোকটি আলী (রাযি.)-এর মুখে থুতু নিক্ষেপ করল। সাথে-সাথে আলী (রাযি.) তাকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে এলেন। কাফের তো অবাক। বলে উঠল, আলী! তোমার সাথে আমি যে-আচরণ করেছি, এর জন্য তো আরও তাড়াতাড়ি আমাকে হত্যা করা তোমার উচিত ছিল। আলী (রাযি.) জবাব দিলেন, তুমি যখন আমার মুখে থুতু মেরেছ, আমার রাগ তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তখন আমার মন চেয়েছিল, তোমার বুকে ছুরিটা সাথে-সাথে বসিয়ে দিই। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি এজন্য যে, এই হত্যা যেন আমার নিজের স্বার্থে না হয়ে যায়। কারণ, আমি কাউকে হত্যা করলে একমাত্র আল্লাহর জন্যই করব। নিজের স্বার্থে নয়।

আল্লাহর জন্য দান করা

وَأَعْطٰى لِلّٰهِ আল্লাহর জন্যই দিতে হবে যখন মানুষ কাউকে কিছু দেবে–

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা যখন কাউকে কিছু দেওয়ার মনস্থ করতেন, তখন রাতের বেলা চুপিসারে গিয়ে যারা হকদার তাদের দিয়ে আসতেন যেন তারা বুঝতেই না পারে দাতা কে? কারণ, তারা কিছু দিতেন তো আল্লাহর জন্যই দিতেন। এতে তাদের পার্থিব কোনো স্বার্থের আশা থাকত না।

এক বুযুর্গ ব্যক্তি কোনো এক কল্যাণমূলক কাজে মানুষের সহযোগিতা কামনা করল। তখন এক লোক মোটা একটা অংকের অর্থ সেই কাজের জন্য দিল। বুযুর্গ তার জন্য খুবই দু'আ করলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। পরবর্তী কালে কোনো এক মাহফিলে বুযুর্গ আলোচনা করতে গিয়ে ওই জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য মানুষের সাহায্য কামনা করলেন। ঘটনাক্রমে ওই মাহফিলে উক্ত লোকটি বসা ছিল। বুযুর্গ মানুষকে তার প্রতি ইশারা করে বলতে লাগলেন, ওমুক ভাই এত টাকা দিয়েছে; কাজেই আপনারাও দিন।

বুযুর্গ যখন তার কথা লোকসমাগমের সামনে প্রকাশ করে দিল, সাথে-সাথে লোকটা উঠে দাঁড়াল এবং বুযুর্গকে সম্বোধন করে বলল, হুজুর! আমি

আপনাকে যে-টাকা দিয়েছি তা আমার মায়ের অজান্তে দিয়েছি। মাকে বিষয়টি না জানিয়ে আমি ভুল করেছি। আমার এজন্য মায়ের অনুমতি নিতে হবে। আমাকে এখন টাকাগুলো ফিরিয়ে দিন। বুযুর্গ তো থ বনে গেলেন। উপস্থিত লোকেরা অবাক। সবাইকে বিষয়টি খুব নাড়া দিল। সবাই এটা অপছন্দ করল। তারপর এক সময় মাহফিল শেষ হলো। এক-দুজন করে সবাই চলে গেল। লোকটা রয়ে গেল। পরে বুযুর্গের কাছে এসে বলল, হুজুর! আমি টাকাগুলো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করেছি। কিন্তু আপনি যখন সবার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করলেন, তখন খুশিতে আমার বুকটা ফুলে উঠেছিল। হঠাৎ করে আমার মনে হলো, আমার তো দানের ছাওয়াব সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাই তৎক্ষণাৎ আমি দাঁড়িয়ে আপনার কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে নিয়েছি, যেন লোকে বুঝতে পারে, আমি টাকা দেইনি। এখন সবাই চলে গেছে। আমি আল্লাহর জন্য টাকাগুলো আবার দিয়ে দিলাম। এটাই ঈমানি জিন্দেগি। এরই নাম ইখলাস।

আল্লাহর জন্য কাউকে না দেওয়া

وَمَنَعَ لِلّٰهِ ঈমানি জিন্দেগিতে মানুষ কিছু দিলে আল্লাহর জন্যই দেয়। আর না দিলে তা-ও হয় আল্লাহর জন্য। এর কিছু দৃষ্টান্ত দেখুন–

ওমর (রাযি.)-এর খেলাফতকালে একবার অনেকগুলো গনিমতের মাল এল। সেখানে অনেকগুলো আতরও ছিল। ওমর (রাযি.)-এর স্ত্রী প্রস্তাব করল, আতরগুলো আমি ভাগ করে দেই। সাথে-সাথে ওমর (রাযি.) না করে দিলেন। স্ত্রী বললেন, আমি সবার মাঝে ইনসাফের সাথে ভাগ করে দেব। এমনকি নিজের হাতেও এতটুকু আতর লাগতে দেব না। ওমর (রাযি.) বললেন, তবুও তুমি এগুলো ভাগ করতে পারবে না। কারণ, তুমি যখন এগুলো ভাগ করে দেবে, তখন আতরের সুগন্ধি তুমি উপভোগ করতে থাকবে। আমি চাই না আমার পরিবারের কেউ এতটুকু অতিরিক্ত উপকার গনিমতের মাল থেকে উপভোগ করুক।

একবার হযরত আবুবকর (রা)-এর স্ত্রী মিষ্টি খাওয়ার খুব ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু আবুবকর (রাযি.)-এর ভাতা ছিল খুবই কম। তাই তাকে বলতে সাহস করলেন না। পরে চিন্তা করলেন, আমাদের দৈনন্দিন খরচ থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে কিছু দিন পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা হলে মিষ্টি তৈরি

করব। যেই ভাবা সেই কাজ। কিছু দিন সঞ্চয় করে কিছু টাকা হলে তিনি মিষ্টি তৈরি করলেন। নিজেও কিছু খেলেন, হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর সামনেও কিছু পেশ করলেন। আবুবকর (রাযি.) তো অবাক! মিষ্টি বানানোর পয়সা কোথায় পেলে? স্ত্রী ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। তখন আবুবকর (রাযি.) বললেন, বোঝা গেল, বাইতুলমাল থেকে আমার অতিরিক্ত ভাতা নেওয়া হচ্ছে। এই বলে তিনি নিজের ভাতা কমিয়ে দিলেন।

ইসলামি জীবন মানুষকে এমনই নিষ্ঠাবান হতে শেখায়।

একবার হযরত আলী (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে গমন করেন। তিনি ছিলেন খেলাফতের কোনো কাজে ব্যস্ত। যখন কাজ থেকে ফারেগ হলেন, তখন আলী (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করলেন, আলী ভাই! তুমি কি খেলাফতের কোনো বিষয়ে কথা বলবে, নাকি ব্যক্তিগত কোনো আলোচনা করবে? আলী (রাযি.) জবাব দিলেন, আলোচনাটা ব্যক্তিগত। শুনে ওমর (রাযি.) পাশে জ্বলতে থাকা বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। আলী (রাযি.) বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলেন, মানুষ মেহমান এলে ঘরে আলো জ্বালায় আর আপনি কিনা নিভিয়ে দিলেন! ওমর (রাযি.) উত্তর দিলেন, আলী ভাই! তুমি ঠিকই বলেছ, মেহমান এলে আলো জ্বালানোই নিয়ম। কিন্তু ব্যক্তিগত কথা বলার জন্য বায়তুলমালের তেল ব্যবহার করব এই অনুমতি ইসলাম তোমাকে-আমাকে দেয় না।

এটি ঈমানি জীবনের চিত্র। এখানে কারও জন্য প্রাণ উৎসর্গ করবে; কিন্তু কোনো বিনিময় চাইবে না।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর জীবনের দিকে তাকান। কেমন পরহেযগারি তিনি অর্জন করেছেন! নিজের প্রতি কতটা কঠোর ছিলেন। তিনি তো চাইলে অনায়াসে নিজের সকল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি একমাত্র আল্লাহর দিকে তাকিয়ে।

হযরত ইউসুফ (আ.) গোনাহ করতে চাইলে তাঁর জন্য কোনো বাধা ছিল না। তিনি নিজ প্রবৃত্তির হীন স্বার্থ তালাবদ্ধ ঘরের নীরব কুটিরে চরিতার্থ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাঁর অন্তরে ছিল আল্লাহর ভয়, জাহান্নামের ভয়। তিনি বিরত থাকলেন, সংযম অবলম্বন করলেন। এটি ঈমানি জীবন। এখানে মানুষের চক্ষুর ছায়া থাকবে না। কারও চৌকস কান পাতা থাকবে না। কেউ উঁকি মেরে দেখবে না। কিন্তু তবুও কোনো অনৈতিক কার্যকলাপ দেখা যাবে না। কারণ. এখানে কোনো কিছু না থাকলেও একটা ভয় আছে– আল্লাহর ভয়।

সারকথা

তো ভাই!

এখন তিনটি কথা মনে রাখবেন–

১. প্রবৃত্তির শাসন হলো পাশবিক জীবন।

২. শুধু আকলের শাসন হলো মানবিক জীবন।

৩. কুরআনের শাসন হলো ঈমানি জীবন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ঈমানি জীবন দান করেন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সহনশীলতা

'সহনশীলতার একটি উপকারিতা হলো, এর দ্বারা মানুষ স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। যার মাঝে এই গুণটি নেই, সে সবর্দা কোনো-না-কোনো টেনশনে থাকে। যদি স্ত্রী হয়, তাহলে কখনও স্বামীর ওপর রাগ, কখনও বাচ্চাদের ওপর রাগ, কখনওবা শ্বাশুড়ির ওপর রাগ, কখনও ননদের ওপর রাগ, কখনও আপন বোনদের ওপর রাগ। আর যদি পুরুষ হয়, তো কখনও ক্ষিপ্ত হয় নিজের অধীনের ওপর, কখনও নিজের বন্ধুদের ওপর, কখনওবা বিবি-বাচ্চাদের ওপর। এক কথায় সব সময় শুধু টেনশন আর টেনশনই ফিল করতে থাকে।

তো বন্ধুগণ! চিন্তা করে দেখুন, সহনশীলতার কত বড় ফায়দা যে, একজন মানুষ শুধু এ-কারণেই এই ফেতনার দুনিয়াতে আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপন করে।'

সহনশীলতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَلِيمًا

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

تحمل-এর আভিধানিক অর্থ

تحمل-শব্দটি উর্দুতে পাশাপাশি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ, এর মূল অক্ষর হলো حمل যার অর্থ বোঝ উঠানো। আর حمل শব্দটি দুভাবে ব্যবহৃত হয়। ১. حِمْلٌ ২. حَمْلٌ

প্রথমটির অর্থ হলো বাহ্যিকভাবে কোনো জিনিস বহন করা। যেমন– কেউ মাথায় বোঝা বহন করল বা হাতে কোনো জিনিস ধারণ করল।

فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا

অবশ্যই সে কেয়ামতের দিন মহা ভার বহন করবে।[৯৬]

আর দ্বিতীয়টির অর্থ অভ্যন্তরীণভাবে কোনো জিনিস বহন করা। যেমন– গর্ভবর্তী মহিলাকে বলা حامل তথা বহনকারী। সে বাস্তবেই বহনকারী। কারণ, তার পেটে সন্তান আছে। কিন্তু তার এই বহন দেখা যায় না। কুরআনে কারীমে এসেছে–

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ

গর্ভবতী মহিলা।[৯৭]

---

৯৬. সূরা তোয়া-হা : আয়াত ১০০

৯৭.. সূরা ত্বলাক : আয়াত ৪

'সহনশীলতা' কাকে বলে?

সবার কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, বোঝা বহন অনেক কষ্টের বিষয়। তবুও কখনও-কখনও মানুষ বোঝা বহন করে। একে পরিভাষায় تحمل বা বহন করা বলা হয়। মানুষের মাঝে প্রতিশোধের একটা নেশা আছে। মানুষ শত্রু থেকে প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু অনেক সময় নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণ করে। কারও কাছ থেকে প্রতিশোধের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও এবং অন্তরের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে ক্ষমা করে দেয়। প্রতিশোধ নেওয়া বর্জন করে। নিজেকে দমিয়ে রাখে। এভাবে অপরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য হাতের নাগালে পাওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বাধা দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার নাম হলো আত্মসংবরণ বা সহনশীলতা।

আল্লাহ তা'আলার حليم ও عليم নামের তাৎপর্য

আল্লাহ তা'আলা عليم ও حليم। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই উভয় গুণ নিজের জন্য একত্রে বর্ণনা করেন। আল্লাহ যে কতটুকু সহনশীল তা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব। আমরা কাউকে ক্ষমা করি কখন? যখন তার অপরাধের ব্যাপারে আমদের খুব কম ধারণা থাকে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের সব গুনাহ, সব অপকর্মের কথা জানেন এবং আমাদের অন্তরে যখন কোনো গোনাহের চিন্তা আসে, তখনও তিনি অন্তরের সেই মন্দ ইচ্ছার ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবগত থাকেন। তারপরও তিনি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নেন না, আমাদের পাকড়াও করেন না। আমরা তো আমাদের সন্তানরা কখনও অবাধ্য হলে তাকে একবার বুঝাই। দ্বিতীয়বার মেরে থাকি। আর তৃতীয়বার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিই। কিন্তু আল্লাহ এমনটা করেন না। বান্দা কত নাফরমানি করা সত্ত্বেও তিনি কাউকে একথা বলেন না যে, তুই আমার অবাধ্য কেন হলি? সুতরাং আজ থেকে তোর রিযিক বন্ধ। যদি অপরাধের সাথে-সাথে আল্লাহ রিযিক বন্ধ করে দিতেন, তাহলে আমাদের মতো গোনাহগারদের কী অবস্থা হতো? এমন সহনশীল আল্লাহ। আল্লাহ শক্তি থাকা সত্ত্বেও শাস্তি দেন না। বান্দার অপরাধ লোকসমাজে প্রকাশ করে দেন না, যার কারণে মানুষ তার প্রশংসা করতে থাকে। অথচ বাস্তবে সে কত বড় অপরাধী!

এক বুযুর্গ বলেন–

اے دوست جس نے تیرے تعریف کی، اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی

দোস্ত! যে তোমার গুণ গায়, বাস্তবে সে তোমার প্রভুর তোমার দোষ-ত্রুটির ওপর দেওয়া পর্দার গুণ গায়।

বাস্তবতাও তা-ই। আল্লাহ যদি আমাদের দোষ-ত্রুটির ওপর পর্দা না দিয়ে বরং তা প্রকাশ করে দিতেন, তাহলে মানুষ আমাদের মুখে থুতু দিতেও ঘৃণা করত। কিন্তু আল্লাহ আমাদের গোনাহের ওপর পর্দা ঢেলে দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ সহজে কাউকে ধরেন না। আর আমাদের অবস্থা হলো, ছেলে একটু ভুল করলে মা ছেলেকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ যদি এমন করতেন, গুনাহের সাথে-সাথে সুস্থতা ছিনিয়ে নিতেন, খাবার বন্ধ করে নিতেন, তাহলে আমাদের কী দশা হতো? কত দুর্দশায় আমরা পড়তাম? কিন্তু আল্লাহ এমনটি করেন না। আল্লাহ দয়াবান, মেহেরবান। এ কারণে বলা যায়, এ পৃথিবীতে আজও কোনো সন্তানের জন্ম হওয়া মানে হলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে এখনও নিরাশ হননি। অর্থাৎ– সম্ভবত তার শোকরগোযার বান্দা এখনও তৈরি হবে।

সায়্যিদুনা আদম (আ.) থেকে একটা ভুল হয়ে গেল। আল্লাহ নিজেও কুরআনে বলেছেন–

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

আমি এই ভুলের ক্ষেত্রে তার কোনো ইচ্ছা দেখতে পাইনি।[৯৮]

কিন্তু তবুও তাঁর সাথে আল্লাহর কি মোয়ামালা হয়েছে? তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। জান্নাতের পোশাক খুলে নিলেন। কষ্টের এ দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। সাথে-সাথে তাঁকে এসব শাস্তি দিয়ে দিলেন। কিন্তু আমরা গুনাহ করি। আমরা উলঙ্গ হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হই। কিন্তু আল্লাহ আমাদের সেই দেহে আবার কাপড় ফিরিয়ে দেন। আমাদের জন্য পোশাক নিষিদ্ধ করে দেন না। আমি গোনাহের পরিকল্পনা করে ঘর থেকে বের হই। কিন্তু আমাদের সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরিয়ে দেন। আল্লাহ আমাদের পথেই শেষ করে দেন না। আল্লাহ এত দয়ালু! এত মায়াশীল বান্দার প্রতি!

---

৯৮. সূরা ত্বহা : আয়াত ১১৫

ہم نے کئے گناہ اس نے نہ کی پکڑ

کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے

আমরা কত গুনাহ করি; কিন্তু তিনি (প্রভু) আমাদের পাকড়াও করেন না। আমাদের প্রভু কত দয়াবান! কত মেহেরবান!

হযরত আবুবকর (রাযি.) বলেন, সহনশীলতা দ্বারা ইল্‌মের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

মজার ব্যাপার হলো, মানুষের মাঝে এই উভয় গুণই বিদ্যমান। মানুষের যেমন আছে ইল্‌ম, তেমন রয়েছে হিল্‌ম (সহনশীলতা)। তবে আজকের পৃথিবীতে ইল্‌মের জয়জয়কার অবস্থা। কিন্তু সহনশীলতা কমে যাচ্ছে। আমাদেরকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে হবে। রাসূল বলেছেন–

تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ

'তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।'

আল্লাহ আমাদের পবিত্র আখলাক দ্বারা সজ্জিত করে দিন। আমাদের ইল্‌মের সাথে সহনশীলতাও বাড়িয়ে দিন। আমীন।

মন্দ আচরণের জবাব উত্তম কথা দ্বারা দেওয়ার শিক্ষা

কুরআনে আমাদের শিক্ষা দেয়, আমরা মন্দের জবাবে উত্তম আচরণই করব। ইরশাদ হয়েছে–

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنَ

'তুমি মন্দকে উত্তম আচরণ দ্বারা প্রতিহত করো।'[৯৯]

একবার একলোক হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে খুব মন্দ আচরণ করে। সে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়। উপস্থিত লোকেরা দেখে তো অবাক। সবাই বলতে লাগল, হুজুর! ও আপনাকে এভাবে গালি দিচ্ছে আর আপনি এভাবে মুখ বুঝে সহ্য করছেন আর তার জন্য দু'আ করছেন! হযরত ঈসা (আ.) বললেন–

كل إناء يترشح بما فيه

প্রত্যেক পাত্র থেকে সে জিনিসই বের হয়, যা তার মাঝে থাকে।

---

৯৯. সূরা হামীম-সাজদা : আয়াত ৩৪

তার ভেতরটা মন্দে ভরা। এ-কারণে সে মন্দ কথাই বলে। আমার ভেতর আল্লাহ ভালো দিয়েছেন। এ-কারণে ভালো কথাই আমার মুখ দিয়ে বের হয়।

তো শরীয়ত আমাদের উত্তম আচরণ, উত্তম চরিত্র দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করতে শেখায়। এ-কারণে যে নাপাককে কখনও নাপাক জিনিস দ্বারা পবিত্র করা সম্ভব নয়। নাপাককে পাক করতে পবিত্র পানি লাগবে। ঠিক তেমনিভাবে যদি মন্দের জবাব মন্দ দিয়েই দেওয়া হয়, তবে কখনও মন্দ ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে না। তাকে ভালো করতে হলে ভালো পথেই তার সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে।

কুরআন কারীমের অন্য জায়গায় এসেছে–

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

তারা দুর্ব্যবহার প্রতিরোধ করে উৎকৃষ্ট কথা দ্বারা। উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য।[১০০]

আবার কেউ যদি মন্দের প্রতিশোধ নিতে চায়, তাহলে শরীয়ত তাকে সেই অনুমতিও প্রদান করে। তবে কতটুকুর জন্য সেটা বুঝতে হবে। যতটুকু মন্দ করেছে শরীয়ত ততটুকু মন্দ দ্বারা জবাব দেওয়ার অনুমতি দেয়। ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেওয়ার অনুমতি শরীয়ত কখনওই প্রদান করে না। আল্লাহ কুরআন মজিদে ইরশাদ করেন–

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

যদি তোমরা শাস্তি দিতেই চাও, তবে ততটুকুই দেবে যতটুকু তোমাদের দেওয়া হয়েছে।[১০১]

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য এটা অত্যন্ত সুখবর।[১০২]

---

১০০. সূরা রা'দ : আয়াত ২২
১০১. সূরা নাহল : আয়াত ১২৬
১০২. সূরা নাহল : আয়াত ১২৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মসরংবণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতপূর্ণ পবিত্র জীবন দয়া, ক্ষমা ও সহনশীলতার এমন অভিনব দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিপূর্ণ যে, মানুষ সেগুলো পড়লে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে যায়। কীভাবে শত্রুকে এভাবে ক্ষমা করা যেতে পারে। কত উদার মনের অধিকারী হলে এত অপরাধ করা সত্ত্বেও, এত কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও নিজের ঘোর দুশমনকে হাতের নাগালে পেয়ে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায়? এত উদারতা! এত মানবতা! এত দয়া! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিষয়গুলো আমাদের জন্য সত্যিই অনুসরণযোগ্য।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ লিখেছেন–

অত্যাচারিত হলে ধৈর্যধারণ, যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে দৃঢ়তা, লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা অবলম্বন, শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া এ বিরল গুণগুলো কারও জীবনে এমনভাবে একত্র হয়নি যেমনিভাবে একত্র হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে।

কাজী ইয়াজ শিফা শরীফে লিখেছেন–

وَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيْدُ مِنْ كَثْرَةِ الْأَذٰى إِلَّا صَبْرًا

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনের কষ্টের মুখে কেবল ধৈর্য ধারণই করতেন।

وَعَلٰى اَشْرَافِ الْجَاهِلِ إِلَّا حِلْمًا

জাহেলরা তাঁর সাথে যত বেশি দুর্ব্যবহার করত, তিনি তত বেশি সহনশীল হতেন।

আপনারা দেখে থাকবেন, মানুষ সবচেয়ে বেশি পরিবারের লোকদের আঘাত সহ্য করে থাকে। স্ত্রী, ছেলে, সন্তান, মা-বাবা প্রমুখের পদে-পদে তাকে গ্লানি সইতে হয়। যাদের সে একটু বেশি ভালোবাসে তারাই তাকে বেশি আঘাত দেয়। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের প্রতি লক্ষ করুন। যে যত নিকটতম ছিল, সে তত বেশি তাঁর ভালোবাসার পাত্র ছিল। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তত বেশি ভালোবাসত।

অধীনদের ব্যাপারে সহনশীলতা

হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ছোট বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হই এবং দশ বছর তাঁর খেদমত করি। এই দশ বছরের মধ্যে কোনো দিন তিনি আমাকে প্রহার করেননি, কখনও কর্কশ ভাষায় কথা বলেননি। ধমকও দেননি। সুবহানাল্লাহ!

এটি-ই ছিল রাসূলের দীক্ষা। আর আমাদের অবস্থা তো হলো, আমরা দু-চার দিন যেতে-না-যেতেই স্ত্রী-সন্তানদের সাথে রূঢ় আচরণ শুরু করে দিই। ধমক দিতে ছাড়ি না। পারলে মাটির নিচে চাপা দিয়ে মেরে ফেলি।

এক যুবকের একটা বদ-অভ্যাস ছিল। সে যেখানে কোনো ভালো খেজুর দেখতে পেত, অমনি গাছ থেকে ছিড়ে খেত। মালিকের অনুমিত বা বিনিময় প্রদানের কোনো তোয়াক্কা করত না। তার এলাকার নিয়ম ছিল, গাছ থেকে খেজুর পড়ে গেলে কোনো প্রকার অনুমতি ছাড়াই যে-কেউ ওই খেজুর খেতে পারত। কিন্তু গাছ থেকে ছিঁড়তে হলে অবশ্যই মালিকের অনুমতি লাগত। কিন্তু যুবক এ নিয়ম পুরোপুরি ভঙ্গ করেই চলছিল।

একবার এক মালিক তাকে ধরে ফেলল এবং তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে এল। যুবক নিজ মুখেই বর্ণনা দেয়, মালিক যখন আমাকে রাসূলের দরবারে হাজির করে, তখন আমি ভয়ে কাচুমাচু হয়ে যাই। আমি নিশ্চিত যে, আমার আজ হাত কাটা হবে। আমি খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অপরাধ শুনে খুব নরম স্বরে আমাকে কাছে ডাকলেন। আমার মাথায় হাত রেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি গাছের খেজুর ছিড়ে খাও কেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক হাত আমার মাথায় পড়তেই আমার অর্ধেক ভয় দূর হয়ে যায়। আমি কণ্ঠে একটু জড়তা রেখে উত্তর দেই, হুজুর! আমি দরিদ্র, ক্ষুধার তাড়নায় যখন কিছু না পেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে যাই, তখন আমার কোনো জিনিসের বৈধতা-অবৈধতা বিচার করার জ্ঞান থাকে না। তাই আমি খেজুর ছিঁড়ে খেয়ে ফেলি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবার খুব শান্তভাবে বললেন, দেখো, তোমার যদি এত বেশি ক্ষুধা পেয়ে থাকে, তবে তুমি গাছের তলে পড়ে থাকা খেজুরগুলো খাও; কোনো সমস্যা নেই। এর অনুমতি আছে। কিন্তু গাছ থেকে পেড়ে খেতে হলে তো অবশ্যই তোমাকে মালিকের অনমুতি নিতে হবে।

যুবক এবার বলল, দয়ার নবী! আমি আপনার সামনে অঙ্গীকার করছি। আর কোনো দিন এমনটা করব না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অঙ্গীকার শুনে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি এর দারিদ্র্য দূর করে দাও। এর ক্ষুধা মিটিয়ে দাও। যুবক বলে, রাসূলের ওই দু'আ আমার অন্তরে এক প্রশান্তি ঢেলে দেয়। আমি খুবই প্রশান্তি অনুভব করি। রাসূলের দরবার থেকে ফিরে আসার পর সারা জীবন একটিবারের জন্যও আমি আর সেই অপরাধে লিপ্ত হইনি। সুবহানাল্লাহ!

কেমন ছিল নবীজির ইসলাহ, তাঁর সংশোধন। সাপও মরে গেল, লাঠিও ভাঙল না। না দিলেন বকুনি, না দিলেন ধমকি। মোলায়েম স্বরে দু-তিনটি কথা একটা লোকের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। আর আমরা তো কেউ একটু অপরাধ করলে তার প্রতি রাগের শেষটুকুও ঢেলে দেই। আর যদি হয় সে অধীন কেউ, তবে তো কোনো কথা নেই।

আজ শয়তান মানুষের অন্তরে গোনাহের নতুন-নতুন নাম উদ্ভাবন করে দিয়েছে, শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে, যাতে মানুষ গোনাহ বর্জন না করে। এখন গীবত করলে মানুষ বলে, আমরা একটু গল্প করছি। মিথ্যাকে বলে বাহানা। স্ত্রী স্বামীর সাথে মিথ্যা বলে, আমি একটু ভান করেছি। এভাবে রাগের নাম দেওয়া হয়েছে 'কড়া স্বভাব'। মানুষ প্রবল গোস্যার পর এই ভেবে আনন্দ পায় যে, হ্যাঁ; আমি তো কঠোর স্বভারেই মানুষ। শয়তান গোনাহের সুন্দর-সুন্দর নাম রেখে দিয়েছে।

স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সহনশীলতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ স্ত্রীদের ব্যাপারে অনেক উদার ছিলেন। তাদের জন্যও অত্যন্ত রহমদিল ছিলেন। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, কোনো বিষয়ে কখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাগ উঠে গেলে তিনি আমাকে বলতেন,'এই খুকি'। আয়েশা (রাযি.)-এর বয়স কম ছিল। তাই এভাবে বলতেন। কিন্তু দেখুন কতখানি ভালোবাসা আর সোহাগমিশ্রিত শব্দ কানে লাগতেই সকল রাগ পানি হয়ে যায়।

একবার আয়েশা (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো এক বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি করেন। এমন সময় হযরত আবুবকর (রাযি.) সেখানে উপস্থিত হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, আবুবকর! আমাদের মাঝে মিটমাট করে দাও। আবুবকর (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, কেন? কী হয়েছে? হুজুর বললেন, আয়েশা! তুমি বলবে, না আমি বলব? আয়েশা (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে আপনিই বলুন। তবে শর্ত হলো, ঠিক-ঠিকভাবে বলতে হবে। মহিলাদের স্বভাবই হলো কথার সাথে একটা না একটা শর্ত জুড়ে দেবেন। যেমনটি করলেন হযরত আয়েশা (রাযি.)। তাকে ঠিক-ঠিকভাবে বলতে হবে। এ শর্ত শুনে আবুবকর (রাযি.) তো রেগে অস্থির। বলে উঠলেন, তোমার এত বড় সাহস? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমার শর্ত ছাড়া সঠিক বিষয়টি বলবেন না?

রাগ দেখে তো আয়েশা (রাযি.) ভয়ে চুপসে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে গিয়ে মাথা নত করে বসে রইলেন। তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'আবুবকর! তোমাকে তো দায়িত্ব দিলাম আমাদের মাঝে ফয়সালা করতে। কাউকে ধমক তো দিতে বলিনি। ঠিক আছে; তোমাকে সমাধান দিতে হবে না। আমরাই মিট করে নিচ্ছি।' আবুবকর (রা. বেরিয়ে পড়লেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার আয়েশা (রাযি.)-কে হেসে বললেন, দেখলে তো তোমাকে কীভাবে ধমক থেকে বাঁচিয়ে দিলাম। শুনে আয়েশা (রাযি.)ও হেসে ফেললেন। ব্যস, সব সমস্যা চুকে গেল।

তায়েফবাসীর জন্য বদদু'আ করতে অস্বীকৃতি

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত নিয়ে তায়েফ গেলেন, তখন সব দরদ ও আকুতি ঝেড়ে তাদের ডাকলেন। কিন্তু কী নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল তারা রাসূলের সাথে! তিনি ছিলেন মেহমান। খাবার, আদর, আপ্যায়ন তো দূরে থাক উল্টো তারা পাড়ার বখাটে যুবকদের লেলিয়ে দিল তাঁর পেছনে। পাষণ্ডদের দৌরাত্ম্য এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহে পাথর নিক্ষেপ করতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। তাঁর পা মোবারক রক্তে জুতার সাথে লেগে গেল। তাঁর শরীর নিস্তেজ ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ছিল একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু বর্বরদের হৃদয় এতটা পাথর হয়ে গিয়েছিল যে, একটু বসার সুযোগ তারা দোজাহানের বাদশাহকে দিল না। তাদের নিষ্ঠুরতা এমন বর্বর রূপ ধারণ করেছিল যে, এর নয় বছর পর আয়েশা (রাযি.) একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সবচেয়ে কষ্টের দিন কোনটি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, তায়েফের

দিন। কত হৃদয়বিদারক আচরণ হলে নয় বছর পরে অন্তর থেকে এ ধরনের উক্তি বেরুতে পারে!

তাদের প্রবল আঘাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রক্তস্নাত হয়ে গেলেন এবং বাধ্য হয়ে এক বাগানে আশ্রয় নিলেন, সাথে-সাথে হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই পাহাড়কে হুকুম করুন। এখনই সে এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করে দেবে। দয়ার নবী তখন বলে উঠলেন, না-না তা কখনও করব না। এরা ধ্বংস হলে আমার ওপর কারা ঈমান আনবে? আজ হয়তো দেখা যাচ্ছে তারা ঈমান আনছে না। কিন্তু কাল ঠিকই তাদের বংশে এমন সন্তান জন্ম নেবে, যারা আমার কালেমা কবুল করবে। দয়াল নবী তাদের ব্যাপারে নিষ্ঠুর হতে পারেননি। নিষ্ঠুর হতে পারেননি তাদের প্রতি, যারা তাকে রক্তাক্ত করেছে। এ ছিল তাঁর উম্মতপ্রীতি। উম্মতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা।

দাঁত মোবারক শহীদ হওয়ার পরেও দু'আ

উহুদে মুসলমানদের কিছু ভুলের কারণে যখন তাদের সাময়িক বিপর্যয় ঘটল এবং কাফেররা রুখে দাঁড়াল, তখন তাদের অতর্কিত হামলায় মুসলমানরা পর্যুদস্ত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁত মোবারকও শহীদ হয়েছিল। পরে অবশ্য আল্লাহ কাফেরদের পিছু হটতে বাধ্য করেন। যখন যুদ্ধ শেষ হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম আস্তে-আস্তে রাসূলের পাশে জড়ো হলেন। তখন এক সাহাবি জোর গলায় বললেন, হুজুর! তারা আপনার এ অবস্থা করেছে। দয়া করে আপনি তাদের জন্য বদদু'আ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'আমি রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি– লা'নত হিসেবে নয়।' তারপর দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

'হে আল্লাহ! আপনি আমার কওমকে ক্ষমা করুন। কারণ তারা বোঝে না।'

جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپالے ● جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے

যিনি অপরাধীকেও স্বীয় আঁচলে ঢেকে নেন, যিনি আক্রমণের শিকার হয়েও শত্রুকে দু'আ দেন।

جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپالے ● جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے

اسے اور کیا نام دیگا زمانہ ● وہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے

যমানা তাকে আর কী-ইবা নাম দেবে? রহমত যদি না হন, তা হলে কী হবেন তিনি?

দুশমনের জন্য গম সরবরাহের আদেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন, তখন কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ইয়ামামার সর্দার ছুমামা ইবনে আছাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করল।

সে-সময় মক্কাবাসীকে ইয়ামামা থেকে গম সরবরাহ করতে হতো। ছুমামা ইবনে আছাল মুসলমান হওয়ার পর মক্কায় গম পাঠাতে অস্বীকার করল। যেহেতু গম তার। তার অধিকার আছে, যার কাছে ইচ্ছা সে বিক্রি করবে। তো সে গমের ঘাটতির অজুহাত দেখিয়ে গম দিতে অস্বীকার করল। এদিকে গম না পেয়ে মক্কাবাসীর অবস্থা অনেক শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেল। তারা কঠিন সংকটের শিকার হলো। চার দিকে নেই-নেই রব পড়ে গেল। নেতৃস্থানীয় লোকেরা তো পেরেশান। কোনো উপায়ন্তর না দেখে তারা সিদ্ধান্ত নিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আবেদন জানাবে। যেহেতু ছুমামা তাঁর হাতেই ইসলাম কবুল করেছে। তাঁর আদেশ অমান্য সে করবে না। তারা কিছু লোককে মদিনায় পাঠাল। এরা ছিল সেই কুখ্যাত সব পিচাশ, যারা নবুওতের তেরো বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁড় চুষে খেয়েছিল। সম্প্রীতি আর সৌহার্দ্যের এতটুকু দৃষ্টান্তও তারা তাঁর জন্য স্থাপন করেনি। তাঁকে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছে। নির্মমতা আর পৈচাশিকতার কোনো ধরন তারা তাঁর ক্ষেত্রে বাদ রাখেনি। আর শেষে তাকে আঁধার রাতে লোকচক্ষুকে আড়াল করে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল।

সেই তারা যখন লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে তাঁর দরবারে হাজির হলো নিজেদের চরম সংকট দূর করার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করলেন? না নিলেন প্রতিশোধ, না দেখালেন শত্রুতার কোনো ছবি। বরং তাদের কথা শুনে সাথে-সাথে ছুমামা ইবনে আছালের উদ্দেশে পত্র লিখলেন– 'তুমি খুব দ্রুত মক্কাবাসীদের জন্য গমের ব্যবস্থা করো যেন তারা সংকটের শিকার না হয়।' তারপর যথারীতি তারা গম পেয়ে গেল। সংকট কেটে গেল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনা করলেন, ইতিহাসে যা বিরল।

আমাদেরও শত্রু আছে, অনেকের সাথে মনোমালিন্য আছে। কিন্তু আমরা কি কখনও নিজের শত্রুর সাথে এমন আচরণের কোনো চিত্র দেখাতে পারব?

মেয়ের হত্যাকারীদের ক্ষমা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মেয়ে সায়্যিদা যয়নব (রাযি.)-এর বিয়ে হয়েছিল তার চাচাতো ভাই আবুল আসের সাথে। একবার আবুল আস তাঁকে অনুমতি দিল, তিনি চাইলে মদিনা হিজরত করতে পারেন। চাইলে তার সাথে মক্কায়ও থেকে যেতে পারেন। যয়নব (রাযি.) হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন। আবুল আস ভাই কেনানকে আদেশ দিল, সে যেন তাঁকে মদিনায় দিয়ে আসে। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবায়ে কেরামদের তাঁকে স্বাগত জানাতে পাঠালেন। তারা মক্কা থেকে একটু দূরেই অবস্থান করছিল।

যখন তিনি মদিনা যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন, তখন কাফেরদের মাঝে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। তারা সদলবলে ছুটে এল। আগে-আগে ছিল আবুসুফিয়ান। তাদের কথা একটাই– এত বড় আস্পর্ধা যে, দিন-দুপুরে আমাদের সামনে মুহাম্মাদের মেয়ে মদিনায় চলে যাবে! আমাদের মান-সম্মান সব ধুলায় লুটাবে! আমরা অবশ্যই তাকে বাধা দেব।

এ-সময় তাদের মাঝে এক নওজোয়ান ছিল, যার নাম হাব্বার ইবনে আসওয়াদ। সম্পর্কে যয়নব (রাযি.)-এর দূরসম্পর্কের চাচাতো ভাই। অনেক সময় নিজ আত্মীয়রা বেশি কষ্টের কারণ হয়। তার ক্ষেত্রেও সেটা-ই ঘটল। সে এসে যয়নব (রাযি.)-এর ঘোড়ার পায়ে আঘাত করল। উট টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। যয়নব (রাযি.) তার পিঠ থেকে পড়ে যান। তিনি ছিলেন গর্ভবর্তী। আর গর্ভবতী অবস্থায় উটের মতো এমন উঁচু প্রাণীর পিঠ থেকে পড়ে গেলে অবস্থা কতটা করুণ হতে পারে চিন্তা করুন। তা-ই হলো। তার গর্ভ নষ্ট হয়ে গেল। তিনি প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন। দেখে আবুসুফিয়ান বলল, ঠিক আছে; আজ তাকে ফিরিয়ে দাও। অন্য দিন সময় করে চুপচাপ মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবে। তখন আমরা বাধা দেব না। আমরা এতটুকু হলেও সান্ত্বনা লাভ করব যে, তাকে আমরা একবার হলেও ফিরিয়ে দিয়েছি। তো পরবর্তী কালে যয়নব (রাযি.)কে গর্ভজনিত ব্যথা নিয়ে মদিনায় সফর করতে হলো। ওই সময় এতটুকু সফর করতে প্রায় ১৫/১৬ দিন সময় লাগত। চিন্তা করুন, এত দীর্ঘ সফর করেছেন এত কষ্ট নিয়ে। যয়নব

(রাযি.) যখন মদিনায় পৌঁছলেন, তার অবস্থা তখন খুব খারাপ পর্যায়ে চলে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কন্যাকে দেখতে এলেন। আর অমনিই তার চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি কাতর স্বরে বলেন, দীনের জন্য আমার মেয়ের মতো কষ্ট কেউ করেনি। পরে তাঁর ব্যথা বাড়তে থাকল। এক সময় এটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হলো।

চিন্তা করুন, যার জন্য নিজের মেয়ে এত কষ্ট পেয়েছে, সে কত বড় দুশমন। কত বড় শত্রু সে। আমাদের ক্ষেত্রে এমন হলে তো আমরা তাকে গুলি করেই মেরে ফেলতাম। মাথাটা শরীর থেকে পৃথক করে দিতাম। কিন্তু দয়ার নবী কী করলেন? যখন মক্কা বিজয় হলো, এ খবর হাব্বার ইবনে আসওয়াদের কানে চলে গেল। সে ভয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে অন্য দেশে সফরের প্রস্তুতি নিল। কিন্তু একজন তাকে পরামর্শ দিল, একবার গিয়ে নবীজির কাছে ক্ষমা চেয়েই দেখ না। সে নবীর দরবারে এল এবং বলে উঠল, আমাকে ক্ষমা করে দিন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। ক্ষমা করে দিলেন নিজ মেয়ের হত্যাকারীকে।

এ ছিল তাঁর আচরণ, তাঁর চরিত্র। আর আজ আমরা সামান্য একটু কথা নিয়েই অন্যজনকে ঘায়েল করি। যদি শোনে কেউ আমার ব্যাপারে একথা বলেছে, তবে তো হয়েছে। তার ক্ষমা তো দূরের কথা তার ব্যাপারে আরও কত রকম ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়।

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে ক্ষমা

মক্কার বড় এক অস্ত্র ব্যবসায়ী ছিল। তার কাছে শত শত বর্শা, তলোয়ার স্টক থাকত। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা যখন পরস্পর লড়াইয়ে মেতে উঠত, তখন তারা তার থেকে অস্ত্র ধার নিত। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হুনায়নের যুদ্ধে তার থেকে অস্ত্র ধার নেন। তো সে একবার মক্কার এক দরিদ্র লোক ওমায়ের ইবনে ওয়াহ্হাবকে এই প্রলোভন দেখায় যে, আমি তোমার পরিবারের সকল খরচ বহন করব, তারা সারা জীবন আমার ঘাড়ে থাকবে। শর্ত হলো, তোমাকে মুহাম্মাদকে হত্যা করতে হবে। সে-ও এই শর্ত রাজি হয়ে গেল। সাফওয়ান তাকে একটা তরবারি দিল, যাতে বিষ মাখা ছিল। তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এর একটা আঁচড় যার গায়ে লাগবে, সে অবশ্যই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। কারণ, তার মধ্যে বিষের মাত্রা অনেক বেশি ছিল।

তো লোকটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে মদীনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। সে যখন মদীনায় প্রবেশ করল, তখন সাহাবিরা তাকে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গ্রেপ্তার করে ফেললেন। আসলে সবই আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ যাকে বাঁচাতে চান, তাকে মারবে এমন সাধ্য কার? সাহাবিরা তাকে গ্রেপ্তার করে রাসূলের দরবারে নিয়ে গেলেন। রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মদীনায় কেন এসেছ? সে পুরো ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুলে বলল এবং করজোর নিবেদন করে ক্ষমা চাইল। দয়ার নবী তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সে মক্কায় ফিরে এল।

কিছু দিন যাওয়ার পর যখন মক্কা বিজয় হলো, ওমায়ের ইবনে ওয়াহ্হাব তখন কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু সাফওয়ানের মনে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে, আজ তার নিস্তার নেই। তার হত্যা অবধারিত। সে সিদ্ধান্ত নিল, মক্কা ছেড়ে ইয়ামান চলে যাবে। এদিকে ওমায়ের ইবনে ওয়াহ্হাব এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করল, হুজুর! সাফওয়ান প্রাণ বাঁচাতে ইয়ামান চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে বুঝে গেছে আজ তার রক্ষা নেই। হুজুর! তার জন্য আমি আপনার কাছে সুপারিশ করছি, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। নবীজি মুচকি হেসে বললেন, যাও; তাকে গিয়ে বলো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। ওমায়ের বলে উঠল, আমি যদি সাফওয়ানকে ক্ষমার কথা বলি সে আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। তাই আপনি আমাকে এমন কোনো নিদর্শন দিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি তাকে বিশ্বাস করাতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা থেকে পাগড়ি খুলে তার হাতে দিলেন। বললেন, যাও; এটি নিয়ে তাকে দেখাও; সে বিশ্বাস করবে। ওমায়ের ইবনে ওয়াহ্হাব সেটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সাফওয়ানের খোঁজে। পথেই সাফওয়ানের সাথে দেখা। ওমায়ের বললেন, সাফওয়ান! চলো নবীজির দরবারে। ছাফওয়ান ভয়ের সাথে বলল, না ভাই! আমার প্রাণের ভয় আছে। মুহাম্মদ আজ আমাকে ছাড়বে না। যে করেই তিনি আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বেন। ওমায়ের বললেন, তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সাফওয়ান বলল, তিনি যে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, এর কি কোনো প্রমাণ আছে তোমার কাছে? ওমায়ের বললেন, দেখো ভাই! তিনি কত দয়াবান। নিজের পাগড়িটা খুলে দিয়েছেন, যেন তুমি দেখে ক্ষমার কথা বিশ্বাস করো।

এবার সাফওয়ান সোজা রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলে উঠল, হুজুর! শুনেছি, আপনি নাকি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। বলল, আমি তো এখনও ইসলাম গ্রহণ করিনি। আপনি আমাকে দুমাস সময় দিন। আমি ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেব। হুজুর বললেন, তোমাকে দুমাসের জায়গায় চার মাস সময় দিলাম। তুমি চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নাও। আল্লাহ তা'আলা সাফওয়ানের অন্তরে রাসূলের মাধুর্যপূর্ণ আচরণের এমন প্রভাব ঢেলে দিলেন যে, সে চার মাস না যেতেই ইসলামের ছায়ায় এসে নিজেকে ধন্য করল।

বিষ প্রয়োগকারী মহিলার ক্ষমা

যখন খায়বার বিজয় হলো, তখন এক ইহুদি মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু পাকানো গোশত পাঠাল, যেগুলোতে বিষ মেশানো ছিল। বিষের মাত্রা এত বেশি ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটুখানি মুখে দিতেই পুরো মুখ ফুলে উঠল এবং বিষ কঠিনভাবে ক্রিয়া করল। সাহাবায়ে কেরাম ইহুদি মহিলাকে ধরে আনলেন। সে খাদ্যের সাথে বিষ মেশানোর কথা শিকার করল এবং নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও ক্ষমা করে দিলেন।

আবুজাহলের ছেলেকে ক্ষমা

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে আবুজাহলের ছেলে ইকরিমা ভীষণ চিন্তায় পড়ে যায়। সে এই ভেবে ভয় পায় যে, আমার বাবা ছিলেন ইসলামের ঘোর দুশমন। ইসলামের বিরুদ্ধে তিনি কী না করেছেন? জানি না, তার পাপের ফল আমাকে বইতে হয় কিনা। এসব ভেবে সে মক্কাতে গা ডাকা দেয়। তার স্ত্রী হযরত উম্মে হাকীম (রাযি.) রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন। স্ত্রী নিজের ক্ষমা পেয়ে দয়ার নবীর কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চান। তিনি তার জন্যেও ক্ষমা চান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মতো ইসলামের ঘোর দুশমনের ব্যাপারেও কঠোর হতে পারেননি। তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

শুনে স্ত্রী উম্মে হাকীম স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। খুঁজতে-খুঁজতে এক সময় নদীর পাড়ে চলে আসেন। এখানে এসেই জানতে পারলেন, স্বামী ইকরিমা একটু আগে নৌকা নিয়ে ওপারে রওনা হয়েছে। তিনিও একটা নৌকা ভাড়া করেন। মাঝিকে জোরে চালানোর তাগাদা দেন। মাঝিও জোরে

চালিয়ে ইকরিমার নৌকা ধরে ফেলেন। স্ত্রী তার কাছে গিয়ে ঘরে ফেরার অনুরোধ করেন। ইকরিমা অবাক হয়ে বলে, ঘরে ফিরে যাব? আজ মুহাম্মাদের হাত থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? কী না করেছি আমি তার বিরুদ্ধে? আজ আমার রক্ষা নেই। স্ত্রী তাকে রাসূলে ক্ষমার কথা শুনিয়ে দেন। এবার ইকরিমা আশ্বস্ত হন এবং রাসূলের দরবারের দিকে ছুটে চলেন। যখন ইকরিমা রাসূলের দরবারে পৌঁছলেন, তখন তাকে দেখে জনৈক সাহাবি দৌড়ে রাসূলের কাছে চলে যান। অবাক হয়ে বলেন, হুজুর! ইকরিমার মতো ইসলামের চরম শত্রু আজ আপনার দরবারে উপস্থিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়িত ছিলেন। সাহাবির কথা শুনে সাথে-সাথে উঠে বাইরে চলে এলেন এবং ইকরিমাকে দেখে বলে উঠলেন, তোমার আগমন মোবারক হোক হে আগন্তুক!

এ ছিল ইসলামের ঘোর শত্রু আবুজাহলের ছেলের সাথে রাসূলের আচরণ!

আবু সুফিয়ানের ক্ষমার ঘোষণা

আবু সুফিয়ানকে দেখুন। সে ছিল ইসলামের চরম শত্রুদের একজন। রাসূলের হত্যার পরামর্শে তার রয়েছে উপস্থিতি। সে খন্দক যুদ্ধের নেতা। ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য হেন চেষ্টাটুকু সে বাকি রাখেনি। কিন্তু যখন মক্কা বিজিত হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন। সাথে এ-ও ঘোষণা করে দেন–

مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِىْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ

আজ আবু সুফিয়ানের ঘরে যে প্রবেশ করবেম সে নিরাপদ।

হিন্দাকে ক্ষমা

আবু সুফিয়ানের স্ত্রীর নাম হিন্দা। সে বড়ই কঠিন হৃদয়ের মহিলা ছিল। চরম পাষণ্ড ছিল। খন্দক যুদ্ধে আপন গোলাম ওয়াহশিকে দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রাযি.)কে শহীদ করেছিল। হযরত হামযা যখন শহীদ হয়ে যান, তখন হিন্দা এসে তাঁর বুকে বসে একের পর এক বর্শা চালাতে থাকে। তারপর তাঁর বুক থেকে কলিজা বের করে ইচ্ছামতো দাঁত দিয়ে চিবাতে থাকে। এতেও তার জিদ মিটে না। সে হামযা (রাযি.)-এর কান কাটে, চোখ উপড়ে ফেলে

এগুলো কানে ও গলায় ঝুলিয়ে পৈশাচিক নৃত্যে নেচে উঠে, মনের স্বাদ মেটায়। কত বেশি হিংস্র হলে একটা লোক মারা যাওয়ার পরেও তার লাশকে নিয়ে এমন পাশবিক আচরণ করা যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন হামযা (রাযি.)-এর লাশ নিয়ে যাওয়া হয়, তখন অশ্রুতে ছলছল করে ওঠে তার দুচোখ। আপন চাচার এমন বিকৃত দেহ কে-ইবা সহ্য করতে পারে। দেহ এত বেশি ক্ষতবিক্ষত ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ফুপি হযরত সাফিয়্যা (রাযি.)কেও আপন ভাইয়ের লাশ দেখতে দেননি। এই বলে নিষেধ করে দিলেন যে, তার লাশ দেখলে তুমি নিজেকে সামলাতে পারবে না। তার মৃত্যুতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ব্যথিত হন। অনবরত অশ্রু ঝরতে থাকে চোখ দিয়ে। কারণ, হামযা (রাযি.)-এর সাথে তাঁর তিন দিক থেকে আত্মীয়তা ছিল। একে তো তিনি তাঁর আপন চাচা। দ্বিতীয়ত সমবয়সি বন্ধু। তৃতীয়ত তাঁর দুধভাইও। কারণ, এক বাদী তাদের উভয়কেই দুধ পান করায়। সেই হিন্দা যখন মক্কা বিজয়ের দিন এসে ক্ষমা চাইল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও ক্ষমা করে দিলেন।

কতটুকু উদারতা থাকলে তার মতো এমন জঘন্য মহিলার সাথে এমন সহনশীলতার পরিচয় দিতে পারেন।

ওয়াহ্‌শির ক্ষমা

এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো ওয়াহ্‌শির ব্যাপার, যে হযরত হামযা (রাযি.)কে শহীদ করেছিল। মক্কা বিজয়ের দিন সে-ই প্রথমে পালানোর সিদ্ধান্ত নিল। পরে নবীজির দয়ার কথা চিন্তা করে সে-ও ক্ষমার প্রবল এক আকুতি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো। তবে সামনের দিক থেকে না এসে পেছনের দিক থেকে এল এবং উচ্চৈঃস্বরে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেছনে কালেমার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকালেন। সাথে-সাথে চোখে পড়ল ওয়াহ্‌শির চেহারা, যে হত্যা করেছিল আপন চাচা হামযাকে। কিন্তু নবীজি কালেমা পড়া শুনে তাকেও ক্ষমা করে দিলেন। তবে চাচাহত্যার যে-ব্যথা তার অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল, তা অত্যন্ত বেশি ছিল। যার কারণে ওয়াহ্‌শিকে শুধু এতটুকু বললেন, ওয়াহ্‌শি! তুমি আমার সামনে কখনও এসো না। তোমার চেহারা দেখলে আমার চাচার কথা মনে পড়ে যায়। আমি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করি।

তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন এ ধরনের হাজারো ক্ষমা, হাজারো সহনশীলতার কাহিনিতে পূর্ণ।

ওছমান ইবনে তালহার ব্যাপারে সহনশীলতা

মক্কা বিজিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে ইবাদাতের জন্য কা'বার ভেতরে যান। কা'বার চাবি সব সময় ওছমান ইবনে তালহার কাছে থাকত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দরজার চাবি দিতে বললেন। সে চাবি বের করে দিল। বাইতুল্লাহর দরজা খুলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে তাতে প্রবেশ করলেন এবং নামায আদায় করে বেরিয়ে এলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিল বড়-বড় সাহাবিগণ। হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান, সায়্যিদুনা আলী ও আব্বাস (রাযি.) প্রমুখ। তাঁদের প্রত্যেকের আশা ছিল, কা'বার চাবি আমার হাতে থাকুক।

এমনিতেই মানুষ ক্ষমতা লাভ করলে সব কিছু নিজের করে নিতে চায়। আর পারলে শত্রুর মুখের গ্রাসটাও ছিনিয়ে নেয়। তো তারা চাচ্ছিলেন, যেন ওছমান থেকে চাবিটা নিয়ে তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দরজা বন্ধ করে বাইরে এলেন। ওছমান ইবনে তালহা সামনেই দাঁড়ানো ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বললেন, ওছমান! মনে পড়ে আমার হিজরতের দিনের কথা? সেদিনকার কথা, যেদিন শেষবারের মতো একবার কা'বায় প্রবেশ করে প্রভুর ইবাদাত করতে চেয়েছিলাম। তোমার কাছে চাবি ছিল। কত অনুরোধ করেছি দরজাটা খুলে দিতে। তুমি দরজা খোলনি। আমাকে ফিরিয়ে দিলে। মনে পড়ে কি সেদিন আমি তোমাকে কী বলেছিলাম? বলেছিলাম, একদিন দেখবে এ চাবি আমার হাতে। সেদিন আমি তোমার জায়গায় আর তুমি থাকবে আমার জায়গায়। দেখো, আমার আল্লাহ আমার কথাকে পরিপূর্ণ সত্য করে দেখিয়েছেন। আজ এ চাবি আমার হাতে যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তা দিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার মতো করব না। নাও। এই চাবি চিরদিন তোমার বংশের মাঝেই থাকবে। আল্লাহু আকবার!

যে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করল– শুধু একটিবারের জন্য নবীজিকে কা'বায় ঢুকতে দিল না, আজ নিজহাতে তিনি কা'বার চাবি তাকে দিয়ে দিলেন।

মক্কাজয়ের দিন সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা

মক্কাজয়ের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাজরে আসওয়াদের সামনে গেলেন, তখন মক্কার বড়-বড় সর্দাররা তাঁর সাথে উপস্থিত। আজ তাদের মাথা ঝুঁকানো। তাদের মনে পড়ছে, তারা কেমন রূঢ় আচরণ করেছিল বেলালের সাথে! কেমন পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছিল যোবায়েরের সাথে। নির্মম আচরণ করেছিল সুমাইয়ার সাথে। খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কত কষ্টই-না তারা দিয়েছিল। আজ তিনি মক্কার কর্ণধার। তাঁর এক হুকুমেই যে-কারও মাথা মাটিতে পড়ে যেতে বাধ্য। আজ লজ্জায় তাদের মাথা উঠানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন, আমার থেকে তোমরা কী আশা করছ? সবাই সমস্বরে উত্তর দিল, আপনি দয়াবান, আপনি আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন এমন আশা-ই আমরা রাখি। এখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলে বলতে পারতেন, কীসের ভিত্তিতে তোমরা এমন আশা করছ? ভুলে গেছ কি তেরো বছরের কথা? আমার রক্ত পানি করার কথা? না নবীজি এগুলো কিছুই বলেননি। ধমক দেননি, কর্কষ ভাষায় কথা বলেননি। কী বললেন? বললেন, আজ তোমাদের সাথে আমি তেমন আচরণই করব, যেমন আচরণ আমার ভাই ইউসুফ তার ভাইদের সাথে করেছিলেন।

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হবে না।[১০৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কুরাইশ সর্দারকে ক্ষমা করে দিলেন।

পশুত্ব ছাড়ুন, মানবতা বাস্তবায়িত করুন

আজ আমরা ছোট-ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় মেতে উঠি। স্বামী সাধারণ একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে তালাকের মতো কঠিন জিনিসের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। স্ত্রী সাধারণ টুকিটাকি বিষয় নিয়ে বেঁকে বসে। সংসারের শান্তি শেষ করে দেয়। এতসব করার পরও আমরা মনে করি, আমরা অনেক দীনদার। কখনও না। এটা দীনদারি হতে পারে না। একবার তাকান নবী

---

১০৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯২

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক জীবনের প্রতি। কত সৌহার্দ, সম্প্রীতি, ক্ষমা ও আত্মসংবরণে পূর্ণ। আজ খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় মেতে ওঠা সাধারণ একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আরে আল্লাহর বান্দা! ফেরেশতা কোথায় পাবে? মানুষের সাথে জীবন যাপন করতে হবে। একটা ভুলের কারণে কারও সারা জীবনের ভালোবাসা ভুলে গেলে চলবে না। স্বামী একটা অপরাধ করলে স্ত্রী এমনভাব ধরে, যেন জীবনে সে তাকে একটুও ভালোবাসেনি। আর স্ত্রীর একটু এদিক-সেদিক হলে স্বামীর গরমে থাকা যায় না। ভাবখানা এমন, যেন একে আখলাক বলে না। একে তারবিয়ত বলা যায় না। এটা মানবতা নয়, পশুত্ব। আমাদেরকে নিজেদের আখলাক সংশোধন করতে হবে। আমরা পরস্পর সুন্দর আচরণ করব, যেন আল্লাহ কেয়ামতের দিন আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেন। হাদীছ শরীফে এসেছে, যে-ব্যক্তি মানুষকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ কেয়ামতের দিন খুব দ্রুত তার অপরাধ মার্জনা করে দেবেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তার কিতাবে একটি ঘটনা লিখেছেন, একবার জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী থেকে অনেক বড় একটা অপরাধ হয়ে যায়। অপরাধটা এতো বেশি গুরুতর ছিল যে, লোকটা চাইলে তাকে তালাক দিতে বা অন্য কোনো বড় ধরনের শাস্তি দিতে পারত। কিন্তু সে দেখল, স্ত্রী খুব লজ্জিত। সে অপরাধ করে অনুশোচনায় ভুগছে। স্বামী স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে বললেন, আরে আল্লাহর বান্দি! ঠিক আছে; তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।

কিছু দিন পরে লোকটা মারা গেল। তার এক পরিচিত লোক মৃত্যুর কিছু দিন পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, ভাই! আল্লাহ তোমার সাথে কেমন আচরণ করলেন? লোকটা উত্তর দিল, আমাকে আল্লাহর কাছে পেশ করা হলে আল্লাহ আমাকে বললেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার স্ত্রীকে একবার অপরাধ করা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিয়েছে শুধু এজন্য যে, সে আমার বান্দী। তোমার সেই ক্ষমায় আমি সন্তুষ্ট হয়ে আজ তোমাকে আমি নিজ বান্দা হিসাবে ক্ষমা করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ!

মতবিরোধকে শত্রুতার হাতিয়ার বানানো যাবে না

আউলিয়া কেরামের আখলাক ছিল, তারা অপর ভাইকে ক্ষমা করে দিতেন। আমাদেরকে তাদের থেকে শিক্ষা নিতে হবে। অপর ভাইকে ক্ষমা

করার উদার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। সাধারণ দু-একটা কথার রেশ ধরে ঝগড়ায় মাতা যাবে না। আশ্চর্য না হয়ে পারি না। অনেক সময় দেখা যায়, একই মসজিদের দুই মুসল্লী। একজন এখানে নামায পড়ছে, আরেকজন সেখানে। উভয়ের মুখ থেকে আল্লাহর নাম বেরোচ্ছে। কিন্তু উভয়ে পারস্পরিক মনকষাকষিতে লিপ্ত। একজন অন্যজনকে ক্ষমা করার বিষয় যেন ভুলেই গেছে।

Toran a big show one should have a big hart.

যদি ভালোভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, তবে অবশ্যই প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে।

কাজেই আমাদের উদার মনের অধিকারী হতে হবে। যদি আপনি চিন্তা করেন, মন্দের জবাব যদি ভালো দিয়ে দিই, তবে আমার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে, তা হলে ঠিক হবে না। না ভাই! যারা ধৈর্য ধারন করে, আল্লাহর সাহায্য সব সময় তাদের সঙ্গী হয়। আর আপনি যদি আল্লাহর রহমত আপন পাল্লায় তুলতে পারেন, তবে আপনার পাল্লা সারা দুনিয়া থেকে ভারি হয়ে যাবে। কাজেই ক্ষমার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কারণ, ক্ষমা আল্লাহর গুণ। যে যত ক্ষমা করবে, সে আল্লাহর রহমতের তত বেশি অধিকারী হবে। তবে হ্যাঁ, মানুষের অনিষ্টতা থেকে বাঁচতে হলে কুরআন শরীফের কিছু সূরা ও বিশেষ কিছু আয়াত প্রতিদিন তেলাওয়াত করবেন। আল্লাহ আপনাদের রক্ষা করবেন।

দশ জিনিস দশ জিনিসকে প্রতিরোধ করে

আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ুতী (রহ.) লিখেছেন–

عَشَرَةُ أَشْيَاءَ تَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ

দশ জিনিস দশ জিনিসকে বাধা দেয়।

খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যদি এগুলোর ওপর আমল করতে পারেন, তবে আপনাদের কবিরাজের শরণাপন্ন হতে হবে না।

(১) اَلْفَاتِحَةُ تَمْنَعُ غَضَبَ الرَّبِّ

'সূরা ফাতেহা আল্লাহর ক্রোধ দমন করে।'

অর্থাৎ– বান্দা যদি বেশি-বেশি সূরা ফাতেহা পাঠ করে, তবে সে আল্লাহর গোস্বা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

(٢) يٰس تَمْنَعُ عَطَشَ الْقِيَامَةِ

'সূরা ইয়াসীন কেয়ামতের দিনের পিপাসা দমন করে।'

অর্থাৎ– যদি কেউ দৈনিক সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তবে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিনের পিপাসা থেকে রক্ষা করবেন।

(٣) اَلدُّخَانُ تَمْنَعُ مِنْ أَهْوَالِ الْقِيَامَةِ

'সূরা দুখান কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি দেবে।'

যদি আমরা উক্ত সূরাটি বেশি-বেশি তেলাওয়াত করি, তাহলে কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে বেঁচে যাব।

(٤) اَلْوَاقِعَةُ تَمْنَعُ الْفَقْرَ وَالْفَاقَةَ

সূরা ওয়াকেয়াহ দরিদ্রতা ও অনাহার প্রতিহত করে।

যে-ব্যক্তি ঋণী থাকে অথবা অভাব-অনটন যার পিছু ছাড়ে না, সে যেন প্রতিনিয়ত সূরা ওয়াকেয়াহ তেলাওয়াত করে। আল্লাহ তা'আলা তার দরিদ্রতা ও অনাহার দূর করে দেবেন।

(٥) اَلْمُلْكُ تَمْنَعُ عَذَابَ الْقَبْرِ

'সূরা মুল্‌ক কবরের আযাবকে বাধা দেবে।'

এই সূরা প্রতিনিয়ত পাঠ করার তাগিদ এসেছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শোওয়ার আগে সূরা মুল্‌ক তেলাওয়াত করতেন। বরং নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইরশাদ করেন, কুরআনে ৩০ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা রয়েছে। আমার ইচ্ছা, তা যেন আমার উম্মতের প্রত্যেকের অন্তরে থাকে। তাহলে ত্রিশ আয়াত মুখস্থ করা কি কঠিন কাজ? এ তো একজন সাধারণ মানুষও মুখস্থ করতে পারে। যে খুব মেধাবী নয়, সেও প্রতিদিন একটি করে আয়াত মুখস্থ করতে পারে, যা এক মাসেই সম্ভব।

(٦) اَلْكَوْثَرُ تَمْنَعُ خُصُوْمَ الْخُصَمَاءِ

'সূরা কাওছার দুশমনের দুশমনি হতে রক্ষা করে।'

অর্থাৎ– এই সূরার তেলাওয়াত দুশমনের দুশমানি হতে রক্ষা করবে। আপনি সূরা কাওছার তেলাওয়াত করুন। আল্লাহ আপনাকে দুশমনের রক্তচক্ষু হতে রক্ষা করবেন।

(৮) اَلْكٰفِرُوْنَ تَمْنَعُ الْكُفْرَ عِنْدَ النَّزْعِ

'সূরা কাফেরূন অন্তিম সময়ে কুফরি হতে রক্ষা করবে।'

আল্লাহ আকবার! এই সূরাটি তিলাওয়াতকারী মৃত্যুর সময়ে কুফরি হতে বেঁচে যাবে।

(৮) اَلْاِخْلَاصُ تَمْنَعُ النِّفَاقَ

'সূরা ইখলাছ কপটতা হতে রক্ষা করবে।'

যদি কেউ মুনাফিকি হতে রক্ষা পেতে চায়, তাহলে সে যেন বেশি-বেশি সূরা ইখলাছ তেলাওয়াত করে। আল্লাহ তাকে কপটতা হতে রক্ষা করবেন।

(৯) اَلْفَلَقُ تَمْنَعُ حَسَدَ الْحَاسِدِيْنَ

'সূরা ফালাক হিংসুকের হিংসা হতে রক্ষা করবে।'

(১০) وَالنَّاسُ تَمْنَعُ الْوَسَاوِسَ

'এবং সূরা নাস কুমন্ত্রণা হতে রক্ষাকারী।'

যাকে প্রবৃত্তি, শয়তান ও জৈবিক কুমন্ত্রণা সংকুচিত করে রাখে, সে যদি সূরা নাস তেলাওয়াত করে, তাহলে আল্লাহ তাকে কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা করবেন।

তো ভাইয়েরা! আল্লাহর বান্দাদের সাথে বিবাদে জড়াব কেন? কুরআনে চিকিৎসা রয়েছে। তার সূরাসমূহ তেলাওয়াত করে নাও; তাহলে আল্লাহ নিজেই বিতর্ককারীদের বিতর্ক হতে, হিংসুকের হিংসা থেকে এবং প্রত্যেক বিরোধীদের বিরোধিতা হতে তোমাকে রক্ষা করবেন। তবে আমরা অন্তরে এ ইচ্ছাই পোষণ করব যে, যে আমার সাথে কোনো খারাপ আচরণ করবে, আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করব।

হযরত গঞ্জেবখ্শ লাহোরি (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত গঞ্জেবখ্শ লাহোরির প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা আছে। তিনি নৌকায় ভ্রমণ করছিলেন। লোকেরা তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করল। যখন লোকেরা তাঁর সাথে খুব বেশি দুর্ব্যবহার করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাঁর অন্তরে ইলহাম করলেন, হে আমার প্রিয়! তারা আপনার সাথে এরকম দুর্ব্যবহার করছে আর আপনি ধৈর্য ধারণ করে বসে আছেন। আপনি যদি চান, আমি নৌকা উল্টিয়ে দেব, যাতে এরা সকলে ডুবে মরে যায়। যখনই তাঁর অন্তরে এ ধরনের

ইলহাম হলো, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ হাত উত্তোলন করলেন এবং দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! যদি আপনি তাদের নৌকা উল্টে দিতে চান, তাহলে তাদের অন্তরের নৌকা উল্টে দিন। হযরতের দু'আ কবুল হয়ে গেল এবং উক্ত নৌকায় যত পুরুষ-মহিলা ছিল, মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে ওলীর মর্যাদা দিয়ে দিলেন। আমাদেরকে সহনক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

হযরত আবুল হাসান খিরকানির দৃষ্টান্তমূলক ধৈর্য

সেলসেলায়ে আলিয়া নকশবন্দি তরিকার একজন বুযর্গ ছিলেন হযরত আবুল হাসান খিরকানি (রহ.)। তাঁর এক মুরিদ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাড়ি এল এবং দরজায় কারাঘাত করল। ভেতর হতে জবাব এল, তিনি ঘরে নেই। সে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তিনি কোথায় গেছেন? তখন কয়েকটি কটুবাক্য তাকে শুনতে হলো এবং বলল, আমার জানা নেই তিনি কোথায় আছেন। এত কঠোরতার সাথে উত্তর এল যে, সে চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং ভাবতে লাগল, হযরত এত বড় বুযুর্গ; অথচ তাঁর ঘরে এমন মহিলা!

তারপর সে ওই বনের দিকে যেতে লাগল, যেখানে হযরত গিয়েছেন। গিয়ে দেখলেন, হযরত একটা বাঘের পিঠে চড়ে আসছেন। সে এ দৃশ্য দেখে খুবই চিন্তিত হলো। হযরতের সাক্ষাতে মিলিত হলো এবং জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনার মর্যাদা এত বড় যে, আপনি বাঘের পিঠে আরোহণ করেছেন আর ঘরে এমন ব্যাপার ঘটেছে। তখন হযরত বললেন, আমি আমার স্ত্রীর রুক্ষ আচরণ সহ্য করার কারণে তার বিনিময়ে বাঘ আমার বোঝা বহন করছে এবং আমাকে তার ওপর আরোহণের অনুমতি দিয়েছে। ধৈর্য কখনও বিফলে যায় না।

হযরত মির্জা মাযহার জানেজানাঁ কীভাবে ওলী হলেন?

হযরত মির্জা মাযহার জানেজানাঁও আমাদের নকশবন্দি তরিকার একজন বুযুর্গ ছিলেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁর ব্যাপারে লিখেছেন, আল্লাহ তাঁর ওপর জামালের তাজাল্লি ঢেলেছেন। নিজেও খুব সুন্দর ছিলেন এবং তার সঠিক বিষয়গুলোই তাঁর ভালো লাগত। অত্যন্ত নাজুক স্বভাবের ছিলেন। এমন নাজুক ছিলেন যে, একদা তৎকালীন বাদশাহ তাঁর সাক্ষাতে এলেন। অল্প সময় হযরতের কাছে বসলেন। এমতাবস্থায় তাঁর পিপাসা লাগল। কোনো খাদেম কাছে না থাকায় বাদশাহ নিজেই অনুমতি চাইলেন যে, হযর! আমি আপনার কলসি হতে পানি পান করতে পারব কি? হযরত বললেন, অবশ্যই পান করুন।

বাদশাহ দেখলেন, কলসির ওপর গ্লাস রাখা। তিনি গ্লাসটা উঠালেন এবং পানি পান করলেন। তারপর গ্লাসটা রাখতে একটু বাঁকা করে রাখলেন। তারপর এসে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গেলেন। সর্বশেষ বাদশাহ বলতে লাগলেন, হযরত! আপনার কোনো খাদেম নেই? যদি অনুমতি পাই, তাহলে আপনার খেদমতে একজন খাদেম পাঠিয়ে দেব। হযরত উত্তরে বললেন, আপনার এই আবেদনকে আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আপনার নিজের অবস্থা তো এমন যে, পানি পান করেছেন আর তারপর গ্লাসটা বাঁকা করে রেখেছেন। তখন থেকেই আমার মাতা ব্যথা শুরু হয়েছে। আর যদি আপনার খাদেম আসে, তাহলে আমাকে কত কঠিন বিপদে ফেলে কে বলবে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর সৌন্দর্যের এমন তাজাল্লি দিয়েছেন, যে ছোট কাল থেকেই কোনো কুশ্রী লোকের কোলে যেতেন না। অথচ তখনও তিনি দুধের শিশু। তার অনেক আশ্চর্যমূলক ঘটনা আছে। তাঁর মর্যাদা ও স্তর কী ছিল? হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন কাশ্‌ফ দান করেছেন যে, আমি পুরা দুনিয়াকে এমন দেখি, যেমন কেউ হাতের তালুর ওপর রাখা গমের দানা দেখে। তারপর বলেন, পৃথিবীতে তৎকালীন সময়ে মির্জা মাযহার (রহ.)-এর মতো অন্য কোনো বুযুর্গ ছিলেন না। তাঁর ব্যাপারে শাহ ওয়ালী উল্লাহর উক্ত সত্যায়ন আছে।

তাঁর উক্ত মর্যাদা কীভাবে অর্জন সম্ভব হয়েছে? তা এভাবে যে, একদা তাঁর ইলহাম হলো, যদি তুমি বেলায়েতের উঁচু স্তরে পৌঁছতে চাও, তাহলে অমুক মেয়েকে বিবাহ করো। তার স্বভাব অনেক গরম ও রুক্ষ। হযরত উক্ত মেয়েকে বিবাহ করলেন। সে বাস্তবেই অনেক রাগী ছিল। হযরত তার রাগের ওপর ধৈর্য ধারণ করতেন। তারপর তার রাগের কারণে হযরতের বেলায়েতের উঁচু স্তরে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। হযরত তার কঠোরতা ও রুক্ষতা সহ্য করতেন ও তার জন্য দু'আ করতেন। আল্লাহওয়ালাদের দু'আ বিফলে যায় না। তাঁর দু'আর ফলাফল দেখুন। হযরত জীবদ্দশায় তো তাঁর স্ত্রী এমন স্বভাবেরই ছিলেন। হযরতের মৃত্যুর পর তাঁরই খলিফা হযরত ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) হযরতের স্ত্রীর জন্য মাদ্‌রাসার নিকটে একটি ঘর খরিদ করে দিলেন। হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) কামেল মানুষ ছিলেন। মুহাদ্দিছ ছিলেন, ফকীহ এবং সূফীও ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন যে, তিনি তাফসীরে মাযহারী লিখেছেন। তাঁর এত মর্যাদা ছিল। হযরত মির্যা মাযহার (রহ.) বলেছেন, কেয়ামতের

দিন যদি আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কী নিয়ে এসেছ? তখন আমি কাজী ছানাউল্লাহকে পেশ করব।

তারপর মির্জা সাহেবের স্ত্রী পানিপথ থাকতে শুরু করলেন আর হযরতের দু'আর প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। তাঁর স্ত্রীর মন ভালো কাজের দিকে ঝুঁকতে শুরু করল। তিনি একাই থাকতেন। তিনি বাচ্চাদের কুরআনের তা'লীম দিতে শুরু করলেন। বাচ্চাদের দ্বারা তার ফয়েজ এমন বিস্তার লাভ করেছে যে, আজ অবধি পানিপথের কেরাতের সুর প্রসিদ্ধ। তা একমাত্র ওই মহিলার পড়ানো ছাত্র-ছাত্রীদেরই। যদি আপনিও চিন্তা করেন, তাহলে মহিলাদের মধ্যে সেই পানিপথি সুরই বেঁজে উঠবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুরকে এমন কবুল করে নিয়েছেন যে, বিশ্বব্যাপী উক্ত সুরে বহু কারী কুরআনের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন এবং তার নেকি উক্ত মহিলাও লাভ করছেন।

সাধারণ কাজের বিনিময়ে ক্ষমা

দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বপ্রথম শিক্ষক যিনি ছিলেন, তাঁর নাম মোল্লা মাহমুদ এবং যিনি প্রথম ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁর নাম মাহমুদ হাসান, যিনি পরবর্তী কালে 'শাইখুল হিন্দ' নামে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ছাত্র শিক্ষক উভয়েই মাহমুদ।

মোল্লা মাহমুদের মৃত্যু হয়ে গেল। কেউ তাকে স্বপ্নে দেখল। জিজ্ঞাসা করল, আপনার শেষ পরিণতি কী হলো? তিনি উত্তরে বললেন, এমন এক আমলের কারণে ক্ষমা হয়েছে, যা আমার স্মরণই নেই। জিজ্ঞাসা করল, সেটি কোন আমল ছিল? তিনি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, একদা আমার স্ত্রী রুটি বানাবার সময় আটায় লবণ দিতে ভুলে গেছে। আমি খেতে বসে তা অনুভব করলাম। কিন্তু আমি এ-ব্যাপারে কথা বলতে অনুচিত মনে করলাম। আমি সহ্য করে নিলাম এবং মনে করলাম, সেও তো মানুষ। ভুল হতেই পারে। আমার উক্ত সহনশীলতাকে আল্লাহ কবুল করে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার!

এক বুযুর্গের সহনশীলতা

এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁকে তার স্ত্রী অনেক চিন্তিত করে দিলেন এবং বললেন, আমাকে পৃথক করে দাও। এক নিকটাত্মীয় বিষয়টি বুঝতে পেরে এসে বলল, হযরত! শুনেছি, আপনার স্ত্রী আপনার কাছে তালাক চাচ্ছে? হযরত বললেন, হ্যাঁ; আমি কীভাবে গীবত করবঃ শত হলেও সে আমার স্ত্রী। লোকটি নিশ্চুপ হয়ে গেল। স্ত্রী অতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে বুযুর্গ পরে তাকে

তালাক দিয়ে দিলেন। তারপর উক্ত আত্মীয় পুনরায় তার কাছে এল এবং বলতে লাগল, আপনি তো তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এখন বিস্তারিত বলুন। তিনি বলতে লাগলেন, যখন সে আমার স্ত্রী ছিল, তখন তার গীবত আমার সহ্য হচ্ছিল না। এখন তো সে অপরিচিতা; এখন কীভাবে তার গীবত করব? সহনশীলতার নমুনা দেখুন!

এক মহিলার সহনশীলতা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের বোন রমলা বিনতে জুবাইর (রাযি.) বিবাহ হয়ে গেল। কোনো এক সময় স্বামী রাগান্বিত হলো। তখন সে অবিরাম গতিতে কথা বলতে লাগল আর স্ত্রী চুপ করে বসে শুনতে থাকল। আবশেষে সে তার যতটুকু জিদ দেখানোর তা দেখাল। কিছুক্ষণ পর সে নিজেই ক্লান্ত হয়ে গেল এবং নিশ্চুপ হয়ে গেল এবং স্বাভাবিকতায় চলে এল। তখন স্ত্রী বুঝতে পারল, সে এখন স্বাভাবিক কথা বলছে। এমনকি সে স্বামীর প্রতি তাকিয়ে মুচকি হেসে দিল। স্বামী তার হাসি দেখে নিজেও হেসে উঠল। স্ত্রী স্বামীকে হাসতে দেখে বলতে লাগল, আমি জানি তোমার চিকিৎসা হলো মুচকি একটা হাসির দৃষ্টি। আমি তোমার রাগ সংবরণ করেছি। আর আমার একটি মুচকি হাসি তোমার উপকারে এসেছে। এমনকি ঝগড়ার ইতি হয়ে গেল। মহিলাদের মধ্যেও এমন ধৈর্য ছিল। এমন ধৈর্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নচেৎ মানুষ কখনও দুনিয়াতে সফলতার জীবন পেত না।

অভিযোগ আর অভিযোগ

যদি মানুষের মাঝে সহ্যক্ষমতা না থাকে, তাহলে তার অভিযোগের অন্ত থাকে না।

স্বামী হলে স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ।

স্ত্রী হলে স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ।

পিতার ছেলের ব্যাপারে অভিযোগ।

ছেলের মাতাপিতার ব্যাপারে অভিযোগ।

এক প্রতিবেশীর অন্য প্রতিবেশীর ব্যাপারে অভিযোগ।

কিছু দিন পূর্বে একজনের সাথে টেলিফোনে কিছু কথা হলো। তাকে আল্লাহ তা'আলা বিদেশ যাওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। পেট যখন ভরা হয়, তখন মনমানসিকতাও এমনই হয়। তার কিছু দিন পাকিস্তান অবস্থানের সুযোগ হয়। সে বলল, আমি তো এখানে (পাকিস্তানে) অনেক পেরেশানিতে আছি– অমুক পাকিস্তানি এমন, অমুক পাকিস্তানি ওরকম। আমি তার কথা

শুনেছি ঠিক; কিন্তু আমার এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার মধ্যে কতটুকু ধৈর্য রয়েছে। আল্লাহ আমাকে পেট ভরে খাওয়ার তাওফীক দিয়েছেন, তাই বলে কি সব পাকিস্তানির আপনার মতো পেট ভরে খেতে হবে? বিষয়টা এমন নয়। একজন তাকে প্রশ্ন করল, কোন বিষয়টি আপনার অসহ্য লাগে? কিসে আপনার বাধে? আল্লাহ যদি আপনাকে এখানকার রিযিক দেন, এখানেই থাকতে দেন, তাহলে আপনার কি হতো চিন্তা করুন। আপনার তো এখানেই জন্ম। এখানেই বেড়ে ওঠা।

তো দেখুন, কথা বলার ধরন কী। বলে, পাকিস্তানিরাও এমনই হয়। অথচ তার শিক্ষা পাকিস্তানিদের কাছ থেকে। পাকিস্তানের হাতেই বাইআত হয়ে ইসলাহের চেষ্টা করছে আর বলছে তাদের বিরুদ্ধে। যার তার সাথেই ঝগড়া করে। এটা পছন্দ নয়, ওটা ভালো লাগে না। যদি কাউকে আপনার ভালো না লাগে, তবে আল্লাহকে কীভাবে ভালো লাগে? সবাই খারাপ, একমাত্র আপনিই ভালো?

বান্দার তো উচিত নিজেকে একটু হলেও চেনা। আহলুল্লাহর পরিচয় তো এই যে, তাদের ব্যাপারে কেউ অভিযোগ করে না। আল্লাহর কি মর্জি আল্লাহ তাদের এমন স্বভাব দান করেছেন। এমন উদার চিত্তের অধিকারী করেছেন যে, তাদের মুখে কখনও কোনো বিরোধী কিংবা কোনো দুশমন বা হিংসুকের আলোচনা বেরই হয় না। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ঘরের পারিবারিক জীবনে এই ধৈর্যক্ষমতা না থাকায় যত সব সমস্যা, যার কারণে আজ বিশেষভাবে এর নামকরণ করা হয়েছে 'তরবিয়াতি ইজতিমা'। প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই এমনটা করা হয়েছে। আমাদের মনে-মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। আমরা অবশ্যই সহিষ্ণুতার অধিকারী হব। কথায়-কথায় বাহাদুরি আর বড়ত্ব দেখানো পরিহার করব। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত তাওবা খুব পছন্দ করেন। স্মরণ রাখা চাই, তাওবা আল্লাহর রহমত ডেকে আনে। ধৈর্য ধারণকারীর কাজের জিম্মাদার আল্লাহ। তিনি তার কর্মবিধায়ক। তার সাহায্যদাতা। তাই আমরা এই বিশেষ গুণের মাধ্যমে অবশ্যই আল্লাহর মদদের ভাগীদার হব।

খাজানাসমূহের চাবি

জান্নাতের চাবি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

নামাযের চাবি পবিত্রতা; তথা উজু।

উজু ছাড়া নামায হয় না। এটি হলেই তবে নামায বৈধ হয়।

নেকির চাবি সত্য বলা।

ইল্‌মের চাবি সুন্দর জিজ্ঞাসা।

অর্থাৎ– বিনয়সুলভ ভঙ্গিতে জানতে চাওয়া।

বেলায়েতের চাবি অধিক জিকির।

সফলতার চাবি তাক্‌ওয়া।

তাওফীকের চাবি গোনাহ্‌ থেকে বাঁচা।

যে যত গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকবে, আল্লাহ্‌ তাকে তত বেশি নতুন-নতুন আমলের তাওফীক দান করবেন।

নেয়ামতের চাবি শুকরিয়া।

আপনি যত বেশি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করবেন, আল্লাহ্‌র নেয়ামত তত বেশি আপনার ওপর আসতে থাকবে।

মদদে ইলাহীর চাবি ধৈর্য।

যখন বান্দা ধৈর্য ধারণ করে, তখন আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য করেন।

আজ একটি সবক অবশ্যই স্মরণ রাখবেন। আপনি চলনে-বলনে, ওঠা-বসায় যদি কারও কোনো দুর্ব্যবহারের শিকার হন, মনে আঘাত পান, তাহলে আপনার কাজ আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন। আপনি সহিষ্ণুতার পরিচয় দেবেন। আপনার মদদদাতা হবেন আল্লাহ্‌।

একটি উপদেশপূর্ণ ঘটনা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন। আছেন আবুবকর (রাযি.)। এমন সময় একজন লোক এল, যার কোনো একটি বিষয়ে আবুবকর (রাযি.)-এর সাথে বিরোধ ছিল। সে এসে খুব কর্কষ ভাষায় আবুবকর (রাযি.)কে কিছু বলতে লাগল। তিনি চুপচাপ তার কথা শুনছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শুনছেন। আবুবকর (রাযি.) যখন দেখলেন, কথা বেশি হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি তার প্রতিউত্তর করলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে সাফাই গাইলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। আবুবকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?

রাসূল বললেন, আবুবকর! এ লোকটি যখন তোমার মন্দ বলছিল, আল্লাহ্‌ তার মন্দের জবাব দেওয়ার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আপনি উত্তর দেওয়া শুরু করলেন, তখন ওই ফেরেশতা চলে গেল। তাই আমিও চলে যাচ্ছি।

তো ভাইয়েরা! আমাদের কত সহজ পথ এটা যে, আমরা ধৈর্য ধারণ করব আর আল্লাহর রহমতের ভাগীদার হব। কাজেই ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহর রহমত আসবেই। অবশ্যই আসবে।

ধৈর্যের একটি বড় ফায়েদা

ধৈর্যের একটি বড় ফায়দা হলো, ধৈর্যধারণকারী সবসময় সুখী থাকে। পক্ষান্তরে অধৈর্যশীল বিপাকে ও পেরেশানিতে থাকে।

স্ত্রী হলে স্বামীর প্রতি রাগ। কখনও ছেলের প্রতি, কখনও শাশুড়ি, কখনও ননদ, কখনও সমবয়সীদের প্রতি। এমনকি নিজের বোনের প্রতিও অভিমান করে থাকে।

আর পুরুষ হলে নিজের অধীনদের প্রতি।

কখনও-কখনও দোস্ত-আহবাবদের সাথে।

আবার কখনও স্ত্রীর প্রতি গোস্বা করে থাকবেই।

মোটকথা, সবসময় কোনো-না-কোনো টেনশন সে ফিল করবেই। পক্ষান্তরে ধৈর্যশীলতার কত বড় ফায়দা যে, সে এই ফেতনার দুনিয়াতে আনন্দময় জীবন যাপন করবে।

একটি অমূল্য রতন

স্মরণ রাখবেন, কখনও মানুষকে কষ্ট দেবে না। মানুষের কাছ থেকে আনলিমিটেড চাহিদার কারণে দুঃখ পেতে হয়। তাই আপনি অবশ্যই আশা করলে আল্লাহর কাছেই করবেন, যিনি আশাকে পূর্ণাঙ্গরূপে দান করেন। বান্দার কাছে আশা করবেন না। আনন্দময় জীবন যাপনের উত্তম পদ্ধতি হলো, নিজের দিলকে বড় করতে হবে।

এগারোটি জিনিসের বাস্তবায়ন এগারোটি জিনিসের মাধ্যমে

এজন্য এগারোটি জিনিসের বাবস্তবায়ন এগারোটি জিনিসের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

১. ইনসাফের মাধ্যমে রাজত্ব।

২. বেঁচে থাকার মাধ্যমে সুস্থতা।

৩. বদান্যতার মাধ্যমে সম্পদ।

৪. সুন্দর বলনে সম্মান।

৫. নেক সন্তানের মাধ্যমে শান্তি।

৬. অন্তর পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে মহব্বত।

৭. সত্যবাদিতায় কামিয়াবি।

৮. ঘৃণার মাধ্যমে দুশমনি।

৯. অপচয়ের মাধ্যমে ঋণগ্রস্ততা।

১০. সত্যবাদিতার মাধ্যমে আস্থা।

১১. সহনশীলতার মাধ্যমে সুখ।

অর্থাৎ– ধৈর্যের কারণে মানুষ প্রশান্তির সাথে জীবন অতিবাহিত করে। প্রচণ্ড পেরেশানির মধ্যেও তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয় না। হতাশার ছাপ পড়ে না। দেখলে মনে হয় জীবন একটা পাহাড়। কাজেই আমাদের অবশ্যই ধৈর্যধারণের উত্তম গুণ অর্জন করতে হবে, যেন আমাদের জীবন আনন্দময় হয়।

এই রইল আপনাদের সামনে এগারোটি মুক্তার একটি তালিকা।

অজ্ঞ লোকের ক্ষমা

আমাদের পাশের গ্রামের ঘটনা। এক যুবকের একটি দুঃসম্পর্কের সুদর্শনা বোন ছিল। যুবক ছিল গন্ড মূর্খ। দেখতে সাধারণ পাবলিকের মতো। জ্ঞানে-বুদ্ধিতে ছিল গ্রাম্য। লোকটি তার সেই বোনকে বিয়ে করতে চাইল। তার মা-বাবাও এ-ব্যাপারে সম্মতি জানাল এবং প্রস্তাবও পাঠাল। মেয়েবাড়ির লোকেরা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে সে প্রথমে রাজি হলো। বিয়েও হয়ে গেল এবং অন্য সবকিছুও যথাযথভাবে সম্পন্ন হলো। কিন্তু মেয়ে যখন ছেলের সাথে থাকতে লাগল, তখন সে জানতে পারল, লোকটা আস্ত একটা মূর্খ। সে তো পড়ল মহা টেনশনে। না আছে বুদ্ধি, না আছে শিক্ষা, না আছে চেহারা। এ লোকটাকে নিয়ে জীবন সংসার কীভাবে কাটাবে। এসব ভাবতে-ভাবতে এক সময় লোকটার প্রতি মেয়ের ঘৃণা জন্মাল। কিন্তু ব্যাপারটা সে গোপন রাখল।

বিয়ের চার দিন পর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মেয়ে বাপের বাড়ি এল। তার অন্তরে ছিল, একবার বাপের বাড়িতে গেলে দ্বিতীয়বার আর এ-বাড়িতে পা দেবে না। তবে মা-বাবার সামনে এ-ব্যাপারে মুখ খুলতে সাহস করল না। কারণ, একে তো ছেলেরা তাদের আত্মীয়। দ্বিতীয়ত প্রথমে সেও তো রাজী ছিল। দু-চার দিন পর তার স্বামী এল তাকে নিতে। মা-বাবা তাকে প্রস্তুত হতে তাগাদা দিলেন। মেয়ে গাট্টি-বোচকা গোছাল। মেয়েকে জামাইর হাতে তুলে দিলেন মা-বাবা। তারা যাবে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। পথে

মেয়েটি স্বামীকে বলল, খুব পিপাসা পেয়েছে আমার। পাশেই ছিল একটি কূপ। স্বামী কূপের পাশে গিয়ে বালতি ফেলে পানি উঠানোর চেষ্টা করল। নিজের গাট্টিটা নামিয়ে পাশেই রাখল। মেয়েটিকে শয়তানে ধরল। তার মনে কুমন্ত্রণা দিল। স্বামীকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিল। সে কূপের ভেতর পড়ে গেল। মনে-মনে ভাবল, এ এখানে মরে পড়ে থাকবে আর আমি সারা জীবনের জন্য রক্ষা পেলাম।

সে ফিরে এল নিজ বাড়িতে এবং তাদের ধোঁকা দিতে সচেষ্ট হলো। আর এ-ব্যাপারে মহিলারা এমনিতেই খুব পটু। সে ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের মতো চক্রান্তে লিপ্ত হলো। চোখ মুছতে-মুছতে, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এল। মা-বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছ কেন? মেয়েটি কাঁদো-কাঁদোভাবে বলতে লাগল, আমার স্বামী আমাকে বসিয়ে রেখে কোথায় চলে গেল। আমি তার অপেক্ষা করেছিলাম দীর্ঘক্ষণ ধরে। এমনিতেই ছিলাম একা। প্রচণ্ড ভয়ও লাগছিল। কী অবস্থা হতো আমার যদি অন্য কেউ আমার কাছে চলে আসত। আমার জানের ভয় ছিল, ছিল সতীত্বের ভয়ও। লোকটা সত্যিই অত্যন্ত বেপরোয়া। ফলে আমি ফিরে এলাম। এসব শুনে তো মা-বাবা একদম চটে গেলেন যে, আমাদের মেয়েকে এভাবে বেওয়ারিশ রেখে গেল সে। সে তো আস্ত একটা বেকুফ।

এবার এ দিকের কথা শুনুন। স্বামী যখন কূপের ভেতর পড়ে গেল, তখন জান বাঁচানোর জন্য চারদিকে হাত মারতে লাগল। ভাগ্যক্রমে তার হাত পড়ে গেল কূপের বালতিবাঁধা রশির ওপর। সে ওটা আঁকড়ে ধরল আর বেঁচে গেল ডুবে মরা থেকে। একটু পর হিম্মত করে আস্তে-আস্তে ওই রশিটায় চড়তে লাগল এবং বের হয়ে এল কূপ থেকে। এবার সে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। কী করবে সে। স্ত্রীর কাছ থেকে তো সে কখনওই এমনটা আশা করেনি।

একটু পর তার মনে হলো, কোনো সমস্যা নেই। আমি আবারও যাব। সেও ফিরে এল শশুরালয়ের দিকে। ততক্ষণে পরনের ভেজা কাপড়চোপড় শুকিয়ে গেছে। বাড়িতে ঢুকতেই শশুর-শাশুড়ি দিল তাকে এক গাল বকা। খুব শাসাল, তুমি বড় গাধা, বেকুফ। কেমন স্বামী তুমি যে, আমার মেয়েকে একা রেখে কোন দিকে চলে গেছ। কোনো তোয়াক্কা-ই নেই তোমার। তার প্রতি সামান্য খেয়ালটুকুও তোমার দ্বারা হয় না। শশুর যা বলার বলেছেন। কিন্তু লোকটি একদম চুপ হয়ে সব শুনল আর গিলল। শেষে শুধু এতটুকুই বলল, আমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে ক্ষমা করে দিন। আপনাদের মেয়েকে পাঠিয়ে দিন; আমাদের জলদি যেতে হবে।

মা-বাবা যখন তাকে দেখলেন ভীষণ লজ্জিত, তখন আর কিছু বললেন না। মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন। মেয়ে তার সাথে বের তো হলো বটে; কিন্তু একটা কথা তার মনে বারবার দোলা দিতে লাগল। লোকটা মূর্খ ঠিক আছে, সে যদিও জ্ঞান-বুদ্ধিতে অতটা পাকা নয়; কিন্তু সে তো মহান; আমার দোষের কথা মা-বাবার কাছে ফাঁস করে আমাকে আপমান করেনি। যদি করত, তবে তাদের সামনে কীভাবে মুখ দেখাতাম। এই একটা চিন্তা তার মাঝে এমন প্রভাব ফেলল যে, সে তার বাকি জীবন স্বামীকে আন্তরিকভাবে ভালোবেসে কাটিয়ে দিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্যের আরেকটি দৃষ্টান্ত

মাওলানা রুমী (রহ.) বর্ণনা করেন, এক ইহুদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এল। তার বাড়ি একটু দূরে এক পল্লিতে। রাসূলের কাছে তার রাত হয়ে গেল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুরোধ করলেন, আজ রাত যেন তাঁর বাড়িতে মেহমান হিসাবে থেকে যায়। সেও রাজি হয় এবং থেকে যায়। রাতে তাকে খাবার দেওয়া হলো। খুব পেট ভরে খেল সে। তার বিছানা করে দেওয়া হলো।

যখন একটু রাত হলো, তখন বেশি খাওয়ার দরুণ লোকটির পেট খারাপ হয়ে যায়। পায়খানা চেপে ধরে টয়লেটে যাওয়ারও সুযোগ তার হয়নি। বিছানাতেই সব সেরে দিল সে। তাই রাতে সেখান থেকে বের হয়ে গেল। অন্য এক জায়গায় গিয়ে কাপড় খুলে ধোওয়া-মাজা করল এবং তৎক্ষণাৎই চলে যাওয়ার মনস্থ করল। পরক্ষণেই তার স্মরণ হলো, আমি তো অমুক জিনিসটা রেখে এলাম। তাই লজ্জা ভুলে তাকে আবার আসতে হলো নবীবাড়ি। কারণ, ওই জিনিসটার লোভ সংবরণ করতে পারল না। সে যখন ফিরে এল, তখন সকাল হয়ে গেছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর মেহমানের খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, মেহমান গায়েব হয়ে গেছে আর বিছানা নাপাক করে দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা কাউকে বললেন না। বরং নিজেই নিজহাতে পানি এনে সেগুলো ধুতে শুরু করলেন। লোকটা ফিরে এসে দেখতে পেল, রাসূল নিজ হাতে সেগুলো পরিষ্কার করেছেন। সাথে-সাথে সে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল। এমন আখলাক একমাত্র আল্লাহর রাসূলেরই হতে পারে। আল্লাহু আকবার!

সালাম তাঁর প্রতি, যিনি গালির বদলে দু'আ দেন।

সালাম তাঁর প্রতি, যিনি দয়ার মোতি বিলিয়ে বেড়ান।

সালাম তাঁর প্রতি, যিনি ত্রুটিকে নিজের দিকেই নেসবত করেন।

نشہ پلاکے گرانا توسب کو آتا ہے ● مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لیتا ہے ساقی

অর্থ : নেশা পান করিয়ে কাবু করতে তো সবাই পারে। কিন্তু কৃতিত্ব হলো তখন, যখন পানকারী পতনন্মোখকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়।

আজ দৃষ্টি দিন আপন জীবনের প্রতি। কত অজায়গায়, অকাজে রাগ করেছি। কত মানুষকে কষ্ট দিয়েছি। আমরা এত গুনাহ, এত অপরাধ নিজেদের আমলনামায় লিখিয়েছি যে, আজ আল্লাহর কাছে নেয়ামত চাইলে তাওবা ভিন্ন তিনি আমাদের দিয়ে দেবেন? আমাদের ওই গুনাহগুলো থেকে তাওবা করতে হবে একদম পাক্কা নিয়তে, খাঁটি দিলে মনে-মনে এ খেয়াল করে যে, হে আল্লাহ! আজ তুমি ভিন্ন আমাদের না আছে কোনো আশ্রয়, না আছে কোনো ঠিকানা। আমরা তওবা করব।

বনী ইসরাঈলের এক হৃদয়গ্রাহী ঘটনা

বনী ইসরাঈলের একটি আজীব ঘটনা রয়েছে। মনোযোগসহকারে শুনুন। আল্লাহ রব্বুল ইয্যত কত মেহেরবান যে, বান্দা যখন খালিছ দিলে তাঁর কাছে তাওবা করে, তখন বান্দাকে তিনি ক্ষমা করে দেন।

হযরত ওহ্ব ইবনে মুনাব্বাহ (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যামানায় এক নওজোয়ান ছিল গুনাহগার। নিজের ব্যাপারে বেশি বাড়াবাড়িকারী। লোকেরা তার মন্দ স্বভাবের কারণে তাকে বের করে দিল। তারপর শহরের উপকণ্ঠে এক নির্জন ভূমিতে তার মৃত্যু হলো। তখন আল্লাহ মূসা (আ.)-এর কাছে ওহী পাঠালেন, হে মূসা! আমার এক ওলী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তুমি তার কাছে উপস্থিত হও এবং তাকে গোসল দাও ও তার জানাযা পড়াও। আর যারা অনেক গুনাহ করে ফেলেছে, তাদের বলো তার জানাযায় শরীক হতে, যেন আমি তাদের ক্ষমা করে দিই এবং ওই ব্যক্তিকে দাফন করো, যেন আমি তার সাথে উত্তম আচরণ করি।

মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলদের ডাক দিলেন। অনেক মানুষ সমবেত হলো। তারা লোকটাকে দেখে চিনতে পারল এবং বলল, হে আল্লাহর নবী, এ তো সেই ফাসিক, যাকে আমরা এলাকা থেকে বের করে দিয়েছি। শুনে

মূসা (আ.) তাজ্জব বনে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার কাছে এ মর্মে ওহী পাঠালেন যে, তারা সত্য বলছে। কিন্তু কথা হলো, যখন এই নির্জন ভূমিতে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন সে ডানে-বামে তাকাল, কিন্তু কোনো আত্মীয় খুঁজে পেল না– নিজেকে পেল বিদেশি, একলা, অসহায় ও দুঃখে চূর্ণবিচূর্ণরূপে। তখন সে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলল এবং বলল, হে প্রভু! আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দা, যাকে তার দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আমি যদি জানতাম, আমাকে আযাব দেওয়াতে আপনার রাজত্ব বাড়বে আর ক্ষমা করলে আপনার রাজত্বে ঘাটতি আসবে, তাহলে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতাম না। আমার কোনো আশ্রয় থাকত না। থাকত না কোনো আশা। কিন্তু আমি শুনেছি, আপনার আয়াতের মধ্যে আপনি বলেছেন, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, রহীম, নেহায়েত রহমওয়ালা। কাজেই আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

হে মূসা! তাকে ফিরিয়ে দেওয়া কি আমার জন্য আদৌ উচিত হবে? অথচ সে নিজ আবাসন থেকে অনেক দূরে এবং আমার কাছে রহমত কামনা করেছে, রোনাজারি করছে? আমার ইজ্জতের শপথ, যদি সে আমার কাছে পুরো দুনিয়ার গুনাহগারদের ব্যাপারে ক্ষমা চাইত, তবে তার কারণে আমি সকলকে ক্ষমা করে দিতাম।

হে মূসা! আমি তো মুসাফিরের আশ্রয়স্থল, তার বন্ধু, চিকিৎস ও রহমদাতা।

একটু চিন্তা করুন। একটি যুবক নিজেকে এমন অবস্থায় পেয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করায় তিনি তো তার ফরিয়াদ কবুল করেছেনই; সাথে বলে দিলেন, পুরা দুনিয়ার গুনাহগারদের জন্য ক্ষমা চাইলেও তিনি সকলকে ক্ষমা করে দিতেন। যখন তিনি এত কারীম, এত দয়ালু, তখন আমাদের মাঝে কি এমন কেউ নেই, যে ফরিয়াদ করলে আল্লাহ কবুল করবেন। কোনো পুরুষ বা মহিলা অবশ্যই আছে, যার দু'আর কারণে অন্য সকলের দু'আ কুবল হয়ে যাবে। কাজেই আপনারা খাঁটি দিলে তাওবা করে জিন্দেগির গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নিন। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে ভবিষ্যত জীবন, পরহেযগারি ও নেকির জীবন করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বরকত ও বরকতের উপকরণ

'ইসলাম মানবজাতিকে এমন একটি জীবনব্যবস্থা দান করে, যাতে তারা অর্জন করে থাকে আত্মিক ও দৈহিক নানা উপকারের প্রাচুর্য। বরকত সেগুলোর অন্যতম। ঈমানদার আপন ঝুলি ভরে নেয় বরকতের মাধ্যমে। অন্য দিকে কাফেররা এর থেকে পুরোপুরি শূন্য। মুসলমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতপূর্ণ সুন্নতের ওপর আমল করে বরকত অর্জন করে আর কাফেররা এর থেকে বঞ্চিত।'

বরকত ও বরকতের উপকরণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ـ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

বরকতপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

ইসলাম মানবজাতিকে এমন একটি জীবনব্যবস্থা দান করে, যাতে তারা অর্জন করে থাকে আত্মিক ও দৈহিক নানা উপকারের প্রাচুর্য। বরকত সেগুলোর অন্যতম। ঈমানদার আপন ঝুলি ভরে নেয় বরকতের মাধ্যমে। অন্য দিকে কাফেররা এর থেকে পুরোপুরি শূন্য। মুসলমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতপূর্ণ সুন্নতের ওপর আমল করে বরকত অর্জন করে আর কাফেররা এর থেকে বঞ্চিত।

বরকতের সঠিক অর্থ

বরকতের সঠিক অর্থ বুঝতে হবে। জানতে হবে বরকত আসলে জিনিসটি কী? মনে রাখবেন, যে বস্তুতে বরকত থাকবে, তা মানুষের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হবে, চিন্তা দূর করবে, সম্মানের কারণ হবে, প্রশান্তির উৎস হবে।

ভূমিতে বরকত

ভূমির ফসল মানুষের প্রয়োজনমতো হলে তা-ও বরকতপূর্ণ জিনিসের ক্যাটাগরিতেই পড়বে। শাম দেশের মাটিকে বলা হয় আম্বিয়া কেরামের

ভূমি। আল্লাহর বিশেষ বরকত সেই দেশে বর্ষিত হয়েছে। বিশেষ বরকতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেখানে ফল-মূল, শাক-সবজি এবং এ ধরনের অন্য সব জিনিস অনেক ভালো উৎপন্ন হয়ে থাকে। কুরআন কারীমের পাঁচ জায়গায় সেখানকার বরকতের আলোচনা এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন–

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে নৈশ ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসার দিকে। ওই আকসা, যার চারপাশকে তিনি করেছেন বরকতপূর্ণ। যেন তিনি তাকে দেখান তার কিছু নিদর্শন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১০৪]

আল্লাহ এ-জমিনের মাঝে বরকত রেখে দিয়েছেন, যার কারণে ফল-মূল, শাক-সবজি ইত্যাদি খুব বেশি ফলে। এ-কারণেই এর প্রতি কাফেরদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। তারা সর্বদা চিন্তা করে থাকে, কীভাবে একে দখল করা যায়। কীভাবে এর উপকার ভোগ করা যায়।

তো এ জমিনে বরকত আছে এ-কারণে যে, এটি মানুষের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট।

বাইতুল্লাহ শরীফে বরকত

বাইতুল্লাহ শরীফে আল্লাহ অপার বরকতের সমাহার ঘটিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

নিশ্চয় মানুষের জন্য বরকতরূপে এবং জগদ্‌বাসীর জন্য হেদায়েতরূপে প্রথম যে-ঘরটি স্থাপিত হয়েছে, তা সেটিই, যেটি বাক্কায় রয়েছে।[১০৫]

তো এ-ঘরটি বরকতপূর্ণ। বরকতপূর্ণ ঘরের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর বান্দারা এখানে আসে এবং আল্লাহর থেকে প্রার্থিত বস্তু নিয়ে ফিরে যায়। আমার মুরশিদ প্রখ্যাত আলেমে দীন বলেন, একবার মক্কা শরীফে হাজীদের ঢল নামে। তখন জোরেশোরে একটা কথা শোনা যায়, যে এবার সবচেয়ে

---

১০৪. সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ১

১০৫. সূরা আলে-ইমরান : আয়াত ৯৬

বেশি হাজী হজ করতে এসেছে। এটা ছিল ১৯৩০ সনের কথা। সে-বছর হাজীর সংখ্যা ৩৫,০০০-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর অতটুকুতেই এমন হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। আর এ-বছর হজ মৌসুমে খবর শুনলাম ৪০ লাখ মানুষ বিমানে করে এবং ৩০ লাখ সাধারণ গাড়িতে করে হজব্রত পালনের জন্য কা'বা শরীফে সমবেত হয়েছে। তো মোট হলো ৭০ হাজার। এর কারণ কী? কারণ এটাই যে, হারাম শরীফ নারীর জরায়ুর মতো। বাচ্চা যখন ছোট থাকে, তখন যেমন মায়ের জরায়ু তার জন্য যথেষ্ট হয়, তেমনি বাচ্চা যখন বড় হয়, তখনও জরায়ু তার জন্য যথেষ্ট হয়। হারাম শরীফের অবস্থাও ঠিক একই রূপ। যখন হাজীর সংখ্যা কম, তখন যেভাবে যথেষ্ট, ঠিক তেমনিভাবে আজ যখন হাজীর সংখ্যা ৭০ লাখে পৌঁছেছে, এখনও যথেষ্ট।

হজ ও ওমরায় বরকত

হাদীছ শরীফে আছে, যখন কোনো ব্যক্তি নবীজির নিকট এসে দারিদ্রের অভিযোগ করত, তখন তিনি তাকে বলতেন, তুমি বিয়ে করে ফেল। অর্থাৎ– বোঝাতেন, বিয়ে রিযিক বৃদ্ধির কারণ। এটা এজন্য যে, অবিবাহিত ব্যক্তি শুধু নিজের রিযিকই পেয়ে থাকে। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে স্ত্রীর রিযিকের ভাগীও হয়ে যায় সে। আর হতে পারে স্ত্রীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। অনেক বড় কপালের অধিকারী সে। তার রিযিকের বরাদ্দ অনেক বেশি। বাস্তবতাকে তো আমরা এমনই পেয়েছি। মানুষ যখন একা থাকে, তখন তার রিযিক থাকে কম। কিন্তু বিয়ে করলে রিযিক বেড়ে যায়। তারপর সন্তান হলে আরও বেশি বাড়ে। এটা এ-কারণে যে, যে আসে সে তো অন্যের রিযিক খেতে আসে না– সাথে করে নিজেরটা নিয়েই আসে। যদি দরিদ্র লোকটি বিয়ে করে পুনরায় দারিদ্র্যের কারণে নবীর কাছে এসে ফরিয়াদ করত, তিনি তাকে হজ ও ওমরা করতে আদেশ দিতেন। এ-কারণেই তো অনেক কিতাবে আছে, বেশি হজ ও ওমরা করলে রিযিক বৃদ্ধি পায়।

বকরির মাঝে বরকত

বরকতের দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝে নিন, হাদীছে এসেছে, নবীজি ইরশাদ করেন, তোমরা বকরি পালো; এতে বরকত রয়েছে।

বাস্তবতাও এমন যে, সত্যিই বকরিতে বরকত রয়েছে। এর বিপরীতে কুকুরকে দেখুন। সে এক সাথে কখনও পাঁচ- ছয়টা, কখনও সাত-আটটা, আবার কখনও-কখনও দশটা বাচ্চা দিয়ে থাকে। আর বকরি বাচ্চা দেয়

কখনও একটা, কখনও দুটা জোরে গেলে তিনটা। এবার চিন্তা করুন, বকরি একে তো বাচ্চা কম দেয়। অন্য দিকে প্রতিনিয়ত একে জবাই করা হয়। তামাম দুনিয়ার মানুষ এটা খায়। তারপরও দেখা যাবে, শত-শত ছাগলের পাল মাঠে-ঘাঠে বিচরণ করছে। কিন্তু কখনও কুকুরের পাল এভাবে দেখা যায় না। এগুলোর জন্মের আট-দশ দিন পরেই শেষ হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ এর মাঝে বরকত রাখেননি। আর বকরি যদিও বাচ্চা দেয় এক দুটা; তারপর আবার প্রতিদিন জবাই করা হয়; তবুও তাকে পাল ধরে চলতে দেখা যায়। এর কারণ এটিই যে, আল্লাহ এর মাঝে অনেক বরকত রেখেছেন।

দেখা যায়, যেসব এলাকায় মানুষের বকরি পালার প্রবণতা আছে, সেসব এলাকায় একেকজনের দুই থেকে তিনশো পর্যন্ত, কোথাও এর চেয়েও বেশি পাওয়া যায়। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় বনু কালিব নামক একটি গোত্র ছিল। তাদের বকরি এত বেশি ছিল যে, সেগুলো বের হলে একটি পাহাড় ঢেকে ফেলত।

যায়তুনের বরকত

যায়তুনের বরকতের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ

বরকতময় যয়তুন বৃক্ষ।[১০৬]

আজ সায়েন্সের জগত বলছে, যয়তুন তেলে মানুষের জন্য অনেক উপকারিতা আছে। সারা দুনিয়ার মাঝে ব্যবহৃত যত তেল আছে, সমস্ত তেল মানুষের ধমনির রক্তচলাচল বন্ধ করে দেয় এবং কোলেস্ট্রল হাই হয়। ঘি, তেল কোকেন অয়েল সবই এর অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো হৃদস্পন্দন রুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু সমগ্র দুনিয়ায় যায়তুন তেলই একমাত্র তেল, যা বন্ধ শিরাকে খুলে দেয়। এটি নতুন এক গবেষণা। এই গবেষণার পর কাফেররা যায়তুনের ব্যবহার বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তো কুরআনে যায়তুনের নামে কসমও খেয়েছেন–

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

শপথ 'তীন' ও 'যায়তুনের'।[১০৭]

---

১০৬. সূরা নূর : আয়াত ৩৫

১০৭. সূরা তীন : আয়াত ১-২

এবং বলেছেন,

شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

বকরতপূর্ণ বৃক্ষ।

এর পেছনে কোনো হেকমত তো অবশ্যই ছিল। আজ চৌদ্দশ বছর পর সেই হেকমত প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য এর মাঝে হেকমত রেখে দিয়েছেন।

আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে। তিনি বলেন, আমার কাছে হার্টের ব্যাধিতে আক্রান্ত ১০০ লোক এসেছে। আমি তাদের প্রত্যেকের ওষুধ বন্ধ করে দিলাম এবং যইতুন তেল ব্যবহার করতে বললাম। বলে দিলাম, তরকারির মধ্যে যয়তুনের তেল দেবেন। পরোটাও বানাবেন যয়তুনের তেল দিয়ে। লাগাতার চল্লিশ দিন ব্যবহারের পর দ্বিতীয়বার আবার চেক করাবেন। তিনি বলেন, আমি তো দেখলাম, তাদের মধ্যে চল্লিশজনের কোলেষ্টরল নিচে এসে গেছে অল্প দিনেই।

মুমিনের উচ্ছিষ্টের বরকত

আল্লাহ তা'আলা মুমিনের উচ্ছিষ্টের মধ্যেও বরকত রেখেছেন। হাদীছে এসেছে, মানুষের খাবার প্লেটের সামনে যে সালন থাকে, এর মধ্যে বরকত রয়েছে। এজন্য নিজের সামনে থাকা তরকারির পার্শ্ব থেকে খাওয়া চাই। হাদীছে এসেছে–

كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

তুমি ডান হাতে খাও এবং নিজের সামনে থেকে খাও– মাঝখান থেকে নয়। কারণ, তাতে বরকত রেখে দেওয়া হয়েছে।

নবীয়ে রহমতের লোকমার বরকত

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাচ্ছিলেন। এ-সময় তার পাশ দিয়ে এক বেপরোয়া মহিলা যাচ্ছিল। তাকে বেপরোয়া এজন্য বলা হতো যে, সে পুরুষের সাথে কথা বলার সময় কোনো কিছুর বাছবিচার করত না। যেনতেনভাবে কথা বলত। কাউকে ভয় করত না। রাসূলের একটু নিকটবর্তী হতেই মহিলা বলে উঠল, নিজে একা-একা খাচ্ছেন আর আমাকে একটু খোসাও দিচ্ছেন না। শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে

বললেন, তুমিও এক লোকমা খাও। মহিলা বলল, আমি প্লেটের লোকমা খাব না; বরং আপনার মুখের চাবানো লোকমা খাব। নবীজি নিজের চাবানো লোকমা তাকে দিলেন। মহিলা ওই লোকমা খাওয়াতে তার এমন লজ্জাবোধ সৃষ্টি হয় যে, তখন থেকেই তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এটি-ই হচ্ছে মুমিনের উচ্ছিষ্টের বরকত।

তাহনীকের মধ্যে বরকত

এ-কারণেই শরীয়ত তাহনীকের হুকুম দিয়েছে। ছোট বাচ্চার মুখে সর্বপ্রথম কোনো নেক বান্দার ঝুটা দেওয়া এটাও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছের ভাষায় একে 'তাহনীক' বলা হয়। এতে বরকত রয়েছে। ইসলাম আমাদের বরকত অর্জনের শিক্ষা দিয়ে থাকে। কাফেররা তো জানেই না, বরকত কী জিনিস। তাদের অভিধানে বরকতের কোনো প্রতিশব্দ নেই।

সুস্থতার মাঝে বরকত

আল্লাহ তা'আলা মানুষের সুস্থতার মধ্যেও বরকত দিয়েছেন। সুস্থতায় বরকতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ মানুষের স্বাস্থ্যে এমন বরকত ঢেলে দেবেন যে, তার আর ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। উদাহরণস্বরূপ–

আমি রাশিয়ায় এক বৃদ্ধকে দেখেছি। বয়স আশিরও বেশি। সে বলল, আশি বছরের জীবনে আমি নিজ হাতে একটা ট্যাবলেটও মুখে দেইনি। অর্থাৎ– জীবনে তার কোনো ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজনই দেখা দেয়নি। এটাই সুস্থতার বরকত।

আমার হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) শেষ জীবনে ডায়বেটিসে আক্রান্ত হলেন। আপনাদের জানা আছে, এ রোগে আক্রান্তদের কিছুক্ষণ পরপরই পেশাব হয়ে থাকে। আমি 'মরিতে' একদিন তার খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। ওই দিন সেখানে সেই দেশের বিখ্যাত বড়-বড় কারীগণ সমবেত হলেন। রমযানের রাত ছিল। হযরত মাগরিবের নামায পড়ে খাবার খেলেন। খানা খেয়ে উজু করে মসজিদে তাশরীফ আনেন এবং সেখানেই ঈশার নামায, তারপর তারাবীর নামায পড়েছেন। তারপর কেরাতের সেলসেলা শুরু হলো। হযরত ছিলেন কুরআনের ভক্ত। কুরআন তেলাওয়াত শুরু হলে হযরত মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে থাকেন। একসময় সাহরির সময় হলো। সাহরির জন্য মসজিদেই দস্তরখান বিছানো হয়। হযরত সেখানেই সাহরি খেলেন।

সাহরির পর সাধারণত তাঁর এস্তেঞ্জার প্রয়োজন হতো। তাই আমি হযরতের কাছে গিয়ে বললাম, হযরত কামরায় চলুন। জিজ্ঞেস করলেন, কেন? আমি বললাম, উজু করার জন্য। হযরত বললেন, আমার উজু কাঁচা সুতা তো আর নয়।

আমি তো কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারছিলাম না। মাগরিবের সময় উজু করেছিলেন। রাত চলে গেল। সাহরিও খেলেন। ছিলেন ডায়বেটিসের রোগী। এত সব সত্ত্বেও কিনা বললেন, আমার উজু কাঁচা সুতা তো আর নয়।

হযরত ফজর পড়ে কুরআনের দরসে হাজির হলেন। তারপর ইশরাকের ওয়াক্ত হলে ওই উজুতেই ইশরাক আদায় করলেন। তারপর কামরায় এসে এস্তেঞ্জা করলেন এবং উজু করলেন।

লোকে তো ইমাম আযমের ব্যাপারে বলে থাকে, তিনি ঈশার উজু দিয়ে ফজর আদায় করতেন। আমি নিজের জীবনে এমন এক আল্লাহওয়ালাকে দেখেছি, যিনি মাগরিবের উজু দিয়ে ইশরাক আদায় করেছেন। তাও আবার ডায়বেটিসের রোগী। এ হলো স্বাস্থ্যের বরকত।

একবার আমি হযরতকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মতো স্বাস্থ্য তো আমি কারও দেখিনি। হযরত বললেন, আল্লাহ এই বান্দাকে একবার শবে কদর দান করেছিলেন। আমি ওই রাতে যা-যা দু'আ করেছি, তার মধ্যে এটিও একটি ছিল যে, হে আল্লাহ! আমার জীবনে বরকত দান করুন।

তারপর হযরত বললেন, আয়ুতে বরকত কখনও এভাবে হয়ে থাকে যে, বয়স ছিল ষাট বছর; আল্লাহ বাড়িয়ে করে দিলেন ৮০ বছর। কতক লোক তো এমন আছে যে, ষাট বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে যায়। চলতে পারে না, উঠতে পারে না, বসতে পারে না। অন্যের জন্য বোঝা হয়। তারপর বললেন, কখনও জীবনের বরকত এভাবেও হয় যে, মানুষটি মৃত্যের আগ পর্যন্ত কারুর মুখাপেক্ষী হয় না।

আজ এক আত্মীয়র জানাযা পড়লাম। তিনি আমাদের খান্দানের সবচেয়ে বেশি বয়সপ্রাপ্ত। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৮২ বছর। তার ছেলে আমাকে বলেছে, তিনি এ-বয়সে নিজের সব কাজ নিজেই করতেন– কারও মুখাপেক্ষী হতো না। একেই বলে জীবনের বরকত।

ইল্‌মের মাঝে বরকত

আল্লাহ তা'আলা ইল্‌মের মাঝেও বরকত রেখেছেন। ইল্‌মের মাঝে বরকত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ইল্‌ম অর্জন করা হয়েছে, সে অনুযায়ী

আমলের তাওফীক লাভ করা এবং ইল্‌ম অর্জনকারী থেকে কোনো শাগরেদ তা শিখলে এটা তার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ– তার মাধ্যমে ইল্‌ম জারি হতে থাকে।

উদহরণত শাইখুল হিন্দ (রহ.)। তাঁর কাছে কেউ পড়েছে; কিন্তু দীনের কোনো খেদমত করেনি এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বর্তমানে যদি কোনো ওস্তাদকে বলা হয় এমন একজন শাগরেদ দেখান, যাকে আপনি তৈরি করেছেন। তো সারা জীবনে দেখাতে পারেন কিনা সন্দেহ? আমাদের জীবনও দেখুন, তার জীবনও দেখুন। আমরা জীবনভর এক শাগরেদ দেখাতে অক্ষম আর তার কাছে হাদীছ পড়েছে আর দীনের কাজ করেনি এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। তার কাছে পড়েছে তো আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর ইল্‌মের মাঝে বরকত দান করেছেন, তাই তো তার ফেকাহ শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতাকে উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়েছেন। একবার বাদশাহ হারুনুর রশীদ ওলামায়ে কেরামের এক জামাতকে আদেশ দিলেন, চিনের প্রাচীর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসো। তারা এসে জানালেন, আমরা যে পর্যন্ত পৌঁছেছি, ইমাম আবুহানীফার ফেকাহর নূর তারও আগে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ তাঁর ইল্‌মের মাঝে অপার বরকত দান করেছেন।

সময়ে বরকত

আল্লাহ তা'আলা সময়ের মাঝেও বরকত দিয়েছেন। সময়ের বরকত হলো, কম সময়ে অনেক বেশি কাজ করা সম্ভব হয়ে থাকে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনার জীবন দশ বছরের। দশ বছর তো অত্যন্ত সীমিত সময়।

আমাদের অবস্থা দেখুন, আমরা যারা স্লোগান লাগিয়েছি, পাকিস্তানের উদ্দেশ্য কি? লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আজ পঞ্চাশ বছর গত হওয়ার পরও আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি যে, আমরা আসলে কী করব। বছরের-পর-বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে; কিন্তু বুঝে ওঠার কোনো সময় হয় না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের গুটিকয়েক বছরে কেমন মেহনত করেছেন যে, তার মাধ্যমে সৃষ্ট জীবনবিপ্লব সমগ্র বিশ্বময় বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে-ইসলামিক বিপ্লবের জন্ম দিয়ে গিয়েছিলেন, তার তিনটি সৌন্দর্য এই–

১. সেটি কম সময়ে হয়েছে।

২. স্বল্প মাধ্যম ব্যবহার করে হয়েছে।

৩. কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে।

পুরা দুনিয়াতে তিনি এক পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। দশ বছর কি আর সময়। অথচ, এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি বিপ্লব ঘটালেন দুনিয়াব্যাপী। আসবাব ছিল অতি অল্প। কেমন অল্প? কখনও সওয়ারি থাকত না, আবার সওয়ারি থাকলে খাবার পাওয়া যেত না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন সৈন্যদল ছিল, যার প্রতিজন সদস্য দৈনিক একটিমাত্র খেজুর পেতেন। কোনো এক সাহাবি একথাটি যখন নিজ সন্তানকে বললেন, সে যারপরনাই আশ্চার্য হলো। বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল, মাত্র একটি খেজুর খেতেন? সাহাবি বললেন, এমন দিনও গেছে, সেই একটি খেজুরও পাইনি।

তৃতীয় হলো সামান্য কিছু ক্ষতির মাধ্যমে বিপ্লব। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে যত যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, তার মধ্যে মুসলিম ও কাফেরদের সর্বমোট মৃতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০৬৭। শুধু এ কজন লোকের জানের বদৌলতে পুরা দুনিয়ায় এ বিল্লব সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আজকাল নিরাপত্তার এ যুগে কোনোরূপ যুদ্ধের কথাবার্তা হওয়ার আগেই হাজার-হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। তো এত কম সময়ে কম আসবাব নিয়ে সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে এত বড় আন্দোলন, এত বড় বিপ্লব ঘটানো একমাত্র আল্লাহর রাসূলেরই শান। আল্লাহ তাঁর সময়ের মধ্যে বরকত ঢেলে দিয়েছেন।

একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর লিখিত কিতাবসমূহের পৃষ্ঠা আর জীবনের প্রতিটি দিনের হিসাব করলে দেখা যায়, প্রতি দিনে ৪০ পৃষ্ঠা করে পড়ে। বর্তমানে আমরা তো দিনে চল্লিশ পৃষ্ঠা পড়তেও পারি না। আর তিনি দৈনিক লিখেছেন ৪০ পৃষ্ঠা। তারপর যদি শিক্ষার বয়সটুকু অর্থাৎ প্রথম ১৫-২৫ বছর যদি বাদ দেওয়া হয়, তবে তো এই গড়ের মাত্রা আরও বাড়বে। দৈনিক ৪০ পৃষ্ঠা লেখা কোনো চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু আল্লাহ সময়ের মাঝে বরকত দিলে কম সময়ে অধিক কাজ করা সম্ভব হয়ে যায়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর গ্রন্থের সংখ্যা ২,৪০০। এর মধ্যে তাফসীর আছে, হাদীছসংক্রান্ত, ফিকাহ, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ের কিতাব রয়েছে। জীবনের এমন কোনো দিক বাকি নেই, যে ব্যাপারে তিনি কলম ধরেননি। আল্লাহ তার সময়ে বরকত দিয়েছেন।

স্মৃতিশক্তিতে বরকত

আল্লাহ কখনও-কখনও মানুষের স্মৃতিশক্তিতে বরকত দিয়ে থাকেন। তা এভাবে হয় যে, কোনো কথা একবার শুনলেই পাথরের অংকনের মতো হয়ে যায়।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)কে আল্লাহ অগাধ স্মৃতিশক্তি দিয়েছিলেন। একবার বিরুদ্ধবাদীরা আদালতে কিতাবের একটি রিডিং পেশ করে, যা তাদের দাবিকে সমর্থন এবং আহলে হকদের দাবি নাকচ করে। অনেক ওলামায়ে কেরাম ওই রিডিং দেখে হয়রান। সবারই মনে প্রশ্ন জাগে, তবে ব্যাপারটা আসলে কি? কিতাব ঠিক, লেখাও ঠিক। তবে এমন কেন?

কোনো একজন প্রস্তাব পেশ করল, এই রিডিং আনোয়ার শাহ কাশ্মিরিকে দেখানো দরকার। তাঁকে তা দেখালে তিনি সাথে-সাথে বলে দিলেন, এখানে লিপিকার ভুল করেছে। কিতাব লিখতে গিয়ে মাঝখান থেকে এক লাইন বাদ দিয়ে লিখেছে, যার কারণে আগ-পরের বক্তব্য মেলালে অর্থ অন্য রকম হয়ে যায়। তাই মূল কিতাব আনা হোক। মূল কিতাব আনা হলে দেখা যায় হযরতের কথা ১০০% সঠিক। তারপর হযরত বলেন, এ রিডিং আমি ২৭ বছর আগে দেখেছিলাম।

একবার হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) বর্ষার মৌসুম শেষ হলে ভাবলেন, নিজের কিতাবগুলো একটু গোছগাছ করে রাখবেন। তাই এক ছাত্রকে আদেশ দিলেন, কিতাবগুলোকে বের করে বাইরে রোদের মধ্যে রাখো, যাতে আদ্রতা শুকিয়ে যায় আর কোনোটার বাইন্ডিং নষ্ট হলে নতুন করে বাইন্ডিং লাগিয়ে দেয়। ছাত্র কিতাব বের করে একটি কিতাব নিয়ে হুজুরের কাছে এল এবং আরজ করল, হযরত! এ কিতাবটি বাইন্ডিং করতে হবে এবং এর প্রথম দিকের কয়েকটা পৃষ্ঠা ছুটে গেছে। হযরত আদেশ করলেন, নতুন কাগজ লাগিয়ে এবারত লিখে দাও। ছাত্র তো হকবাক! বলল, আমার তো এবারত মুখস্থ নেই। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, কিতাবের নাম কী? ছাত্র বলল, মাইবুজী। হুজুর আবার জিজ্ঞেস করলেন, শেষ শব্দটি কী? শেষ শব্দটি বলা হলে হুজুর নিজের স্মৃতি থেকে দু-তিন পৃষ্ঠার এবারত লিখে কিতাব পূর্ণ করে দিলেন।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর শাগরেদ ছিলেন মাওলানা গোলাম রাসূল পন্টবি। এটি মুলতানের আগের একটি এলাকা। মাওলানা সাহেবের ওই এলাকার সাথে সম্পৃক্ততা ছিল বলেই তাকে পন্টবি বলা হয়। তিনি

শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর অনেক খেদমত করেছেন এবং প্রচুর দু'আ নিয়েছেন। আল্লাহ শাইখুল হিন্দের বরকতে তাকে এমন স্মৃতিশক্তি দান করেছেন যে, নিজের বয়ানের প্রাক্কালে তিনি ঘোষণা করলেন, সারা দুনিয়ার থেকে যদি শরহে জামী কিতাবটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়, তারপর কোনো ছাত্র এসে যদি আমার কাছে অবদার করে শরহে জামী কিতাবের, তবে আমি তাকে সেটি হরফে-হরফে লিখে দেব।

হযরত আবুযর নামে একজন বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন। কেউ তাঁকে প্রশ্ন করল, হযরত! আপনার কি ১,০০০০০ (এক লাখ) হাদীছ মুখস্থ আছে? তিনি উত্তর দিলেন, আমার ১ লাখ হাদীছ সূরা ফাতেহার মতো মুখস্থ আছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এমন অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দান করেছেন।

রিযিকে বরকত

আল্লাহ তা'আলা মানুষের রিযিকের মাঝেও বরকত দিয়ে দিয়েছেন। রিযিকের বরকতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের কাছে যা থাকে তা তার প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট হওয়া। এমন অনেক লোক আছে, যাদের সন্তান ছয়-সাতটা। বেতন পায় ছয় থেকে সাত হাজার। অথচ এই সামান্য আয় দ্বারা তাদের সংসার সুন্দরমতো চলে যায়। এর কিছু দৃষ্টান্ত শুনুন–

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) ইরশাদ করেন, একবার আমার ভীষণ খিদে পায়। তাই ঈশার নামায পড়েই রাস্তায় এসে বসে পড়ি। আশা ছিল, সাহাবারা বাড়ির দিকে যাবেন আর ঘরে কিছু থাকলে মেহমান হিসেবে আমাকেও নিয়ে যাবেন। একসময় আবুবকর (রাযি.)-এর সাথে দেখা হলো। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জবাব দিয়ে কিছু না বলেই চলে গেলেন। ভাবলাম, হয়তো বাড়িতে কিছু নেই। তারপর দেখা ওমরের সাথে। তাকেও সালাম দিলাম। তিনিও উত্তর দিয়ে কিছু না বলে চলে গেলেন। আমি ধারণা করলাম, তার ঘরেও মনে হয় কিছু নেই।

তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনেন এবং আমাকে রাস্তায় পেয়ে সাথে করে নিয়ে চললেন। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের ভেতর পয়গাম পাঠালেন যেন খাবারের কিছু থাকলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভেতর থেকে জবাব এল, এক পেয়ালা দুধ আছে। আবু হুরায়রা বলেন, আমি তো মনে-মনে ভীষণ খুশী। কারণ, এক পেয়ালাই একজনের জন্য যথেষ্ট। দুধ আনলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, আবুহুরায়রা আসহাবে সুফ্ফার সবাইকে ডেকে আনো। তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন।

এবার আমি পড়ে গেলাম মহা ভাবনায়। এতটুকু দুধ! তারপর আবার ৭০জন মানুষ! আর নিশ্চয় তাদের পরিবেশনের দায়িত্ব পড়বে আমার ঘাড়ে। তাদের দিতে-দিতে আমার জন্য তো কিছুই থাকবে না। তারপর যখন তারা এলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ দিলেন, সবাইকে পরিবেশন করতে। আমি দুধ পান করানো শুরু করলাম। প্রত্যেকেই পেট ভরে পান করতে লাগলেন। একে-একে সত্তরজনের পান করা শেষ। কিন্তু রয়ে গেল ঠিক অতটুকু যতটুকু প্রথমে ছিল। তারপর নবীজি আমাকে পান করার জন্য আদেশ করলেন। আমি খুব তৃপ্তিসহকার পান করলাম। পুনরায় বললেন, আরও পান করো। আমি একদম পেট ভরে পান করলাম। এরপরও ততটুকু দুধই অবশিষ্ট ছিল, যতটুকু প্রথমে ছিল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পান করলেন।

খন্দক যুদ্ধের সময় হযরত জাবের (রা.)-এর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বকরি জবাই করলেন এবং হযরত জাবের (রাযি.)-এর মাধ্যমে খবর পাঠালেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার ঘরে আপনার দাওয়াত। চলুন; কিছু খাবার আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে সকল সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দাওয়াতের ঘোষণা করে দিলেন। বললেন, আজ জাবেরের ঘরে সবার দাওয়াত।

জাবের (রাযি.) শুনে তো হতবাক! দৌড়ে ঘরে গেলেন। স্ত্রীকে বললেন, হুজুর তো সকল সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে আসছেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, সবাইকে আপনি দাওয়াত দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর নবী নিজে দিয়েছেন? বললেন, তিনি দিয়েছেন। আমি তো কেবল তাঁকেই দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু তিনি সবাইকে দাওয়াত দিলেন। স্ত্রী বললেন, যদি তিনি দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের ভাবনার কোনো কারণ নেই। তিনিই সব কিছু বুঝবেন।

যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তাশরীফ আনলেন, তখন তিনি নিজহাতে ওই গোশত বণ্টন শুরু করে দিলেন। পুরা জামাত খাওয়ার পরও আরও কিছু উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। একেই বলা হয় রিযিকে বরকত। রিযিকের বরকত উঠে গেলে লাখ-লাখ উপার্জন করা সত্ত্বেও টাকা কোন দিকে যায় টেরই পাওয়া যায় না।

আমাদের এক বুযুর্গ ছিলেন খাজা আবদুল মালেক (রহ.)। একদিন তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, আমি এখন নামায পড়ে মসজিদে বসে আছি এবং উজুর সাথে আছি। এ অবস্থায় তোমাকে একটি কথা শোনাতে চাই, যেটি ১০০% সত্য। যেহেতু বুযুর্গ সরাসরি কথাটা আমাকে বলেছেন, তাই আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি। তো তিনি আমাকে বললেন, আমি সারা দিন যিকির-আযকার করে থাকি আর আল্লাহর কাছে দু'আ করি, হে আল্লাহ! আমাকে রিযিক দিন এবং তাতে বরকত দান করুন এবং আমার শায়েখকেও বললাম, আমার জন্য দু'আ করতে। একবার তিনি (শায়খ) প্রায় বিশ কিলোগ্রাম গমভর্তি একটি বালতি পাঠালেন। আর সাথে একটি চিঠিও। চিঠির ওপর লেখা ছিল إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ (আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।) তারপর লেখা ছিল, এর গমগুলো একটা পাত্রে ঢেলে রাখো। তারপর একটা কাপড় দিয়ে পাত্র ঢেকে রাখো এবং এর থেকে গম নিয় খেতে থাকো।

হযরত বললেন, আজ প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলছে, বরং আরও বেশি হতে পারে। এ-সময়টাতে আমার খাবার ওই গমগুলোই। তারপর বললেন, এক সময় প্রায় প্রতিদিন এক-দুশ মেহমান আমার ঘরে খানা খেত। তাদেরও খাবার তৈরি হতো ওই গম দিয়েই এবং বার্ষিক এজতেমায় যে হাজার-হাজার মানুষ একত্রিত হয়, তাদের খাবারও এই গম থেকেই হয়ে থাকে।

একবার আমার কাছে একলোক আসে। সে ছিল দুটা টেক্সটাইল মিলের ম্যানেজাদের পর্যবেক্ষক ম্যানেজার। তখন তার মাসিক বেতন ছিল এক লাখ। এটা ওই সময়ের কথা, যখন ডলারের দাম ছিল পাকিস্তানি ১৮ রুপি। বর্তমানে তো ষাটা রুপি। ওই সময়ে ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন ছিল দু-তিন হাজার। তো তার মাসিক বেতন ছিল এক লাখ। পরিবারের সদস্য ৫জন। স্বামী-স্ত্রী আর তিন সন্তান। বড় ছেলের বয়স বারো বছর। মেঝটার দশ আর ছোটটার ৮। তারপর বলল, মালিক আমাকে দু-তিনটা বাড়িও দিয়েছেন। গাড়ির পেট্রোল খরচ, ড্রাইভারের বেতন সব তিনিই বহন করেন। তারপর আমাকে সিকিউরিটি গার্ড দিয়েছেন। আমার ইনকামট্যাক্সও তিনিই বহন করেন। বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন চার্জ যা আসে সবই তার। আমি পুরো এক লাখ টাকা নিয়ে বাড়িতে চলে আসি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তো আপনার সমস্যাটা কী? এমন প্রশ্ন শুনেই তার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল। সে বলে উঠল, এক লাখে আমার খরচ কুলায় না। শুনে তো আমি তাজ্জব বনে গেলাম। এ কেমন কথা!

আমি জানার আগ্রহ নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এমন সমস্যা কীভাবে হতে পারে? সে বলল, আমি বসবাসের জন্য ডিফেন্স লাহোরে একটি প্লট ক্রয় করি, যার দাম ছিল ৬৫ লাখ। যখন বিল্ডিং তৈরির কাজ শুরু করি, তখন আরেক ব্যক্তি এসে বলে উঠল, এটা তো আমার প্লট। শুনে তো আমি হয়রান। তারপর খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, যার থেকে আমি প্লট ক্রয় করেছি, সে অন্য আরেকজনের কাছে তার আগে একবার বিক্রি করেছে আর আমাকে সে ধোঁকা দিয়েছে? এখানে আমার ৬৫ লাখ টাকা লস হয়ে গেল। তারপর দ্বিতীয়বার অন্য এক জায়গায় প্লট ক্রয় করি। ভবন নির্মাণের জন্য ম্যাপ তৈরি করা শেষে একটি ঠিকাদারকে ভাড়া করলাম। ঠিকাদার পনেরো লাখ টাকা এডভ্যান্স চাইল। দিলাম। টাকা নিয়ে সে যথারীতি কাজও শুরু করে দিল। এর মধ্যে সে অন্য জায়গায় একটি ভালো কাজ পেয়ে যায়। আমার কাজটা রেখে সে চম্পট দেয়। সেখানে আমার ১৫ লাখ টাকা গচ্ছা গেছে। একবার স্ত্রীর একটা গাড়ি খুব পছন্দ হয়। দাম ছিল ৪৫ লাখ। আমাকে অনুরোধ করলে আমি ক্রয় করে নেই। এখানো তাতে নম্বরপ্লেট লাগানো হয়নি। এরই মধ্যে একদিন আমি ওটা নিয়ে শহরে ব্যাংকে যাই। গাড়িটি রেখে ভেতরে ঢুকি। কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে জানতে পারি, একটা দ্রুতগামী গাড়ি ড্রাইভারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে আমার গাড়িটাতে এমন সজোরে আঘাত করেছে যে, সেটা চুরমার হয়ে গেছে। মুহূর্তেই আমার ৪৫ লাখ টাকা শেষ।

সব শুনে আমি বললাম, আসলে সমস্যা রুজির নয়; বরং সমস্যাটা হলো বেবরকতি। বরকত ছাড়া আপনার তো সমস্যা কোনো দিন সমাধান হবে না। প্রশ্ন করলেন, বরকত কীভাবে আসবে? আমি বললাম, নেকি ও তাক্ওয়ার দ্বারা। সৌভাগ্য যে, লোটকা বুদ্ধিমান ছিল। আল্লাহ মেহেরবানি করেছেন। লোকটা নিজের জীবন পরিবর্তন করে ফেলল। সে নেক ও নামাযী হয়ে গেল। আল্লাহ তার জীবনে সুখ দান করলেন। এর দ্বারা তার জীবনে বরকতও এল।

আমাদের এখানে এই জঙ্গ-এর পাশে একটা গ্রাম আছে। তাতে খুব দানশীল একজন মহিলা আছে। লোকে বলে হাতেম তাইর বোন। তার চিরাচরিত অভ্যাস হলো, কোনো ভিক্ষুক তার দরজায় এলে সে কোনো দিনও তাকে খালি হাতে ফেরায় না। সে ওই গ্রামের মান্যগণ্য মহিলাদের একজন। অনেক প্রভাব আছে তার।

গ্রামটি সড়কের একদম পাশে ছিল না। প্রধান সড়কের মাঝে আর তার মাঝে ছিল কিছুটা দূরত্ব। ভেতরের গ্রামগুলোর অবস্থা ছিল এমন যে, লোকেরা সেই ভেতর থেতে ৮-১০ মাইল পায়ে হেঁটে মেইন রোডে উঠত। তারপর গাড়িতে করে শহরের দিকে যেত। অনেক সময় দেখা যেত, শহরের যাওয়ার গাড়িগুলো সব চলে গেছে। তখন মানুষকে ওই রোডের পাশেই রাতে অবস্থান করতে হতো। আর রোডের পাশে তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না যে সেখানে রাত কাটানো যায়। অনেক সময় শহর থেকে গ্রামমুখী মানুষগুলোকে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। রাতের বেলা এই বিরান ভূমি মাড়িয়ে গ্রামে পৌঁছা ছিল খুব জটিল ব্যাপার। কিন্তু কোনো উপায়ন্তর না দেখে তাদেরও ওই রোডের পাশেই অবস্থান করতে হতো।

তো ওই মহিলার মনে চিন্তা এল, আমি সেখানে এমন কিছু ব্যবস্থা করে দেব, যার মাধ্যমে কিছুটা হলেও মানুষের সমস্যা লাঘব হবে। এই ভেবে সেখানে একটা ঘর তুলে দিল। এতে মানুষের জন্য খুব সুবিধা হলো। কিছুদিন পর সেখানে পানির ব্যবস্থাও করে দিল। এতে মানুষের আরেকটু সুবিধা হলো। কিছু দিন পর তাতে রীতিমত লুচি পাঠানো শুরু করল। এতে আরেকটু সুবিধা হলো। আরও কিছু দিন যাওয়ার পর তার মনে হলো, এদের জন্য কিছু ডাল-রুটির ব্যবস্থা করলে খারাপ হয় না। কারণ, সবাই তো অনেক ক্ষুধার্ত থাকে। তারপর থেকে সে ওখানে রান্না শুরু করে দিল আর এর দ্বারা পূর্ণ সুবিধা ভোগ করতে লাগল পথিক। এখন মাগনা খাওয়ায় অভ্যস্তরা নিজেদের প্ল্যান তৈরি করে এমনভাবে যে, সেখানে রাত যাপন করব। রাতের খাবার খাব এবং তাড়াতাড়ি সকাল-সকাল শহরে চলে যাব। তো যা ই হোক, একটা সেবার ধারাবাহিকতা জারি হয়ে গেল।

কিছু মানুষ আছে, যারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বোঝে। এদের থেকে আল্লাহ হেফাজত করুন। গ্রামের এমন এক অসাধু লোক মহিলার স্বামীকে গিয়ে বলল, মনে হয় তোমাদের কাছে অনেক মাগনা সম্পত্তি আছে। টাকা কি গাছ থেকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে নাও নাকি। খরচ করার জায়গা না পেলে আমাকে দাও। আমি খরচ করে দেখাই। শান্তভাবে মহিলার স্বামী বলল, ভাই কী বলছেন আর কিইবা বোঝাতে চাচ্ছেন? লোকটা খুব তিরস্কারের সুরে বলল, তোমার স্ত্রী যে এখানে খাবার খাওয়ানো শুরু করেছে। এখানে তো সবধরনের লোক আসে। অনেক বেকার এবং বিনা পয়সায় খেতে অভ্যস্ত লোকও আসে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তোমরা কোত্থেকে মাগনা টাকা পাও

আর সেগুলো তাদের পেছনে খরচ কর। যেহেতু লোকটির কথা তিরস্কারে ভরা ছিল, ছিল অপমানের সুর; তাই কথাগুলো ওই সম্ভ্রান্ত লোকটির গায়ে খুব হিট করল, যার কারণে সে ওই মেহমানদারি বন্ধ করে দিল।

সেটা বন্ধ করে দিলে এতে স্ত্রী খুবই মনক্ষুণ্ন হলো। কিন্তু সে খুবই বুদ্ধিমতী। তাই এ-ব্যাপারে স্বামীকে কিছু বলেনি। বরং এ-ব্যাপারে কথা বলার জন্য একটা মোক্ষম সময়ের তালাশ করতে থাকে। কিছু দিন যেতে-না-যেতেই স্বামী স্ত্রীকে বলল, কি হলো তোমার? তোমাকে খুব ভারী-ভারী মনে হচ্ছে। স্ত্রী বলল, এমনিতেই একটু পেরেশানি। স্বামী তাকে তার সাথে যাওয়ার জন্য বলল, যেখানে বাগবাগিচা, ক্ষেত-খামার, বিল ইত্যাদি অনেক মনোমুগ্ধকর জিনিস আছে। বলল, ওখানে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলে তোমার মনের অবস্থা একদম পাল্টে যাবে। সে তার স্বামীর কথায় তার সাথে সেখানে চলে যায়। সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে সময় কাটাল। তারপর এক সময় সেখানকার কূপের পাশে এসে বসল এবং কূপের ভেতরে তাকিয়ে কী যে দেখতে লাগল। স্বামী এসে বলল, ঘরে চলো; রাত নামছে। স্ত্রী বলল, এখনই উঠছি। স্বামী জিজ্ঞেস করল তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কূপের ভেতর তাকিয়ে কী দেখছ? স্ত্রী উত্তর দিল, এমনিতেই কূপটা দেখছি। এবার স্বামী বলল, সত্যি করে বলো তুমি আসলে কী দেখছ? স্ত্রী বলল, দেখছি, কূপের মধ্যে বালতি ফেললে বালতি পূর্ণ হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে; অথচ পানি আগের মতো থাকে। কমতির কোনো ছাপও দেখা যায় না। পানিও খতম হয় না। স্বামী বলল, ওহে আল্লাহর বান্দি! কূপে তো পানি দিন-রাত উঠতেই থাকে। যতই এর থেকে পানি উঠানো হোক-না কেন এর পানি কমবে না। স্ত্রী বলল, তাহলে কি এমনই হয়? স্বামী উত্তর দিল, হ্যাঁ এমনই হয়ে থাকে কূপের পানি খতম হয় না। এবার স্ত্রী বলল, যদি কূপের পানি বন্ধই না হয়, তবে তো আল্লাহ আমাদের ঘরেও একটি কূপ দিয়েছেন। ওই রন্ধনশালাটা তো কূপেরই মতো। তবে তুমি কেন এই ভেবে ভয় পাচ্ছ যে, মানুষ যদি সেখান থেকে খেতে থাকে, তবে তোমার সম্পদ শেষ হয়ে যাবে?

স্বামীর কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল এবং দ্বিতীয়বারের মতো সেটা চালু করে দিল। মানুষ তো বলে, যত দিন ওই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জীবিত ছিলেন, ততদিন মানুষের জন্য তার রন্ধনশালা উন্মুক্ত ছিল।

বরকতের উপকরণ

এখন অন্তরে প্রশ্ন জাগতে পারে, বরকতের উপকরণগুলো কী? শুনে রাখুন, বরকত অর্জনের অনেকগুলো মাধ্যম আছে।

১. তাক্ওয়া : তাক্ওয়ার কারণে আল্লাহ মানুষের জান-মাল, সন্তান, রিযিক, সম্মান, দীন মোটকথা সর্ব বিষয়ে বরকত দান করেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন–

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

যদি এ গ্রামবাসী ঈমান আনত এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও জমিন থেকে বরকতসমূহ খুলে দিতাম।[১০৮]

তো যে বান্দা তাক্ওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার জীবনে বরকত দান করবেন। এটি কুরআনের ফয়সালা। এটি সমগ্র জগতের জন্য সদকাস্বরূপ। এটি একটি পাকাপোক্ত ও সন্দেহাতীতভাবে ঘোষিত সত্য কথা যে, তাক্ওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ পাক বরকত দান করেন। এ কারণেই তো দেখা যায়, আল্লাহওয়ালাদের রিযিকের কোনো অভাব হয় না।

আমার এক বন্ধু বলেন, আমি এক আল্লাহওয়ালার কাছে গিয়ে তাকে আল্লাহর নিকট আমার এবং আমার সন্তানের জন্য দু'আর অনুরোধ জানলাম। তিনি দু'আ করলেন। আল্লাহ একসময় আমাকে একটি সন্তানও দান করলেন। তো আমি হাদিয়াস্বরূপ তাকে এক রুপি দিলাম। বললাম, হযরত! আপনার তো অনেক খরচ, সব সময় আপনার ঘরে অনেক মেহমান হয়। এ একটা রুপি রেখে দিন; আপনার হয়তো কাজে আসবে। তিনি জবাব দিলেন, আমি একটি লাইব্রেরিতে কিছু কাজ করি। সেখান থেকে আমি মাসিক পঁচিশ রুপি ভাতা পাই। এই পঁচিশ রুপিও তো খরচ করে শেষ করতে পারি না। বাস্তবতাও এমন যে, আল্লাহওয়ালাদের পঁচিশ রুপি শেষই হয় না।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর কাছে এক লোক এসে আরজ করল, হযরত! আমার হজ করার ভীষণ আগ্রহ। কিন্তু হজ্বের যে আসবারের প্রয়োজন, তার কিছুই আমার নেই। আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ যেন ব্যবস্থা করে দেন। হযরত একটা থলে এনে তাকে দিয়ে বললেন, যাও এটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। এখান থেকে খরচ করো এবং যা বাঁচবে, তা আমাকে ফেরত দেবে। লোকটি তা পকেটে পূরে গ্রামের বাইরে চলে গেল। পথে একটি কাফেলা দেখতে পেল। কাফেলার লোকেরা তার নিকট হতেই তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় যাবে? শুনে লোকটা বলল, আমিও তো হজ করতে চাই। শুনে কাফেলার লোকেরা বলে উঠল, আরে ভাই! তুমি আমাদের সাথে

---

১০৮. সূরা আরাফ : আয়াত ৭৬

চলো, আমাদের এক সাথী আসার কথা ছিল। কিন্তু কোনো কারণে আসতে পারেনি। তাই আমাদের কাছে খালি একটা উট আছে। এটা তুমি ব্যবহার করবে। আর খানাও খাবে আমাদের সাথে। ব্যাস সে তাদের মেহমান হয়ে বাইতুল্লাহ যেয়ারত করল।

ফেরার পথে এ ধরনের আরেকটা কাফেলার সাথে তার দেখা হলো। তারা বলল, আমাদের এক সাথী হারিয়ে গেছে। তার উটটা খালি পড়ে আছে। তুমি যেখানে যাবে আমরা সেখানে যাব। তো সে তাদের সাথে ফিরে এল। ফেরার পর লোকটি জুনায়েদ (রহ.)-এর কাছে গেল। হযরত তার কাছে হজের বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। লোকটি বলল, হযরত! আপনার থলের একটা টাকাও খরচ হয়নি। হযরত বললেন, ঠিক আছে; থলেটা আমাকে দিয়ে দাও।

কেয়ামত যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন সমগ্র দুনিয়ায় ঈমানদারে ভরে যাবে। হাদীছে এসেছে, এ-সময় আল্লাহ এত বরকত দেবেন যে, এক গাভির দুধ এক খান্দানের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এর কারণ একমাত্র তাক্ওয়া।

২. যিকরে ইলাহী : যেমনিভাবে আল্লাহর সত্তার মাঝে বরকত আছে, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর নামের মধ্যেও বরকত নিহিত আছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

বরকতময় সেই সত্তা, যার হাতে রাজত্ব।[১০৯]

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ

বরকতপূর্ণ তোমার প্রভুর নাম।[১১০]

যেহেতু আল্লাহর সত্তা বরকতময়, তার নামও বরকতময়, কাজেই যে বান্দা প্রত্যেক ভালো কাজে বিসমিল্লাহ বলায় অভ্যস্ত হবে, আল্লাহ তার কাজে বরকত দান করবেন। বরং মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, "اسم" শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটা অর্থ 'নাম'। যেমন– আমরা বলি, শুরু করছি প্রভুর নামে। আরেকটি হলো বরকত। এই হিসেবে বিসমিল্লাহর অর্থ দাঁড়ায় 'শুরু করছি আল্লাহর বরকতের মাধ্যমে'।

---

১০৯. সূরা মুলক : আয়াত ১

১১০. সূরা আর-রহমান : আয়াত ৭৮

আমি ছোটকালে দেখতাম, যে মহিলা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধা হতো, সে উঠতে-বসতে 'আল্লাহ বরকত দাও! আল্লাহ বরকত দাও!' বলে প্রার্থনা করত। আজ তো আমার মনে হচ্ছে সত্যি বড় ছবক ছিল সেই কথাটির মাজে।

যাহোক, যে-ব্যক্তি উঠতে-বসতে সব কাজে বিসমিল্লাহ পড়ে এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ তার কাজে বরকত দান করেন।

৩. আল্লাহর দরবারে দু'আ : বরকতের তৃতীয় মাধ্যমটি হচ্ছে আল্লাহর দরবারে দু'আ। বান্দা যখন পূর্ণ ইখলাছের সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তার কাজে বরকত দান করেন। যেমন–

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত কম ছিল। কিছুই স্মরণ থাকত না। আমি রাসূলের কাছে অভিযোগ করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দু'আ দিলেন যে, পরবর্তী কালে তিনিই রাসূলের হাদীছ বর্ণনা করতে সবচেয়ে বেশি সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহ তার স্মৃতিশক্তিতে বরকত দিয়েছেন।

হযরত আনাস (রাযি.) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কনিষ্ঠ খাদেম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য তিনটি জিনিসের দু'আ করেছেন–

১. সন্তানের বরকত।

২. রিযিকের বরকত।

৩. হায়াতের বরককত।

তিনি বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই তিনটিতে এত বরকত দান করেছেন যে, আমার জীবদ্দশায় আমার সন্তান ও নাতি-পুতির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪০। তাদের আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তো আল্লাহ সন্তানের মাঝে বরকত দান করেছেন।

তারপর রিযিকের ব্যাপারে তিনি বলেন, আল্লাহ আমার রিযিকে এত বেশি বরকত দান করেন যে, আমি লাকড়ি কাটার কুড়াল দিয়ে স্বর্ণের ইট গুড়া করতাম। কি ভাইয়েরা! যে সোনার চাকা কুড়াল দিয়ে ভাঙা হয়, তা কি কয়েক তোলার? আল্লাহ রিযিকে বরকত দিয়েছেন।

আর হায়াতেও বরকত দান করেছেন। তার বয়স ১০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকতে আল্লাহ তার সন্তান, রিযিক ও হায়াতে এমন বরকত দান করেছেন।

৪. বড়দের সোহবত : বরকত অর্জনের চতুর্থ মাধ্যম হচ্ছে বড়দের সাহচর্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ

বরকত তোমাদের বড়দের সাথে।

মানুষের জীবনের দুটি দিক আছে। একটি হলো দুনিয়ার। কাজেই কোনো ব্যক্তি দুনিয়ায় বসবাসকালে যদি মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণ করে এবং তাদের খেদমত করে দু'আ নেয়, আল্লাহ তার রিযিকের মাঝে বরকত দেন। দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে দীনের। কাজেই দীনি বিষয়ে যদি কেউ তার ওস্তাদ ও শায়খের খেদমত করে এবং তাদের দু'আ নেয়, আল্লাহ তার দীনি বিষয়ে বরকত দান করেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন। এক নওজোয়ানের মা-বাবার খেদমতের অনেক শখ ছিল। সে তার ভাইদের বলে দিল, সব সম্পত্তি তোমরা নিয়ে নাও আর মা-বাবার খেদমত আমাকে দিয়ে দাও। শুনে তো ভাইয়েরা মহাখুশী। তারা তা-ই করল। যুবক মা-বাবার সেবা করে দু'আ নিতে লাগল। মা তার রিযিকের জন্য দু'আ করলেন। এক সময় তার মা-বাবা পরলোকগমন করেন। এক রাতে সে স্বপ্ন দেখল, এক লোক তাকে বলছে, অমুক জায়গায় একটা পাথরের নিচে ১০০ দিনার আছে? তুমি এগুলো উঠিয়ে নাও। লোকটা যেহেতু সবসময় মায়ের কাছে বরকতের কথা শুনত, তাই তাকে জিজ্ঞেস করল, ভাই! তাতে কি বরকত আছে। জবাব এল, না তাতে বরকত নেই। লোকটি তাৎক্ষণিক বলে উঠল, আমি তা নেব না। সকালে উঠে স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা বললে স্ত্রী পরামর্শ দিল নিয়ে আসো। লোকটি বলল, না। কারণ, তাতে বরকত নেই।

দ্বিতীয় দিনও ঠিক একই স্বপ্ন দেখল। কিন্তু এবার দিনারের পরিমাণ দশটি। লোকটি আগের মতো আজও বরকতের কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর এল, তাতে বরকত নেই। লোকটি তাও নিতে অস্বীকার করল। স্ত্রীকে সকালে উঠে স্বপ্নের কথা বললে স্ত্রী নিয়ে আসার জন্য বলল। কিন্তু লোকটি অনড়। বরকতহীন জিনিস নেবেই না সে। স্ত্রী বলল, তবে পরিক্ষামূলক গিয়ে দেখে আসো সত্যিই ওই পাথরের নিচে দিনার আছে কি-না। সে তা-ও করতে অস্বীকার করল।

তৃতীয় রাতে আবার সে একই স্বপ্ন। এবার বলল ১টি দিনারে কথা। লোকটি বরকতের কথা জিজ্ঞেস করলে বলল, হ্যাঁ এটাতে বরকত আছে। সকালে উঠে লোকটি উক্ত স্থানে গেলে দিনার পেয়ে গেল। দিনারটা নিয়ে ফেরার পথে তার শখ জাগল, একটু ভালো-মন্দ খেলে খারাপ হয় না। দীর্ঘ দিন ধরে ভালো কিছু খাওয়া হয় না। পথেই এক লোককে বড় একটা মাছ নিয়ে যেতে দেখল। সে কয়েকটা টাকায় তা কিনে নিল। বাড়ি এসে স্ত্রীকে বলল, খুব ভালো করে এটা রান্না করো। স্ত্রী সেটা কাটলে ভেতর থেকে একটি মুক্তা বেরিয়ে এল। তারপর লোকটি ওই মুক্তা স্বর্ণকারের কাছে এতো চড়া দামে বিক্রি করল যে, তার সারা জীবনের খরচের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বরকত হারিয়ে যাওয়ার কারণসমূহ

বরকত হারিয়ে যাওয়ার কতগুলো কারণ আছে।

১. নিয়তের গোলমাল : এক নম্বর কারণ নিয়তের সমস্যা। যখনই কোনো বান্দার নিয়তে গরমিল দেখা দেয়, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বরকত খতম করে দেওয়া হয়। এটা তো এক আজিব বিষয়। অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। অন্তর ঠিক, বরকত ঠিক। অন্তরে সমস্যা, বরকতে সমস্যা।

যখন বাদশাহর নিয়ত পরিবর্তন হয়

মাওলানা রুমি (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন। এক বাদশাহ ছিলেন। একবার তিনি শিকারে বের হলেন। ফেরার পথে তার প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেল। তিনি পাশের একটা আনার বাগানে ঢুকে পড়লেন। নিজের বাহনটাকে পাশে বেঁধে বাগানের মালিককে বললেন, কিছু পান করাও। লোকটা তার মেয়েকে বলল তার জন্য আনারের শরবত আনার জন্য। মেয়েটি গিয়ে একটি আনার ভাঙল আর একটার রসেই গ্লাস ভরে গেল। বাদশাহ রসে ভরা আনারের গ্লাসটা পান করে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। পরক্ষণেই তার মনে হলো, এ ধরনের বাগানের মালিক তো বাদশাহর হওয়ার দরকার। তাই তিনি মনে-মনে স্থির করলেন, নামমাত্র কিছু দাম দিয়ে তার থেকে উক্ত বাগান ক্রয় করে নেবেন। প্রথম গ্লাসটা পান করা শেষ হলে বললেন, আরেক গ্লাস দাও। এবার যখন মেয়েটা গেল, তখন একটা আনারের মাধ্যমে গ্লাসের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ হলো। আরেকটা ভাঙলে আরও অর্ধেক পূর্ণ হলো। সর্বশেষ তিনটা ভাঙার পর গ্লাস পূর্ণ হলো। এবার যখন বাদশাহ পান করতে গেলেন,

তখন আগের মতো স্বাদ পেলেন না। তাই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো? আনার কি ভিন্ন গাছ থেকে এনেছ? মেয়েটা ছিল খুবই বুদ্ধিমতী। সে বলল, বাদশাহ নামদার! গাছ তো একটাই। আমার মনে হয়, আপনার নিয়তের কোথাও গরমিল দেখা দিয়েছে।

তো তার এমন নিয়তের কারণে বরকত শেষ হয়ে গেল। আজ আমাদের নিয়ত পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, অধিংকাংশেরই নিয়ত গলদ। যার কারণে না আছে জীবনে বরকত, না আছে দীনে বরকত। কোনো কিছুতেই বরকত নেই। তবে কিছু লোকের নিয়ত এখনও ঠিক আছে।

ভালো নিয়তের ফলে কোটিপতি!

কাল আমার সাথে একটা লোকের সাক্ষাৎ হয়। সে বলল, আমি যখন চাকুরি ছেড়ে দেই, তখন আমার কাছে এক লক্ষ টাকা ছিল। আমি এর মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করলাম। পরবর্তী কালে এক প্রতারণার শিকার হয়ে সেই এক লক্ষ টাকাও হারালাম। আমার আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। তারপর এক বুযুর্গের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি তার কাছে দু'আ চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন, ভাই! রিযিকদাতা কে? আমি বললাম, আল্লাহ। তিনি বললেন, তবে তোমার এত টেনশনের কী আছে? বরং এমন নিয়ত করো যে, হে আল্লাহ! আমি কারও হক মেরে খাব না। কেউ যদি আমার হক খেয়ে থাকে, তবে আমি মাফ করে দিলাম। তবে যেন এমন না হয় যে, হাশরের ময়দানে সে আমার ঘাড় ধরে টান দেয়। লোকটা বলল, তার কথা অনুযায়ী আমি তা-ই করলাম। তারপর ছোটখাট একটা চাকরি নেই। আল্লাহ তা'আলা কয়েক বছরের মধ্যে আমাকে কোটিপতি বানিয়ে দেন।

বরকতের ফয়সালা

বানুতে এক বড় লোকের সাথে আমর সাক্ষাৎ হয়েছে। সে বলল, আমি অনেক দরিদ্র ছিলাম। আমার পেশা ছিল মজুরি। আমি মনে-মনে নিয়ত করি, হে আল্লাহ! আমি প্লাট কিনে তারপর তা বিক্রি করব। কিন্তু বিক্রিত টাকা দিয়ে সর্বপ্রথম তোমার ঘর নির্মাণ করব। ব্যস, সে এ নিয়ত করে নিল। সে বলল, তারপর আমি উক্ত কাজ শুরু করে দেই। দশ বছরের মধ্যেই আল্লাহ আমাকে শ্রমিক থেকে কোটিপতি বানিয়ে দিলেন। তো সে শুধু নিয়তই করেছিল। অর্থাৎ– আমি তোমার ঘর বানাব আর আল্লাহ এর মাধ্যমেই বরকতের ফয়সালা করে দিলেন।

২. আল্লাহর নাফরমানি : বরকত খতম হওয়ার দ্বিতীয় কারণ গুনাহ। গুনাহের কারণে আল্লাহ রিযিকের বরকত উঠিয়ে নেন। তাই তো দেখা যায়, এমন অনেক লোক আছে, যাদের টাকা-পয়সার অভাব নেই। কিন্তু সেই টাকার মাঝে কোনো বরকত নেই। বরং সে অন্যদের তুলনায় বেশি পেরেশান থাকে। আল্লাহ তা'আলা অধিক মাল দেন। কিন্তু গুনাহের কারণে ছেলেদের বদদীন করে দেন। সম্পদ তো বেশি কামাই করে; কিন্তু অনেক সময় মানুষ অবাধ্য বেদীন হয়ে থাকে। আর এ-কারণে শান্তি পাওয়া যায় না। কোনো লাভ নেই এমন মালের মধ্যে।

সুদের লানত এমন মারাত্মক যে, আমি আমার জীবনে শত-শত সুদখোরের পতন দেখেছি। এর কারণ হলো, সুদ খাওয়া তো আল্লাহ আর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। সুদখোরের মালের মধ্যে কীভাবে বরকত হতে পারে? অনেক লোক দেখেছি, তারা ছোটখাট হালাল কাজ করে থাকে। একসময় তার মাথায় ব্যবসা বাড়ানোর ভূত চাপে আর এ-কারণে সে ব্যাংক থেকে হারাম লোন নেয়। পরে লোনের টাকা তো হারালই; নিজের মূল পুঁজিটাও গচ্ছা যায়।

৩. কুদৃষ্টি : বরকত নষ্ট হওয়ার তৃতীয় কারণ কুদৃষ্টি। আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন, যত মহিলাই বেপর্দায় অভ্যস্ত, বাজারে ওড়না গায়ে দিয়েই ঢুকে পড়ে, চেহারাটা খুলে রাখে, দোকানদারের সাথে খোলামেলা কথা বলে, তাদের থেকে বরকত উঠে যায়। এর কারণ কী? কারণ হলো, তাদের স্বামীরা তাদের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। তারা তাদের স্বামীর সাথেই থাকে। তার সাথেই জীবন অতিবাহিত করে। সব কিছু করা সত্ত্বেও স্বামীর অন্তর তাদের প্রতি ধাবিত হয় না। আর এ-কারণে ওই মহিলারা সবসময় চিন্তিত থাকে এভাবে যে, আমার স্বামী মনে হয় অমুকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। মূল কারণ তো এটাই যে, তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে। তাই আল্লাহ তাদের থেকে বরকত উঠিয়ে নিয়েছেন। পর্দানশীন, দীনি চেতনায় বলীয়ান মহিলারা যদি সুশ্রী না-ও হয়, তবুও আল্লাহ তাদের মাঝে এমন বরকত দান করেন যে, স্বামী তাদের মাধ্যমে আত্মিক শান্তি পেয়ে থাকে।

আমরা যদি নিজেদের জীবনে, হায়াতে, রিযিকে, মান-সম্মানে সব কিছুতে বরকত কামনা করে থাকি, তাবে আমাদের প্রথমত সব প্রকারের গুনাহ থেকে পাক্কা তাওবা করে তাক্ওয়ার জিন্দেগি অবলম্বন করতে হবে।

তারপর দেখবেন, বরকতের ধারা কীভাবে জারি হয়। আল্লাহ কীভাবে বরকত দেন। আমাদের জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান এই নয় যে, পাঁচ টাকা আয় করছি তো দশ টাকার জন্য চেষ্টা চালাব বা দশ টাকা আয় করছি; তখন বিশ টাকার জন্য চেষ্টা করব, যাতে সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। না ভাই! আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান হবে একমাত্র বরকতের মাধ্যমে। যখন জীবনে বরকত আসবে, তখন আল্লাহ অন্তরের পেরেশান দূর করে দেবেন এবং স্বাচ্ছন্দপূর্ণ এক অপূর্ব জীবন আমাদের দান করবেন।

বরকত লাভের দু'আসমূহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ থেকে বরকত হাসিলের জন্য দু'আ শিখিয়ে গেছেন। তার কয়েকটি উদাহরণ দেখুন–

একবার সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো খানা খাই; কিন্তু পেটে ক্ষিধে থেকে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সম্ভবত তোমরা পৃথক-পৃথক খানা খাও। তারা উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমরা একা খানা খাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যদি এক সাথে বসে খানা খাও এবং খাওয়া শুরুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়, তবে আল্লাহ খাবারের মাঝে বরকত দেবেন। এর পাশাপাশি তিনি খানা খাওয়ার সময় বরকতের জন্য আরও কিছু দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন–

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ

শুরু করছি আল্লাহর নামে এবং তার বরকতের ওপর।

বরং দস্তরখান বিছানোর পর খাবারে বরকতের জন্যেও দু'আ শিখিয়েছেন। সেই দু'আ হলো এই–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

হে আল্লাহ এতে বরকত দান করো এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার আমাদের খাওয়াও।

যে-ব্যক্তি মেহমানের সেবা করছে আর মেহমানের খাবারে যেন বরকত হয় এজন্য তাকেও দু'আ শিখিয়ে গেছেন।

সেটা হলো–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

হে আল্লাহ! যে খাবার আপনি তাদের রিযিক হিসেবে দিয়েছেন, তাতে বরকত দান করুন এবং তাদের ক্ষমা করুন ও রহম করুন।

দুধ আল্লাহর অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি নেয়ামত। দুধ পান করার দু'আও শিখিয়ে গেছেন। তা হলো–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

হে আল্লাহ এই দুধে বরকত দান করুন এবং এর চেয়ে বেশি দান করুন।

সিজনের নতুন ফল গাছে এলে সাধারণত ছোট বাচ্চাকে দেওয়া হয়। যখন ওই ফল দেখা যায় তখন পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا

হে আল্লাহ! আমাদের ফলের মাঝে বরকত দানন করুন, বরককত দিন আমাদের শহরের মাঝে এবং ছোট-বড় সর্ব পাত্রের মাঝে।

তওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে অবস্থানের সময়ও বরকতের দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন। সেই দু'আটি হলো–

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে রিযিক দিয়েছ, তার ওপর আমাকে তুষ্ট করে দাও এবং তাতে তুমি বরকত দাও এবং যারা অনুপস্থিত (আমার পরিবার) তুমি তাদের জন্য মঙ্গলের মাধ্যমে আমার খলিফা হয়ে যাও। (অর্থাৎ তাদের হেফাযত করো)।

দুরুদে ইবরাহীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহর দরবারে রহমত বর্ষণের দু'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেখানে নবীজির ওপর বরকতের নাযিলের দু'আও শেখানো হয়েছে। সেজন্য আমরা দুরুদে ইবরাহীমে এই দু'আটি পড়ে থাকি–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বরকত নাযিল করুন। নাযিল করুন তার পরিবারের প্রতি যেমনিভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ.) এবং তদীয় পরিবারবর্গের প্রতি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও।

এ ছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কেউ শুধু السلام عليكم বলে, তবে তার জন্য দশটি নেকি। আর যদি ورحمة الله বাড়ায় তবে বিশ নেকি। এর সাথে যদি وبركاته যোগ করে তবে ত্রিশ নেকি। আর এই সালামেই হলো পরস্পর সাক্ষাতের সবচেয়ে বড় আদাব। আর এর মধ্যে আমরা একে অপরকে বরকতের দু'আ দিয়ে থাকি।

নব বিবাহিত বরকে যে দু'আ দেওয়া হয় তাতেও রয়েছে বরকতের কথা। কারণ পড়া হয়–

بَارَكَ اللهُ لَكَ بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

আল্লাহ তোমাকে মোবারক করুন। তোমার ওপর বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের উভয়ের সাথে কল্যাণের সমাবেশ ঘটান।

বাহনটা কোথাও দাঁড়িয়ে গেলে তখনও বরকতের জন্য দু'আর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। চাই সে দাঁড়ানোটা অত্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য হোক। দু'আটি হলো–

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

হে আল্লাহ! আমাদের অবতরণ এক বরকতময় স্থানে করুন। আর আপনিই সর্বোত্তম তাদের মধ্যে যারা অবরতণ করায়।

উজুর মাঝেও বরকতের দু'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তখন পড়তে হয় নিম্নোক্ত দু'আটি–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ۔

হে আল্লাহ! আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমার ঘর সুপ্রশস্ত করে দিন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন।

রিযিকে বরকতের জন্য নিম্নোক্ত দু'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনি আপনার বরকত, রহমত, দয়া ও রিযিকের চাদর বিছিয়ে দিন।

কোনো বস্তিতে প্রবেশের প্রাক্কালেও বরকতের দু'আ শিখানো হয়েছে। তখন নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ বস্তিতে বরকতের ব্যবস্থা করে দিন।

এক হাদীছে এসেছে, যে-ব্যক্তি প্রতিদিন পঁচিশবার পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي الْمَوْتِ وَفِيْ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ

হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুতে বরকত দাও এবং মৃত্যু পরবর্তী যিন্দিগীতে বরকত দাও।

তবে আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন, প্রকৃত বরকত তো এটাই এ ধরনের আরও অসংখ্য অগণিত দু'আ বরকত অর্জনের জন্য শিখানো হয়েছে। আল্লাহ আমাদের দুনিয়া, আখিরাতে বরকত দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ইসলামি শিক্ষার নির্যাস

'নছিহত এক জিনিস আর ছিদ্রান্বেষণ অন্য জিনিস। আমরা ছিদ্রান্বেষণ বেশি করে থাকি আর নছিহত করি কম। নছিহতে থাকে অন্তরের ব্যথা, ভালোবাসা, আপনত্ব আর অকৃত্রিম কল্যাণ কামনা। পক্ষান্তরে ছিদ্রান্বেষণে থাকে শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মানুষ এটা পছন্দ করে না। বরং নছিহতই মানুষের পছন্দ। আম্বিয়া কেরাম নিজ সম্প্রদায়কে বলতেন, আমি তোমাদের জন্য নছিহতকারী (কল্যাণকামী) ও বিশ্বস্ত। দেখলেন তো, তারা নছিহতের কথা বলছেন। বান্দা যখন অন্তরের দরদ নিয়ে কাউকে সদুপদেশ দেয়, তখন তা অভাবনীয় কল্যাণ বয়ে আনে।'

ইসলামি শিক্ষার নির্যাস

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

নছিহতের মাধ্যমে কল্যাণ সাধন

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

আপনি উপদেশ দিয়ে যান। নিশ্চয় তা মুমিনের জন্য উপকারী।[১১১]

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে, যেন সে নছিহতের মাধ্যমে কল্যাণ লাভে ধন্য হয়। বাহ্যিকভাবে সে নছিহত না মানলেও এবং নিজের অভ্যন্তরীণ জগত পাপে ভরে থাকার কারণে যদি তা মেনে নাও চলে তবু সে ওই কল্যাণকামিতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। যেমনটি হয়েছিল হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে। কাফেরদের নছিহত করলে যদিও তারা বাহ্যিকভাবে তা প্রত্যাখান করত; কিন্তু তাদের অন্তর তা মেনে নিয়েছিল। কুরআন মাজীদ দ্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে–

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ

তারা তাকে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) চিনে যেমন চিনে নিজেদের ছেলেদের।[১১২]

---

১১১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৫৫

১১২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৬

তারা তাঁকে চিনে নিয়েছে; কিন্তু স্বীয় বিদ্বেষের কারণে তারা তাকে অস্বীকার করেছে এবং নিজ গোঁড়ামির ওপর অটল রয়েছে–

ফলকথা, নছিহত মানুষের জন্য কল্যাণকর। চাই তা কোনো দেওয়ালে লেখা থাকুক না কেন। আর কেনই বা তা হবে না? সুস্থ বিবেকের অধিকারী প্রতিটি মানুষ নছিহত শুনলে তা কবুল করে নেয়। কিন্তু যদি হয় তার অন্তর কলুষিত, তা হলে এর দ্বারা তার গোস্বা-ই বাড়ে।

কল্যাণকর কথা তার ভালো লাগে না, তার গায়ে দাহ সৃষ্টি করে। কিন্তু সুস্থ তবিয়তের মানুষ তা অকপটেই গ্রহণ করে নেয়।

কে কাকে নছিহত করবে

কুরআন কারীমের একটি সূরার নাম 'লোকমান'। লোকমান হাকীম আল্লাহর এক প্রিয় বান্দা ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে নছিহত করেছেন। ওই নছিহত আল্লাহর খুব পছন্দ হয়। এত পছন্দ হয় যে, কুরআনে তার নামে একটি সূরা নির্ধারণ করে তাতে তার নছিহতগুলো উল্লেখ করেছেন। এ আমলটি তথা বাবার নছিহত ছেলের প্রতি আল্লাহর খুবই পছন্দ হয়। তাই কর্তব্য হচ্ছে, বড় ছোটকে এবং ওস্তাদ শাগরেদকে নছিহত করবেন। আমাদের বুযুর্গগণ বলে গেছেন, যে-ঘরের কর্তা তার ঘরের লোকদের নছিহত করে না, সেই ঘরের জীবিত আর মৃত লোকদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই এ দায়িত্বটি পালন করা চাই।

নছিহত ও ছিদ্রান্বেষণ

'নছিহত এক জিনিস আর ছিদ্রান্বেষণ অন্য জিনিস। আমরা ছিদ্রান্বেষণ বেশি করে থাকি আর নছিহত করি কম। নছিহতে থাকে অন্তরের ব্যথা, ভালোবাসা, আপনত্ব আর অকৃত্রিম কল্যাণ কামনা। পক্ষান্তরে ছিদ্রান্বেষণে থাকে শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মানুষ এটা পছন্দ করে না। বরং নছিহতই মানুষের পছন্দ। আম্বিয়া কেরাম নিজ সম্প্রদায়কে বলতেন, আমি তোমাদের জন্য নছিহতকারী (কল্যাণকামী) ও বিশ্বস্ত। দেখলেন তো, তারা নছিহতের কথা বলছেন। বান্দা যখন অন্তরের দরদ নিয়ে কাউকে সদুপদেশ দেয়, তখন তা অভাবনীয় কল্যাণ বয়ে আনে।'

লোকমান হাকীম তো নিজ সন্তানকে নছিহত করেছেন। মানুষ কুরআনে তা পাঠ করছে। এ উম্মতের মাঝে নছিহতের এই ধারা চালু হয়। আমাদের আকাবিরগণ ছোটদের নছিহত করে যেতেন।

ইমাম জা'ফর সাদেক (রহ.)-এর নছিহত

ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) বলেন, আমাকে আমার পিতা ইমাম বাকের (রহ.) নছিহত করে বলেছেন, হে বৎস! পাঁচ ধরনের মানুষের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবে না। রাস্তায় চলাকালে তাদের সাথে চলবে না। কারণ, সেই পাঁচ প্রকারের সাথে এতটুকু সময়ও মঙ্গলজনক নয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? তিনি বললেন,

১. বেকুফ। তার সাথে বন্ধুত্ব করবে না। কারণ, সে তার জ্ঞানহীনতার কারণে তোমার কোনো উপকারে আসবে না। বরং এ সমস্যার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তোমাকে বিপাকে ফেলবে। আর এ-কারণেই বলা হয় মূর্খ বন্ধুর চেয়ে জ্ঞানী শত্রু ভালো।

২. মিথ্যুক। কারণ, সে তোমার কাছে সব সময় বাস্তবতা গোপন রাখবে। সত্যকে বানাবে মিথ্যা আর মিথ্যাকে বানাবে সত্য।

৩. ফাসেক। কারণ, যে আল্লাহর বান্দা হয়েও তার অবাধ্য হয়, তার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে না, সে কীভাবে তোমার প্রতি আন্তরিক হবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফাসেকের সাথে বন্ধুত্ব কেন করব না? বললেন, সে তোমাকে একটি রুটির বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে। জিজ্ঞেস করলাম, এক রুটি দ্বারা কী উদ্দেশ্য? বললেন এক রুটির আশায় বিক্রি করে দেবে। আর এই অধম বলি, এমনভাবে বিক্রি করবে যে, টেরই পাওয়া যাবে না। এ-কারণেই তো যে ফাসেক ও পাপাচারী হয়, মানুষ তার ওপর ভরসা করতে পারে না।

৪. কৃপণ। কারণ, সে তোমাকে এমন সময় ধোঁকা দেবে, যখন তাকে তোমার খুব প্রয়োজন। সে ওই সময় তোমাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাবে।

৫. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী। সামান্য বিষয় নিয়ে যে আপনজনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। আপনজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তারপর বললেন, কারণ আমি কুরআন মাজীদের তিন জায়গায় এদের ওপর অভিশাপ দিতে দেখেছি। আল্লাহ এদের পছন্দ করেন না।

ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর নছিহত

ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.) কিছু ওসীয়ত করে গেছেন। যেগুলোকে ওসায়ায়ে আবুহানীফা বা আবুহানীফার ওসীয়তনামা বলা হয়। সেই

নছিহতের মধ্যেই তিনি আপন সন্তান হাম্মাদকে বলেন, হে বৎস! আমি পাঁচ লাখ হাদীছের মধ্য থেকে পাঁচটা হাদীছ তোমার জন্য নির্বাচন করেছি। যদি ওই পাঁচ হাদীছ অনুযায়ী চলতে পার, তবে তোমার পুরা দীনের ওপর চলা হয়ে যাবে। একটা কথা বুঝে রাখুন যে, তিনি তাঁর গোটা জীবনের নির্যাস বলে দিচ্ছেন। তিনি বলেন–

১নং হাদীছ হলো–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সমস্ত আমলের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

২নং হাদীছ হলো–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ

অপ্রয়োজনীয় জিনিস বর্জন করা মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

৩নং হাদীছ হলো–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ

তোমাদের কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তা তার অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে না।

৪নং হাদীছ হলো–

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ

হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝে কিছু সন্দেহপূর্ণ বিষয় রয়েছে।

৫নং হাদীছ হলো–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

খাঁটি মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

প্রথম হাদীছের ওপর পর্যালোচনা

ইমাম আযম (রহ.)-এর বর্ণনাকৃত প্রথম হাদীছটি ছিল সঠিক নিয়তের ব্যাপারে।

নিয়তের পরিশুদ্ধি : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

এ মোবারক হাদীছটি বোখারি শরীফের প্রথম হাদীছ। ইমাম বোখারি (রহ.) হাদীছটিকে তার ছহীহ-এর শুরুতে এনেছেন। কারণ, যেহেতু আমলের ভিত্তি নিয়তের ওপর। নিয়ত যদি গড়বড়ে হয়, তবে আমলের কোনো দাম নেই। তবে নিয়তের পরিশুদ্ধি শিখে নিতে হয়। এক বুযুর্গ তো বলেন, আমি আমার শায়খের নিকট আট বছর সময় কাটিয়েছি। আর এই দীর্ঘ সময় জুড়ে আমি শুধু নিয়তের পরিশুদ্ধি শিক্ষা করেছি।

বুঝুন, কত জটিল ব্যাপার। অথচ, আমরা একে কত সহজ ভাবি! আমাদেরকে প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করতে হবে।

জনৈক বুযুর্গ শাগরেদের পক্ষ থেকে দাওয়াত পেয়ে তার ঘরে গমন করেন। শাগরেদ নতুন ঘর বানিয়েছিল। ঘরের ভেতর জানালা দেখে বুযুর্গ শাগরেদকে বললেন, তুমি ঘরে এটা কী বানিয়েছ? শাগরেদ বলল, হুজুর, জানালা। বললেন, এটা কেন? শাগরেদ উত্তর দিল, দিনের বেলা যাতে সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করে এবং বাতাস আসে। তখন বুযুর্গ তার এছলাহ করলেন এই বলে যে, তোমার নিয়ত এমন করা উচিত ছিল যে, এটা বানিয়েছি যাতে আযানের আওয়াজ ঘরে আসে এবং যথাসময় মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে পারি। তাহলে নিয়তের কারণে তোমার ছাওয়াবও হবে আর বাতাস, আলো তো তুমি ফ্রি পেয়েই যাবে। সামনে থেকে জানালা বানালে এ নিয়তেই বানাবে যে, তাহলে ইবাদাতের ছাওয়াব পেয়ে যাবে।

নিয়তের গরমিলের কারণে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত

অনেক সময় মানুষ আমল যথাযথভাবেই করে; কিন্তু নিয়তের সমস্যার কারণে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, যদি কোনো ব্যক্তি ওজন কমানোর জন্য সারা দিন অভুক্ত থাকে– কোনো কিছু পান না করে, স্ত্রীর কাছে গমন না করে এবং এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত করে থাকে, তাহলে কিন্তু তাকে রোযাদার বলা হবে না। অথচ সে তো রোযার আমল করেছে; কিন্তু নিয়তের কারণে রোযার ছাওয়াব পায়নি।

কেউ যদি কোনো বিরান ভূমিতে নামাযের ইচ্ছা করে; কিন্তু তার কেবলার দিক জানা নেই এবং পাশে এমন কেউ নেই, যাকে জিজ্ঞেস করবে,

তবে তার ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম হলো, সে চিন্তা করে ঠিক করবে কেবলার দিক কোনটি এবং যে দিকের ব্যাপারে তার কেবলা হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মাবে, সে দিকে ফিরেই নামায আদায় করবে। এখন যদি সে মুসাফির হয়, তবে তাকে দু-রাকাত নামায আদায় করতে হবে। তো ধরে নিন সে নামায শুরু করে দিল। এক রাকাত আদায় করার পর তার মনে হলো, কেবলা মনে হয় আমার পেছনের দিক, তাহলে এ-ক্ষেত্রে মাসআলা হলো, সে তার পেছনের দিকে ফিরে যাবে এবং বাকি এক রাকাত আদায় করবে। এমন করার দ্বারা তার নামায আদায় হয়ে যাবে।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। একব্যক্তি নামায আদায়ের জন্য জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করল এবং সামানপত্র পেছনে রেখে নামায আরম্ভ করল। এক রাকাত আদায়ের পর তার মনে হলো, আমার জিনিসপত্র পেছনে থাকলে হয়তো চুরি হয়ে যাবে। এভাবে সে তার পেছনে থাকা জিনিসপত্রের দিকে মুখ করে নামায আদায় শুরু করল, যাতে তা চুরি না হয়। এমন করার কারণে ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, তার নামায সহীহ হবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, উভয়জনই তো এক রাকাতের পর ভিন্ন দিকে মুখ করে নামায আদায় করল। কিন্তু প্রথমজনের ব্যাপারে বিধান হলো, তার নামায সহীহ। আর দ্বিতীয়জনের ব্যাপারে বিধান হলো, তার নামায ভেঙে গেছে। এই ভিন্নতার হেতু কী? উত্তরে বলব, নিয়তের ব্যবধান। আর এ-কারণেই তাদের হুকুমের মাঝে এমন বিস্তর ব্যবধান। ভিন্ন দিকে ফেরার দ্বারা প্রথমজনের উদ্দেশ্য সঠিক কেবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করা আর দ্বিতীয়জনের উদ্দেশ্য নিজের সামানপত্র হেফাযত করা।

আমল আর ফে'ল-এর মাঝে পার্থক্য

হাদীছের মধ্যে انما শব্দটি حصر তথা সীমাবদ্ধতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ শুধু এটাই। তারপর বলা হয়েছে اعمال কিন্তু افعال বলা হয় নাই। اعمال ও افعال -এর মাঝে ব্যবধান আছে। فعل বলা হয় নিয়ত ছাড়া কাজকে। আর এটা জানোয়ারের পক্ষ থেকেও হয়ে থাকে। আর اعمال বলা হয় শুধু মানুষের কার্যাবলিকে।

জান্নাতে মর্যাদা আমলের ওপর ভিত্তি করে

এ-কারণে কুরআনে ঈমান ও সৎকর্মের আলোচনা এসেছে। কুরআন মাজীদ খুললে আপনারা জায়গায়-জায়গায় اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (যারা ঈমান

এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে) দেখতে পাবেন। কারণ, ঈমান হলো জান্নাতের চাবি। আর ঈমান যদি জান্নাতের চাবি হয়, তাহলে সৎকর্ম কী গুরুত্ব রাখে? ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, শুধু চাবি তালা খোলার জন্য যথেষ্ট না; বরং তার মাঝে কতগুলো দাঁত থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত সবগুলো দাঁত ঠিক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চাবি ঢোকানো সত্ত্বেও তালা খুলবে না। নেক আমল হলো সেই দাঁতের মতো। তো ঈমানও থাকতে হবে, সৎকর্মও লাগবে। আর এই উভয়ের সম্মিলনে কল্যাণ অর্জিত হবে। আর জান্নাতের দরজা তো আমলের মাধ্যমে নির্মিত হবে। আল্লাহ বলেন–

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا

আর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তার আমলের বিনিময়ে মর্যাদা।[১১৩]

তো আমাদের বেশি-বেশি আমল করতে হবে। কারণ, কেয়ামতের দিন এ আমলই আমাদের কাজে আসবে।

কেয়ামতের দৃশ্যাবলির বিশ্লেষণ

একটি হাদীছে খুবই আশ্চর্য ধরনের বিষয় বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে, যা হযরত সাঈদ ইবনে হাসীব (রহ.) হযরত আব্দুর রহমান (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুব ভোরবেলা সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, 'আমি আজ রাতে একটি আশ্চর্য ধরনের স্বপ্ন দেখেছি। আর আম্বিয়া (আ.)-এর স্বপ্ন সত্যই হয়ে থাকে। এ ছাড়াও আল্লাহ তাঁদের কেয়ামতের দৃশ্যাবলি দেখিয়ে থাকেন।'

১. তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি দেখলাম, আজরাঈল আমার এক উম্মতের জান কবজের জন্য এলে তাঁর মা-বাবার প্রতি সদাচরণ, তাদের সেবা-শুশ্রূষা আজরাঈলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে তার আত্মা কেড়ে নেওয়া থেকে বিরত রাখে। অর্থাৎ– এর উদ্দেশ্য হলো, মাতাপিতার সেবার দ্বারা আল্লাহ হায়াত বাড়িয়ে দেন। যেভাবে সদকা করার দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পায়, ঠিক তেমনিভাবে মাতাপিতার সেবার দ্বারাও হায়াত বৃদ্ধি পায়।

২. আমি দেখেছি, আমার এক উম্মতকে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে অপকর্মে লিপ্ত করাতে চাইল। তখন তার আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যায়। আর ওই

---

১১৩. সূরা আহকাফ : আয়াত ১৯

স্মরণ তাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। কাজেই আমরা যদি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করি, তবে আল্লাহ আমাদের শয়তানের পাঞ্জা থেকে রক্ষা করবেন।

৩. আমি দেখি, আমার এক উম্মতের ওপর কবরের আযাব অবধারিত হয়ে গেছে। তার উজু করার প্রয়োজন হলে সে গুরুত্ব সহকারে উজু করে। তখন তার জন্য অবধারিত কবরের আযাব অপসারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ– গুরুত্বসহকারে উজু করলে কবরের আযাব মাফ হয়।

৪. আমি দেখি, আমার এক উম্মতের ভীষণ পিপাসা পায় এবং এ-কারণে সে হাঁপাতে শুরু করে। সে যখন হাউজে কাওছারের কাছে আসে, তখন তাকে সেখান থেকে পানি পান করা থেকে বারণ করা হয়। এমন সময় তার রোযা এসে তার হাত ধরে তাকে হাউজে কাওছারের দিকে নিয়ে যায় এবং তৃপ্তিভরে পানি পান করায়।

৫. আমি দেখি, এক মজলিসে নবীগণ বৃত্তাকারে উপবিষ্ট। আমার এক উম্মত মজলিসের এক দিকে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ভিন্ন আরেক দিকে যাওয়ার পরও তাকে বসতে দেওয়া হলো না। এমনকি প্রত্যেক দিক থেকে তাকে বাধা দেওয়া হয়। কারণ, তার ওপর ওই সময় গোসল ফরজ ছিল। তারপর তাকে আমার দিকে এনে বসতে দেওয়া হয়। এর দ্বারা বোঝা গেল, কারও ওপর গোসল ফরজ হলে দেরি করতে নেই। ইসলামি বিধান মোতাবেক গোসল করে নেওয়া চাই। অনেককে দেখা যায়, তারা গোসলে অলসতা করে। ভাই, মুত্যুর কি কোনো গ্যারান্টি আছে? আমাদের আকাবিরদের অভ্যাস তো ছিল, গোসল ফরজ হওয়ার সাথে-সাথে তাঁরা গোসল করে নিতেন। কিন্তু বর্তমানে তো গোসলের কারণে অনেকে কয়েক ওয়াক্ত নামায কাজাও করে ফেলে।

৬. আমি দেখি, আমার এক উম্মতকে সবদিক থেকে আঁধার ঘিরে রেখেছে। আর ওই অন্ধকারে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। তখন তার হজ ও উমরা তার সামনে এসে তাকে সেই আঁধারের কবল থেকে রক্ষা করে।

৭. আমি দেখি, আমার এক উম্মত লোকদের একটি দলের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের কেউ তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে না। তখনই তার 'সেলায়ে রেহমী' তার সামনে আসে। 'সেলায়ে রেহমী' বলা হয়, দীনের খাতিরে, দীনি কল্যাণ সাধণে কারও সাথে

সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা। তো তার সেলায়ে রেহমী এসে বলল, হে লোকসকল! এ লোকটি আমাকে হেফাজত করেছে, মেনে চলেছে। এটা শুনতেই লোকেরা তার সাথে মোসাফাহা শুরু করে দিল এবং সখ্য গড়তে লাগল। আর তাকে ওই জামাতের সদস্য করে নিল।

৮. তারপর বললেন, আমি দেখি, আমার এক উম্মত আগুনে ভস্মীভূত হচ্ছে। তখনই তার দান তার কাছে এসে পানির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে আগুন থেকে রক্ষা করল।

৯. আমি দেখি, আমার এক উম্মতকে দোযখের ফেরেশতারা পাকড়াও করে তাকে দোযখে নিতে উদ্যত হয়। এমন সময় তার সৎকাজের আদেশ এসে তাকে তাদের থেকে নিয়ে বেহেশতের ফেরেশতাদের নিকট পৌঁছে দেয়।

১০. আমি দেখি, আমার এক উম্মতের আমলনামা দেওয়া হয়েছে তার বাম হাতে। তখন তার খোদাভীতি এসে তার আমলনামা বাম হাত থেকে নিয়ে ডান হাতে নিয়ে দেয়।

১১. আমি দেখি, এক উম্মত জাহান্নামের কিনারে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। সে প্রায় জাহান্নামে পড়ে যাচ্ছিল এ-সময় তার আল্লাহ ভীতিতে ক্রন্দন এসে তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

১২. আমি দেখি, আমার এক উম্মত জাহান্নামে পড়ে যাচ্ছে। এ-সময় তার আল্লাহর ভয়ে অশ্রুবিসর্জন এসে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে।

১৩. আমি দেখি, হাশরের ময়দানে আমার এক উম্মতের নেকির পাল্লা হালকা হয়ে যায়। এ-সময় তার বাল্যবয়সে মৃত সন্তান এসে তার নেকির পাল্লা ভারি করে দেয়।

১৪. আমি দেখি, আমার এক উম্মত পুলসিরাতের ওপর এমনভাবে দুলছিল, যেমন বাতাসে খেজুরের ডাল দুলতে থাকে। এ-সময় তার আল্লাহর ব্যাপারে উত্তম ধারণা এসে তার দুপা মজবুত করে দেয়।

১৫. আমি দেখি, আমার এক উম্মত পুলসিরাতের ওপর একবার পড়ে যায়, আবার ওঠে। এ-সময় তার নামায এসে তাকে পুলসিরাত পার করে দেয়।

১৬. আমি দেখি, আমার এক উম্মত জান্নাতের সামনে জান্নাতের সব দরজা বন্ধ পায়। এ-সময় তার বেশি-বেশি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ এসে তার জন্য বন্ধ জান্নাতের দরজা খুলে দেয়।

এ দীর্ঘ হাদিছ দ্বারা বোঝা গেল, কেয়ামতের দিন আমল বড়ই কাজে আসবে। আর যেহেতু আমলের ভিত্তি হলো নিয়তের ওপর, তাই আমাদের নিয়ত শুদ্ধ করতে হবে।

খারাপ নিয়তের ক্ষতি

এক হাদীছে এসেছে, কেয়ামতের দিন একজন আলেম, একজন শহীদ এবং একজন দানশীলকে ডাকা হবে, যাদের দুনিয়াতে নিয়তের সমস্যা ছিল। আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ দেবেন, এদের উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। তো ভাববার বিষয় হলো, যদি একজন আলেম, শহীদ ও দানশীল নিয়ত ঠিক না থাকার কারণে জাহান্নামি হয়, তাহলে আমাদের অবস্থা কতখানি নাজুক হতে পারে চিন্তা করুন।

আমল একটি নেকি একাধিক

এক হাদীছ এসেছে, ওলামায়ে কেরাম اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এক আমলের নিয়তের মাধ্যমে একাধিক আমলের ছাওয়াব অর্জন করা যায়। কারণ, আমল করার অঙ্গ অনেকগুলো। আর নিয়ত দিলের সাথে সম্পৃক্ত। আর সেটি একটি। কাজেই যত রকম নফল আছে সবগুলোর মধ্যেই যদি একাধিক নিয়তের সমাবেশ ঘটায়, তাহলে ছাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি ভোর বেলা অফিসে যাবেন। যাওয়ার পথে চিন্তা করলেন, দু-রাকাত তাহিয়্যাতুল উজু, দু-রাকাত ইশরাক, দু-রাকাত সালাতুল হাজাত এবং দু-রাকাত শোকরের নামায পড়ব আর এসব পড়তে গেলে আপনার সময় লাগবে অনেক বেশি। কিন্তু যদি আপনি দু-রাকাতে সবগুলোর নিয়ত করে দু-রাকাতই আদায় করেন, তবে আল্লাহ আপনাকে সবগুলোর ছাওয়াব দেবেন।

হাফেজ ইবনে হাজ্‌র (রহ.) বলেন, মানুষ যে কাপড় পরে, এই কাপড় পরার সময় চার ধরনের নিয়ত করতে পারে–

১. ইত্তিবায়ে সুন্নত ২. সতর ঢাকা ৩. দেহের সৌন্দর্য ৪. শরীরকে ঠান্ডা থেকে বাঁচানো।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, মানুষ যে সুগন্ধি ব্যবহার করে, তার মধ্যে কয়েক প্রকার নিয়ত করা যেতে পারে–

১. এত্তেবায়ে সুন্নত ২. শরীরের দুর্গন্ধের অবসান ৩. মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি ৪. আপন সাথীকে সুগন্ধি বিলানো।

ওলামায়ে কেরাম আরও লিখেছেন, কেউ যদি কোনো মসজিদে বসা থাকে, এই বসার মাধ্যমে সে কয়েকটি নিয়ত করতে পারে। যেমন–

১. ইত্তিবায়ে সুন্নত ২. নামাযের অপেক্ষা ৩. তেলাওয়াতের নিয়ত ৪. যিকরুল্লাহ্ নিয়ত ৫. দু'আ করার নিয়ত ৬. নিজেকে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এবং অহেতুক কর্ম থেকে বিরত রাখার নিয়ত ৭. মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতের নিয়ত ৮. মসজিদ আবাদের নিয়ত ৯. মসজিদ দেখাশোনার নিয়ত ১০. মসজিদ পরিষ্কারের নিয়ত ১১. মসজিদ থেকে উপকার সাধন এবং মসজিদের উপকার করার নিয়ত।

আর এ-কারণেই এক আবেদ এক আলেমের সমকক্ষ কখনওই হতে পারে না। আলেম তো এক আমলের মধ্যে হাজার নিয়তের কারণে হাজার ছাওয়াব পেতে থাকেন। পক্ষান্তরে আবেদ এক আমলের শুধু একটি ছাওয়াবই পায় নিয়ত একাধিক না থাকার কারণে বা নিয়তের কথা জানা না থাকার কারণে।

আমলের ভিত্তি কীসের ওপর

হাদীছে বলা হয়েছে, আমলের ভিত্তি নিয়তের ওপর। এখন প্রশ্ন হতে পারে, আমলের বিশুদ্ধতার ভিত্তি নিয়তের ওপর, নাকি ছাওয়াবের ভিত্তি নিয়তের ওপর?

আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর

ইমাম আযম (রহ.) বলেন, আমলের ছাওয়াবের ভিত্তি নিয়তের ওপর। এখন কোনো মানুষকে যদি কেউ একজন ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দেয়, তিনি বলেন, তো যেহেতু উজুর সব কাজ সম্পাদন হয়েছে এজন্য উজু হয়ে যাবে। কিন্তু সে এর ছাওয়াব পাবে না। তবে এখানে ফোকাহায়ে কেরামের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

ফকীহদের মতবিরোধে উম্মতের জন্য আসানি

কেউ-কেউ বলে থাকেন, ফকীহগণ মতবিরোধ করেন কেন? তারা এমনটা না করলে তো সব সমস্যা চুকে যেত। ওলামায়ে কেরাম বলেন, তাদের মতবিরোধের মাধ্যমে উম্মতের জন্য রয়েছে আসানি। আর শরীয়তও একে সুদৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। কারণ, একটা হুকুম সব ধরনের মানুষের জন্য তাদের পরিবেশের ভিন্নতার কারণে, স্বভাব ও চালচলনে বৈপরীত্ব থাকার

কারণে তা মেনে চলা অসুবিধাজনক। কাজেই যেহেতু মতবিরোধের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সহজতা দান করেছেন, কাজেই আমরা কেন তাকে খারাপ ভাবব? একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট হয়ে যাবে। কেউ কসম করল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে এক হীন (حين) পর্যন্ত কথা বলব না। আর حين আরবি শব্দ। বহুবচন احيان। আর বহুচনের বহুবচন হলো احايين। এর অর্থ হলো সময়। আর এটা বেশিও হতে পারে, কমও পাতে পারে। যখন সে এই বলে কসম করল, তখন সে খুবই বিপাকে পড়ল– কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। লোকটি সমাধানের জন্য এল হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর কাছে এবং তাকে কসমের ধরন বুঝিয়ে বললে তিনি তাকে বললেন, তুমি কেয়ামত পর্যন্ত তার সাথে কথা বলতে পারবে না। লোকটি জিজ্ঞেস করল, এ ফতোয়ার ব্যাপারে আপনার দলিল কী? বললেন, কুরআনের আয়াত

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

আর তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য আবাসস্থল এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগসম্ভার।[১১৪]

আর এখানে حين এর অর্থ কেয়ামত। আর যেহেতু তুমি حين পর্যন্ত কথা বলবে না বলেছ, তাই কেয়ামত পর্যন্ত তার সাথে কথা বলতে পারবে না।

এবার লোকটি দৌড়ে গেল হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর কাছে এবং কসমের কথা খুলে বলল। জিজ্ঞেস করল, হযরত! আমি কি কখনও আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে পারব? তিনি বললেন, পারবে; তবে চল্লিশ বছর পর। বললেন, আপনার প্রমাণ কী? বললেন, কুরআনের আয়াত

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

অবশ্যই মানুষের ওপর এসেছিল এমন একটি সময়, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুই ছিল না।

মুফাসসিরীনে কেরাম এখানে حين-এর অর্থ করেছেন চল্লিশ বছর। তারপর লোকটি হযরত ওছমান (রাযি.)-এর নিকট গেল এবং কসমের কথা খুলে বললে তিনি তাকে বললেন, তুমি এক বছর পর্যন্ত তার সাথে কথা বলতে পারেব না। জিজ্ঞেস করল, আপনার কাছে এর কী প্রমাণ আছে? বললেন, কুরআনের আয়াত

---

১১৪. সূরা বাকারা : আয়াত ৩৬

تُؤْتِيْ أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا

সে তার ফল দিয়ে থাকে প্রতি 'হীন' আল্লাহর আদেশে।[১১৫]

যেহেতু গাছ প্রতি বছর একবার ফল দেয়, তাই বোঝা গেল, এখানে حين-এর অর্থ এক বছর।

এবার লোকটি হযরত আলী (রাযি.)-এর কাছে এসে কসমের কথা সবিস্তারে আলোচনা করল। আলী (রাযি.) বললেন, তুমি তার সাথে একদিন এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর কথা বলতে পারবে। লোকটি প্রমাণ চাইল। বললেন, কুরআনের আয়াত

فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ۔

তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো সকালে ও সন্ধ্যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তোমরা তার পবিত্রতা বর্ণনা করো অপরাহ্নে ও দুপরে।[১১৬]

এখানে حين শব্দটি এক দিন এক রাত বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটাই হচ্ছে ফোকাহায়ে কেরামের মতবিরোধের নমুনা। প্রত্যেকেই আপন মত ব্যক্ত করেন আল্লাহপ্রদত্ত উৎস তথা কুরআন ও রাসূলের হাদীছকে সামনে রেখে। এখন হয়তো কেউ ১নং অর্থ, কেউ ২নং, কেউ ৩নং, কেউ ৪ নম্বরটা গ্রহণ করবে। কাজেই বোঝা যায়, এই মতবিরোধের সুযোগ আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর কথা

আমাদের উচিৎ নিজেদের নিয়তকে বিশুদ্ধ করার মেহনত করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) ইরশাদ করেন–

رُبَّ عَمَلٍ صَغِيْرٍ تُعْظِمُهُ النِّيَّةُ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيْرٍ تُصْغِرُهُ النِّيَّةُ

অনেক ছোট আমল নিয়তের কারণে বড় আমলে পরিণত হয়। আবার অনেক বড় আমলও নিয়তের কারণে ছোট আমলে পরিণত হয়।

তো এটা হলো নিয়তের কারিশমা।

---

১১৫. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ২৫

১১৬. সূরা রূম : আয়াত ১৭-১৮

নিয়তের তিনটি অবস্থা

যেকোনো আমলের মধ্যে নিয়তের তিনটি অবস্থার যেকোনো একটি অবশ্যই থাকবে–

১. ভালো নিয়তে আমল করা।

২. খারাপ নিয়তে।

৩. কোনো ধরনের নিয়ত ছাড়া।

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এই উম্মত খারাপ নিয়তে আমল করার দ্বারা যতটা ক্ষতিগ্রস্ত, নিয়তবিহীন আমল করার কারণে তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। নিজের জীবনের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, আমরা অনেক কাজ নিয়ত ছাড়া করার কারণে তার ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকি। যদি সেগুলো নিয়তের সাথে করি, তবে অবশ্যই আমরা তার ছাওয়াব পাব। আমাদের নিজের অভ্যাসকে ইবাদত বানাতে হবে।

আমল কীভাবে প্রতিদানযোগ্য হয়

আমরা নিজেদের আমলকে কীভাবে প্রতিদানযোগ্য বানাতে পারি এর কয়েকটি সূরত উদাহরণ হিসাবে দেখুন–

প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যে মাতাপিতার জীবদ্দশায় দৈনিক কয়েকবার তাদের চেহারা দেখে। কিন্তু সে কি কখনও এ নিয়তে দেখে যে, শরিয়ত বলেছে, মাতাপিতার দিকে একবার মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকালে একটা কবুল হজ্বের ছাওয়াব হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! যদি কেউ বারবার তাকায়? তখন তিনি উত্তর দিয়েছেন, তাহলে সে বারবার ছাওয়াব পেতে থাকবে। তাই সে ছাওয়াব পাওয়ার জন্য আমি মায়ের দিকে তাকাচ্ছি। আমরা তো এমন নিয়ত করে দিনের মধ্যে কয়েকটি কবুল হজ আর ওমরার ছাওয়াব লাভে ধন্য হতে পারি। এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায়, যারা নিজের মাতাপিতাকে দেখার সময় এ ধরনের নিয়ত করে।

এমনিভাবে প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীকে এবং প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীকে দেখে মুচকি হাসে। আর এ হাসির মধ্যে শুধু জৈবিক চাহিদার দিকটাই সামনে থাকে। কিন্তু শরীয়ত বলে, স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পরকে দেখে মুচকি হাসে তখন আল্লাহ তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। বলুন, আমাদের কতজনের অন্তরেই এই নিয়ত থাকে। বোঝা গেল, আমল তো করি; কিন্তু নিয়ত না থাকার কারণে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হই।

অনেকে আছে, রাতে শোওয়ার সময় কাপড় পরিবর্তন করে শোয়। রাতে কাপড় পরিবর্তন করে শোওয়া নবী কারীম আলাইহিস সালামের সুন্নত। কিন্তু বলুন তো, আমাদের কজন এমন আছে, যে উক্ত কাজের দ্বারা সুন্নাতের নিয়ত করে? বোঝা গেল, এটা আমরা অভ্যাস হিসেবে করি, ইবাদাত হিসেবে নয়। আর এই নিয়ত না থাকাটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নিয়ত করে কাজকে ইবাদত বানাতে হবে।

প্রত্যেক মা তার সন্তানকে ঘুম পাড়ায় আর ওই সময় তারা নানান রকম কথা বলে। নেককার মায়েরা আল্লাহু আল্লাহু বলে। কিন্তু যাদের মন-মেজায বিগড়ানো, তারা কত কিছু বলে। অথবা বলে ঘুমাও, ঘুমাও। অথচ মহিলাটি যদি একটু বুঝের হয়, তবে সে তার এ কাজটাকে ইবাদাতে পরিণত করতে পারে। আগোর যুগে মায়েরা সন্তানকে ঘুম পাড়ানোর সময় আরবি বুলি শিখাতেন–

حَسْبِيْ رَبِّيْ جَلَّ اللهُ ' مَا فِيْ قَلْبِيْ غَيْرُ اللهِ

এর দ্বারা বাচ্চা ছন্দবদ্ধ কথা শুনতে পেত। মায়েরও বোঝানো হয়ে যেত আর সন্তানও ঘুমিয়ে পড়ত। এ ক্ষেত্রে মা যদি সন্তানকে দু'আ শোনায়, তবে একে তো বাচ্চা তা শুনতে পায়, দ্বিতীয়ত, মা এর জন্য ছাওয়াব পায়। এছাড়াও যে সকল মহিলা আরবি জানেন– যেমন আলেমা মহিলা। তারা তো আরবি শব্দ দিয়ে বিভিন্ন কথা বলতে পারেন। যেমন–

اٰمَنَّا بِاللهِ

'আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।'

صَدَّقْنَا بِرَسُوْلِ اللهِ

'আল্লাহর রাসূলকে সত্যায়ন করেছি।'

نَرْجُو الْجَنَّةَ نَدْخُلُهَا

'আমরা জান্নাতে প্রবেশের আশা রাখি।'

يَوْمُ الْحَشْرِ اِنْ شَاءَ اللهُ

'সেটা কেয়ামতের দিন ইনশাআল্লাহ।'

يَا رَحْمٰنُ عَافِنَا

'হে দয়াময়! আমাদের ক্ষমা করুন।'

وَاعْفُ عَنَّا يَا اللهُ

'হে আল্লাহ! আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন।'

দেখুন, এগুলোও বুলি। কিন্তু সামান্য বিবেক খাটানোর কারণে এটি হয়ে গেল ইবাদাত। প্রত্যেক মা সন্তানকে ঘুম পাড়ানোর জন্য কিছু-না-কিছু বলেই থাকে। তো আমরা কেন ভালো বলে ছাওয়াব অর্জন করব না। কিন্তু কেউ যদি আরবি না জানে, তা হলে নিজের ভাষায় সুন্দর-সুন্দর বুলি বানিয়ে নেবে। এতে সমস্যা নেই। যেমন মেয়েকে ঘুম পাড়ানোর সময় বলল, আমার সোনামণি! ঘুমাও, আল্লাহ খুশি হবেন। মেয়ে আমার! কাঁদে না; জান্নাতের সম্মান পাবে ইত্যাদি। এভাবেই অভ্যাস ইবাদাতে পরিণত হয়। আর এই নেয়ামত উত্তম নিয়তের কারণে মানুষ লাভ করে থাকে।

হযরত সুলতান বাহু (রহ.)-এর নিকট নিয়তের তাৎপর্য

আমাদের এলাকায় একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। নাম তার হযরত সুলতান বাহু। তার কথা খুবই আশ্চর্য ধরেনের। পাঞ্জাবি ভাষায় তার কিছু কবিতা আছে। বিষয় বস্তুর মিলের কারণে আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি। কিন্তু যেহেতু সবার জন্য বোঝা একটু মুশকিলের তাই অধম شعر এর সাথে অনুবাদও করে দেব।

جی ناتیاں دھوتیا رب ملدا تے ملدا کمیان مچھیاں توں

যদি গোসল করা খোদাকে পাওয়ার মাধ্যম হতো তবে মাছ-কচ্ছপই খোদাকে পেত।

جی سر منایاں رب ملدا ے ملدا بھیڑاں سسیاں نوں

যদি মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে খোদাকে পাওয়া যেত, তবে সসি ভেড়াগুলো খোদাকে পেত।

সসি ভেড়া এমন এক জাতকে বলে, যেগুলোর মাথার চুল একেবারে খাট।

جی ذکر کیتیاں رب ملدا ئے ملدا کال کڑچھیانوں

যদি যিকিরের মাধ্যমে খোদাকে পাওয়া যেত, তবে কালছড়ি খোদাকে পেত।

কালছড়ি এক ধরনের ছোট পাখি। এগুলো রাতে বিপরীতমুখী হয়ে গাছে ঝুলে থাকে এবং সারা রাত কিচিরমিচির করে। অর্থাৎ– যিকির করে। ইংরেজিতে বলে Grackle।

جی جتیان ستیاں رب ملدا ملدا افرائے کھیسانوں

যদি চারিত্রিক নিষ্কলুষতার দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যেত, তবে খাসিকরা প্রাণীগুলো তাকে পেত।

সর্বশেষ বলেন,

جی رب ملدائے ملدا نیتاں اچھاں نوں

আল্লাহকে পাওয়া যায় একমাত্র নিয়তের মাধ্যমে।

কাজেই আমাদেরকে নিয়ত যথাযথ সঠিক করতে হবে। মনে রাখবেন, আমরা কখনও কারও সাথে বাড়াবাড়ি করব না। কাউকে বুকের পাটা দেখাতে যাব না। তবে কেউ যদি আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তাহলে আমরা তাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখব। ইনশাআল্লাহ আমরা এর বরকত অবশ্যই পাব।

দ্বিতীয় হাদীছ : অনর্থক বিষয় পরিহার করা

ইমাম আযম (রহ.) আপন সন্তানকে যে পাঁচটি হাদীছ দিয়ে নছিহত করেছেন। এর দ্বিতীয়টি ছিল–

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَايَعْنِيْهِ

অনর্থক বিষয়াদি পরিহার করা মানুষের ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য।

অনর্থক কাজ ওই সকল কাজকে বলে, যার দ্বারা আখেরাতের কোনো উপকার হয় না। আজ আমাদের সোসইটি দেখুন, আমাদের যুবক ভাইয়েরা অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করেই দিন কাটাচ্ছে। আমাদের বুঝতে হবে এবং সময়ের মূল্য দিতে হবে। এ-অভ্যাস আমাদের অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

আপনি ওলিমার সময় নির্ধারণ করলেন দুপুর একটা। কিন্তু মাথায় থাকে মানুষ তিনটায় আসবে। ধারনা করা যায়? মানসিকতা এমনই হয়ে গেছে। দু-ঘণ্টার পার্থক্যকে কিছুই মনে করে না। এক-এর অর্থ তো একই হয় তাই না? আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে সময়ের মূল্য দিতে শিখিয়েছে, যেন আমরা

অহেতুক কাজে জীবনের সময়গুলোকে নষ্ট না করি। আমাদের আকাবিরগণ সময়ের এমন মূল্য দিতেন, যেমন কৃপণ তার সম্পদের মূল্য দিয়ে থাকে।

কলম ভাঙার সাথে-সাথে জিকরে ইলাহী শুরু

হাফেজ ইবনে হাজ্‌র (রহ.) বলেন, আমি হাদীছ লিখতে থাকতাম। যখন লেখার মাঝে কলম ভেঙে যেত, তখন নতুনভাবে তা মেরামত করতে-করতে কালেমায়ে ছুওম পড়া শুরু করতাম। কলম তৈরির ফাঁকেও আমি আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকতাম না।

সূর্যকে থামিয়ে সময় নিয়ে নাও

ইবনে আবু কায়েস (রহ.) হাদীছ মুখস্থ করার কাজে লেগে থাকতেন আর মানুষের সাথে কথা বলতেন। একদা একব্যক্তি তার কাছে এসে বলতে লাগলন, হযরত! আমাকে কিছু সময় দিন। তিনি প্রতিউত্তরে বললেন, সূর্যটাকে থামিয়ে রাখো। আর যতক্ষণ থামিয়ে রাখবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে থাকব। অর্থ হলো, আমি সূচির বাইরে সময় ব্যয় করতে রাজী নই।

খাওয়ার সময়ও দীনের খেদমত

আবেদ নামক জনৈক মুহাদ্দিছ গত হয়েছেন। তাঁর ত্রিশ বছর যাবত এই অভ্যাস ছিল। তিনি বসে-বসে হাদীছ লিখতেন আর তাঁর স্ত্রী মুখে খাবারের লোকমা তুলে দিতেন। ত্রিশ বছর যাবত তিনি নিজ হাতে খাবার গ্রহণ করেননি। আল্লাহু আকবার!

তাঁরা খাওয়ার সময়কেও দীনের কাজে ব্যয় করেছেন।

শুকনো ছাতুর খাওয়ার কারণ

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি শুকনো ছাতু খেতে শুরু করলেন। কেউ তাকে বলল, জনাব! এর সাথে পানি, গুড় মিশিয়ে নিন। তাতে অনেক সুস্বাদু হবে। এতে আপনার ভালো লাগবে। উত্তরে তিনি বললেন, আমি শুকনো ছাতু ও ভিজা ছাতু খাওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান দেখেছি। ভিজা ছাতু খেতে সময় বেশি লাগে। এ-কারণে বিশ বছর যাবত শুকনা ছাতু খেয়ে জীবন যাপন করছি। এতে যে-সময়টুকু পাই, তাতে সত্তরবার সুবহানাল্লাহ পড়ে নিই।

যে শ্বাস গাফলতের, সেই স্বাস কাফের

আমাদের মাশাইখগণ বলেছেন, যে শ্বাস আল্লাহর জিকির ছাড়া অতিবাহিত, তা কুফরির অবস্থায় পরিগণিত। সময়ের এত গুরুত্ব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটি নেয়ামত এমন আছে যে, তার ব্যাপারে মানুষ ধোঁকায় লিপ্ত।

১. সুস্থতা।

২. অবসর।

আজকাল কোনো যুবককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কি করছ? সে উত্তর দেবে। সময় কাটাচ্ছি, টাইম পাছ করছি। ভাই! সময় পাছ করছ না, বরং নিজের জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলছ।

উদাহরণস্বরূপ কারও হায়াত ছিল সত্তর বছর। কোনো এক আল্লাহর ওলী তাকে বললেন, আমি ইলহামের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, তোমার জীবন থেকে তিন বছর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সংবাদ শুনে তার কতই-না অনুশোচনা হবে। সে কাঁদতে থাকবে এবং চিৎকার করতে থাকবে যে, আমার জীবনের তিনটি বছর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে! কিন্তু মানুষ অহেতুক এমন বহু সময় নষ্ট করছে, যা একত্র করলে জীবনের দশ বছরের সমান হবে। কিন্তু তাতে কোনো অনুশোচনা নেই।

জীবনের ভরসা কী?

ইয়াহয়া ইবনে মুঈন (রহ.) নামক একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। তার এক ছাত্র বর্ণনা করে, একদা ইয়াহয়া ইবনে মুঈন একজন মুহাদ্দিছ মুহাম্মদ ইবনে আফজালের দরজায় একটি হাদীছ শুনতে গেলেন। তিনি হাদীছ শুনিয়ে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই হাদীছটি আপনার কাছে লিখিত আছে কি? তিনি বললেন, আছে; আমি নিয়ে আসছি। যখন পাণ্ডুলিপি আনতে রওনা হলেন, তখন ইয়াহয়া ইবনে মুঈন তার কাপড় ধরে টেনে রাখলেন আর বলতে লাগলেন, জনাব! আগে আমাকে লিখে দিন, তারপর পাণ্ডুলিপি আনতে যান। আপনার আসা-যাওয়ার মাঝে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায়!

পদব্রজের সময়ও অধ্যয়ন

ব্যাকরণশাস্ত্রের বড় এক ইমাম ছিলেন। তার অভ্যাস ছিল, রাস্তায় চলাচলের সময়ে অধ্যয়ন করতেন। আল্লাহর কী শান! তার মৃত্যুও এমনভাবে

হয়েছে যে, তিনি চলার পথে অধ্যয়নরত ছিল। সামনের দিক থেকে একটি বাহন এসে তাকে আঘাত করল। সাথে-সাথে তিনি মারা গেলেন।

আল্লামা ইবনে আছীরের অভ্যাস

আল্লামা ইবনে আছীরের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি রুটি তৈরি করে রেখে দিতেন। অনেক দিন যাবত ওই রুটি খেয়ে কালাতিপাত করতেন। যখন ওই রুটি একদিন পর শুকিয়ে যেত, তখন রুটিগুলো পানিতে ভিজিয়ে রাখতেন। এভাবে নরম করে খেতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি রুটি খাওয়ার এ-পদ্ধতি কীভাবে আবিষ্কার করলেন? তিনি উত্তর দিলেন, স্বাভাবিকভাবে রুটি খেতে বেশি চাবানো লাগে। কিন্তু ভিজা রুটি কম চাবানো লাগে, যাতে সময়ও কম লাগে। আমি কম চাবিয়ে সময় বাঁচিয়ে ওই সময়ে হাদীছ লিখি।

বাথরুমেও শিক্ষার চিন্তা

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তিনি বাথরুমে যেতেন, তখন তাঁর ছাত্রদের বললেন, তোমরা একটু উঁচু আওয়াজে তাকরার করো। তারা বলত, হযরত! তা কেন? তিনি বললেন, আমি বাথরুমে গিয়ে মুখে কোনো কিছু পড়ার সুযোগ পাই না। তোমাদের পড়ার আওয়াজ আসবে আর আমি তার চিন্তায় ব্যস্ত থাকব। তারা বাথরুমের সময়কেও শিক্ষার মাধ্যম বানিয়েছেন।

কূপের দেওয়ালে লেখার মাধ্যমে শিক্ষা

ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি যখন ক্ষমতায় আরোহণ করল, তখন তাকে বন্দি করে ফেলল। তিনি ছাত্রদের মাধ্যমে কাগজ চেয়ে নিলেন এবং কিতাব রচনা করতে লাগলেন। যখন তাঁর নতুন বই রচনা হলো, তখন হিংসুক জানতে পারল। বলল, কূপে বন্দি থেকেও কিতাব রচনা করছে! তারপর কাগজ, কলম, দোয়াত সরবরাহ বন্ধ করে দিল। এমতাবস্থায় ইবনে তাইমিয়ার মৃত্যু হয়ে গেল।

মৃত্যুর পরে তাঁর নতুন আরেকটি কিতাব বের হলো। তখন হিংসুকরা আশ্চর্যান্বিত হলো যে, এখন কিতাব কীভাবে রচনা হলো? জানতে পারল, যখন কাগজ, দোয়াত, কলম সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল, তখন তিনি পাহারাদার পুলিশকে ম্যানেজ করে কিছু কয়লা চেয়ে নিলেন। আর কয়লা

দ্বারা কূপের দরজায় কিতাব লিখলেন। আল্লাহু আকবার! ইতিহাস এমন ইল্‌ম শেখার আগ্রহের নজির পেশ করতে অপরাগ, যা আমাদের পূর্বসূরীগণ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদের শিক্ষাদান ব্যস্ততা

ইমাম মুহাম্মদ এক জায়গায় শিক্ষাদান করতেন। অন্য এলাকাবাসী এসে বলল, আমাদের এলাকাতে শিক্ষাদান করুন। হযরত বললেন, ভাই! আমার সময় এত কম যে, আসা-যাওয়ার মাঝেই তা শেষ হয়ে যাবে। তারা বলল, আপনার জন্য আমরা বাহনের ব্যবস্থা করব। আপনি গাড়িতে করে দ্রুত এসে দরস দিয়ে উক্ত সময়ে চলেও যেতে পারবেন। এভাবে করলে আপনার রুটিনের কোনো ক্ষতি হবে না। তাদের নিষ্ঠা দেখে ইমাম মুহাম্মদ তা গ্রহণ করলেন। এখন তিনি এক জায়গায় দরস দিয়ে দ্রুত বাহনে করে অন্যত্রে চলে যেতে পারেন।

দৌড়ে-দৌড়ে ইল্‌ম শিক্ষার দৃষ্টান্ত

ইত্যবসরে এক ছাত্র এসে আবেদন জানাল, হুজুর! আমি আপনার কাছে একটি কিতাব পড়ব। তিনি বললেন, ভাই! আমার কাছে তো সময় নেই। আমি তোমাকে কীভাবে পড়াব? সে বলল, আমি যদি এই কিতাব পড়ি, তাহলে একমাত্র আপনার কাছেই পড়ব। তিনি বললেন, আমার তো সুযোগ নেই; তুমি কীভাবে পড়বে? ছাত্র বলল, হযরত! আমার কাছে একটি পদ্ধতি আছে। তাহলো, আপনি যখন বাহনে চড়ে এক এলাকা হতে অন্য এলাকায় যাবেন, তখন আমি আপনার বাহনের সাথে দৌড়ে-দৌড়ে চলতে থাকব আর আপনি পড়াতে থাকবেন। আমি এভাবেই আপনার থেকে সবক পড়ে নেব। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

অবাক হতে হয় আমাদের পূর্বসূরীদের ইল্‌মের প্রতি এত আগ্রহ দেখে! চিন্তা করুন, ওস্তাদ বাহনে আরোহী আর ছাত্র দৌড়ে সবক পড়ছে।

ভিখারীর বেশে ইল্‌ম অর্জন

ইবনে মুখাল্লাদ (রহ.) নামক স্পেনে এক মুহাদ্দিছ অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি সফর করে বাগদাদে পৌঁছলেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে হাদীছ পড়ার জন্য তিনি এই ভ্রমণ করেছেন। আল্লাহর কী শান! তৎকালীন সময়ের বাদশাহ ইমাম আহমাদকে নজরবন্দি করে রেখেছেন।

তাঁর সাথে কাউকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না এবং তাঁকেও কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না। ইবনে মুখাল্লাদ (রহ.) বহু পেরেশান হলেন। তার মাথায় একটি বুদ্ধি এল। হোটেলের যে-রুমে তিনি অবস্থান করছিলেন, সেখান থেকে বের হওয়ার সময় মাথায় কাপড় বেধে নিলেন। পায়েও একটি কাপড় বেধে নিলেন। এক হাতে লাঠি নিলেন অন্য হাতে ভিক্ষার ঝুলি নিলেন, যেন একজন ভিক্ষুক হোটেল হতে বের হয়ে ভিক্ষা করা শুরু করল। তৎকালীন সময়ে ফকির যখন ভিক্ষা করত, তখন বলত–

أَجْرُكُمْ عَلَى اللهِ

'তোমাদের প্রতিদান আল্লাহ দেবেন।'

একথা শুনে যারা ভিক্ষা দেওয়ার তারা দিয়ে দিত। তারপর এই আওয়াজ করতে-করতে অলিগলিতে চলতে লাগলেন। মানুষ মনে করল, তিনি ভিক্ষুক। কেউ কিছু দিল আবার কেউ দেয়ও না। এভাবে আওয়াজ করতে-করতে তিনি ইমাম আহমদের দরজায় পৌঁছে গেলেন। আওয়াজ দিলেন। ইমাম দরজা খুলে বললেন, দাঁড়াও; নিয়ে যাও। তিনি বললেন, আমি টাকা-পয়সার ভিক্ষুক নই, আমি হাদীছের ভিক্ষুক। আপনার কাছে হাদীছ পড়তে এসেছি। তিনি বললেন, আমি তো হাদীছ পড়াতে পারব না। আপনার সাথে কথা বলতে পারব না। সরকার আমাকে অনেক শাস্তি দেবে। তিনি বললেন, হযরত! আমি এভাবে প্রতিদিন ভিখারী ভেসে আপনার দরজায় আসব। আপনি দরজা খুলে যতটুকু সময় টাকা-পয়সা দিতে ব্যয় হয় এতটুকু সময় আমাকে হাদীছ শুনিয়ে দেবেন আর আমি মুখে-মুখেই মুখস্থ করে নেব। তিনি এক বছর যাবত আহমদের দরজায় আসতেন আর আওয়াজ দিতেন। ইমাম বের হয়ে তাঁকে হাদীছ শুনিয়ে দিতেন আর তিনি মুখস্থ করে নিতেন।

যখন কেয়ামত দিবসে এ সমস্ত মনীষীগণ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বলবেন, হে আল্লাহ! আমরা আপনার দীন এভাবে অর্জন করেছি, তখন সেখানে আমাদের কোনোই মর্যাদা থাকবে না। আমরা সময়ের প্রতি দৃষ্টি দিই। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে, ফ্যানের নিচে, পরিষ্কার স্থানে বসে বর্তমানের ছাত্ররা শিক্ষকদের থেকে এলেম হাসিল করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে থাকে। স্মরণ রেখো, সময় আমাদের কাছে আল্লাহর প্রদত্ত বড় নেয়ামত।

اَلْوَقْتُ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ

'সময় সোনা-রুপার মতো দামি।'

বিশ বছর যাবত সুযোগ হয়নি

হযরত মাওলানা ইয়াহয়া (রহ.)-এর অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা জাগল যে, কখনও যদি সুযোগ হয়, তাহলে শীতের দিন রোদে বসে আখ খাব। শীতের দুপুরে বসে আখ খেতে মজা। তাঁর জীবনের বিশ বছর অতিবাহিত হলো। কিন্তু দুপুরে বসে আখ চিবানোর সুযোগ তাঁর হয়নি। এত ব্যস্ততার জীবন ছিল তাঁর।

তৃতীয় হাদীছ : অন্যের রুচির মূল্যায়ন করা

এখন ইমাম আবুহানীফার বর্ণনাকৃত তৃতীয় হাদীছ শুনুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ

তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করবে।

আমরা কামনা করি, যদি আমাদের থেকে কোনো ভুল হয়ে যায়, তাহলে আমাদের যেন ক্ষমা করা হয়। আমরাও মানুষের ভুলত্রুটি ক্ষমা করি। আমরা কামনা করি, আমাদের ভুলত্রুটির প্রতি যেন মানুষ ভ্রূক্ষেপ না করে, আমরাও মানুষের ভুলত্রুটি ঢেকে রাখব। আমরা কামনা করি, মানুষ যেন আমাদের প্রতি কুধারণা না করে। আমরাও মানুষের প্রতি ভালো ধারণা রাখব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতই-না সুন্দর কথা বলেছেন– কারও যদি শরীয়তের বুঝ না-ও থাকে আর সে উক্ত মূলনীতির অনুসরণ করে যে, আমি অন্যের জন্য ওই বিষয় ভালোবাসি, যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। তাহলে তার বুঝ শরীয়তসম্মত হবে।

আজকাল আমরা তো কামনা করি, আমার স্ত্রী যেন অনেক ভালো হয়, সৎ হয়, খেদমতকারিণী হয়, নেককার হয়, তাহলে আমাকে তো এমন স্বামী হওয়া উচিত। আমরা কি এমন সৎ হয়ে থাকি? ভাই! যখন নিজের জন্য একটি বিষয় পছন্দ করছ, তাহলে অন্যের জন্যও তা পছন্দ করো।

আমরা কামনা করি, কেউ যেন আমাকে ধোঁকা না দেয়। তাহলে আমি কেন অন্যকে ধোঁকা দিই? আমরা কামনা করি, কেউ যেন আমার সম্মানের প্রতি আঙ্গুল তুলতে না পারে। তাহলে আমি কেন অন্যের সম্মানের প্রতি

কুদৃষ্টি দিই? যা নিজের জন্য পছন্দ করি, তা যেন অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করি। আমরা নিজের মধ্যে অনুভূতি জাগ্রত করি। কেননা, চিন্তাহীন কর্ম কখনও ভালো ফলাফল বয়ে আনতে পারে না। আর চিন্তা কর্মকে সুন্দর করে তোলে।

একটি হৃদয়গ্রাহী সন্ধি

কাজী মুসা ইবনে ইয়াসার (রহ.)-এর আদালতে এক দম্পতির ঝগড়া উত্থাপিত হলো। ঝগড়াটা কী ছিল? একে অন্যের প্রতি ভীতি। স্ত্রী কামনা করে, সে যেন তালাক দিয়ে আমার মোহর আমাকে দিয়ে দেয়। মোহরের অংক অনেক ছিল। এজন্য স্বামী বলছিল, আমি তালাক দিতে পারি; কিন্তু মোহর দিতে পারব না।

মোকদ্দামার সাক্ষীদের মধ্যে হতে কেউ বলল, আমার তো জানা নেই, পর্দাবৃতা মহিলা কে? যদি সে তার চেহারা খুলে দেখায়, তাহলে আমি তাকে চিনে সত্যায়ন করতে সক্ষম হব, সে অমুকের স্ত্রী। অন্যথায় কোনো গায়রে মাহরাম মহিলাও তো হতে পারে। কাজী সাহেব বললেন, হ্যাঁ। এমতাবস্থায় সাক্ষী যদি চায়, তাহলে সে দেখতে পারবে। إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا উক্ত আয়াতের অর্থই এটিই। প্রয়োজনে এমনটি করা যাবে। এখন স্বামী কোনোভাবেই কামনা করছে না, তার স্ত্রী পরপুরুষের সামনে চেহারা খুলুক।

কাজী সাহেব বলে দিলেন, যদি সাক্ষী চায়, তাহলে নিজ পরিচয়ের স্বার্থে চেহারা খুলতে হবে। স্বামী যখনই উক্ত কথা শুনল, তখন বলতে লাগল, কাজী সাহেব! আমি আমার স্ত্রীর চেহারা খোলার নির্দেশ দেব না। আমি তার পূর্ণ পাঁচশত দেরহাম দিতে প্রস্তুত। যখন স্বামী বলল, আমি পাঁচশত দেরহাম পরিশোধ করতে রাজী; কিন্তু আমার স্ত্রী অন্যের সামনে চেহারা উন্মুক্ত করুক তা মেনে নিতে রাজী নই, তখন স্ত্রীর অন্তরেও এই অনুভূতি জাগ্রত হলো যে, আমার ব্যাপারে স্বামী এতো আত্মমর্যাদাশীল! সুতরাং আমি আমার চিন্তা প্রত্যাহার করলাম। এমনকি সে বলতে লাগল, কাজী সাহেব! আমি আমার স্বামী হতে তালাক ও মোহর কোনোটাই চাই না। কাজী সাহেব উভয়কে হাসিমুখে বিদায় করলেন।

চতুর্থ হাদীছ : ইমাম আযম (রহ.)-এর অসিয়তের মধ্য হতে চতুর্থ হাদীছ হলো–

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

হালাল ও হারাম স্পষ্ট। তার মাঝামাঝিটা সন্দেহভাজন।

আল্লাহর যে বান্দা হারাম ও সন্দেহভাজন বিষয়াদি পরিত্যাগ করবে, সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হবে।

যতক্ষণ আমরা হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু পরিত্যাগ করতে সক্ষম না হব, ততক্ষণ পর্যন্ত তাক্ওয়া অর্জন করতে পারব না। আমাদের পূর্বসূরীগণ এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরলাম।

মাওলানা আব্দুল মালেক সিদ্দিকী (রহ.)-এর খোদাভীতি

আলেম ও নেককারদের ইমাম হযরত খাজা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক সিদ্দিকীর খোদাভীতি প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি শীত ও গরমকালে সর্বদা ছাতা ব্যবহার করতেন। গরমে ছাতা রাখার বিষয়ে তো বোঝা যায় যে, রোদ হতে বাঁচার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শীতকালে ছাতা ব্যবহারের যুক্তি কী। তাঁর কাছে অনেক আলেম থাকতেন। একদা এক আলেম তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, হুজুর! শীতকালে হাতে ছাতা রাখার কী কারণ? যখন তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তখন এর রহস্য বললেন, সাধারণত মানুষ গরম-শীত থেকে বাঁচতে ছাতা ব্যবহার করে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অন্য। তারা জিজ্ঞাসা করল, তা কী? তিনি বললেন, রাস্তায় চলতে যখন দেখি ডান দিক হতে কোনো গায়রে মাহরাম মহিলা আসছে, তখন আমি সেদিকে ছাতা ধরি এবং নিজের চেহারাটা লুকিয়ে ফেলি। আর যখন দেখি, বাম হতে কেউ আসছে, তখন বাম দিকে ছাতা ধরি। আমি বেগানা মহিলার কাপড়ও দেখি না, যাতে তার প্রতি আমার খেয়াল না যায়। এটাই তাক্ওয়া যে, বেগানা নারীর চেহারা দেখা তো দূরের কথা, তার কাপড় পর্যন্ত দেখতে রাজী নন।

আমাদের মুরশিদ (রহ.)-এর বড় ছেলে আব্দুর রহমান কাসেমী (রহ.) বলেন, একদা আব্বাজান বহিঃরাষ্ট্রে গেলেন। সেই দিনগুলোতেই হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সিদ্দিকী (রহ.) ইসলামাবাদ হতে ফিরে চাকওয়াল চলে গেলেন। আমি ঘরেই ছিলাম। হযরতকে বসালাম, পানি ইত্যাদি পান করলাম। তারপর মাকে বললাম খানা পাকাতে। যখন খাবার পাকানো শেষ হলো, আমি হযরতের সামনে দস্তরখানা বিছালাম। কিন্তু হযরত খেতে হাত বাড়ালেন না। আমি বললাম, হযরত! খাবার গ্রহণ করুন। হযরত আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, কাসেমী! তোমার ঘরে শূকর কোথা হতে এল?

শুনে আমি হতভম্ব হলাম। দৌড়ে আমার মায়ের কাছে গেলাম এবং বললাম, হযরত খাচ্ছেন না আর বলছেন, আমাদের ঘরে শূকর কোথা হতে

এল? মা যখন একথা শুনলেন, তখন তিনি চিন্তিত হয়ে শীতল শ্বাস নিলেন এবং বললেন, বাস্তবেই আমার ভুল হয়ে গেছে। ভুলটা হলো এই যে, এক মহিলা অনেক দিন যাবত আমাকে ছাড়ছে না এই বলে যে, যখনই পীর সাহেব আসবেন, আমি তার জন্য এক বেলা খাবার তৈরি করে দেব। প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল করতে গিয়ে আমি তাকে খাবার পাকাতে অনুমতি দিয়েছি। এ-কারণে আজকের খাবার তার ঘরে পাকানো খাবার, যা হযরতের সামনে পরিবেশন করা হয়েছে।

তারপর আমার আম্মা খানা পাকালেন। এবার সিদ্দিকী সাহেব (রহ.) খেলেন। যখন বিষয়টি পূর্ণ তদন্ত করা হলো, তখন জানা গেল, উক্ত প্রতিবেশীর স্বামী একটি হালাল চাকরি করতেন। কিন্তু ব্যাংকের সেভিংস একাউন্টে টাকা জমা রাখত। সেখান থেকে সুদের কিছু পয়সা তার উপার্জনের সাথে মেশে যেত, যার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ টাকার ওপর পড়েছে। হযরত এ বিষয়টি উপলব্ধি করে জিজ্ঞাসা করেছেন, কাসেমী! তোমার ঘরে শূকর কোথা হতে এল?

বিশর হাফী (রহ.)-এর বোনের তাক্ওয়া

আগেকার যুগে শুধু পুরুষরা-ই খোদাভীতি অর্জন করেনি। বরং তখনকার মহিলারাও অধিক পরহেযগার ও মুত্তাকী হতেন। মহিলাদের খোদাভীতির দৃষ্টান্ত শুনুন।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর ছেলের নাম ছিল আব্দুল্লাহ। এই আব্দুল্লাহ (রহ.) বলছেন, একদা আমি আমার সম্মানিত পিতার নিকট বসা ছিলাম। ইত্যবসরে এক বৃদ্ধা এল এবং আমার পিতার কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। মহিলা বলল, আমি তুলা কাটতাম। একদা আমি ছাদে বসে তুলা কাটছিলাম। তখনকার রাষ্ট্রকর্তৃক নিযুক্ত পুলিশ অফিসার গলি দিয়ে যাচ্ছিল। তার সাথে বাতি ছিল। সে সেখানে কারও সাথে কথা বলতে থামল। বাতির আলো বাড়ছিল। তখন তুলা বেশি দেখা যাচ্ছিল। আমি চিন্তা করলাম, এখনই বেশি তুলা কেটে নিই। তারপর আমি তাড়াতাড়ি তুলা কাটলাম। যখন পুলিশ অফিসার চলে গেল, তখন আমার খেয়াল হলো, তার কামাই সন্দেহযুক্ত; অথচ আমি তার বাতির আলো দ্বারা উপকৃত হলাম। এখন প্রশ্ন হলো, তার বাতির আলোতে কাটা তুলা আমার জন্য বৈধ হবে কি-না?

ইমাম আহমাদ (রহ.) বললেন, তুমি সবগুলো তুলা সদকা করে দাও। আল্লাহ তোমাকে অনেক রিযিক দেবেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি এই উত্তর শুনে বড়ই বিস্মিত হলাম। উত্তর তো এমন হওয়া উচিত যে,

যতটুকু তুলা তার আলোতে কেটেছিলে, তা সদকা করে দাও। কিন্তু আব্বাজান বললেন পুরো তুলা সদকা করতে। উত্তর শুনে মহিলা চলে গেল।

তার দিনচারেক পর বৃদ্ধা আবার এল এবং বলল, আমি ইমাম সাহেবের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তারপর ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করল, আমি রাতে বাতি জ্বালিয়ে সুতা কাটি। কখনও তেল শেষ হয়ে গেলে চাঁদের আলোতে সুতা কাটি। বাতির আলোতে সুতা ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয় আর চাঁদের আলোতে তেমন নজরে আসে না। এখন জিজ্ঞাসার বিষয় হলো, যখন আমি ক্রেতার কাছে সুতা বিক্রি করব, তখন তাকে বলতে হবে কি, আমি সুতা বাতির আলোতে কেটেছি নাকি চাঁদের আলোতে কেটেছি? ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন, হ্যাঁ; তোমাকে তা বলে দিতে হবে। তারপর দু'আ করে চলে গেল।

বর্ণনাকারী বলেন, ওই মহিলা যখন চলে গেল, তখন ইমাম সাহেব তার খোদাভীতির ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং আমাকে বললেন, তার পেছনে-পেছনে যাও। দেখো, সে কোন ঘরের মেয়ে। হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, যখন আমি তাকে ফলো করলাম, তখন দেখলাম, সে বিশর হাফীর (রহ.)-এর ঘরে প্রবেশ করেছে। তখন বুঝতে পরলাম, তিনি বিশর হাফীর বোন ছিলেন, যাকে আল্লাহ এত তাক্ওয়ার জীবন দিয়েছেন। তৎকালীন সময়ে মহিলারাও হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয় হতে এত বেঁচে থাকতেন। কেয়ামত দিবসে এই মহিলারাও আমাদের ছাড়িয়ে যাবে।

পঞ্চম হাদীছ : পঞ্চম হাদীছ উপরিউক্ত হাদীছগুলোর সারাংশ।

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

মুসলমান কে?

এই হাদীছে মুসলমানের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রকৃত মুসলমান কে? এই হাদীছ একটি মূলনীতি। যদি কেউ পূর্ণ নীতির অনুসরণ করে, তাহলে সে পূর্ণ মুসলমান। নচেৎ অপূর্ণ মুসলমান। প্রকৃত মুসলমান হওয়া সাধারণ বিষয় নয়।

چوں می گویم مسلمانم بلرزم

کہ دانم مشکلات لا الہ را

যখন আমি নিজেকে মুসলমান দাবি করি, তখন আমি কেঁপে উঠি। কেননা আমি জানি মুসলমান কাকে বলে।

অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সহজভাবে বলে দিলেন মুসলমান কে? অর্থাৎ– মুসলমান ওই ব্যক্তি, যে কাউকে হাত দ্বারা কষ্ট দেয় না। অর্থাৎ– সাধারণত হাত দ্বারাই কাউকে কষ্ট দেওয়া হয়। কিন্তু এখন হাতের সাথে মুখেরও আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, স্বাভাবিকভাবে মানুষ হাত-মুখ দ্বারাই কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকে। কথা মুখ থেকে বের হয় এবং বেশির ভাগ কাজ হাতের দ্বারা করা হয়। আর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ দুটির আওতাধীন।

মুখ হাতের আগে কেন?

তারপর হাত ও মুখের মধ্যে মুখের উল্লেখ আগে কেন করা হয়েছে? তার কিছু কারণ উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ হচ্ছে–

মানুষ হাতে যে-কষ্ট পৌঁছায়, তার সুযোগ কমই থাকে। মানুষ হাত দ্বারা অন্যের আঁচল ধরে রাখার সুযোগ পায় না। কিন্তু মুখ দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ অনেক থাকে। যখন ইচ্ছা করে অন্যকে মুখে এমন এক কথা বলল, যার ফলে তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেল।

যদি চিন্তা করি, মানুষ দিনে হয়তো কাউকে কষ্ট দিল; কিন্তু রাত্রে তো তার ঘরেই সে থাকে। তখন তো মানুষ তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু মুখ এমন তরবারি, যা রাতেও চলে, দিনেও চলে। নিজের ঘরে বসেও চলে। মানুষ মুখে এমন কথা বলতে পারে, যা অন্যের অন্তরকে ব্যথিত করে। মুখ এমনভাবে আত্মীয়তা ছিন্ন করে দেয়, যা তরবারি দ্বারাও কাটা যায় না। রাগ হয়ে দুই ভাই কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ দুই ভাইয়ের সম্পর্ক এমন ছিল, যা কোনো তরবারি ও কেচি দ্বারা কাটাও সম্ভাবপর ছিল না। কিন্তু মুখের কথা উভয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। এতে বোঝা গেল, মুখের ক্ষতি হাতের তুলনায় অনেক বেশি।

হাত দ্বারা কষ্ট দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু মুখে ব্যথা দিতে কোনো কষ্ট হয় না। একটি বচ্চাও ক্ষতি করতে পারে। মেয়েরাও পারে। হাত দ্বারা তখন ব্যথা দেওয়া সম্ভব, যখন সে অন্যের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হবে। যদি মজলুম তার তুলনায় বেশি শক্তিশালী হয়, তখন উল্টা তাকে ব্যথা দিয়ে দেবে। কিন্তু মুখে যে কেউ যাকে ইচ্ছা কষ্ট দিতে পারবে।

হাতে কষ্ট দিতে হলে যাকে ব্যথা দেবে, সে সামনে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু মুখে কষ্ট দেওয়ার জন্য সামনে হওয়া আবশ্যক নয়। অনুপস্থিত

ব্যক্তিকেও কষ্ট দেওয়া যায়। বরং চলেযাওয়া ব্যক্তিকেও ব্যথা দেওয়া যায়। যেমন– তার গীবত করবে।

হাত দ্বারা একজনকে ব্যথা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মুখে এক সাথে পুরো বংশকে; বরং গোটা জাতিকে ব্যথা দেওয়া সম্ভব। এ-কারণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের আগে মুখের আলোচনা করেছেন আর বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

অধিকার ক্ষুণ্ন করা হতে দূরে থাকো

আমাদের উচিত যেন আমরা অন্যকে কষ্ট দেওয়া হতে দূরে থাকি এবং অন্যের অধিকার হরণ না করি। কাউকে মুখেও কষ্ট দেব না। কোনো কাজের মাধ্যমে নয়। এ-কারণে আমাদের ধর্ম আমাদের উত্তম চরিত্র শেখায়, যেন আমি অন্যের সাথে ভালো আচরণের জীবন গড়ি। কাউকে সামান্যতম কষ্টও যেন না দিই। এমনকি কারও মনে ব্যথাও যেন না লাগে।

উক্ত পাঁচটি হাদীছ শরীয়তের সারাংশ কীভাবে?

ইমাম আযম (রহ.) বলেন, এই পাঁচটি হাদীছ শরীয়তের সারাংশ। প্রশ্ন জাগে, এই হাদীছগুলো পূর্ণ শরীয়তের সারাংশ কীভাবে? একটু চিন্তা করুন।

১. প্রথম হাদীছ নিজের কর্মশুদ্ধি সম্পর্কে।

২. দ্বিতীয় হাদীছ সময়ের সঠিক ব্যবহার প্রসঙ্গে।

৩. তৃতীয় হাদীছ মানুষের অধিকার সম্পর্কে।

৪. চতুর্থ হাদীছ আল্লাহর হক প্রসঙ্গে।

৫. পঞ্চম হাদীছ মুসলমানদের ব্যাপারে।

যখন নিজ কর্মসূচি ঠিক হয়ে যাবে ও সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে, তখন মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে। সাথে-সাথে আল্লাহর হকও পরিপূর্ণরূপে আদায় করা সম্ভব হবে। তখন পুরো দীনের ওপর আমল করা সহজ হবে। এ-কারণে ইমাম আযম উক্ত পাঁচটি হাদীছকে দীনের সারাংশ বলেছেন। তাঁর কথা শতভাগ সত্য ও সঠিক।

মানুষের অসৎ স্বভাবের পরিচয়

যখন আমরা উদাসীনতার জীবন অতিবাহিত করব এবং দৈনন্দিন লেনদেনে অবহেলা করব, তখন নিজেকে শিংবিহীন গরু অনুভব হবে, যে

যে-ই কাছে আসে, তাকেই গুতা লাগিয়ে দেয়। সব দিকে সমালোচনার বিষয় দৃষ্টিগোচর হবে। মানুষের দোষ বর্ণনা করা, নিজের গুণাগুণকে বড় করে দেখা, অন্যের দোষ দেখা, অন্যের অধিকার সংরক্ষণ না করা এবং নিজেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা মনে করা এগুলো অসৎ স্বভাবের পরিচয়।

বেলায়াতের পথে বাধা

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) বলেন, এক রাতে আমি মসজিদে গেলাম আর সেখানে এবাদতরত অবস্থায় ঘুম এসে পড়ল। আমার সাথে বিছানা ছিল না। আমি মসজিদের কাতারে রাখা কাপড় টেনে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি যে মসজিদে ঘুমন্ত, তা অন্য কেউ জানত না। তিনি বর্ণনা করেছেন, কয়েকজন আল্লাহর ওলী মসজিদে এসে পরস্পর কথা বলা শুরু করল। তাদের মধ্য হতে একজন বলতে আরম্ভ করল, এখানে অন্য কেউ আছে মনে হয়। তাদের মধ্যে হতে বড়জন বলল, হ্যাঁ। এখানে আদহামের ছেলে শুয়ে আছে এবং বলছে, আমি ওলী হয়ে যাব। সে (আদহাম) কীভাবে ওলী হবে? সে অমুকের খেজুর অনুমতি ছাড়া খেয়েছে।

তিনি বলেন, আমি তখন নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রইলাম। যখন তারা বৈঠক শেষ করে চলে গেল, তখন আমার স্মরণ এল, গতকাল আমি খেজুর ক্রয়কালীন সময়ে একটি খেজুর নিচে পড়ে গেলে তা আমার ক্রয়কৃত মনে করে উঠিয়ে মুখে দিয়েছিলাম। অথচ সেটা আমার খেজুর ছিল না। সেটা ছিল বিক্রেতার। আমি তার অনুমতি ছাড়া খেয়ে নিয়েছি। পরের দিন গিয়ে আমি বিক্রেতার কাছে ক্ষমা চাইলাম। তখনই আমি আবদালের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলাম।

যখন ধরা পড়ব, তখন আল-আমীন, আল-হাফীজ

আমাদের অবস্থা কী? হালাল কামাইয়ের চিন্তা তো নেই। হারাম থেকে বাঁচারও ফিকির নেই। উপরে-উপরে তাসবীহ জপি আর ভেতরে কামাইয়ের চিন্তা। উপরে লা-ইলাহা ইল্লাহ ভেতরে কালিমা লেপা। কেয়ামত দিবসে যদি হক্কুল ইবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন আমাদের কী অবস্থা হবে? এজন্য প্রকৃত অর্থে সূফী ওই ব্যক্তি, যার আঁচল কেয়ামত দিবসে কেউ ধরতে পারবে না। যদি কেউ আঁচল ধরে বসে, তখন আল-আমীন, আল-হাফীজ।

কেয়ামত দিবসে মানুষ আল্লাহর সামনে কীভাবে দাঁড়াবে?

فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

একাকি দাঁড়াবে যেমনটি প্রথমবার আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি।[১১৭]

একজন-একজন করে। এয়ারপোর্টে কাস্টম্‌সে যেমন চেক করা হয়, তেমন আল্লাহর সামনে দিয়ে অতিবাহিত হতে হবে। আর ফেরেশতা তাদের অন্তর চেক করবে। ওখানে যখন কিছু লোক আগ বেড়ে যেতে চাইবে, তখন তাদের বলা হবে–

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

ওদের দাঁড় করাও। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করব।[১১৮]

মানুষকে অহেতুক দোষারোপ করতে।

অন্যায়ভাবে অপবাদ দিতে।

স্ত্রীর মনে ব্যথা দিতে।

আল্লাহর বান্দাদের প্রাণনাশের চেষ্টা করতে।

এদের দাঁড় করাও। এরা দীনদারির পোশাক পরিধান করেছে। অথচ মানুষকে ধোঁকা দিত। অনুমতি ছাড়া মানুষের জিনিস ব্যবহার করত। ওই সমস্ত লোকদের দাঁড় করাও। যারা আমার মহাব্বতের দাবিদার; অথচ অন্যের প্রতি কুদৃষ্টি দিত। আমার প্রেমের দাবিদার; অথচ অন্যের ভালোবাসা তার অন্তরে ভরপুর।

যদি কেয়ামত দিবসে আমাদেরকে দাঁড় করানো হয়। তাহলে কি অবস্থা হবে। এখনও সময় আছে আল্লাহর কাছে সব গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর। ভবিষ্যতে দীনদারি এবং পরহেজগারিপূর্ণ জীবনের শপথ নাও এবং অন্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করো। আল্লাহ আমাদেরকে তার নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

واخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين

[খুতুবাতে যুলফিকার পঞ্চদশ খণ্ড সমাপ্ত]

---

৯০. সূরা আন'আম : আয়াত ৯৪

১১৮. সূরা ছফ্‌ফাত : আয়াত ২৪

খুতুবাতে যুলফিকার-১৬

নবীজির আগমন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ـ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

পুরস্কারের পূর্বে পরীক্ষা

আপনারা ওষুধের বোতল দেখেছেন। গায়ে লেখা থাকে 'ব্যবহারে পূর্বে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন।' এটা দেখলেই আমার মাথায় একথা ভেসে ওঠে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে যখন কোনো নেয়ামতে ধন্য করতে চান, তখন তাকে ঝাঁকি দেন, ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেন, নেয়ামতের বোঝা সে বইতে পারবে কি-না? তারপরই বান্দাকে সেই বিশেষ নেয়ামত দান করেন। কুরআনে একথার দলিল পাওয়া যায়। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত সাইয়্যিদুনা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে বহু নেয়ামত দান করেছেন। তবে প্রথমে তাঁকে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِذِ ابْتَلٰى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

আর স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম (আ.)কে পরীক্ষা করেছিলেন তার রব। পরীক্ষা করা হয়েছিল কিছু বিষয় নিয়ে। সে পরীক্ষায় শতভাগ সফলকাম হয়েছে।[১১৯]

তারপর কী ফল দাঁড়াল? ইরশাদ হচ্ছে–

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

---

১১৯. সূরা বাকারা : আয়াত ১৩৪

'বললেন, (হে আমার প্রিয় ইবরাহীম) আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাব।'[১২০]

তো দেখুন, ইমামতের দায়িত্ব পাওয়ার পূর্বে তাঁকে পরীক্ষা করা হলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাকবুল বান্দাদেরই পরীক্ষা করে থাকেন। এমনসব পরীক্ষা এসেছে যে, কুরআন মাজীদ সাক্ষী দিচ্ছে–

مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا

তাদের ওপর এ-পরিমাণ পরীক্ষা এসেছে, সংকীর্ণতা এসেছে, কঠোরতা এসেছে এবং তাদের প্রকম্পিত করা হয়েছে।

حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ

এমন হয়েছে যে, রাসূল ও তারা যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল বলতে লাগল, আমাদের ওপর আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?[১২১]

এমন পর্যায়ে পৌঁছলে আল্লাহ বলেন–

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

'শুনে রাখো! আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটেই।'[১২২]

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাতের নির্বাচিত বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরও তো পরীক্ষা করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

'তারা অত্যন্ত মারাত্মকভাবে প্রকম্পিত হয়েছে।'[১২৩]

কথা তো সত্যই। পরীক্ষা তো নেবেনই। আমরা মাটির একটি পাত্র কিনতে গিয়ে কত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখি। দুই টাকার পাত্র– কাঁচা-পাকা, ভালো-মন্দ সব কিছু পরীক্ষা করে দেখি, দু-তিন টাকার তরমুজ– সেটাও আমরা এদিক-সেদিক উল্টিয়ে আওয়াজ দিয়ে দেখি কাঁচা, না পাকা। তো আল্লাহ যাকে নিজের নৈকট্য দান করতে চান, তাকে তো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেনই।

---

১২০. সূরা বাকারাহ : আয়াত ১৩৪
১২১. সূরা বাকারা : আয়াত ২১৪
১২২. সূরা বাকারা : আয়াত ২১৪
১২৩. সূরা বাকারাহ : আয়াত ২১৪

তার ঈমান দুর্বল, না মজুবত তা তো তিনি পরীক্ষা করার অধিকার রাখেনই। বরং বলা যায়, এটা তাঁর দায়িত্বও বটে। তো পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হবে, তাকেই শুধু তিনি সফলতা দান করবেন।

তিন মহান ব্যক্তিবর্গের পরীক্ষা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন হবে, দুনিয়ায় আল্লাহ তাঁকে কুরাইশ গোত্রে সৃষ্টি করবেন এ তাঁর পূর্বসিদ্ধান্ত ছিল। এজন্য আল্লাহ নবীজির তিনজন নিকটাত্মীয়কে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছেন।

১. হযরত আব্দুল মুত্তালিবের পরীক্ষা

প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের। তো তিনি নবীজির দাদা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত সুশ্রী ও উন্নত দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী ছিলেন। জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর মাথার কিছু চুল সাদা ছিল। সেই হিসেবে তার নাম শাইবা রাখা হয়েছিল। শাইবা অর্থ শুভ্রকেশী। আল্লাহরই ইচ্ছে আব্দুল মুত্তালিব জন্ম গ্রহণের কিছু দিনের মাথায়ই তার পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেল। তাঁর মাতার নাম ছিল সালমা। হযরত আব্দুল্লাহ বাবার মৃত্যুর পর মায়ের সাথে মদীনাতেই বড় হতে লাগলেন। যুবক বয়স পর্যন্ত তিনি মদীনায় ছিলেন।

এমন সময় মক্কা অধিবাসী হারেছি এক লোক কোনো প্রয়োজন মদীনায় গেল। সে কিছু যুবক-কিশোরকে তিরন্দাযি করতে দেখল। তাদের মধ্যে একজন উন্নত গঠনের যুবক। দেখতে বড়ই চমৎকার। ব্যক্তিত্বে আভিজাত্বের ছাপ। এই ছেলেটির সমগ্র দেহে বীরত্বের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সে দ্বিতীয় তিরটি মারছে। সেটি গিয়েই সঠিক লক্ষে একেবার কেন্দ্রবিন্দুতে বিদ্ধ হচ্ছে। ছেলেটি উৎফুল্ল হয়ে কবিতাও আবৃত্তি করে। কবিতার মর্মার্থ এমন দাড়ায়- লোকেরা! তোমরা শুনে রাখো, আমি মক্কার কুরাইশ গোত্রের বীর বংশধর। আমি লক্ষভ্রষ্ট হই না।

তার প্রতি হারেছি লোকটির মায়া হলো। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার পরিচয় কী? কে তুমি? বলা হলো, এই ছেলেটির জন্ম মক্কায়। তার বাবা মারা গেছে। মায়ের সাথে এখন মদীনায় থাকে। নানার বাড়ি তার এখানে। সে তার সকল গোত্রের নাম জানে।

হারেছি মক্কায় চলে এল। সে ভালো করেই চিনে ফেলেছে। তিরের নিশানা তার বিচ্যুৎ হয় না একটুও। যে-ছেলেটির দেহ জুড়ে ছড়িয়ে আছে সৌন্দর্য ও অভিজাত্য, সে আর কেউ নয়। সে আব্দে মানাফের ছেলে আব্দুল মুত্তালিব। মক্কায় ফিরে এসে সোজা তার চাচা মুত্তালিবের কাছে গিয়ে বলল, আরে! তুমি তো দানশীল, মেহমানদের খেদমতকারী উন্নত আখলাকের মানুষ। তোমার কী খবর আছে, তোমার ভাতিজা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও এক দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে? তোমার ভাতিজাকে তোমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে উন্নত শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত করো। আদর্শবান, সৎ ও সাহসী বানাও। হারেছি আব্দুল মুত্তালিবের চাচা মুত্তালিবকে নানা রকম কথা ও তার দেখা ঘটনাগুলো বলে-বলে এতখানি উত্তেজিত করে তুলল যে, চাচা শপথ করে বললেন, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভ্রাতুস্পুত্রকে আমার কাছে মক্কায় নিয়ে না আসব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনোভাবেই স্থির ও শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না। শপথমতো মুত্তালিব মদীনায় এলেন। তিনি আব্দুল মুত্তালিবের মায়ের সাথে এ নিয়ে কথা বললেন। সেখানে মা সালমার গোত্রের লোকেরাও বোঝাল, বাচ্চাটি তো বড় হয়ে গেছে। এখনও তোমার কাছে সে মর্যাদাবান হতে পারবে না। সে তার বাপ-দাদার দেশে গেলে তার বড় মর্যাদার আসন তৈরি হবে। সে সুন্দর জীবনের সন্ধান পাবে। তো মা রাজী হয়ে গেলেন এবং আব্দুল মুত্তালিব ওরফে শাইবাকে তার চাচার সাথে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন।

সুশ্রী ও উন্নত দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী এ যুবক বসল পেছনে আর তার চাচা বসলেন সামনে। উটনি চলল মক্কার পথে। যুবককে নিয়ে চাচা মুত্তালিব মক্কার নগরীতে এলেন। লোকেরা মুত্তালিবের বাহনে এই অচেনা যুবককে দেখে ভাবল, মুত্তালিব মনে হয় গোলাম ক্রয় করে নিয়ে এসেছে। তাই তারা যুবক শাইবাকে আব্দুল মুত্তালিব অর্থাৎ মুত্তালিবের গোলাম বলে ডাক দিল। সেই থেকেই শাইবার নাম হয়ে গেল আব্দুল মুত্তালিব। এই আব্দুল মুত্তালিব হচ্ছেন নবীজির দাদা। তারপর আর কেউ তাকে শাইবা নামে ডাকল না। সবাই তাকে আব্দুল মুত্তালিব বলেই ডাকতে লাগল।

বড় অসহায় ও কষ্টের জীবন যাপন করছেন। এতিম ছিলেন। এখন আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেবেন? কী সেই পুরস্কার? তিনি স্বপ্নে দেখলেন, অমুক স্থানে যমযম। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন লোকেরা খোঁজখবর না রাখায় যমযমের স্থান বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। তো তিনি স্বপ্নেদেখা স্থানটি খনন করতে থাকেন। একপর্যায়ে পানির ঝরনা প্রবাহিত হতে শুরু হলো। ওই

সময়টিতে মক্কায় পানির বড়ই অভাব ছিল। লোকদের বসবাস পর্যন্ত দুঃসহ হয়ে পড়েছিল। জীবন ধারনের পানিও ছিল না। আব্দুল মুত্তালিবের হাতে আবিষ্কৃত এই ঝরনাধারা মানুষের জন্য রহমত হয়ে দেখা দিল। সারা মক্কায় আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। তাই সকলে মিলে এ-কারণেই আব্দুল মুত্তালিবকে বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লী বানিয়ে দিল। তাকে মুতাওয়াল্লী বানানোর কথা ছিল বলেই আল্লাহ্ কুদরতিভাবে এমন করেছেন। কত কষ্ট করে, মেহনত করে তিনি যমযমটা আবার আবিষ্কার করলেন। এই কষ্টের পরই তো তিনি যমযমের সন্ধান পেলেন, বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লী হলেন।

আজ আমাদের অবস্থা এমন যে, আমাদের ওপর যদি সামান্যতম বিপদ আসে অথবা কোনো সমস্যায় পড়ে যাই, তখনই আমরা হা-হুতাশ শুরু করে দিই আর বলি, হায়! আল্লাহ আমাদের জন্য কিছুই করলেন না। এই ভেবে আমরা আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়ি। অভাবে পড়লে ভাবি, আল্লাহ মনে হয় আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট। এটা কেমন কথা যে, টাকা-পয়সার মালিক হওয়াকে আল্লাহ সন্তুষ্ট ধরে নেওয়া হচ্ছে আর টাকা-পয়সা না এলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট আছেন ধরে নেওয়া হচ্ছে! স্মরণ রাখবেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির সম্পর্ক আহকামে শরীয়তের সাথে। যদি জীবনটা শরীয়তের মোতাবেক হয়ে যায়, তাহলে ভাববে, আল্লাহ সন্তুষ্ট আছেন। আর যদি শরীয়তের বিপরীতে জীবন যাপিত হয়, তাহলে বুঝবে, আল্লাহ অসন্তুষ্ট। তো দেখুন, আমরা কতটা ধোঁকা ও প্রতারণার মধ্যে আছি।

হযরত আব্দুল্লাহর পরীক্ষা

হযরত আব্দুল মুত্তালিব মান্নত করলেন, যদি আমার দশজন ছেলে জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে আমি তাদের একজনকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করব। আল্লাহরই কুদরত। দশজন ছেলে তার জন্মগ্রহণ করল। আব্দুল মুত্তালিব এবার চিন্তা করলেন, আমি আমার কসম পূর্ণ করব। তবে কাকে জবাই করব? তাই তিনি লটারি দিলেন। লটারিতে তার এক ছেলের নাম উঠল, যে সবচেয়ে সুন্দর, সুশ্রী ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তার নাম আব্দুল্লাহ। লোকেরা বলল, ভাই! তোমার সন্তানটিকে জবাই করো না। তুমি সন্তানের মাঝে আর উটের মাঝে লটারি দাও। কথামতো আব্দুল মুত্তালিব সন্তান ও দশটি উটের মাঝে লটারি দিলেন। লটারিতে আব্দুল্লাহর নামই উঠল। এবার বিশ উট ও আব্দুল্লাহর মাঝে লটারি দিল। আবারো আব্দুল্লাহর নাম উঠল। এভাবে দশ-দশ করে বৃদ্ধি করতে-করতে ৯০ দিয়েও লটারি দিল। এবারও

আব্দুল্লাহরই নাম উঠল। এবার আরও ১০ বাড়িয়ে একশত উট এবং আব্দুল্লাহর মাঝে লটারি দিলেন। এবার লটারিতে আব্দুল্লাহর পরিবর্তে একশত উটের নাম উঠল। ফলে আব্দুল মুত্তালিব পুত্র আব্দুল্লাহর পরিবর্তে একশত উট আল্লাহর নামে কুরবান দিলেন। এ-কারণে আব্দুল্লাহকে যাবীহুল্লাহ মানে আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত বলে ডাকা হতো।

একবার এক গ্রাম্যলোক এল। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে দুই জবাইকৃতের পুত্র! তখন নবীজি মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হ্যাঁ; আমি ইসমাঈলের বংশধর। তিনি আল্লাহর নামে জবাইকৃত ছিলেন। আবার আমি হচ্ছি আব্দুল্লাহর পুত্র। তিনিও যাবীহুল্লাহ তথা আল্লাহর নামে জবাইকৃত ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ যখন যুবক হলেন, তখন তার সৌন্দর্য ও উন্নত দেহ সৌষ্ঠব দেখে লোকেরা সন্দেহ করত। কারণ ইহুদিরা এমন রূপলাবণ্যের বর্ণনা তাদের কিতাবের মধ্যে পেয়েছে। তারা ভালো করেই জানত কে হবেন শেষ নবীর পিতা! তারা জানত শেষ নবীর পিতার ললাটে ঝিকমিক করবে। ফলে ইহুদিদের নারীরা এমন যুবকদের খুঁজে ফিরত।

একবার হযরত আব্দুল্লাহ মক্কা থেকে মদীনায় যাচ্ছিলেন। তখন ফাতেমা নামে এক নারী হযরত আব্দুল্লাহর সমীপে নিজেকে সঁপে দিল। হযরত আব্দুল্লাহ বললেন, এভাবে তো আমি বিবাহ করব না। ওই নারী বলল, যদি বিবাহ না কর, তাহলে এভাবেই (বিবাহ ছাড়াই) আমার সাথে মিলন করে নাও। হযরত আব্দুল্লাহ বললেন, না এমন কাজ আমি করতে পারি না, যা সেই ব্যক্তির জন্য অপমান, যার বংশধারায়, যার রক্ত হতে নবীর জন্ম হবে। সে শত প্রলোভনেও ব্যভিচার করবে না। আল্লাহ তাকে কুদরতিভাবে রক্ষা করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ মদীনায় পৌঁছে গেলেন।

মদীনায় বনী যুহরা নামে এক গোত্র ছিল। তাদের বিবাহযোগ্য কন্যা ছিল। নাম তার আমেনা। সে বড়ই সুন্দরী ও চরিত্রবতী ছিলেন। সেই ছোট্ট থেকেই তিনি সবার হৃদয়ের মধ্যমণি। দেহাবয়ব সৌন্দর্য ও রূপে পরিপূর্ণ। গুণে অনন্যা। সর্বপ্রকার সাফল্য এসে তার পদতলে আছড়ে পড়েছে। তাকে হযরত আব্দুল্লাহর জন্য পছন্দ করা হলো। ফলে অনতিবিলম্বেই মক্কার যুবক আব্দুল্লাহর সাথে মদীনায় মহীয়সী রমণী আমেনার বিয়ে সম্পন্ন করা হলো।

বিবাহের পরে হযরত আব্দুল্লাহ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথে আবার সেই ফাতেমা নামের মেয়েটির সাথে সাক্ষাৎ ঘটল। সস্ত্রীক

আব্দুল্লাহকে দেখে মেয়েটি বলল, এখন তোমার চেহারায় সেই জ্বলজ্বলে নূরটি দেখতে পাচ্ছি না, যা আগে দেখছিলাম। সত্যি বলতে কী, নবীয়ে রহমত তত দিনে পিতার ঔরস থেকে মায়ের গর্ভে স্থানান্তরিত হয়ে গেছেন।

প্রিয় সুধী! এবার দেখুন, পিতা আব্দুল্লাহর ওপরও পরীক্ষা এসেছে। এবার মা আমেনার পরীক্ষার পালা।

৩. মা আমেনার পরীক্ষা

বিবাহের কয়েক মাস পরে মক্কা মোকাররমার একটি কাফেলা ব্যবসার জন্য শাম অভিমুখে গেল। হযরত আব্দুল্লাহও সেই কাফেলার সাথে গেলেন। এখন এই নবদম্পত্তির সাথে বিচ্ছেদের বেদনা তীব্রভাবে কাজ করতে লাগল। একের জন্য অন্যের অন্তর কাঁদতে লাগল। অবশ্য সফরে বের হওয়ার সময়ই আব্দুল্লাহ আমেনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, তুমি এমন করে ব্যথিত হবে না। এই তো কটা দিন পরই আমি ফিরে আসছি। আরও বললেন, প্রথম থেকে যখন কাফেলা আগমনের ঘন্টাধ্বনি বাজানো হবে, তখন তুমি বাড়ির গেটে অগ্রসর হয়ে আমাকে স্বাগত জানাবে। আমার হৃদয়ের ভালোবাসায় তোমাকে উষ্ণতা দেব। পরম প্রণয়ে দুজনে সাক্ষাৎ করব।

হযরত আব্দুল্লাহ এমন সান্ত্বনামূলক কথা বলে চলে গেলেন শামে। ব্যবসায় কিছু দিন ব্যয় হলো শাম দেশে। ফিরতি পথে মদীনায় গমন করলেন। সেখানেই তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এত অসুস্থ হয়ে গেলেন যে, সফরই করতে পারছিলেন না। ফলে শ্বশুরালয়েই অবস্থান করতে থাকলেন। প্রবাসী এই কাফেলা চলে গেল মক্কায়। নিয়মমতো কাফেলা আগমনের ঘণ্টা বেজে উঠল। হযরত আমেনা দরুণভাবে আনন্দিত ও খুশি হলেন। ভাবলেন, তাঁর জীবনসঙ্গী এসেছে।

কাফেলার সবাই যে যার ঘরে চলে গেল। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহর আগমন ঘটল না। পেরেশান হয়ে গেলেন বিবি আমেনা। সংবাদ নিয়ে জানতে পারলেন, তিনি অসুস্থ। মদীনায় শ্বশুর বাড়িতে আছেন। আবদুল্লাহর এক আত্মীয় মদীনার পথে রওনা হলো। আল্লাহর কী কুদরত! এই আত্মীয় মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই হযরত আব্দুল্লাহর ইন্তেকাল হয়ে গেল। তখন বিবি আমেনার বয়স আঠারো বছরেরও কম। এতো কম বয়সেই বিবি আমেনা বিধবা হয়ে গেলেন। চিন্তা করুন, কত বড় ও কত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন বিবি আমেনা।

প্রকাশ হতে লাগল আশ্চর্যসব দৃশ্য ও অবস্থা

বিবি আমেনা বলেন, বেশ কিছু দিন পর আমি নিজেকে গর্ভবতী অনুভব করলাম। তবে আমার গর্ভের অবস্থা বড় আশ্চর্যজনক ছিল। সাধারণত গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত ভার অনুভূত হয়, কষ্ট হয়। কিন্তু আমি ভারও অনুভব করিনি, কষ্ট ও অনুভব করিনি। তবে আমার যে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, তা আমি বুঝতাম।

আমি কোথাও রওনা হলে পথে চলার সময় দেখতাম, গাছেরা আমার সামনে ঝুঁকে পড়ছে। আমি পানি আনতে যখন যমযম কূপের পাড়ে যেতম, তখন দেখতাম, যমযমের পানি উপরের দিকে একেবারে কূলে এসে উঠে আছে। আবার পাত্রে পানি পূর্ণ করে যখন ফিরে আসতে শুরু করতাম, তখন দেখতাম, পানি একেবারে তলে চলে গেছে। মক্কার নারীরা আমাকে ধরে সেখানে যমযমের তীরে দাঁড় করিয়ে রাখত। বলত, আমেনা! তুমি যেও না; এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। তোমার উসিলায় আমরা যমযমের পানি সহজেই পেয়ে যাই।

আমি এও দেখতাম যে, রোদে যদি আমার কোনো কাজ করতে হতো, তখন এক খন্ড মেঘ এসে আমার ওপর স্থির হয়ে থাকত, আমাকে ছায়া দিত। গাছের ঝুঁকে পড়া, পানি আমার হাতের নাগালে এসে যাওয়া আর মেঘখণ্ড আমাকে ছায়া দান করা এসব কিছুই আমার কাছে বড় অদ্ভূত মনে হতো।

এই সময়টাতেই বিবি আমেনা একটি স্বপ্ন দেখলেন। সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই দাঁড়াল যে, তুমি অত্যন্ত পবিত্র ও মহান এক সত্তার মা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

ইহুদিদের উৎকণ্ঠা

বিবি আমেনা বলেন, মুহাম্মাদের জন্মের দিন যখন কাছাকাছি এসে গেল, তখন একটি লাল ও উজ্জ্বল নক্ষত্র আকাশের বুকে জ্বলজ্বল করতে লাগল। তাওরাতে এই আলামতের কথা উল্লেখিত আছে যে, যখন শেষ নবীর আগমনের সময় খুব কাছাকাছি এসে যাবে, তখন আকাশের বুকে একটি উজ্জ্বল তারকা দেখা যাবে।

ইহুদিরা সর্বদা সেই তারকাটি খুঁজে ফিরত এবং ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রহর গুনত, কখন উদিত হবে সেই তারকা। হঠাৎ তারা এই তারকা দেখে হইচই শুরু করে দিল। তারা বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে বলাবলি শুরু করল, আরে! শেষ

যমানার নবীর আগমন তো হয়েই গেল তাহলে। ইহুদিরা তাদের রমণীদের কাছ থেকে অতি সঙ্গোপনে খোঁজ নিতে লাগল, কে সেই নারী? মহিলারাও খুঁজতে থাকল। এমনকি প্রসূতি নারীর খোঁজখবরও তারা নিতে লাগল। কিন্তু কোনো সন্ধান পেল না।

শেষ পর্যন্ত এক ইহুদি মক্কা মুকাররমায় আগমন করল। সে এসে কুরাইশ গোত্রের খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল, এক রমণী গর্ভবতী আছে। নাম তার আমেনা। সে সজোরে চিৎকার করতে লাগল, হে লোকসকল! আমার মনে হচ্ছে, নবুওতের ধারা ইসহাক বংশ থেকে পরিবর্তিত হয়ে ইসমাঈল বংশে চলে গেছে। আহ! এই মহা নেয়ামত বুঝি আমাদের ইসহাক বংশ থেকে চলে গেল!

জন্মলগ্নের বৈশিষ্ট্যাবলি

আল্লাহর কুদরত যে, রাতের শেষ প্রহরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটল ধরার বুকে। বিবি আমেনা বলেন, আমার ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য তেলও ছিল না। কিন্তু মুহাম্মাদের যখন জন্ম হলো, তখন বহু আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করল।

নবীজির ভূমিষ্ট হওয়ার পর তাকে যখন শুইয়ে দেওয়া হচ্ছিল, এমন সময় তাঁর অবস্থাটা এমন হচ্ছিল যে, তিনি যেন সেজদা করছেন।

আসমানের তারকারাজি দারুণ আলোকময় হয়ে উঠল, যেন দুনিয়ার একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গেছে সব তারকা।

কেসরার বাদশাহর রাজমহলের ১৪টি গম্বুজ ভেঙে গেল।

পারস্যবাসী অগ্নিপূজা করত। তাদের পূজনীয় অগ্নিকুন্ডটি হাজার বছর ধরে প্রজ্বলিত ছিল। সেটি মুহাম্মাদের আগমনের সাথে-সাথে ধপ করে নিভে গেল।

কেসরার স্বপ্ন ও ব্যাখ্যা

সেই সময়টিতে বাদশাহ কেসরা স্বপ্ন দেখলেন, কিছু আরব্য উট আর তার সামনে রয়েছে কিছু ঘোড়া। আরবি উটগুলো ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে নদীর তীরে-তীরে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীকে ডাকা হলো। ব্যাখ্যাকারী বললেন, আমার মনে হচ্ছে, আরব দেশে উত্তম কোনো ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে যার উসিলায় আরব্য লোকেরা অন্য লোকদেরকে জাযিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

১৪টি গম্বুজ ধসে যাওয়ার রহস্য

স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, জনাব! আপনিসহ মোট ১৪টি বাদশাহর ধারা অব্যাহত থাকবে আপনার খান্দান ও বংশের লোকদের মাঝে। তারপর এই রাজত্ব চলে যাবে তাদের হাতে। এবার কেসরা প্রশান্ত হলো। ভাবল, ১৪জন বাদশাহর ইতি ঘটতে তো মোটামুটি ভালোই সময় লাগবে। কিন্তু সে তো জানত না, তার পরে একেবারে স্বল্প সময়ের ভেতরেই যে-ই বাদশাহ হবে, সে-ই মরে যাবে। হযরত ওছমান (রাযি.)-এর যামানায় তাদের চৌদ্দ বাদশাহর ধারা সমাপ্ত হয়ে গেল এবং কেসরার ক্ষমতা আল্লাহ মুসলমানদের হস্তগত করলেন।

তারকার সেজদা করার রহস্য

হ্যাঁ, তারকারাজি নবীজিকে সেজদা করে দুনিয়াবাসীকে আহ্বান করে বলেছে, হে দুনিয়াবাসী! শুনো, ইনি তো এমন এক মহান সত্তা, যার সামনে আসমান ও জমিন লুটিয়ে পড়ে, যার সামনে তারকারাজি সেজদা করে। হে দুনিয়ার মানুষ! তোমরা মেনে নাও। তাঁর আনুগত্য কবুল করো।

এতে সময়ের রাজা-বাদশাহদের এই সংবাদ ও সতর্কবাণী দান করা হয়েছে যে, দেখো! আসমানে জ্বলজ্বল করে যে তারকা সেই তারকা আজ সেজদা করছে মুহাম্মাদকে। তোমরাও নতশিরে তাঁর আনুগত্য মেনে নাও।

তবে এতে আরেকটি বিশেষ ইঙ্গিতও আছে। এই নবজাতক সন্তান এমন ব্যক্তিত্ব যে, যারাই তার সংস্পর্শে আসবে, তার পায়ের সামনে যারাই নিজেদের সঁপে দিতে পারবে, তার শিক্ষা ও আদর্শকে যারাই ধারণ ও গ্রহণ করতে পারবে, তারা আকাশের তারকারাজির মতোই জমিনের বুকে ঐশী নূরের আলো বিকিরণ করবে। তারাও তেমনই জ্বলজ্বল করবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেই গেছেন–

أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

আমার সাহাবিরা আসমানের তারকাতুল্য। যে-ই তাদের অনুসরণ করবে, সেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

একজন হৃদয়বান প্রেমিকের প্রণয়সুলভ কথা

এক নবীপ্রেমিক নবীজির জন্মের ব্যাপারে কত সুন্দর বলেছেন–

خلیل اللہ نے جس کے لئے حق سے دعائیں کیں
ذبیح اللہ نے ہونے ذبح جس کی التجائیں کیں
جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا
جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا
کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس ضوفشانی سے
وہ جس کی ارزو بھڑ کی جواب لن ترانی سے

যার অধিকার প্রাপ্তির তরে হযরত ইবরাহীম (আ.) দু'আ করে গেছেন আল্লাহর সমীপে নবীজি তো সেই পুরুষ।

যার জন্যে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর যবেহ থেমে গেছে তিনি তো সেই পুরুষ!

যার জন্যে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর দৃষ্টি ফিরে এসেছে, তিনি তো সেই পুরুষ, যিনি ইউসুফের সেই সৌন্দর্যে নতুন করে আবির্ভূত হয়েছেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর দীন যার আলোর ছোয়ায় প্রাণ পেয়েছে, তিনি তো সেই মহানবী! তিনিই তো সেই পুরুষ, যার আশা পোষণ করে মানুষ আর জবাবে শোনে 'কখনও আমাকে দেখবে না'।

নবীজি এতিম কেন

নবীজি এতিম হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। এর দ্বারা বিশ্ববাসীকে এই সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, নিঃস্ব এই শিশু! কোনো আশ্রয় নেই এর। সহায়হীনের সহায় আল্লাহ! আশ্রয়হীনের আশ্রয় আল্লাহ। আল্লাহ যেন বলে দিয়েছেন, যার দুনিয়ায় অভিভাবক থাকে না, রবই তার অভিভাবক হন। আর তিনিই তো অভিভাবক হিসেবে সবচেয়ে উত্তম। যার রব আছে তার সব আছে। যার রব নেই তার কিছুই নেই। মুহাম্মাদের কেউ নেই তাতে কী হয়েছে! তাঁর তো রব আছে।

اُمّی و دقیقہ دان عالم
بے سایہ و سائبان عالم

যে অসহায় সে-ই পরে হয় অসহায়ের সহায়। যে আশ্রয়হীন সে-ই হয় পরে অন্যের আশ্রয়দাতা।

আমাদের নবীজি তো বাস্তবে এমনই ছিলেন।

আল্লাহু আকবার কাবীরা!

وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی
وہ جس کی یاد میں شاہ سلیماں نے گدائی کی
دلِ یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے
لبِ عیسیٰ پہ آئے وعظ جس کی شان رحمت کے
وہ دن آیا کہ پورے ہوگئے تورات کے وعدے
مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے
جناب رحمۃ للعالمین تشریف لے آئے

তিনিই তো এমন সত্তা, যাঁর নামে হযরত দাউদ (আ.) মধুর স্বরে গীত গেয়েছেন।

তিনিই তো এমন সত্তা, যাঁর স্মরণে হযরত সুলাইমান (আ.) খায়রাত করেছেন।

হযরত ইয়াহয়া (আ.)-এর হৃদয়ের মাঝে যার যেয়ারতের স্বপ্ন ছিল।

আমাদের প্রিয়তম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এমন সত্তা, যাঁর রহমতের ওয়াজ করে গেছে আপন ওষ্ঠে হযরত ঈসা (আ.)।

এমন একটি দিনের আগম হলো, যেদিন পূর্ণ হলো তাওরাতের ওয়াদা।

তাঁরই মাধ্যমে আম্বিয়া কেরাম ও রাসূলগণের আগমনের মুবারক ধারার সমাপ্তি ঘটল। সমাজ-জগত আলো করে একদিন রহমাতুল্লিল আলামীনের আগমন হলো।

এতিম হয়ে গেলেন অন্য এতিমের আশ্রয়স্থল

আল্লাহর শান দেখুন! আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের তিন মাস পূর্বেই তো তাঁর সম্মানিত পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেল। নবীজি এতিম হয়ে গেলেন মায়ের উদরে থাকতেই। নবীজির দাদা তাঁর

জন্মের পর তাঁকে বাইতুল্লাহর দিকে নিয়ে গেলেন। দাদা তো আর জানতেন না, তিনি এমনই এক সত্তা, যাঁর কারণে আল্লাহর অবিরত রহমত ও বরকতের ধারা অনন্তকালের তরে বর্ষিত হতে শুরু করবে।

قدم قدم پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں
جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیا گزر گیا

যেখান দিয়ে, যে পথ হয়ে সারা জাহানের পাপকারীদের সুপারিশকারীর গমন-প্রত্যাগমন হয়েছে, এসব কদমে-কদমে তাঁর রহমত বর্ষিত হয়েছে। কদমে-কদমে তাঁর বরকত বর্ষিত হয়েছে।

নবীজির জন্মের সপ্তম দিনে

সপ্তম দিনটিতে যে-ই এই শিশু বাচ্চাকে দেখল, সে-ই তাঁকে অনেক আদর করল। আদরে-আদরে ভরে দিল। সকলেই তাঁর প্রশংসা করল, করতে থাকল। তাই সপ্তম দিনটিতে যখন নাম রাখার সময় হলো, তখন আব্দুল মুত্তালিব বললেন, আমার এই দৌহিত্রের তারিফ আর প্রশংসা করছে সকলেই। আমার এই কলিজার টুকরাটি প্রশংসিত। আমি এর নামও রাখতে চাই মুহাম্মদ তথা প্রশংসিত। মুহাম্মদ এমন একটি গুণসমপ্ন সত্তা, যাঁর প্রশংসা তামাম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি করা হবে।

তো আমাদের নবীজি মুহাম্মদ ছিলেন। আবার তিনি আহমদও ছিলেন। আহমদের মর্ম হলো, এমন সত্তা, যিনি আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের এমন বিপুল পরিমাণ তারীফ ও প্রশংসা করবেন, যে পরিমাণ তারীফ ও প্রশংসা আর কেউ করতে পারবে না। মনে রাখার বিষয় হলো, এ দুটি নামই এমন যে, নবীজির পূর্বে এই দুই নামে আর কারও নামকরণ করা হয়নি। কত সুন্দর নাম আমাদের নবীজির। শুনতেই কত মধুর লাগে– 'মুহাম্মাদ'। আহ! কী দারুণ! আহমদ! আহ কী জাদুময় নাম!

শিশু মুহাম্মাদকে কোলে নিতে নারীদের আগমন

যখন প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হলো, তখন তায়েফের কাছাকাছিতে অবস্থানকারী বনু সা'দ গোত্রের দশজন রমণী মক্কা মুকার্‌রামায় এল নিজেদের জন্য পারিশ্রমিক নিয়ে দুধ পান করতে শিশু সংগ্রহের জন্য। সেই দশ রমণীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল হালিমা সা'দিয়া (রাযি.)। তার সাথে ছিল একটি উটনি ও একটি গাধি। গাধির ওপর

ছিল সফরের সামানা আর উটের ওপর আরোহিত ছিলেন হযরত হালিমা ও তাঁর স্বামী।

অবশ্য দুধ পান করে এমন আরেকটি শিশুও হালিমার কাছে ছিল। তার উটনিও অনেক দুর্বল ছিল। দশ নারীর সাথে তিনি চলে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। অন্য নজন নারী অনেক আগেই মক্কায় পৌঁছে গেছেন। হালিমা সা'দিয়া পড়ে গেছেন পেছনে। অবশেষে মক্কায় উপস্থিত হলেন।

প্রত্যেক নারীই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য পালক নিতে আগ্রহী। সেই হিসেবে সকলে ধনাঢ্যদের সন্তানই নিতে লাগল। মুহাম্মাদের বাবা নেই। তাই মুহাম্মাদকে কেউ নিতে চাইল না। যে-ই শুনত যে ছেলেটির বাবা নেই, সঙ্গে-সঙ্গে তায়েফের ওই নারীরা পাশ কেটে যেত। কেউ মুহাম্মাদের দায়িত্ব নিল না। কেউ মুহাম্মাদকে দুধ পান করানোর জন্য পালক নিল না। তারা ভাবত, যে বাচ্চার বাবা নেই, সেই সন্তান নিয়ে কী লাভ হবে। পুরস্কার ও বিনিময় তো পাওয়া যাবে না।

আমেনা বড় ব্যথিত হলেন। চোখ বেয়ে তার অশ্রুর ধারা নেমে এল। হায় পিতৃহীন এই শিশু মুহাম্মাদকে কেউ নিতে চায় না। কেউ তাকে পালক নেয় না। কেউ তো জানে না এই নবীর সামনে সেজদা করে চন্দ্র-তারা, যাঁকে ভ্রমণ করানোর জন্য আল্লাহ আরশে ডেকে নেবেন। এই শিশুর আগমনে ভেঙে গেছে কেসরার রাজপ্রাসাদ। নিভে গেছে কায়সারের অগ্নিকুণ্ড। আর তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে সমগ্র বিশ্বজাহানের রাজত্য।

লালন-পালনে হযরত হালিমা নির্বাচিতা

হালিমা সব নারীদের শেষে এসে মক্কায় পৌঁছলেন। তখন আর কোনো শিশু পাওয়া যাচ্ছিল না। হালিমা একটি এতিম শিশুর সংবাদ পেলেন। শিশু মুহাম্মাদের সংবাদ পেলেন। পিতৃহীন মুহাম্মদকে কেউ পালনের জন্য নেয়নি সেই সংবাদ পেলেন এক সময় যিনি হবেন এই কুরআনের আহ্বায়ক, রবের পথের দিশারী, সত্য ও ন্যায়ের পথের সংগ্রামী। সেই মহান শিশুনবীর সংবাদ পেলেন, যাঁকে কেউ নেয়নি।

বিবি হালিমা বললেন, আরে! আমি আগে বাচ্চাটাকে এক নজর দেখি। কেমন সেই বাচ্চা একটু দেখি। বর্ণনায় পাওয়া যায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন শুয়ে আছেন। চাদরে ঢাকা ছিলেন তিনি। বিবি হালিমা যেই-না চাদরটি তুলে নিলেন, সাথে-সাথেই শিশু নবীজি চোখ

খুললেন। বিবি হালিমাকে দেখেই শিশু নবীজি মুচকি হেসে দিলেন। এমন আকর্ষণ ও প্রভাব ছিল তাঁর হাসির মধ্যে যে, হালিমা ব্যাকুল হয়ে গেলেন। হালিমা মুহাম্মাদকে প্রাণ উজাড় করে ভালোবেসে ফেললেন।

হালিমা সা'দিয়া (রাযি.) তাঁর স্বামীকে গিয়ে বললেন, যদিও আমরা এ বাচ্চাটি লালন-পালন করে পুরস্কার খুব বেশি পাব না; কিন্তু বাচ্চাটির মুচকি হাসি আমার হৃদয়ে রেখাপাত করেছে। আমার হৃদয় খুব আশ্বস্ত হয়ে গেছে। সম্ভবত ছেলেটি কোনো সৌভাগ্য নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে। স্বামী হালিমাকে পরামর্শ দিল, নাও; বাচ্চাটি নিয়ে নাও। স্বামী সাথে-সাথে এ বাক্যও বললেন,

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ لَنَا فِيْهِ بَرَكَةً۔

হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাচ্চাটির জন্য আমাদের ওপর বরকত বর্ষিত হবে।

এখানে এসে ওলামায়ে কেরাম একটি সূক্ষ্ম রহস্যের কথা আলোচনা করেছেন। দশ নারীর মধ্য থেকে আগের নজনের দৃষ্টি ছিল বাহ্যিক ধন ও ঐশ্বর্যের প্রতি। তাদের দৃষ্টি ছিল বিনিময়ের প্রতি। একমাত্র হালিমাই এমন ছিলেন যে, তার স্বামীর দৃষ্টি ছিল আল্লাহর প্রতি। আল্লাহর দেওয়া বরকতের প্রতি। কথাটি তাঁর এই বাক্য থেকেই বোঝা যায়–

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ لَنَا فِيْهِ بَرَكَةً

হতে পারে, আল্লাহ এই শিশুর মাঝে আমাদের জন্য বরকত দান করবেন। ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, আল্লাহ মুহাম্মাদের সেবায় হালিমাকে এজন্য নির্বাচন করেছেন যে,

১. হালিমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। প্রজ্ঞা ও জ্ঞান তার অস্তিত্বের সাথেই মিশে ছিল। অনেক মায়ের মাঝে এই প্রজ্ঞার গুণটি থাকে না। তারা বাচ্চা ও সন্তানের ভালো-মন্দ বুঝতেই পারে না। তাই আল্লাহ রব্বুল ইয্যত নবীজির লালন-পালনের জন্য এমন রমণী নির্বাচন করলেন, যার গুণ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা সবই ছিল। সহজে তিনি রাগ হতেন না। তার নামই তো ছিল হালিমা, যার অর্থই পরম ধৈর্যশীলা।

২. দ্বিতীয় কথা এই যে, বিবি হালিমার দৃষ্টি মাখলুকের প্রতি ছিল না। তার দৃষ্টি ছিল খালেক তথা আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের ওপর। হে লোকসকল! এর মধ্যে আমাদের জন্য মস্ত একটি শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। যারা মানুষের

পকেটের দিকে তাকিয়েছে, তারা সাধারণ শিশু নিয়ে ঘরে এসেছে। আর যে-নারী আল্লাহর ওপর ভরসা করেছে, সে অকল্পনীয় বরকত আর প্রাচুর্যের আধার, অফুরন্ত রহমত ও নেয়ামতের উসিলা এবং অনন্য সৌন্দর্যের অধিকারী এক মহামানবকে ঘরে নিয়ে এসেছে।

রবের দানে হালিমার কোলে মুহাম্মাদ

শিশু মুহাম্মাদকে হযরত হালিমা সা'দিয়া (রাযি.) বুকে তুলে নিলেন। হালিমার মন এমন তীব্র আনন্দে ভরে গেল যে, মনের অজান্তেই তিনি বলে উঠলেন, এমন সুন্দর ও মায়াবী সন্তান আমি কখনও দেখিনি। হালিমা সারাক্ষণই শিশু মুহাম্মাদের প্রশংসা করতে থাকলেন। বলতে লাগলেন, এমন সুন্দর ছেলে কখনও দেখিনি আমি। তখন বিবি আমেনা বললেন, হালিমা! তুমি তো গ্রামে থাক। গ্রামেই তোমার বসবাস। এজন্য তুমি কটা শিশুইবা দেখবে। দাদা আবদুল মুত্তালিব দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি বললেন, আমেনা, তোমরা শহর আর গ্রামের কথা বলছ! আমি তো দেশের পর দেশের সফর করছি। শাম সফর করে এসেছি। আমি কোথাও এমন সুন্দর শিশু দেখিনি।

বন্ধুগণ! তাদের এই কথোপকথনের স্থানে যদি খোদ জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত থাতকেন, তাহলে বলতেন, হে হালিমা! তুমি গ্রামাঞ্চলে এমন সন্তান দেখনি। হে আমেনা! তুমি শহরেও এমন সন্তান দেখনি। আর ওহে বৃদ্ধ দাদা আব্দুল মুত্তালিব তুমি দেশে দেশে ঘুরেও এমন সন্তান দেখনি। শোনো, আমি তো সমগ্র বিশ্বজাহান পরিভ্রমণ করে বেড়াই। আমি জিবরাঈলও সারা জাহানে এমন সন্তান দেখিনি।

اے چہرہ ریبائے تو رسک بتان آزری

ہر چند آفاق ہا بسیار خوباں دیدہ ام

হে সুদর্শী! হে সুকুমার! হে প্রিয় মায়াময়! তোমার মতো সুন্দর মানুষ আমি সারা আকাশ-জমিন কোথাও দেখিনি।

বিবি হালিমা, মা আমেনা, দাদা আব্দুল মুত্তালিব আর ফেরেশতা জিবরাঈলের এমন সব কথা শুনে যেন রব্বে কারীম বলে দিচ্ছেন–

আরে, তোমরা শোনো! আমি তো খালেক। আমি তো সবার সৃষ্টিকর্তা। আমি পুরা সৃষ্টিজগতে এমন এমন হৃদয়কাড়া চেহারা আর সৃষ্টি করিনি। আমি তো মুহাম্মাদের চেয়ে সুন্দর কাউকে বানাইনি। কাউকে তার চেয়ে সুন্দর আমি দেখিও না।

والليل سیاہی زلفوی کی چہرہ والضحی جس کا

সূরা লাইলের والليل (রাত) হচ্ছে তার কেশরাজির কৃষ্ণতা আর তার মুখাবয়ব হচ্ছে والضحى তথা ঔজ্জ্বল্য।

سارے جہاں کے پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا

সমগ্র জাহানের প্রিয় আরাধ্য তিনি। আল্লাহ তাঁকে মহব্বতকারী। আল্লাহও তাঁর প্রেমিক।

رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ

আল্লাহ যখন তাঁকে সৃজন করেছেন, তৈরি করেছেন, তখন তিনি নিজেই বলেছেন সুবহানাল্লাহ!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আসমানের দিকে আপন চেহারাটা তুলে ধরতেন, তখন রব্বে কারীম নিজেই বলতেন,

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ

আরে আপনি আসমানের দিকে তাকাচ্ছেন! আর আমি তো আপনার প্রিয় চেহারার দিকে তাকিয়ে আছি।[১২৪]

মায়ের দু'আর ফসল

মা শিশু মুহাম্মাদকে দুধপানের জন্য বিবি হালিমার হাতে তুলে দিচ্ছেন। সন্তানকে বিদায় জানানোর সময় মায়ের হৃদয়ের অবস্থা বড় অদ্ভুত হয়ে যায়। মা ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে যান। সন্তানকে আদরে-আদরে ভরে দেন। দু'আ করেন। বিবি আমেনার অবস্থাও তেমন হলো। তিনিও শিশু মুহাম্মাদকে দু'আ করে দিলেন। সেই দু'আর ফল কী হলো। ওই বিষয়টি জানতে হলে আমাদেরকে ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি বোলাতে হবে।

মুহতারাম হাজিরীন! আগের যুগেও মায়ের দু'আ সন্তানের জন্য বিপুল কামিয়াবি ও বরকতের উসিলা হতো। যেমন– হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন বিবি হাজেরাকে বললেন, ইসমাঈলকে সাজিয়ে দাও; এক মহান ব্যক্তির সাথে আজ সাক্ষাৎ করতে হবে। বিবি হাজেরা শিশু ইসমাঈলকে গোসল করিয়ে দিলেন। নতুন ও সুন্দর কাপড় পরিয়ে দিলেন। স্বামী ইবরাহীম (আ.)-এর

---

১২৪. সূরা বাকারা : আয়াত ৪৪

সাথে বাচ্চাটাকে প্রস্তুত করে রওনা করিয়ে দিলেন। মা দু'আ করে দিলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে বলে দিলেন, আল্লাহ তোমার জন্য খায়ের ও কল্যাণের ফয়সালা করুন।

বন্ধুগণ! যাওয়ার সময় তো এই শিশু শুধু ইসমাঈল ছিল। মায়ের দু'আর ফলে ইসমাঈল যবীহুল্লাহ নামে ভূষিত হয়ে ফিরে এলেন। এই তো মায়ের নিঃস্বার্থ দু'আর বরকত।

হযরত মূসা (আ.)-এর মা ফেরাউনের খড়গ থেকে শিশু মূসাকে বাঁচাতে একটি ছোট বাক্সে করে দরিয়ায় ছেড়ে দিলেন। প্রাণ ভরে মা দু'আ করে দিলেন, আল্লাহ তোমাকে যেখানেই রাখেন, ভালো রাখুন! যেখানেই রাখেন হেফাযতে রাখুন। মায়ের দু'আর বরকতে কী হলো? বাক্সে ভাসমান শিশু মূসা নবী হয়ে, মূসা কালীমুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হয়ে মায়ের কোলে ফিরে এলেন।

আব্দুল মুত্তালিব তার মায়ের কাছে যখন ছিলেন, তখন তার নাম ছিল শাইবা। তাঁর চাচা যখন তাঁকে নিয়ে আসলেন তখন মা সালমা বড় মায়াবী কান্না কেঁদেছেন। আব্দুল মুত্তালিবকে প্রাণ ভরে দু'আ করে দিয়েছেন। আল্লাহর শান কী? মায়ের কোল থেকে আসার সময় ছেলেটার নাম ছিল শাইবা। আর মায়ের দু'আর বরকতে সেই শাইবাই হয়ে গেলেন ওলীয়ে বাইতুল্লাহ তথা বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লী।

বন্ধুগণ! একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। মায়ের দু'আর বরকতে একটি শিশু বাচ্চা কত বড় মর্যাদায় ভূষিত হয়ে যায়।

তো আজ মা আমেনা তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তান মুহাম্মাদকে দু'আ করে দিচ্ছেন। কান্নাভরা দু'আয় তাকে বিদায় জানাচ্ছেন। মায়ের এই দু'আ একদিন ফল দেবে। আজ মুহাম্মাদ নামের এই শিশু মায়ের কাছ থেকে ফিরবেন। একদিন এই মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহরূপে আবির্ভূত হবেন। এই মর্যাদা তিনি তো মায়ের দু'আর বরকতেই প্রাপ্ত হবেন।

হে প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! মায়ের দু'আ থেকে তোমরা নিজেকে কখনও বঞ্চিত করো না। কিছু তরুণ মায়ের সাথে জেদ ধরে, রাগ করে, মায়ের অবাধ্যতা করে, মায়ের মনে কষ্ট দেয়। ফলে তারা বড় করুণ পরিণতির শিকার হয়। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নেয়ামত ও রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। সর্বদা মায়ের দু'আ নিয়ে চলবে। দেখবে, আল্লাহর অকল্পনীয় রহমত তুমি প্রাপ্ত হবে। আল্লাহর অবধারিত বরকত তোমার ওপর বর্ষিত হবে। তুমি সফলকাম হবে। প্রত্যেক কাজে তুমি বিজয়ী হবে।

উচ্চে রাখো মুহাম্মাদকে

মা আমেনা কলিজার টুকরা মুহাম্মাদকে হালিমা সা'দিয়ার হাতে তুলে দিলেন। হালিমা সন্তানকে নিয়ে ফিরে আসতে লাগলেন আপন মনযিলে নিজের গ্রামে। উটের ওপর যখনই সাওয়ার হলেন, তখন হালিমার স্বামী হালিমাকে বললেন, তুমি উটনির পেছনের অংশে বসো; আমি সামনে বসি। আমি উটনি চালিয়ে নেব। উভয়ে উটনিতে চেপে বসলেন, কিন্তু উটনি তার স্থান থেকে সামান্যও নড়লেন না। স্বামী নেমে গেলেন, বুঝতে চাইলেন কী হয়েছে? যেই স্বামী নামলেন সঙ্গে-সঙ্গে উটনি দাঁড়িয়ে চলতে লাগল। স্বামী কিছুই বুঝতে পারল না। আবার উটনিটি বসিয়ে আগের মতো সামনে নিজে বসলেন এবং হালিমা ও মুহাম্মাদকে পেছনে বসতে দিলেন। এবারও আগের মতোই হলো। উটনি সামান্যও নড়ল না। আবারও স্বামী নেমে এলেন এবং হালিমাকে বললেন, তুমি মুহাম্মাদকে নিয়ে সামনে বসো; আমি পেছনে বসি। এভাবে বসলেন। এবার উটনি চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল এবং চলতে লাগল। এই দৃশ্যের অবতারণা করে উটনি যেন হালিমা সা'দিয়াকে জানিয়ে দিল, হালিমা! তুমি সতর্ক হও! তোমার বুকে যে-মানিক এসেছে, তুমি তার সম্মান করো। আর হে হালিমার স্বামী! এই শিশু এমন পূত-পবিত্র সত্তা; যদি তুমি তাকে তোমার পিঠের দিকে রাখতে চাও, তাকে পেছন করে বস, তাহলে আমি উটনি তোমাকে বহন করে চলব না। মুহাম্মাদের অসম্মান হয় এমন অবস্থায় আমার কদম নাড়ানোও হারাম। যদি আমার ওপর সাওয়ার হয়ে তোমার চলতে হয়, তাহলে এই কায়েনাতের সরদার মুহাম্মাদকেই সামনে দিতে হবে। তার দিকে পিঠ করে বসা যাবে না।

এবার উটনি চলছে। দ্রুতগতিতে চলছে। এত জওয়ান হয়ে চলছে যে, হালিমার উটনি ওই সকল নারীদের পেছনে ফেলে দিল, যারা আগে-আগে মক্কার শিশুদের নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল। তারা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তো বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, হালিমা! তুমি কি সওয়ারি বদল করেছ নাকি? উটনি পরিবর্তন করেছ? হালিমা বললেন, আরে, আমি সওয়ারি তো পরিবর্তন করিনি। কিন্তু সওয়ারিরর আরোহী পরিবর্তিত হয়েছে। জানি না কোন মানিক আমার বুকে এসেছে!

হালিমার দুঃখের দিন কেটে গেল

হালিমা সা'দিয়া বর্ণনা করেন, আমি আমার বক্ষে দুগ্ধ নেমেছে বলে উপলব্ধি করলাম। অথচ পানাহারের জন্য তখন কিছুই ছিল না। আমি

উপলব্ধি করতে শুরু করলাম, আমার স্বামী যে বলেছিলেন, আল্লাহ এই শিশুর মাঝে আমাদের জন্য বরকত দান করবেন এই বরকত আমার ও আমার সংসারের ওপর বর্ষণ হতে শুরু হয়ে গেছে।

হালিমা বলেন, আমি সফর শেষ করে ঘরে ফিরলাম। দেখলাম, আমার বকরিগুলোর স্তন দুধে পূর্ণ হয়ে আছে। আমার ঘরের সকল পাত্রে সেই দুধ দোহন করে রাখলাম। হালিমা সাদিয়া বলেন, আমার কোলে এই বাচ্চার আগমনের পর আমার দুঃখের দিনই কেটে গেছে। আমার জীবনে সাচ্ছন্দ্য চলে এসেছে। আমার ঘরে আজ বরকতের ফল্গুধারা বর্ষিত হতে শুরু করেছে। আমি তো যেন একটা বাদশাহি পেয়ে গেছি।

এখানে তালিবুল ইল্‌মদের মনে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহ তো কোনো-কোনো নবীকে শাহি মহলে প্রতিপালন করেছেন। মুহাম্মাদকেও তো শাহি মহলে প্রতিপালন করতে পারতেন। হযরত মূসা (আ.)কে আল্লাহ তখনকার সময়ের বাদশাহ ফেরাউনের ঘরে প্রতিপালিত করেছেন। ফেরাউনের স্ত্রী হযরত মূসা (আ.)কে দেখেই বলেছিলেন–

لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

তুমি তাকে হত্যা করো না। হতে তো পারে সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে সন্তানরূপে গ্রহণ করব।

হযরত মূসা (আ.) শাহি বালাখানায় প্রতিপালিত হতে থাকলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনী দেখুন। আযীযে মেসের তাঁকে ক্রয় করে নিজের বিবিকে বললেন,

عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

হতে পারে ছেলেটা আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে সন্তান বানিয়ে নেব।[১২৫]

হযরত ইউসুফও শাহি মহলে প্রতিপালিত হতে লাগলেন। তো দেখুন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো-কোনো নবীকে শাহি মহলে প্রতিপালিত করেছেন। আর তিনি তাঁর পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গরিব সংসারে অসহায় হালিমার হাতে প্রতিপালিত করেছেন। এর রহস্যটা আসলে কী?

---

১২৫. সূরা কাসাস : আয়াত ৯

এর রহস্য এই যে, যদি নবীজি শাহি মহলে, সুখী পরিবারে লালিত-পালিত হতেন, তাহলে তার উসিলায় এই পৃথিবীতে যে অফুরন্ত বরকতের সূচনা হতে চলেছে, তা বোঝা যেত না। তার কারণে যে-বরকত আসতে শুরু করেছে, তা লোকেরা সহজে বুঝতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা নবীজিকে গরিব সংসারে প্রেরণ করলেন। পরিবারের অবস্থা এমন যে, বকরির স্তনে দুধ নেই, মায়ের বুকে দুধ নেই। বড় নিঃস্ব অবস্থা। এখন নবীজির আগমনের ফলে সংসারটিতে যদি সাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে, তাদের দুঃখের দিন যদি বদলে যায়, দুনিয়ার সকল মানুষ তখন মেনে নেবে, দেখো, যাঁর কোনো সহায়-সম্বল ছিল না আজ তাঁকে আল্লাহ কেমন সুখময় জীবন দান করেছেন। এখন এই সংসারটিতে এত বরকত, এত নেয়ামত! এসব তো সেই ছোট বাচ্চাটির কারণেই হয়েছে, মুহাম্মাদ যাঁর নাম, মক্কা থেকে যাঁকে আনা হয়েছে। এমন কি হালিমার গোত্রের লোকেরা তাকে বলতে লাগল, হে হালিমা!

لَقَدْ اَخَذْتِ مُبَارَكَةً

'তুমি একটি বরকতময় শিশু নিয়ে এসেছ।'

নবীয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন হালিমা সাদিয়ার অসহায় সংসারে হওয়ার দ্বারা এত বরকত দেখা দিয়েছে যে, প্রতিবেশী নারীরা আসত এবং বলত, হে হালিমা! তুমি তোমার বকরিগুলো কোথায় চরাও? হালিমা বলতেন, অমুক পাহাড়ে। এবার এই নারীরাও তাদের বকরিগুলো সেই পাহাড়ে চরানোর জন্য পাঠাত। কিন্তু তাদের বকরির মধ্যে তবুও এত বিপুল দুধ হতো না, যে পমিাণ দুধ হালিমার বকরিগুলোতে হতো। এমন অকল্পনীয় বরকত মুহাম্মাদের উসিলায় হালিমা সাদিয়া লাভ করেছেন।

নবীজি এক স্তনের দুধই গ্রহণ করতেন

হালিমা দুগ্ধ পান করানোর সূচনাকাল থেকেই এক আশ্চর্য ও অদ্ভূত দৃশ্য দেখে আসছেন। হালিমা মুহাম্মাদকে তার ডান স্তন থেকে দুগ্ধ দান করতেন। একবার তিনি বাম স্তন থেকে দুগ্ধ দান করাতে চাইলেন। কিন্তু শিশু মুহাম্মাদ তাতে মুখই দিলেন না। এবার হালিমা লক্ষ করলেন, বাচ্চাটা এই একটি স্তন থেকেই দুধ পান করে। রহস্যটা আসলে কী? ভাইয়েরা! রহস্য তো এই ছিল যে, যদি হালিমা অন্য স্তনটির দুধও মুহাম্মাদ পান করে নিতেন, তাহলে সামনের সেই অনাগত পৃথিবীবাসী বড় গলায় বলত, মুহাম্মাদ তো শিশু

বয়সে তার ভাইয়ের হক নষ্ট করেছেন। তার ভাইয়ের হকের দুধ নিজে খেয়ে নিয়েছেন। অথচ এখন এই মুহাম্মাদ মানুষকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার উপদেশ দিচ্ছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, নবীজি নববি মেজাজ ও মন-মনন নিয়েই জন্ম গ্রহণ করেছেন। সেই শিশু বয়সেই নবীজিকে আল্লাহ তা'আলা এক স্বভাবজাত জ্ঞান ও সাম্যের আদর্শবাদী করে তৈরি করেছেন। এমন তাঁর অবস্থা যে, তিনি সেই ছোট্ট শিশু থেকেই ন্যায় ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক হয়েছেন। সেই শিশুকাল থেকেই তিনি অন্যের হকের প্রতি লক্ষ রাখতেন।

সৌন্দর্য ও সুকুমার বৃত্তির অপার বিস্ময়

হালিমার কন্যার নাম ছিল শিমা। একদিন একটি ঘটনা ঘটল। হালিমা কন্যাকে বললেন, শিমা! দেরি তো হয়ে যাচ্ছে, বকরিগুলো চরাতে নিয়ে যাও। শিমা বলল মা! বকরি তো অনেক; আমি একা কী করে সেগুলো নিয়ে যাব? আমি এগুলোর পিছে দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে যাই। আমি একা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমার সাথে আরেকজনকে পাঠান। হালিমা বললেন, হায় মা! ঘরে তো আর কেউ নেই। তোমার বাবাও বড় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, আমারও তো বয়স হয়েছে। তোমার সাথে যাওয়ার মতো আর তো কেউ নেই। তোমাকে একাই যেতে হবে।

কন্যা শিমা বলতে লাগল। মা! আমার ভাই মুহাম্মাদকে আমার সাথে যেতে দিন। হালিমা বললেন, হায়রে মেয়ে! তুমি বকরি নিয়ন্ত্রণ করবে, নাকি তোমার এই শিশু ভাইকে নিয়ন্ত্রণ করবে। মুহাম্মাদ তো কোলের শিশু। কন্যা বলল, মা! যদি আপনি আমাকে একা-একা পাঠান, তাহলে আমি বকরিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। আর যদি মুহাম্মাদকে আমার সাথে পাঠান, তাহলে আমি বকরিও নিয়ন্ত্রণ করব আবার ভাই মুহাম্মাদকেও নিয়ন্ত্রণ করব। হালিমা উত্তর শুনে হতবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, মেয়ে! তুমি আমার সাথে তামাশা করছ নাকি? আসল কথাটি বলে ফেলো।

এবার শিমা বলল, মা! আমি আগে আপনাকে না বলে দু-একবার আদরের ছলে ভাইটিকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেই রুক্ষ চারণভূমিতে। রোদতপ্ত প্রান্তরে দেখেছি এক খণ্ড মেঘ সারাক্ষণ মুহাম্মাদকে ছায়ায় আবৃত করে রেখেছে। সেই শীতলতা আমি দারুণভাবে উপভোগ করেছি। আমার কোনো ক্লান্তিই অনুভূত হয়নি। আরেকটি বিষয় এই দেখেছি, আমাদের সেই প্রান্তর হয়ে একদল মরু মুসাফির অতিক্রম করেছে। তাদের মধ্যে একজন রাহেব (ইহুদি ধর্মপণ্ডিত) ছিলেন। তারা আমার এই শিশু ভাই মুহাম্মাদকে দেখে

প্রথমে আদর দিলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই শিশুটি কে? আমি বলেছি, মুহাম্মাদ! তৃতীয় আরেকটি বিষয় এই দেখেছি যে, ভাই মুহাম্মাদকে যখন নিয়ে গিয়েছি, তখন আমাদের এই বকরিগুলো অতি দ্রুত ঘাস ভক্ষণ করে উদর পুর্তি করে নিল। আমি তারপর সেখানে গিয়ে বসেছি। সেখানেই বকরিগুলো আমার কোল ঘেঁষে বসে গেল। আমিও আমার ভাইয়ের চেহারা দেখছিলাম। আর এই অবলা বকরিগুলোও ভাই মুহাম্মাদকে নিবিড়ভাবে দেখছিল। আল্লাহু আকবার। আহ! আল্লাহ রব্বুল ইয্যত প্রিয়তম হাবীবকে কেমন সৌন্দর্য সুষমা দান করেছেন।

وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ

হে মাহবুব! ওগো প্রিয়তম! আপনার চেয়ে উত্তম ও সুন্দর সুশ্রী চেহারা কখনও কেউ দেখেনি।

وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

কোনো নারী কোনো দিন আপনার চেয়ে সুন্দর ও সুদর্শন সন্তান জন্ম দেয়নি।

خُلِقْتُ مُبَرَّءً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ

আপনি সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে পবিত্রভাবেই পয়দা হয়েছেন এই দুনিয়ায়।

كَاَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

যেন আপনি যেমন করে সৃষ্টি হতে চেয়েছেন, তেমনই হয়েছেন।

আপনার চাহিদামতো রূপ-লাবণ্য দিয়েই মনে হয় আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়কাড়া ও মায়াবী রূপের মাঝে এমন জাদু ও মাধুর্য ছিল যে, কেউ তাঁকে দেখলে হৃদয় তার মুগ্ধ হয়ে যেত। অন্তর তাঁর তৃপ্ত হয়ে যেত।

শিমার মমতামাখা শ্লোক

নবীজির দুধবোন শিমা তাকে কোলে নিয়ে দোলাতেন আর শ্লোক ও কবিতা বলতেন। আমাদের বোনেরা, মায়েরা আমাদের শিশুদের কোলে নিয়ে যেমন ঘুমপাড়ানি গান বলেন। আদুরে-আদুরে কবিতা বলেন–

حَسْبِيْ رَبِّيْ جَلَّ اللّٰهُ ' مَا فِيْ قَلْبِيْ غَيْرُ اللّٰهِ

তাল মিলিয়ে মিলিয়ে এটা পড়ে পড়ে শিশুকে দুধ খাওয়ান।

মোটকথা, নারীরা সাধারণ শিশুদের নিয়ে দোলাতে থাকেন আর ঘুমপাড়ানি গান গাইতে থাকেন। ছন্দ কাটতে থাকেন। এগুলোতে আল্লাহর নাম থাকে। শুভ ও কল্যাণ কামনার কথা থাকে। নবীজির বোন শিমাও এমন সুন্দর ছন্দময় কথা ও কবিতা বলতেন। নবীজিকে কোলে নিয়ে দুলিয়ে-দুলিয়ে কোনো-কোনো সীরাত গবেষক তাদের কিতাবে সেসব ছন্দবদ্ধ কথাও উল্লেখ করেছেন। শিমার সেই ঘুমপাড়ানি গানের একটি চরণ ছিল এই–

رَبَّنَا أَبْقِ لَنَا مُحَمَّدًا

হে আমাদের রব আমাদের জন্য মুহাম্মাদকে স্থায়ী করো।

মা আমেনার কোলে ফিরে যাওয়া

শিশু মুহাম্মাদের বয়স যখন তিন বা চার বছর, তখন বিবি হালিমা সা'দিয়া উপলব্ধি করলেন, বাচ্চাটা তো বড় হয়ে গেছে। নিয়মমতোই তো চলা দরকার। সেই হিসেবে বাচ্চাটাকে তো দিয়ে আসার সময় হয়ে গেছে। তাই মুহাম্মাদকে তাঁর আপন মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই তো হবে সর্বোত্তম কাজ। তাই বিবি হালিমা সা'দিয়া প্রাণপ্রিয় বাচ্চা শিশু মুহাম্মাদকে তাঁর মা হযরত আমেনার হাতে সমর্পণ করে দিলেন।

নিঃস্ব হওয়ার রহস্য

বন্ধুগণ! দেখুন, দুনিয়ায় আসার আগেই আমাদের নবীজির পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেল। ছয় বছর বয়সে মাতাও চলে গেলেন। তারপর নবীজি দাদার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে লাগলেন। কিছুদিন পর দাদারও ইন্তেকাল হয়ে গেল। এবার নবীজি প্রতিপালিত হতে লাগলেন চাচার তত্ত্বাবধানে। এর কয়েক বছর পর নবীজি নবুওত প্রাপ্ত হলেন। সেই সময়টাতে চাচারও ইন্তেকাল হয়ে গেল। কেন এমন হলো? কেন সব সহায় হারিয়ে গেল? সব ভরসা নিঃশেষ হয়ে যায়। আসল রহস্য তো এই যে, নবীজি যদি সুনির্দিষ্টভাবে কারও ছায়ায় প্রতিপালিত হতেন, তাহলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ বলে বেড়াত, সারা জনম অন্যের আশ্রয়ে জীবন যাপনকারী মুহাম্মদ আজ একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসার কথা বলছে। দেখো, মুহাম্মদের অবস্থা! তো আল্লাহ তা'আলা সেজন্যই শুরু থেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে সুরক্ষিত রেখেছেন যে, কেউ তাকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখারও সুযোগ পাবে না। বাবাহারা, মাহারা, সহায়-সম্বল ও আশ্রয়হারা এই নবীজির জীবন পরিক্রমার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীকে

আল্লাহ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন, দুনিয়ার মধ্যে যার কোনো আশ্রয় থাকে না, তার আশ্রয় স্বয়ং আল্লাহ হয়ে যান। আর আল্লাহ যার আশ্রয় হয়ে যান, তাকে প্রতিটি কর্মে ও পদক্ষেপে আল্লাহ সাফল্য দান করেন। তাঁকে আল্লাহ আপন লক্ষ্যে অবিচল রাখেন।

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى আয়াতের মর্মকথা

কুরআনুল হাকীমের সূরা দোহার ৬নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى

তিনি কি আপনাকে এতিমরূপে পাননি? তারপর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন?

এখানে আয়াতটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তবে তার মর্ম অতিবৃহৎ।

আপনি এতিম ছিলেন। আমি আশ্রয় দিয়েছি।

আপনি সহায়হীন ছিলেন। আমি আপনার সহায়তা করেছি।

আপনি দরিদ্রতার মাঝে ছিলেন। আমি আপনাকে স্বাবলম্বী করেছি।

আপনি যখন ভূমিষ্ট হয়েছেন, আপনার ঘরে তখন প্রদীপ জ্বালানোর তেল ছিল না। আর আমি আপনাকে এমন বানিয়ে দিলাম যে, আপনারই বরকতে সারা জাহান হেদায়েতের নূরে আলোকোজ্জ্বল হলো।

اٰوٰى শব্দের অর্থ আশ্রয় দেওয়া, ঠিকানা দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে বলে দিচ্ছেন–

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ

স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, যখন তোমরা স্বল্পসংখ্যক ছিলে।

مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ

জমিনের মধ্যে তোমরা ছিলে দুর্বল।

تخافون

তোমরা ছিলে ভীত-সন্ত্রস্ত।

اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ

মানুষ তো যেন তোমাদের উপড়ে ফেলে দেবে এমন ছিলে তোমরা।

فَاٰوٰكُمْ

তারপর আল্লাহ তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন।[১২৬]

এখানে আশ্রয় দিয়েছেন মানে সাহাবায়ে কেরামকে মক্কা থেকে মদিনায় নিয়ে গেছেন। মদীনায় নিয়ে তাদের পা শক্তিশালী করে দিয়েছেন। ইসলামের শিকড় মজবুত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى

আল্লাহ তো আপনাকে এতিম পেয়েছেন। তারপর আশ্রয় দিয়েছেন।[১২৭]

অর্থাৎ– আমি আপনার পা মজবুত করে দিয়েছি। আমি দুনিয়া ও আখেরাতের নেতৃত্ব আপনারই হাতে তুলে দিয়েছি। আপনাকেই বানিয়েছি বাদশাহরও বাদশাহ। আপনাকে আমি সুউচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছি। কবি বড় চমৎকার বলেছেন–

وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں
جہاں دیکھوں خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے

সন্দেহ তো নেই যে, তিনি একজন মানুষ। কিন্তু তাশাহ্হুদের মধ্যে, আযানের মধ্যে আপনার উপস্থিতি বিরাজমান।

যেখানেই দেখবে, যেদিকেই তাকাবে আল্লাহ তা'আলার নামের পরেই তাঁর নামটিও দেখতে পাবে।

এখানে একটি পয়গাম ও সুসংবাদ লুকিয়ে আছে। হে দুনিয়ার গরিব-অসহায়-নিঃস্বম্বল। হে দুনিয়ার এতিম লোকেরা! তোমরা ভাবছ, মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। আমার প্রিয়তম মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত্রের দিকে তাকাও। আমার হাবীবের জিন্দেগিটা দেখো। যদি তোমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে পার, তবে রব্বে কারীম তোমার মাথার ওপর তাঁর রহমতের তাজ স্থাপন করে দেবেন।

---

১২৬. সূরা আনফাল : আয়াত ২৬
১২৭. সূরা দোহা : আয়াত ৬

ইসলামে এতিমের মর্যাদা

নবীজি এতিমদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। হাদীছে পাকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একবার ঈদের নামায পড়ার জন্য নবীজি রওনা হয়েছেন। পথে এক এতিম শিশুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। নবীজি ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, আদর দিলেন এবং বাড়িতে নিয়ে এলেন। আয়েশা (রাযি.) তাঁকে গোসল দিয়ে সুন্দর পোশাক পরিয়ে দিলেন। শিশুটিকে নবীজি বললেন, শোনো বাছা! আমিই তোমার বাবা! আয়েশা তোমার মা।

হযরত আয়েশা খুব যত্ন করে শিশুটিকে খাইয়ে দিলেন। বাচ্চাটার বয়স হযরত হাসান (রাযি.)-এর সমান ছিল। হাসানের কাপড়ই তাকে পরিধান করানো হলো। খুশবু মেখে দেওয়া হলো। নবীজি বললেন, তুমি তোমাকে এতিম মনে করা। আরে! আজ তোমাকে ঈদগাহে হেঁটে যেতে হবে না। উঠো! আমার কাঁধে উঠো। নবীজি এই বাচ্চাটাকে কাঁধে নিয়েই ঈদগাহের পথে হাঁটা দিলেন। পথের বাচ্চারা দেখে তো অবাক।

পরে যখন বাচ্চাটা ওই পথে খেলাধুলায়রত শিশুদের কাছে গেল, মনের আনন্দে সে সবার কাছে বলে বেড়াল, নবীজি আমাকে নিজের পুত্র বানিয়েছেন। আমাকে খেতে দিয়েছেন। হযরত আয়েশাকে মা বানিয়েছেন। নবীজি ঈদগাহে নিয়ে গেলেন বাচ্চাকে। মিম্বরেই বাচ্চাটাকে বসতে দিয়ে নবীজি বললেন, আজ তুমি নিচে বসবে না। আমার সাথেই মিম্বরে বসবে।

এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে লক্ষ করে বললেন, হে লোকসকল! যে-ব্যক্তি এতিমের মাথায় দয়ার হাত বুলিয়ে দেবে, তার হাতের নিচে যতগুলো চুল থাকবে, এতোগুলো নেক আল্লাহ তাকে দান করবেন।

দেখুন! বন্ধুগণ! আজ এতিমের হক নষ্ট করা হয়। তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়। তাদেরকে দুনিয়ায় বাঁচারই অধিকার দেওয়া হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সুমহান আদর্শকে ধারণ ও বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করেন। আমাদেরকে এতিমদের তত্ত্বাবধানকারী বানিয়ে দিন। আমীন।

শিমার একটি সম্মানজনক কাহিনি

ফতে মক্কার কিছু দিন পরে নবীজি হুনাইনের পথে রওনা হলেন। সেখানে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সে এক বিরাট কাহিনি। সংক্ষেপে

কথা হলো, হুনাইনের যুদ্ধে নবীজি ছয় হাজার শত্রুসেনাকে বন্দি করেন। ১২ হাজার বকরি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত হন। নবীজি ইচ্ছে করলেন, এগুলো সাহাবাগণের মাঝে বণ্টন করে দেবেন।

এমন সময় এক সাহাবি এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন বয়স্কা নারী আসতে চাচ্ছে। মহিলা বলছে, হে লোকেরা! আমি তোমাদের নবীর বোন। তোমাদের নবীর সাথে আমাকে সাক্ষাৎ করতে দাও। নবীজি তো বিস্মিত হয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ ও আমেনার ঘরে তো আমিই একমাত্র সন্তান। আমার তো কোনো ভাই-বোন ছিল না। নবীজি বললেন, ঠিক আছে; মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। বয়স্কা এই রমণী এসে বললেন, মুহাম্মাদ! আমি তোমার বোন। নবীজি বললেন, কীভাবে? মহিলা বললেন, আমার নাম শিমা। আমি হালিমার কন্যা। তুমি হালিমার দুধ পান করেছ। সে সময় আমি তোমাকে ক ত যে কোলে নিয়েছি। আমার উষ্ণ কোলে তোমাকে কত যে দোল খাইয়েছি। কত ঘুমপড়ানি গান আমি তোমাকে শুনিয়েছি। কতবার رَبَّنَا اَبْقِ لَنَا مُحَمَّدًا এই ছন্দটি আবৃত্তি করে-করে তোমাকে ঘুম পাড়িয়েছি। আমার রব্বে কারীম আমার সেই দু'আ কবুল করে নিয়েছেন। আজ সে দৃশ্যই তিনি তোমাকে দেখাচ্ছেন। ও আমার ভাই! আজ বন্দিনি হয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। আমি তো জানতামই না, তোমাকে আল্লাহ এমন মহামর্যাদার আসন দেবেন।

নবীজি একথা শোনার সাথে-সাথে আপন চাদরটি জমিনে বিছিয়ে দিলেন। বললেন, বোন শিমা! প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বোন আমার! এসো, নবুওয়াতের এই চাদরের ওপর বসো। সমগ্র দুনিয়াবাসী সেদিন দেখে নিল, নবীজি তার দুধবোনকে কতখানি সম্মান দান করলেন। তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, বোন! যদি আপনি আমার কাছেই থাকতে চান, তাহলে আমি আপনার দায়িত্ব নেব। আর যদি আপনার আত্মীয়দের কাছে চলে যেতে চান, তবে তা-ও করতে পারেন। অনুমতি আছে। শিমা বললেন, আমি আত্মীয়-স্বজনদের কাছে যেতে চাই। নবীজি তাকে কিছু বকরি উপহার দিলেন। কিছু গোলাম উপহার দিলেন। দুজন সাহাবিকে ডেকে বলে দিলেন, যাও তো; আমার শ্রদ্ধেয়া বোনটিকে তার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসো।

বোন শিমা যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তিনি যাচ্ছেন না। নবীজি বললেন, বোন আমার! কেন আপনি যাচ্ছেন না। বোন বলতে লাগলেন, তুমি

তো আমাকে মুক্ত করে দিয়েছ। আমারই দেশের এই যে ছয় হাজার লোক তারা তো তোমার হাতে বন্দি রয়ে গেছে। আজ আমি একা চলে যাব? লোকেরা বলবে, দেখো; নিজে একা-একা মুক্ত হয়ে চলে গেল। গোত্রের লোকদের কথা ভাবল না। নবীজি বোনের এই আদর্শ কবুল করলেন। সাহাবাগণের সাথে মুশাওয়ারা করে সবাইকে মুক্ত করে দিলেন। আল্লাহু আকবার!

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى

হে আমার প্রিয়তম হাবীব! আমি তো তোমাকে এতিম পেয়েছি। তোমার কদমকে আমি দৃঢ় ও মজবুত করে দিয়েছি। আমি আপনাকে মক্কার বিজয়ী বীর বানিয়েছি। হাজারো মানুষকে তোমার কদমে গোলাম বানিয়ে নিক্ষেপ করেছি। কোনো একজন বড় চমৎকার করে বলেছেন–

اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں
ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق ویقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں
تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمیں میں ہوا، آسماں میں ہوا
کیا عرب، سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں

হে রাসূলে আমীন! খাতামুল মুরসালীন! আপনার মতো কেউ নেই। আপনার মতো কেউ নেই।

আমাদের এ-ই তো বিশ্বাস যে, আপনার মতো কেউ নেই। আপনার মতো কেউ নেই।

আপনার আদর্শ, আপনার গুণাবলি সর্বত্রই বিস্তৃত। আসমানে বিস্তৃত। জমিনে বিস্তৃত।

কি আরব কি আযম! এই ভূমি, কি অন্য ভূমি সর্বত্রই তোমার বিজয়গান। সর্বত্র তোমারই শান। তোমার মতো কেউ নেই। তোমার মতো কেউ নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই প্রিয়তম হাবীবের সুন্নাতমতো জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন।

হে বন্ধুগণ! এমন জীবন গঠন করুন। ফেরেশতা এসে আমাদের আত্মাকে আদরের সাথে নিয়ে যায় যেন এবং তখন যেন আমাদের অন্তরাত্মা

নবীজির প্রেম ও ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে। আমাদের জান নেওয়ার সময় এই জান যেন নবীজির প্রেম-ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে। আমাদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রূহ নেওয়ার সময় প্রতিটি অঙ্গই যেন নববী সুন্নাতে পূর্ণ থাকে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। সুন্নত নিয়েই আল্লাহ আমাদের তাঁর দরবারে হাজির করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বোধ ও বুদ্ধির আলোকরশ্মি

'আকল, জ্ঞান বা বোধ ও বুদ্ধি আমরা যাকে বলে থাকি এটি একটি আলো। জ্ঞানের এই আলোটা যদি মানব মস্তিষ্কে প্রথিত না হয় বা না থাকে। কাজ-কর্মে সে হবে অন্যসব জন্তু-জানোয়ার ও প্রাণীর মতো। অত্যন্ত সুন্দর লাবণ্যময় নর-নারী। চোহারা ও অবয়বের প্রতি লক্ষ করলে মনে হবে অতি মহান মানুষ। কিন্তু চারিত্রিকভাবে এতোটা অধঃপতনের শিকার সে। যার কারণে তাকে মানব সন্তান বলাই দায় ঠেকে। তাকে সুশীল মানব দৈহিক দিক থেকে মনে হলেও তার ভেতর বসবাস করছে অতিহীন ইতর প্রজাতির একটি জন্তু। অত্যন্ত হীন ও হিংস্র একটি জানোয়ার। তাই বলছি আলোকিত জ্ঞান বা জ্ঞানের আলো এবং সুস্থ সবল মস্তিষ্ক একটি অতিমহান নেয়ামত।'

বোধ ও বুদ্ধির আলোকরশ্মি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ اٰذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ -

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ -

আকলে সালীম : সুস্থমস্তিষ্ক একটি অপ্রত্যাশিত নেয়ামত

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত মানবজাতিকে অগণিত নেয়ামতে ধন্য করেছেন। আমরা যদি গাণিতিকভাবে সেই নেয়ামতগুলোকে হিসাবের আওতায় আনতেও চাই, তাহলে আমরা সক্ষম হব না। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত নিজেই ইরশাদ করেছেন–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا

যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতগুলোকে গণনা করতে চাও, তাহলে তোমরা গণনা করতে সক্ষম হবে না।[১২৮]

এই নেয়ামতরাজির মধ্যে একটি অনন্য নেয়ামত হচ্ছে মানবের আকল, মানবের মস্তিষ্ক কিংবা বলতে পারি মানবের বোধ ও বুদ্ধি। এই বোধ-বুদ্ধি ও জ্ঞানই মানুষকে পশুশুলভ আচরণ থেকে নিভৃত রাখে এবং মানব ও জীবজন্তুর মাঝে প্রভেদ তৈরি করে দেয়। তাই তো এই আকলের কারণেই মানুষ–

ভালো-খারাপের মাঝে পার্থক্য করতে পারে।

---

১২৮. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৪

বন্ধু ও শত্রুকে চিনতে পারে।

বৈধ ও অবৈধ বিষয়কে চিনতে পারে।

জায়েয ও নাজায়েযের মাঝে তারতম্য করতে পারে।

যদি আকলের এই নূর, জ্ঞানের এই আলো মানবের দেমাগ ও মস্তিষ্কের মাঝে বিদ্যমান না থাকে, তাহলে মানুষের আকৃতি ও অবয়ব তো মানুষের মতো ঠিক; তবে তার স্বভাব-চরিত্র ও কাজ-কর্মে সে হয়ে যাবে পশুর চেয়েও অধম। অনেক সুন্দর ও সুদর্শন মানব আছে। সৌন্দর্য যেন তাদের দেহ থেকে চুয়ে-চুয়ে পড়ছে। কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র এতই অধঃপতিত এবং হীন যে, অন্য সকল প্রাণীও যেন তার সামনে হার মানে। তার আখলাক এত নিম্নমানের যে, তাকে আপত দৃষ্টিতে মানব মনে হলেও সে কাজ-কর্মে মানব নয়। তাই মনে রাখতে হবে, বিশুদ্ধ জ্ঞান, পরিশুদ্ধ চিন্তাচেতনা এবং সুস্থ মস্তিষ্ক অতি বড় নেয়ামত।

আকলের কারণেই মানুষ মহিষকে নিয়ন্ত্রণে রাখে

আমার ছোট সন্তান সাইফুল্লাহ একবার আমার সাথে ছিল। আমাদের কাছ দিয়েই একটি মহিষ অতিক্রম করল। মহিষটিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ছোট একটি মানুষ! আমি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, বলো তো বাবা আকল বড়, না এই মহিষ বড়? ছেলে বলল, আকল। আমি বললাম, কী করে আকল বড় হলো? ছেলে বলল, আকল আমাদের যদিও অতি ছোট একটি আধারে রাখা; তবুও এই আকলের কারণেই মানুষ এমন বড় মহিষকে নিয়ন্ত্রণ ও বশ করে রাখে, মহিষের গলায় রশি বেঁধে দেয়। মানুষকে আল্লাহ আকল দিয়েছেন। তাই শুধু মহিষ নয়; বরং এর চেয়েও আরও বড়-বড় প্রজাতির প্রাণী মানুষ বশ করে রাখে। কোনো দিন কোনো মহিষ মানুষের গলায় রশি বাঁধে কি? তাই বলতে হয়, মানুষের এই ব্রেন অনেক বড়– হাতি-ঘোড়া, গাধা-মহিষ থেকেও।

মানবমস্তিষ্কের কারিশমা

দেখুন, সিংহ-বাঘ এরা বনে রাজত্ব করে বেড়ায়। বনের রাজা বলা হয় এদেরকে। সারাটা জীবন এরা তাজা রক্ত আর কাঁচা গোশত ভক্ষণ করে কোনো লবণ-মরিচ ছাড়াই। সেই বাঘ আর সিংহের এটুকু জ্ঞান নেই যে, এই গোশত খাওয়ার ভিন্ন কোনো প্রক্রিয়া আছে। দারুণ স্বাদে রান্না করে ভক্ষণ

করা যায় এই গোশত। অত্যন্ত সুস্বাদু করে খাওয়া যায়। মশলা দিয়ে তাকে রান্না করে নিতে হয়। একথা সিংহ ও বাঘেরা জানেই না।

গোশতের নানান খাবার

দেখুন, বাঘ-সিংহও গোশত খায়, মানুষও গোশত খায়। কিন্তু মশলা দিয়ে তো সুন্দর করে মানুষ রান্না করে খায়। গোশত দিয়ে তৈরি করে নানা রকম আহার্য। এসবের নামও তো আমরা অনেকে জানি না।

কোনোটাকে বলা হয় চিকেন।

কোনোটাকে বলা হয় চিকেন কাবাব।

কোনোটাকে বলা হয় গ্রিল।

কোনোটাকে বলা হয় ফ্রাইড চিকেন।

কোনোটাকে বলা হয় টিম রোল।

কোনোটাকে বলা হয় সিক কাবাব।

কোনোটাকে বলা হয় বটি কাবাব।

কোনোটাকে বলা হয় চাকা চিকেন।

ইত্যাদি নানা রকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করা হয় গোশত দিয়ে।

পুরো একটি ভুনা গরু

একবার সুগার টেকনোলজিস্ট্র-এর কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফ্রান্সে। যখন আহারের সময় হলো, তখন আমি লক্ষ করলাম, আমন্ত্রণকারীগণ পুরো একটি গরু জবাই করেছে। তার চামড়া পৃথক করেছে। তার পেট পরিষ্কার করে সব ময়লা বের করে নিল। একটি বিশাল উনুনের মধ্যে আস্ত গরুটা দিয়ে দিল। মশলাপাতি সবই দেওয়া হলো। পুরো গরু অপর প্রান্ত দিয়ে ভুনা হয়ে বের হয়ে এল।

এ গরুটাই ঝুলিয়ে দিল একটি হল ঘরের মতো রুমে। পাঁচ ছয়শ মানুষ প্রত্যেকে গিয়ে তার যে-স্থানের গোশত খেতে পছন্দ সে ওই স্থান থেকে খেয়ে-খেয়ে এল। আমি তো বিস্মিত হয়ে গেলাম। এরা একটি গরুকে একটি মুরগির মতো আস্ত রোষ্ট করে ফেলল। আরও আশ্চর্যের কথা হলো, গরুটার যেদিক দিয়েই কাটা হতো, দেখা যেত মশলাপাতি একেবারে পূর্ণভাবেই সুন্দর করে দেওয়া আছে। এমন সুনিপুণভাবে এটি পাকানো হয়েছে যে, কোনো স্থান মশলাহীন রয়ে যায়নি।

সবজিতে গোশতের ব্যবহার

সম্মানিত সুধি! গোশত সবজির সাথে দিয়েও নানা রকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায়।

যেমন– কিমা মটর তৈরি করা হয়।

কিমা করলা তৈরি করা হয়।

এই গোশত দিয়ে স্যুপ বানানো হয়।

স্যুপ আবার নানা রকমের আছে।

চাইনিজ স্যুপ, কর্ন স্যুপ।

আরও কত রকম জিনিস যে তৈরি করা হয় গোশত দিয়ে ওই সব কথা বলেও শেষ করা যাবে না।

আরবদের সুস্বাদু খাবার

মুহতারাম ভাইয়েরা! মানুষ গোশত ও চাউল একসাথে ব্যবহার করে বিরিয়ানি রান্না করে। বিরিয়ানি অনেক প্রকার–

ঢাকার বিরিয়ানি।

মোঘল বিরিয়ানি।

কাচ্চি বিরিয়ানি।

আরব্য বিরিয়ানি।

একব্যক্তি আমাকে সৌদি আরবে বলেছে, আজ আমি আপনাকে মান্দী তথা পোলাও খাওয়াব। সে আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেল। তার নিজ হাতে পাকানো পোলাও এত সুস্বাদু। আল্লাহু আকবার! আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম।

হস্তির তামাশা

মানুষ প্রাণীকুলকে বশে নিয়ে আসে। অথচ শরীর-স্বাস্থ্য ও দৈহিক গঠনে প্রাণীরা সাধারণত মানব থেকে অনেক বড়ই হয়ে থাকে। হাতিকে বশে নিয়ে আসা কোনোভাবেই কোনো সোজা কথা নয়। হাতির ওজন অনেক। শক্তিও অনেক।

একবার আমেরিকায় সফর করার সময় ড্রাইভার বলল, হযরত চলুন, আজ চিড়িয়াখানায় যাই। আমাদের হাতে তো প্রচুর সময় আছে। আমরা সেই আশ্চর্যজনক দর্শনীয় স্থানে যাব। দারুণসব জিনিস সেখানে দেখা যাবে।

আমি বললাম–

مرغ دل زا کلشن بہتر ز کوے یار نیست

طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست

হৃদয়ের পক্ষির জন্য প্রিয়তমের বাগানের গলি ছাড়া উত্তম কিছু নেই। আর সর্বদা পরিদর্শন পিপাসুর জন্য বাগবাগিচার আকর্ষণ নেই।

আমার ছেলেদুটা সাথে ছিল। তখন ওরা লাফিয়ে উঠল। ওরা ওখানে যাবেই যাবে। বাচ্চাগুলোর এমন উচ্ছ্বাস দেখে আমি বললাম, ঠিক আছে; নিয়ে চলো। দুই মিনিটের ভেতর আমরা একটি গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে একটি বড় গ্রাউন্ডের মধ্যে একটা হাতি বাঁধা দেখলাম। লোকেরা হাতির গলায় একটি বেল্ট বেঁধে রেখেছে। সেই বেল্টে কমপক্ষে তিন ইঞ্চি মোটা রশি বাঁধা। আমরা সবকিছু গাড়িতে বসেই দেখছিলাম। এটি আসলে হাতিখেলা। চিড়িয়াখানায় আজ যত মানুষ আসবে, তাদের সবার জন্য চিড়িয়াখানা পরিদর্শনের পর সর্বশেষ বিনোদনের তরে এই খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগত হাজারো নারী-পরুষ মিলে হাতিকে টেনে আনবে। খেলা পরিচালনাকারী এলান করল, প্রতিদিন এই হাতি খেলা দেখানো হয়। আজ পর্যন্ত কেউ এর সাথে পেরে ওঠেনি। কোনো দিনই হাতিকে পরাজিত করা যায়নি। আপনারা জেতার জন্য তৈরি হোন।

You will be going to moke a record

আপনারা আজ রেকর্ড সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হোন।

এবার পরিচালক সংকেত দিলেন। সাথে-সাথে সকল মানুষ মিলে একসাথে সেই রশি ধরে টানতে থাকল। যতদূর দৃষ্টি গেল ততদূর পর্যন্ত দেখলাম, লোকেরা লম্বা রশিটি ধরে হাতিটাকে নিজের দিকে টানছে। সবাই একসাথে হ্যাচঁকা মেরে টান দেওয়ার সাথে-সাথে হাতিটা এক কদম পেছনের দিকে সরে গেল। তারপর আরেক কদম, তারপর আরেক কদম এভাবে হাতিটি সব মানুষকে নিয়ে বারো কদম পেছনে চলে গেল। মানুষ তাকে নিয়ে বারো কদম পেছনে চলে গেল। এবার পরিচালক এলান করল, আরেক কদম যদি টেনে হাতিটাকে আপনারা পেছনে আনতে পারেন, তাহলে আপনারাই আজ জিতে যাবেন। একথার সাথে-সাথে লোকেরা সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করে হাতিকে টান মারল। এবার হাতিকে নড়াতে পারল না।

হাতিটা বরং এবার সামনে চলতে শুরু করল। সব পিপড়ার মতো হাতির টানে হুড়মুড় করে সামনের দিকে চলে গেল। তারপর জানা গেল, হাতিকে ওরা এভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছে। নির্ধারিত সীমা বারো কদম পর্যন্ত হাতি মানুষকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে। হাতিটা তা-ই করেছে। এই দৃশ্য দেখে আমি বড় অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম পাঁচশত-হাজারজন মানুষকে মাত্র একটানে কীভাবে টেনে নিয়ে গেল। তো হাতিই সবচেয়ে শক্তিধর প্রমাণিত হলো। কিন্তু মানুষের আকল ও জ্ঞান দেখুন। এই জ্ঞানের কারণেই তো এতো বড় হাতিটাকে মানুষ এমন করে বেঁধে রেখেছে। কাবু করে রেখেছে। বশে এনে তার দ্বারা গেম চালাচ্ছে।

হাতির ফুটবল খেলা

আমরা এক জায়গায় হাতির ফুটবল খেলা দেখলাম। এক দিকে হাতির একটি টিম আরেক দিকে আরেকটি। দস্তুরমতো ওরা খেলছে। মানুষ যেমন করে খেলে তেমন করে খেলছে। বলের পিছু ছুটছে। শর্ট দিচ্ছে। আশ্চর্য! আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। আল্লাহর কী দয়া ও কুদরত। মানুষকে এমন জ্ঞান আল্লাহ দান করেছেন, যার সাহায্যে তারা হাতিকেও এমন শিখিয়ে নিয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

হাতির ছবি অঙ্কন

একস্থানে দেখলাম, হাতিকে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হাতিগুলোর সামনে তুলি ও অনেক রংয়ের কালার রয়েছে। হাতিগুলো মানুষের নির্দেশনায় ছবি অঙ্কন করছে।

কোনো মানুষ যখন এসে বলে, আমাকে অমুক জিনিসের ছবি একে দাও, তখন হাতিটি তুলি শুঁড়ে নিয়ে দারুন চমৎকার করে ছবি আঁকে, যেন কোনো আর্টিস্ট তা অঙ্কন করে দিয়েছে। এত সুন্দর চিত্র হাতিটি অঙ্কন করে দেয় যে, পরে মানুষ তা ক্রয় করে নিয়ে যায় এবং বিশাল মূল্যেই তা বিক্রয় হয়।

পশু-পাখিদের কীর্তি

পশু-পাখিকে প্রশিক্ষিত করে তোলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। সেই আদিকাল থেকেই মানুষ তোতা পাখিকে কথা শিখিয়ে আসছে। আমি একবার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেলাম। প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে একটি অতি ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে শোনা গেল, হ্যালো ...। আমি অবাক হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম,

তাদের একটা তোতাপাখি আছে। সে প্রত্যেক আগমনকারীকে হ্যালো বলবে আর প্রত্যাগমনের সময় বাই-বাই বলবে। কিছু মানুষ ময়নাকেও এমন করে কথা শেখায়। আগেকার যুগে কবুতরকে প্রশিক্ষিত করা হতো। কবুতর একজনের চিঠি পৌঁছে দিত আরেকজনের নিকট। সেযুগে এটাই ছিল ডাক যোগাযোগের মাধ্যম। ঘোড়াকে নৃত্য শেখানো তো স্বাভাবিক বিষয় ছিল তখন।

আজকের এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও এই ধারাটা মানুষ অব্যাহত রেখেছে। ঘোড়া, গরু, হাতি প্রভৃতি প্রাণীকে প্রশিক্ষিত করে নানা রকম সার্কেস দেখায় মানুষ।

কারাটের মোকাবেলায় একটি বানর

এক বানরকে কারাটের সাথে ফাইট করতে দেখলাম। সামনে একজন কারাটে প্রশিক্ষিত মানব। বানর ও মানব কারাটে শুরু করল। আমরা দেখলাম, দারুন নৈপুণের সাথে বানর মানুষটিকে কিক মারছে। মানুষ বানরকে কিক মারলে বানর তাকে লক করে দেয়। এভাবে যেন দুজন কারাটে মাষ্টার ফাইটিং করছে।

এক আজব ও দুর্লভ ডেইরি ফার্ম

আমরা একটি ডেইরি ফার্মে গেলাম। ফার্মে তিনশত গাভি আছে। তিনশত গাভির দেখাশোনা ও সেবা যত্নের জন্য আছে মাত্র তিনজন মানুষ। আমাদের এখানে তো একজন দশটির বেশি গরু লালনপালন করতে পারে না। তিনশত গরু পালনের জন্য আমাদের এখানে কমপক্ষে তিন ডজন মানুষের প্রয়োজন হতো। অথচ সেখানে মাত্র তিনজন তিনশত গাভি প্রতিপালন করছে। সিস্টেমটি হলো, প্রত্যেক গাভির গলায় একটি নির্ধারিত নম্বর লাগানো আছে। প্রত্যেক গাভির জন্য নম্বর হিসেবে জায়গা নির্ধারিত আছে। গাভির গলায় রশি নেই। গাভিরা প্রত্যেকে তাদের নির্ধারিত স্থানে রেষ্ট নেয়, আরাম করে, বিশ্রাম করে। কোনো গাভি যদি গোসল করতে চায়, তাহলে গোসলের জন্য নির্ধাতি স্থানে চলে যায়। গোসলখানার গেট ক্যামেরা ফিট করা আছে। ক্যামেরার সংযোগ কম্পিউটারের সাথে। কম্পিউটারে তথ্য জমা হয়। চেক করা হয়। এই গাভি আজ শাওয়ার নিয়েছে কি-না। যদি আজ গোসল করেনি এমন হয়ে থাকে, তাহলে ঝরনা থেকে পানি পড়তে শুরু করে। গাভিটা নিজে নিজেই নিচে দাঁড়িয়ে গোসল করে নেয় এবং নিজের নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসে।

একটি পাইপের মাধ্যমেই তাদের খাবার একেবারে সামনে চলে আসে। ওখানের একটা বিষয়ে আমি বড় বিস্মিত হলাম। ওদের দুধ দোহনের সময় হয়েছে। দেখলাম, ১৫টি গাভি একটি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে নির্দেশনা দেওয়ার কোনো মানুষই নেই। কোনো রশি বা বাঁধন নেই। হঠাৎ একজন এল। হাতে তার দুধদোহনের মেশিন। গাভিটা পজিশনমতো দাঁড়ালেই তার ওলানে মেশিন ফিট করে দেওয়া হয়। গাভিটি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। দুধ দোহন হয়ে যায়। লোক ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটির ওলানে মেশিন ফিট করে যায়। দুধ পুরোপুরিভাবে দোহন হলে গাভিটি নিজে নিজেই নিজের পা দ্বারা মেশিনটা খুলে রেখে দিয়ে নিজের নির্ধারিত স্থানে চলে যায়। ওই দিকের স্থানটা খালি হলে অন্য গাভি এসে সুন্দরমতো এই পজিশনে দাঁড়িয়ে যায়।

আমরা তো হতবাক হয়ে গেলাম। আধুনিক বিশ্ব গাভিকে পর্যন্ত প্রশিক্ষিত বানিয়ে নিয়েছে। এরা নিজেরাই সিরিয়ালে ধরে ১৫টি করে আসে। আর অত্যন্ত সাধারণভাবে দুধ দোহনের কাজে সহায়তা করে। দুধ দোহন শেষ হলেই নিজে নিজেই আপন স্থানে চলে যায়। অন্যগুলো এসে লাইনে দাঁড়ায়। এভাবে প্রশিক্ষিত তিনশত গাভিকে মাত্র তিনজন মানুষ পরিচালিত করছে। তাদের কোনো বেগ পেতে হচ্ছে না।

ডলফিন মাছের আশ্চর্য খেলা

একবার আমার বাল্টিমুর যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। সেখানে একটি বড় Aquarium মৎস্যখামার দেখলাম। খামারে লোকেরা অনেক আশ্চর্য ও দুর্লভ প্রজাতির মাছ চাষ করে।

আমি খুবই উৎসাহের সাথে সে মৎস্যখামার পরিদর্শন করেছি। অনেক অভিজ্ঞতা তখন আমার অর্জিত হয়েছে মৎস্য সম্পর্কে। সেখানে সর্বশেষ আমরা ডলফিন প্রদর্শন করেছি। অনেক রকমের খেলা-ই সেদিন দেখেছি। তবে আশ্চর্য খেলাটা হলো–

দেখলাম, পানি থেকে ২০/২৫ ফুট উপরে একটি ফুটবল ঝুলিয়ে রাখা। ডলফিনকে সংকেতের সাথে-সাথে মাছটা ফুট বলে এসে কিক মারল। এত উপরে পানি থেকে ঝাপিং করে এমন জোরে তার মাথা দ্বারা কিক মারল যে, বল একেবারে বহু উপরে চলে গেল। আল্লাহু আকবার! একটি মাছকে এসবও শিক্ষা দেওয়া যায়। সেসময় ডলফিনটা খুবই উৎফুল্ল ছিল। তার

আনন্দ সে এভাবে প্রকাশ করল যে, সে পানির একেবারে কূলে এসে সাঁতরাতে থাকল। আর তার পেটের পানির ট্যাংকিতে পানি ভরে এত স্প্রিডে আমাদের ওপর নিক্ষেপ করতে থাকল যে, আমাদের সবার কাপড় ভিজে গেল।

তো দেখুন, মানবজাতিকে আল্লাহ আকলের বিশাল জ্যোতি দান করেছেন। মানুষ তার জ্ঞান দ্বারা একটি জ্ঞানহীন প্রাণীকে প্রশিক্ষিত করে তুলছে।

মানবজ্ঞানের গৌরব : মানবপ্রকৃতির গৌরব

আজ মানুষ এমনসব কাজও করছে, যেসবের ব্যাপারে পূর্বযুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। আমরা জানি, চিতা বাঘ বড় ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ায়। আগে মানুষ ভাবত, মানুষের পক্ষে এমন করে দৌড়ানো সাধ্যাতীত বিষয়। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, আজ মানুষ চিতার গতিকেও ম্লান করে দিয়েছে। চিতাকেও হারিয়ে দিয়েছে। আবার দেখুন উট। আগের যুগের মানুষ ভাবত, উটের চেয়ে বোঝা বহনে আর কোনো শক্তিশালী কিছু নেই। কিন্তু এই আধুনিক যুগে কত বড়-বড় গাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে। কত বড়-বড় ট্রাক আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন মানুষের সেই আদিম যুগের ধারণা পাল্টে গেছে।

আগের যুগে মানুষ পক্ষি ছাড়া আর কোনো কিছু যে আকাশে উড়তে পারে, তা কল্পনাও করতে পারত না। অথচ, আজ মানুষ উড়োজাহাজ, বিমান আবিষ্কার করেছে। পক্ষির চেয়ে হাজার গুণ ক্ষিপ্রতায় আরও শতগুণ উচ্চতায় উড়ে বেড়ায় এখন বিমান। এই তো মানুষের জ্ঞান। এই তো মানুষের বিজ্ঞান।

বিষাক্ত মক্ষিকা থেকে রক্ষা পাওয়ার এক আশ্চর্য পন্থা

মানুষ অন্য সব প্রাণীকে বশ করে রেখেছে, নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। এর একটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সম্মুখে পেশ করতে চাচ্ছি।

আমাদের দেশে যখন আম ফলের মৌসুম আসে, তখন এক জাতের মাছির আগমন হয়। এগুলো ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে ফলে বসে। ফলের স্বাদ নিয়ে তাতে এক প্রকার বিষাক্ত রস ছেড়ে যায়। ফলে আমের সকল ফল নষ্ট হয়ে যায়। এ নিয়ে মালিকরা বড় অসহায়ত্ব বোধ করেছিল। কারণ, এতো লাখ-লাখ মাছি তো মারাও সম্ভব নয়।

এবার মালিকরা প্রসেসিং করল। বিজ্ঞান এ নিয়ে গবেষণা করল। এমন একটা ওষুধ তারা আবিষ্কার করল, যার মধ্যে মহিলা মাছির গায়ে যে ঘ্রাণ, তাতে সেই ঘ্রাণযুক্ত করে দিল। এখন এই ওষুধ বাগানে একটা নিদিষ্ট স্থানে রেখে দেওয়া হলো। মহিলা মাছির ঘ্রাণ পেয়ে পুরুষ মাছিরা সেদিকে ছুটে এল এবং ওই বিষাক্ত ওষুধের ওপর পড়ল ও মারা গেল। এভাবে সব পুরুষ মাছি শেষ হয়ে গেল। শুধু মহিলা মাছিগুলো বাকি থাকল। এবার মাছিনিধন অত্যন্ত সহজ হয়ে গেল। নতুন ওষুধটির আবিষ্কারের মাধ্যমে লোকেরা ওই মক্ষিকা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। এটিও তো বড় ধরনের সাফল্য মানুষের। মানুষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে করে ধীরে-ধীরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

আকলের মধ্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এক অপার ক্ষমতা দান করেছেন। তাই তো শুধু আকল খাটিয়েই মানব অনেক কর্মে সিদ্ধহস্ত হওয়ার সমর্থ হয়েছে। কিছু কাজ মানুষ দেখে করে। কিছু মানুষ শুনে করে। আবার কিছু কাজ অনুভব ও উপলব্ধির মাধ্যমে করে। অনুভবটা অনেক সময় হস্ত স্পর্শে হয়ে থাকে। অনেক সময় জিহ্বায় স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর কিছু কর্ম শুধুই আকলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। যেমন দেখুন–

আইনস্টাইন। সে থিউরি অফ রিলিটিউটি নির্ধারণ করেছেন। আজ আইনস্টাইনকে মানুষ তেমনি সম্মান করে। একজন পয়গম্বরকে একটি জাতি যেভাবে সম্মান করে। ওই লোকটা চিন্তা করল, ধরে নেওয়া যাক একটি ফ্রাইম অফ রেফারেন্স। কথাটা উনি সম্ভাবনাময়রূপে ধরে নেওয়া যাক বলে শুরু করেছেন। তিনি কিন্তু কিছু দেখতে পাননি। তিনি শুধু নিজের মেধার আলোকে বলেছেন, এখন ওই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি তার অনুভব ও উপলব্ধিকে অতিক্রম করেছে। তিনি বলেছেন, ধরে নেওয়া যাক, একটি ফ্রাইম অফ রেফারেন্স। এবার তিনি একটি ফ্রাইম অফ রেফারেন্স নিলেন। তারপর আরেকটি নিলেন। এবার ক্যালকুলেশন শুরু করলেন। আইনস্টাইন যত কাজই করেছেন, তার সম্পর্কটা কিন্তু চোখের সাথে ছিল না। কানের সাথেও ছিল না। ওই জাতির অন্য কিছুর সাথেও ছিল না। তার সব আবিষ্কার ভিত্তিই ছিল আকল। জ্ঞান। মানবের বোধ। তাই তিনি সেই আকল ও জ্ঞান দ্বারা ক্যালকুলেশন করে হিসাব করে ফল বের করেছেন– $E=mc2$ এটা এমন এক সমতাবিধান যে, তার দ্বারা বিজ্ঞানের জগতে তিনি এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। আজ এর ওপর ভর করেই মানুষ কত যে নব-নব বিষয় আবিষ্কার

করে বেড়াচ্ছে! এই যে, আবিষ্কার! এর পেছনে কোন শক্তিটা রয়েছে? এটা তো আকলের সেই অপার শক্তি। এই আকলের মাধ্যমেই তিনি বুঝে নিয়েছেন, টাইম Dialate (পরিবর্তন) হচ্ছে। দৈর্ঘ Constiaction (কম) হচ্ছে। এভাবে নানা রকম পরিবর্তন বর্ধিত হচ্ছে। আকলের বিনিময়ে মানবপ্রকৃতিক সর্বপ্রকার সাফল্য অর্জন করে বেড়াচ্ছে।

মানবমস্তিষ্কের দক্ষতা

মানুষের মস্তিষ্কের দৃষ্টান্ত কম্পিউটারের ম্যাসকো প্রসেসরের মতো। কম্পিউটারে প্রোগ্রামসমূহের মধ্যে যদি কোনো একুয়েশন এসে যায়, তাহলে ওই একুশেয়নকে ম্যাসকো প্রসেসরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে দেওয়া হয়। এবার এটা ওই একুয়েশনকে সমাধান করে। তার সঠিক জবাব ফিরিয়ে দেয়। ঠিক এমনিভাবে আপনি মানুষকে একটি ভাবনা দান করুন। এবার এই মানুষটি ভাবনার জগতেই বিশাল প্রাসাদ বানিয়ে নেবে তার স্বপ্নের। মানুষ একটি বিষয়ে চিন্তা করতে-করতে এবং ভাবতে-ভাবতে তার স্বপ্নের একটা পূর্ণাঙ্গ খসড়া চিন্তার জগতেই তৈরি করে নিতে পারে। তার কর্মের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। এটি মানবের মস্তিষ্কের একটি দক্ষতা।

ভাবনার দুই প্রান্ত

মানবভাবনার দুটি প্রান্ত থাকতে পারে। একটিকে ইতিবাচক আর অপরটিকে নেতিবাচক ভাবনা বলা হয়। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝে নিন। মনে করুন, আমার হাতে একটি পানির গ্লাস। এই গ্লাস দেখে মানুষ দুই প্রকারের ফলাফল বের করতে পারে। এক. মানুষ গ্লাসটা দেখে বলবে, গ্লাসের অর্ধেকটা খালি। হ্যাঁ; ঠিকই বলেছে। অর্ধেকটা খালিই। আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলে সেও এই একই কথা এভাবে বলতে পারে যে, হ্যাঁ ভাই!আধা গ্লাস পানিতে ভর্তি আছে। তো যে বলেছে আধা গ্লাস খালি, সেও সঠিক কথা বলেছে। আবার যে বলেছে, আধা গ্লাস পানিতে ভর্তি আছে, সেও ঠিকই বলেছে। কিন্তু একজন চিন্তা করেছে ইতিবাচক দিক থেকে, আরেকজন চিন্তা করেছে নেতিবাচক দিক থেকে।

মানব ব্যক্তিত্বে গবেষণার প্রভাব

যে-মানুষটি গবেষণা করবে এবং যে-ধরনের গবেষণা করবে, তার ভেতরে সেসব রকম প্রভাবই পতিত হবে। কেউ যদি ইতিবাচক দিক থেকে

গবেষণা করে, তাহলে তার ব্যক্তিত্বে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। পক্ষান্তরে কেউ যদি নেতিবাচক দিক থেকে গবেষণা করে, তাহলে তার ব্যক্তিত্বে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মনে করুন, একটা মানুষ আপনার সাথে কথা বলছে। আমি গোলাপ ফুল ছিঁড়তে গেছি। কাঁটায় আমার হাত ফুটে গেছে। ফুল আনতে গেলে কাঁটার আঘাত খেতে হয়। আবার এই কথাটাই অন্য একজন এভাবে বললেন, আরে আল্লাহর বান্দা! শোনো! একথাটা কেন ভাবছ না, যেখানে কাঁটা আছে সেখানে ফুলও আছে। তো এখন একটি লোক তার কথাটা যদি এভাবে চিন্তা করে যে, যেখানে ফুল আছে, সেখানে কাঁটাও আছে, তাহলে তার চিন্তাটি নেতিবাচকভাবে হলো। ফলে তার ভেতর ফরেস্ট্রেশন সৃষ্টি হলো। কিন্তু সেকথাটা যদি এভাবে বলে যে, দুনিয়ার মধ্যে কাঁটা আছে। আবার সাথে ফুলও আছে। এতে করে লোকটির হৃদয়ে আল্লাহর শোকর করার অনুভূতি জাগ্রত হবে।

আরেকটি উদাহরণ শুনুন।

দুজন কয়েদি। তাদের জেলে পাঠানো হলো। কয়েকদিন পর এদের মুক্ত বাতাসে ১০/২০ মিনিটের জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো। তারপর আবার বন্দি করা হলো। এবার তারা দুজনে কথাবার্তা বলছে। একজন বলল, দোস্ত! মনে হয় বাইরে বৃষ্টি হয়েছে। ২য় জন বলল, হ্যাঁ। আমার কাছেও মনে হয়েছে বাইরে বৃষ্টি হয়েছে। একজন বলল, তুমি কী করে বুঝতে পারলে? বলল, খুব কাঁদা দেখতে পেলাম। এবার একজন জিজ্ঞেস করল, তুমি কীভাবে বুঝলে? বলল, গাছের পাতাগুলো দারুণ তকতকে দেখতে পেলাম। ফুলগুলোকে দেখতে পেলাম পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। চার দিক শ্যামল ও সবুজ দৃশ্য দারুণ তরতাজা মনে হলো। এভাবে বুঝতে পারলাম, বাইরে বৃষ্টি হয়েছে।

দেখুন, দুজনের কথার ভাবও মর্ম একই। পার্থক্যটা শুধু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। একজন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলেছে, আরেকজন বলেছে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। একজনের দৃষ্টি কাঁদার দিকে। আরেকজন দৃষ্টি সবুজ-শ্যামলিমা ও পত্র-পল্লবের দিকে।

'মিষ্টিছাড়া' তরমুজ

যদি কোনো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তি মুসিবতে পড়ে, তাহলে সে সাহসীই থাকে এবং মসিবতের সঠিক সমাধান নিতে সক্ষম হয়। আর যে-

ব্যক্তি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির, সে মসিবতে পতিত হলে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, সাহস হারিয়ে ফেলে এবং ভেঙে পড়ে। একবার লাহোরের এক কৃষাণ সিজনের পূর্বেই তার তরমুজ কেটে বাজারে আনল। ভাবল, দাম ভালো পাবে। আল্লাহর কুদরত যে, তরমুজ পেকেছে এবং লালও হয়েছে ঠিক; কিন্তু তাতে তখনও মিষ্টতা আসেনি। একব্যক্তি সেটা ক্রয় করল এবং কেটে এই অবস্থা দেখে কৃষককে বলল, কী মিয়া! তোমার তরমুজ তো সামান্যও মিষ্টি নয়।

আরেকজন ক্রয় করল। একই কথা সেও বলল। লোকটি বড় পেরেশান হয়ে গেল। অবশ্য কৃষক বড় হিম্মতওয়ালা ও সাহসী ছিল। ভাবল, আরে যা হওয়ার, তা তো হয়েই গেছে। পেরেশান হয়ে লাভ নেই। আমি এর একটি সমাধান বের করব। সে চিন্তা করতে লাগল, কীভাবে এর সমাধান বের করা যায়। শেষ পর্যন্ত এক পেইন্টারের কাছে গেল এবং বলল, আমাকে একটা সাইনবোর্ড বানিয়ে দাও এবং এর ওপর লেখে দাও–

'লাহোরে এ-ই প্রথম মিষ্টি ছাড়া তরমুজ।'

লাহোরে এ-ই প্রথম মিষ্টি ছাড়া তরমুজ আবিষ্কৃত হয়েছে। কে নেবেন দ্রুত আসুন। শেষ হয়ে গেল। এভাবে সে চিৎকার করতে লাগল। আর ব্যানারটাও ঝুলিয়ে দিল। এবার তো মানুষের ভিড় লেগে গেছে। সবাই এই নতুন প্রজাতির ফল কিনবে। কেউ তার মায়ের জন্য নেবে, কেউ শাশুড়ির জন্য নেবে, কেউ বউয়ের জন্য দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করতে লাগল।

দেখুন, লোকটি পেরেশান না হয়ে বুদ্ধি খাটাল। আকল খাটিয়ে সে এমন একটা কৌশল বের করল যে, তার তরমুজ উল্টো দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রি হয়ে গেল। তাই বলেছি, কোনো মসিবত দেখা দিলে বা কোনোরূপ সমস্যা হয়ে গেলে পেরেশান ও অস্থির না হয়ে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে সিদ্ধান্ত নেবে। এতে সহজে একটি সুন্দর সমাধান বের করা সম্ভব হবে।

সমস্যায় পড়লে ভিন্ন পথ অন্বেষণ করুন

মনে করুন, আপনি একটি রোডে চলছেন। চলতে-চলতে একপর্যায়ে দেখলেন, পথ একেবারে ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। চার-পাঁচ ফুট উঁচু করে দেওয়াল তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এখন আপনি তো আপনার গাড়ি নিয়ে এখানে বসে থাকবেন না। হয়তো সেখানে কন্টাকশনের কাজ চলছে। তাই তারা একটা বাই রোড বা বিকল্প পথ তৈরি করে দিয়েছে। আপনি আপনার

গন্তব্যে পৌঁছতে হলে সোজা পথে যেতে পারবেন না– বাই রোডে যেতে হবে। রাস্তাটা হতে পারে অমসৃণ এবং এবড়োথেবড়ো বা কাঁচা। এখন বসে থাকলে চলবে না। ওই কাঁচা পথে আপনি একটু অগ্রসর হোন। দেখবেন, কাঁচা পথ একটি পাকা সুন্দর পথে গিয়েই মিলেছে। তো যেমনিভাবে পথ না পেলে আপনি বিকল্প পথ গ্রহণ করেন, তেমনিভাবে আপনার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি কোথাও কোনো অসঙ্গতি দেখা দেয়, এলোমেলো অবস্থা আসে, বিপদ আসে, তাহলে আপনি ঝগড়াঝাটি, হইচই এবং বিশৃঙ্খলা-অস্থিরতার মধ্যে যাবেন না। আপনি বিকল্প পথ গ্রহণ করুন। ভিন্ন পথ অন্বেষণ করুন। একটা সুন্দর সমাধান বের করতে চেষ্টা করুন। ভাবুন, এখন কী করণীয় আপনার? আল্লাহ আপনাকে আকল দিয়েছেন। আপনি তার দ্বারা সুচিন্তিত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

যেমন চিন্তা তেমন কথা

মানুষ যেভাবে যে কথা চিন্তা করে, সে কথাটা সে সেভাবেই বলে। মানুষ তার কল্পনা ও ভাবনা অনুযায়ীই কথা বলে। তাই একজনের কথার সাথে আরেকজনের কথার বিস্তর প্রভেদও থাকে।

একই কথা আপনি যদি সামান্য অশোভনভাবে বলে থাকেন, তাহলে আপনার সম্মুখের মানুষটি আপনাকে থাপ্পরও দেবে। আবার একথাটাই সামান্য সভ্যতার ছোঁয়া দিয়ে বললে মানুষ কৃতজ্ঞ হবে। একটি আশ্চর্য উদাহরণ দেখুন–

আপনি কাউকে যদি বলেন, তোমার আব্বু আসছেন। তাহলে কথাটা শুনলে আপনার প্রতিপক্ষের লোকটি খুশিই হবেন। কিন্তু যদি বলেন, তোমার মায়ের প্রেমিক আসছেন, তাহলে লোকটি আপনাকে জুতা মারবে। অথচ আব্বু আর মায়ের প্রেমিক তথা স্বামী কথাটা কিন্তু একই। লোকও একজনই। কিন্তু ব্যক্তকরণের ভুলের কারণে সমস্যার সৃষ্টি হবে।

এক বাদশাহ স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর কয়েকটা দাঁত পড়ে গেছে। বড় পেরেশান হয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীকে ডাকলেন। সে এলে বাদশাহ এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। ব্যাখ্যাকারী লোকটি ছিল একটু অপরিপক্ব। সে বলল, বাদশাহ সালামত! এর ব্যাখ্যা হলো, আপনার সামনেই আপনার কয়েকজন আত্মীয় মৃত্যুবরণ করবে। বাদশাহ কথাটা শোনার সাথে-সাথে রেগে গেলেন এবং বললেন, একে কয়েক ঘা জুতা মারো। এখান থেকে বের করে দাও। এমন খারাপ ব্যাখ্যা সে কেন দিল!

কিন্তু বাদশাহ তো পেরেশানিতে ভুগছেন। কারণ, এর তো কোনো-না-কোনো ব্যাখ্যা হবেই। এই জন্য আরেকজন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীকে ডেকে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। সে ছিল একটু সমঝদার ও বুদ্ধিমান। বলল, বাদশাহ জাহাঁপনা! সৌভাগ্য আপনার। আপনি আপনার সকল নিকটাত্মীয় থেকেও বেশি হায়াত পাবেন। (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পর বাদশাহর মৃত্যু হবে)।

এই ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ অত্যন্ত খুশী হয়ে গেলেন। লোকটিকে বিপুল পরিমাণে শাহি পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন।

দেখুন, কথা তো উভয়টা একই। বাদশাহ বেশি হায়াত পাবেন। অন্যরা কম হায়াত। আর বাদশাহর জীবদ্দশায় তার নিকটাত্মীয়রা মৃত্যু বরণ করবে। কথাদুটি কিন্তু এক। তবে বাচনভঙ্গিতে পার্থক্যের কারণে এক ব্যাখ্যায় বাদশাহ রেগে গেছেন। আরেক ব্যাখ্যায় বাদশাহ খুশি হয়ে পুরস্কার পর্যন্ত দিলেন।

মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষায় চিন্তাচেতনার প্রভাব

মানুষের চিন্তাচেতনা যেভাবে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে, তেমনিভাবে তার স্বপ্নও চাহিদার মাঝেও প্রভাব সৃষ্টি করে। চিন্তাচেতনা যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে স্বপ্ন ও চাহিদাও তার বিশুদ্ধ হবে। মনের ইচ্ছেগুলো সুন্দর হবে। আর যদি চিন্তাচেতনা হয় নষ্ট ও গলত, তবে তার ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষাগুলোও হবে বিশ্রী ও অসুন্দর। মাছি ও মৌমাছির মধ্যকার পার্থক্য আপনারা জানেন। মাছি কোনো দিন ফলে বসে না। মৌমাছি কোনো দিন আবর্জনায় যায় না। কেন? রুচি ও চিন্তাচেতনার কারণেই।

ফুল আর ফলের রস চুষে বেড়ায় মৌমাছি। আর দুর্গন্ধ, গলিত পচা ও রক্ত-পুঁজে গিয়ে সেই বিষাক্ত রস চুষে বেড়ায় মাছি। মধুমক্ষিকা থেকে জন্ম নেয় মধু। আর মাছি থেকে ছড়ায় ভাইরাস, বিষ।

তাই বোঝা গেল, মৌমাছির চিন্তাচেতনা সুন্দর ও পরিশুদ্ধ তাই তো তার থেকে প্রোডাক্টও হয় ভালো ও উপকার জিনিস। মাছি ও মৌমাছির মতোই মানুষও দুই শ্রেণির রয়েছে।

কিছু মানুষ দুর্গন্ধ ও খারাপ মাছির মতো। তারা সর্বদা খারাপের চর্চা করে বেড়ায়। দুর্গন্ধ বিষয় খুঁজে বেড়ায়। নষ্ট ও ভ্রষ্ট পথে চলে। কারও ভালো ও উত্তম বিষয় তারা দেখে না। তারা কারও কল্যাণ সহ্য করতে পারে

না। তারা কারও ভালো মেনে নিতে পারে না। কাকে কীভাবে ঠকাতে পারে সবসময় সেই চিন্তায় বিভোর থাকে। কার কীভাবে ক্ষতি করবে এমন চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকে। ভালো ও উত্তম মজলিসও তাদের কাছে ভালো লাগে না। যে-মজলিসে গিবত চলবে, যে-মজলিসে অন্যের নিন্দা ও দোষচর্চা চলবে, ওই মজলিস তাদের কাছে প্রিয়। তারা কারও ভালো গুণে মুগ্ধ হয় না। নিজেকে নিজে ভালো মনে করে এবং নিজেকেই সর্বত্র প্রাধান্য দিয়ে চলে। দীনদারদের ভালো ভাসে না। ছোটদের স্নেহ করে না। বড়দের সম্মান করে না। তারা কোনো দিন তৃপ্ত হতে পারে না। খুশি হতে পারে না। হীন ও নীচু মানসিকতার লোকদের চোখে যেন একটা চশমা লাগানো থাকে। সেই চশমা দিয়ে সর্বদা সে খারাপ বিষয়ই দেখতে পায়। ভালো ও উত্তম কিছু দেখতে পায় না। সে শুধু মানুষের দোষই দেখতে পায়– গুণ দেখে না। মানুষের গুণগুলোও তার চোখে দোষরূপে দেখা দেয়।

আরে ভাই! অন্যের দোষত্রুটি এভাবে খুঁটে-খুঁটে দেখ কেন তুমি? নিজের দোষ দেখতে পাও না। অন্যের চোখের পশম তো খুব দেখ, নিজের চোখের পশম দেখতে পাও না। এসব লোক খোদার কাছেও অগ্রহণযোগ্য আর মানুষের কাছে অসম্মানিত ও হীন।

আবার কিছু মানুষ আছে, মধুমক্ষিকার মতো। তাদের চিন্তাচেতনা বিশুদ্ধ। তাদের মন ও মনন বড়ই সুন্দর। তাদের মানসিকতা অত্যন্ত উঁচু। সর্বদা সত্য ও সুন্দরকে খুঁজে ফিরে তারা। অসুন্দরের কাছেও যায় না। অন্যের মাঝে ভালো কিছু আছে কি-না সেই অন্বেষণে বিভোর থাকে। অন্যের মাঝে ভালো কিছু পেলে তা নিজের মাঝে বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থাকে। নেক মজলিস, ভালো ও সুন্দর কথার আসর তাদের কছে ভালো লাগে। তারা অন্যের গুণ দেখে। অন্যকে কল্যাণের পথে ডাকে। অন্যের ভালো ও হিত কামনা করে সর্বদা। কেউ কোনো দোষ করলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। তার সামনে দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ মানুষটিকে এনে দাঁড় করালেও সে তার মধ্যে ভালো কিছু আবিষ্কার করে। কারণ, তার দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দর। তার চিন্তাচেতনা বিশুদ্ধ। তাই তারা আল্লাহর প্রিয় হয়ে থাকেন। দুনিয়ার লোকেরাও তাদের সম্মান করে, সমীহ করে। মধুমক্ষিকার মতোই তারা নিজেদের জীবন যাপন করেন। তাদের জীবন সুখের হয়, সুন্দর হয়। তাদের সামনে কারও সমালোচনা করা যায় না। একটি উচ্চ টার্গেট ও গন্তব্যকে সামনে রেখে তারা তাদের জীবন পরিচালনা করেন।

দাম্পত্যজীবনে চিন্তাচেতনার প্রভাব

দাম্পত্যজীবনে সফল এবং সুখী হতে হলে বিশুদ্ধ চিন্তাচেতনার প্রয়োজন অপরিসীম। স্বামী-স্ত্রী যে কারওই চিন্তাচেতনা নেতিবাচক হবে, সে কখনও সচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারবে না। নেতিবাচক চেতনার লোক তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে, লড়াই করে। যদি বলা হয়, আরে ভাই! তুমি এভাবে ক্ষেপেছ কেন? তখন বলে, আমার বউ আমার ভাইয়ের দিকে মুচকি হেসে তাকিয়েছে। অথবা বলে, আমার বউ ওর ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হেসেছে। তো বলুন, যে-ব্যক্তি এমন সাধারণ বিষয়েই এমন পাগল হয়ে যায়, তার ঘরে সুখ আসবে কী করে। এতে তো স্ত্রীরা আরও বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। তার চিন্তাচেতনা নেতিবাচক। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তার সব সময় সন্দেহ হয়। তাই বলেছি, চিন্তাচেতনা যদি পরিশুদ্ধ হয়, তাহলে অন্যের মাঝেও ভালো বিষয় দেখতে পায়। অন্যের মাঝে সে সৌন্দর্য খুঁজে পায়। আর চিন্তাচেতনা অপরিশুদ্ধ ও অসুন্দর হলে নিজের জীবনসঙ্গিনীর মাঝেও সে অসুন্দর ও খারাপ বিষয় দেখতে পায়। নিজের বউয়ের চালচলনও তখন তার কাছে ভালো লাগে না। স্ত্রীর সব অবদান সে ভুলে যায়। কত কষ্ট করে একটি নারী সন্তান জন্ম দেয় তা স্বামী একেবারেই ভুলে যায়। যে নারীর উসিলায় সন্তান পেল, ভালো জব পেল, বাবা পেল, রিযিক পেল, সেই স্ত্রীকেই এখন সে ঘৃণা করে। কারণ, তার দৃষ্টিভঙ্গি অপরিশুদ্ধ।

মোটকথা, এমন মানুষ কোনোভাবেই দাম্পত্যজীবনে সুখী হয় না। এমন মানুষ সর্বদা কষ্টে থাকে। স্ত্রীকে ভুল বোঝে। সন্তানকে ভুল বোঝে। পরে দেখা যায়, স্ত্রী, সন্তান, মা, শাশুড়ি সবই তার দৃষ্টিতে খারাপ হয়ে যায়। সবই তার বিপরীত হয়ে যায়। সবই তার কাছে ঘৃণিত হয়ে যায় এবং সেও সবার কাছে ঘৃণিত হয়ে যায়। এই সব বান্দারা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা। আল্লাহ এদের এত অপছন্দ করেন যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি নারীদের বেশি জাহান্নামি পাচ্ছি। হযরত উম্মুল মুমিনীন প্রশ্ন করলেন, কেন? কী এর কারণ? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা বেশি-বেশি লা'নত দেয়, আল্লাহর নাশোকরি করে, অন্যের বদনাম বলে, একের কথা অন্যের কাছে বলে বেড়ায়। আল্লাহ এই কাজগুলো অত্যন্ত অপছন্দ করেন। তাই তাদের জাহান্নামে দেবেন।

তো এখানে লা'নত কেন দেয় এবং নাশোকরি কেন এবং কীভাবে করে? আসল কথা হলো, কিছু দুষ্টু স্বামী তাদের স্ত্রীকে কষ্ট দেয়, ব্যথা দেয়, অবলা

নিরুপায় স্ত্রীরা তো ওইসব বদমাশ স্বামীদের কিছু করতে পারে না। তাই তারা লা'নত করে। কিন্তু লা'নত করা তো আল্লাহর অপছন্দনীয় ব্যাপার। আবার স্বামীরা স্ত্রীদের কষ্ট দেওয়ার কারণে তারা স্বামীদের অত্যন্ত বাধ্য হয়েই বলে দেয়, তুমি আমার জন্য কী করেছ? তুমি আমাকে একটু শান্তিও দাওনি। তো এটা তো নাশোকরিমূলক কথা। স্বামীর বদনাম নারীরা নিজেদের মাঝে বলে বেড়ায়। এটা মূলত স্বামীর দুর্ব্যবহারের কারণে হয়। তো হাদীছ তো ঠিকই আছে। সমস্যা সৃষ্টি করছে প্রথমে স্বামী।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে কোনো বিষয় এমন দেখ, যা তুমি পছন্দ কর না, তখন তুমি নিজেকে নিয়ে ভেবে দেখো। তোমার স্ত্রীর কটি কাজ তোমার পছন্দ হয়। তার ভেতর এতগুলো পছন্দনীয় বিষয় থাকা সত্ত্বেও দু-একটা অপছন্দনীয় বিষয়ের কারণে তুমি তোমার স্ত্রীর ওপর এমন বাড়াবাড়ি করছ। বলো, তোমার ভেতরও তো বহু অপছন্দনীয় বিষয় আছে।

এখন তো আধুনিক প্রযুক্তির যুগ। সব রকম মেশিন আবিষ্কার হচ্ছে। প্রত্যেকটা মেশিন বানানোর একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, পদ্ধতি আছে। প্রত্যেক সাইজের মেশিনের পার্টসের আলাদা-আলাদা সাইজ আছে। পার্টসগুলো যদি পরিমাণমতো সঠিক সাইজের হয়, তাহলেই মেশিনটা সঠিক থাকবে। যদি বড় ছোট হয়, তাহলে মেশিন চলবে না।

তেমনিভাবে স্বামী ও স্ত্রী এই দুজনে মিলে একটা সংসার চলবে। উভয়ের মধ্যে সমতা ও বনিবনা থাকতে হবে। আঁকাবাঁকা হয়ে গেলে সংসার চলবে না। তাই মানুষের উচিত একটু বুঝেশুনেই কাজ করা। অন্তরকে উদার রাখা। স্ত্রীর ভুল স্বামী সহ্য করবে। স্বামীর ভুল স্ত্রী সহ্য করবে। যাদের হৃদয়টা বড় এবং উন্মুক্ত, তারাই দুনিয়াতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

কেউ একজন চমৎকার বলেছে–

To run a big sbw. one should have a big heart.

তুমি যদি স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে চাও, তবে তোমার হৃদয়টাকে বড় করো।

পেরেশানি তো আসবেই। কে এমন আছে, যার কোনো পেরেশানি নেই। এই দুনিয়াটাই তো পেরেশানির জায়গা। এখানে হাজারো সমস্যার সমাবেশ। যে-সংসারের দিকেই তাকাবেন, কোনো-না-কোনো সমস্যা দেখতে পাবেন। অবশ্য সমস্যার ধরন ভিন্ন হতে পারে। যেকোনো কাজ-

কর্মের দিকেই তাকাবেন, কোনো-না-কোনো সমস্যা আপনি দেখতে পাবেনই। তবে সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাই আপনার দাম্পত্যজীবনের সুখ-শান্তির জন্যে অবশ্যই ধৈর্য লাগবে। ধৈর্য না থাকলে আপনার সমস্যা আরও বাড়তেই থাকবে।

তো আমাদের উচিত, আমার চিন্তাচেতনাকে পরিশুদ্ধ করে নেব। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সুন্দর করে নেব। আমরা অন্যের জন্য দয়াবান হব। রহমত হব। অন্যের জন্য গজব হব না। কষ্টের কারণ হব না।

আপনার কথা যদি কোনো মানুষ বুঝতে না পারে, তাহলে আপনি চিন্তা করুন, কেন লোকটি আপনার কথা বুঝতে পারছে না। আপনি চিন্তা করলে অবশ্যই কারণ পেয়ে যাবেন।

সাধারণভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া কী বিষয় নিয়ে হয়? একটা অতি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে। বাপের বাড়িতে যাবে কি-না? বাচ্চাটাকে ওষুধ খাইয়েছে কি-না? স্ত্রীর জন্যে পছন্দনীয় শাড়িটা কিনেছে কি-না? এসব অতি সাধারণ বিষয় নিয়েই কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হয় অথবা বেশি থেকে বেশি স্বামীর ভাই বা বোন হয়তো স্ত্রীকে কিছু বলেছে, না হয় স্ত্রীর মাঝে ও স্বামীর মায়ের মাঝে কোনো অমিল হয়েছে? না হয় কোনো একটা কাজ করার ছিল, স্বামী হয় কাজটি করেনি বা স্ত্রী কোনো কাজ করার কথা ছিল সেটি হয়তো সে করেনি। তো এসব নগণ্য বিষয় নিয়ে রাগে উপনীত হওয়ার কী আছে? এতো সেন্টিমেন্ট গরম করলে তো হবে না। উভয়ে এর একটা সুরাহা করে নিলেই তো চলে। উভয়ে মিলে কিছু সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মিটমাট করে নিলেই তো চলে। কিন্তু তা না করে স্বামী স্ত্রীর ওপর বাড়াবাড়ি করে বা স্ত্রী স্বামীর ওপর বাড়াবাড়ি করে। এতেই বিদ্বেষ তৈরি হয়। কোনো সমাধান তো প্রতিফলিত হয় না।

নিজের অযোগ্যতার প্রমাণ দেওয়া

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছোট-ছোট বাচ্চারা পড়াশোনা করে। অনেক সময় ওস্তাদগণ তাদের অতি সমান্য কোনো ব্যাপার নিয়ে থাপ্পড় মেরে দেন। এর দ্বারা তিনি একথাই প্রমাণ করে দেন যে, কথার মাধ্যমে বাচ্চাদের বোঝানোর যোগ্যতা আমার নেই। তো ওস্তাদ নিজের অযোগ্যতারই স্বীকৃতি প্রদান করেন। যে-ব্যক্তির যোগ্যতা আছে, তিনি ধরেই প্রহার শুরু করেন না। ছাত্রদের আদর-যত্নে বুঝিয়ে দিতে পারেন যোগ্য

প্রশিক্ষকগণ। তেমনি সংসারে যে মানুষটি কথায়-কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন, তিনি সংসারে অশান্তির কারণ হয়ে থাকেন। আপনি কথায়-কথায় আপনার দুর্বল স্ত্রীকে মারধোর শুরু করেন। এতে তো আপনি নিজের অযোগ্যতাকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেন। বোঝা যায়, স্ত্রী চালানোর ক্ষমতা, মেধা ও বুঝ আপনার মধ্যে নেই। তাই বলছি, আপনি সুন্দরকে চিনতে শিখুন। ভদ্র ও নম্র হোন।

রাগ অযোগ্যতার আলামত

বাস্তবেই রাগ অযোগ্যতার আলামত। অনেক সময় দেখা যায়, যুবকরা রাগে কম আর বৃদ্ধরা অল্পতেই রেগে আগুন হয়ে যায়। কারণ, বৃদ্ধদের মধ্যে মেনে নেওয়ার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই অতি সাধারণ বিষয়েও তারা চটে যান। তাই তো বৃদ্ধ বয়সে মানুষ খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায়। বয়স যতই বৃদ্ধি পায়, বয়সের সাথে তাল মিলিয়ে খিটখিটে স্বভাবটাও তার বেড়ে যায়।

এক বৃদ্ধ ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলল,

ডাক্তার সাহেব! আমার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। চোখে দেখি না।

ডাক্তার বললেন, এটা বার্ধক্যের কারণে।

বৃদ্ধ বলল, কানেও কম শুনি।

ডাক্তার বললেন, এটাও বার্ধক্যের কারণে।

লোকটি বলল, দাঁতও কয়েকটা পড়ে গেছে।

ডাক্তার বললেন, এটাও বার্ধক্যের কারণে।

ডাক্তার যখন বারবার বললেন, বার্ধক্যের কারণে, বার্ধক্যের কারণে, তখন বৃদ্ধ খুবই রেগে গেল আর বলতে লাগল, বার্ধক্য, বার্ধক্য করছেন কেন? ডাক্তার বললেন, মিয়া সাহেব, এটাও আপনার বাক্যের কারণে।

বৃদ্ধদের সহ্যক্ষমতা এত কমে যায় যে, তারা বাতাসকেও গালি দিতে আরম্ভ করে। তাই যুবকদের উচিত বুড়োদের মতো কথায়-কথায়ই চটে না যাওয়া, গরম না হয়ে যাওয়া। বরং রাগ সংবরণ করবার চেষ্টা করবে। তাই তো নবীজি বলেছেন, পাঞ্জা লড়ে জিতে যে, সে পাহলোয়ান নয়, বীর নয়; বরং রাগের সময় ধৈর্যধারণ করে যে, সেই প্রকৃত বীর। তাই ধৈর্য ও সহনশীলতা যদি বান্দার মধ্যে থাকে, অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকার মতো স্বভাব যদি তার থাকে, তাহলে তার জীবন বড় সুখের হয়, শান্তির হয়। কিন্তু

কোনো মানুষ যদি সামান্য-সামান্য কথাও সহ্য করতে না পারে, তাহলে বলুন তার শেষ পরিণামটা কী হবে? একটু সামান্য চিন্তা করলেই মনে হয় বিষয়টা বুঝতে পারবেন।

পিতা-পুত্রের চিন্তাচেতনা

এক ইঞ্জিনিয়ার তার কামরায় বসে কোনো একটি ডিজাইন তৈরি করছেন। এমন সময় তার স্ত্রী তার ছ-সাত বছরের একটি সন্তান স্বামীর কাছ দিয়ে পাশের বাড়িতে গেল। ছ-সাত বছরের বাচ্চারা তো বড় দুরন্ত হয়। বাবার রুমে সারি-সারি বই পুস্তক, এখানে-ওখানে কাগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সে একবার এটা ধরে, আবার ওটা ধরে। সারাটা রুম কাঁপিয়ে তুলতে লাগল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব শান্তিতে তার কাজ করতে পারছেন না। বাচ্চাটাকে ধমক দিতেও খারাপ লাগছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চিন্তা করলেন, বাচ্চাটাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা পেপারের মধ্যে বড়ো করে একটি মানচিত্র দেখলেন। পেপারের মানচিত্রটা হাতে নিয়ে পেপারটা কয়েক টুকরা করে বাচ্চাটাকে দিয়ে বললেন, এই যে খোকা! এই নাও। এই মানচিত্রটা মিলিয়ে নিয়ে এসো। যদি এটা মিলিয়ে আনতে পার, তাহলে তোমাকে দামি একটি আইসক্রীম কিনে দেব।

আইসক্রীমের কথা শুনে তো বাচ্চা মহা খুশী। দৌড়ে অন্য রুমে গিয়ে বাচ্চা মানচিত্র মিলিয়ে আনার কাজে লিপ্ত হলো। বাবা হাপ ছেড়ে ভাবলেন, দেড়-দুই ঘন্টা সময় একাজে ব্যয় করতে হবে। এই ফাঁকে আমার কাজও আমি শেষ করে ফেলতে পারব। কিন্তু কয়েক মিনিট পরই বাচ্চা পেপারটা এনে বলল, নাও আব্বু মিলিয়েছি। বাবা দেখলেন, একেবারে সঠিকভাবে– নদীর সাথে নদী, সাগরের সাথে সাগর, পাহাড়ের সাথে পাহাড় আর দেশ মহাদেশের সাথে দেশ মহাদেশ মিলিয়ে নিয়ে এসেছে। বাবা একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। বড় ইঞ্জিনিয়াররা পর্যন্ত এই মানচিত্র মিলাতে গেলে বহু সময় লাগার কথা। অথচ বাচ্চাটা এতো অল্প সময়ে এটা মিলাল কী করে? বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো খোকা! এটা কীভাবে মিলিয়েছ? বাচ্চাটা হাসি দিয়ে কাগজটা উল্টো করে বাবার সামনে দিল। দেখা গেল, ওখানে একটা মহিলার ছবি। বাচ্চাটা এই ছবি দেখে যেখানে যে টুকরো মিলানোর ছিল, সেখানে সে টুকরো মিলিয়ে ছবিটা ঠিক করে নিয়েছে। ফলে অপর পৃষ্ঠার জন্য এটি সামান্যও কষ্টের কাজ হলো না।

মুহতারাম হাজিরীন! আমাদের জীবনে যে-সমস্যাটা আসবে, হতে পারে সেটা টুকরো-টুকরো মানচিত্র মিলানোর মতো কঠিন। কিন্তু অন্য আরেকজন মানুষের জন্য এই সমস্যাটা অতি সাধারণ একটি বিষয়। তার কাছে একটি ছবির টুকরো-টুকরো কাগজ একসাথে করার মতোই সহজ। তাই কোনো পেরেশানি বেড়ে যাবে। প্রয়োজন কী এভাবে পেরেশান হয়ে যাওয়ার। এই বাস্তবতা যে বুঝে নেবে, তার জীবন সৌন্দর্যে ভরে উঠবে। তার জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দে পূর্ণ হয়ে যাবে।

সফল জীবনের রহস্য

একটি মূলনীতি মনে রাখুন। সফল জীবনের অধিকারী লোকেরা সাধারণত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়ে থাকেন। একবার আমি ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ড পড়ছিলাম। বইটিতে একস্থানে অত্যন্ত আশ্চর্য কথা লেখা হয়েছে যে, যত মানুষই ওই রেকর্ড বুকে তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, যতজন থেকে আমরা ইন্টারভিউ নিয়েছি, সকলেই এই একটা কথাই বলেছে যে, যখন ইন্টারভিউ দিতে আসি বা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই, তখন আমি পূর্ণভাবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আমিই জিতব, আমিই পারব। পরে দেখা যায়, ঠিকই আমি জিতেছি ও পেরেছি। বইটিতে আরও লেখা হয়েছে, এমন কোনো মানুষই পাওয়া যায়নি, যারা এমন বলেছে যে, প্রতিযোগিতার পূর্ব আমি খুব ভয়ার্ত ও আতঙ্কিত ছিলাম। এতে বোঝা গেল, প্রতিযোগিতার ময়দানে সেই ব্যক্তি জিততে পারে, যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখে, যার ভেতরে বিজয়ী হওয়ার ইচ্ছে ও সংকল্পটা অদম্য থাকে।

God helpe those who help themselves.

'খোদা ওই লোকদের সাহায্য করেন, যারা নিজেরা নিজেকে সাহায্য করে।'

তাই আমাদেরও উচিত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা। তাহলে আমরা সফলতা ও কামিয়াবি পাব। অত্যন্ত সহজেই আমরা আমাদের সমস্যাবলির সমাধান করতে পারব। অত্যন্ত প্রশান্ত জীবন যাপন করতে পারব আমরা।

ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তির মনোবল

ইটালি প্রবাসী এক ব্যক্তি আরবি ভাষা শিখেছে। এবার সে একটি লাইব্রেরীতে গেল। আরব্য ইউনানি শাস্ত্রের কিতাব সেখানে সে পেল। কিছু

আরব্য কিতাব সে ইটালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে দিল। অনুবাদগ্রন্থ বের হওয়ার পরপর মানুষ হাতে-হাতে ওই কিতাবটি ক্রয় করে নিল। সারা দেশে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। কত ভালো একটা কাজ সে করল। এত বড় জ্ঞান সম্পদ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করে দিল। সর্বস্থানে যখন তার প্রশংসা হতে লাগল, তখনই তার শরীর প্রচণ্ড রকম অসুস্থ হয়ে গেল। ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ল এবং ক্যান্সার এত বেশি ছড়িয়ে পড়ল যে, ডাক্তার বলে দিল আর সর্বোচ্চ দু-বছর তার হায়াত আছে।

একথা শুনে লোকটি ভাবল, আমার হায়াত তো কম; তাই আমার কাজ বেশি করা উচিত। অল্প সময়ে আমার সব কাজ ঘুছিয়ে নিতে হবে। তাই সে ভাবল, পেরেশান হলে হবে না। মনোবল ভেঙে ফেললে চলবে না। বরং পেরেশান হওয়ার স্থলে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ক্যান্সার-আক্রান্ত এই লোকটি আবার ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রের আশিটি কিতাব সংগ্রহ করল লাইব্রেরী থেকে। একটি টিম গঠন করল। টিমের সদস্যদের বলল, পারিভাষিক স্থানসমূহ আমি অনুবাদ করব। আর সহজ স্থানগুলোর অনুবাদ তোমরা করবে। সে খুব তেজিয়ান হয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করল। আশ্চর্য! ওই ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি তার টিম নিয়ে ৮০টি আরবি ভাষার ইউনানি কিতাব ইটালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে নিল। নিজের নাম সেই ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডে লিখিয়ে নিল।

অটোমেটিক সেলাই মেশিন

একজন বিজ্ঞানীর জীবনী পড়ছিলাম। লোকটি কাপড় সেলাবার মেশিন তৈরি করতে চাইল। নারীরা কাপড় তাদের হাতে সেলাই করতে হয়। সুঁই ও সুতা দিয়ে চালানো হতো সেলাই কার্যক্রম। তো ওই বিজ্ঞানী একটি সেলাইয়ের মেশিন আবিষ্কার করতে চাইল। একটি ডিজাইনও সে তৈরি করল।

মেশিন তৈরি হলো। কিন্তু সুঁই লাগানো যাচ্ছে না। বরং সুঁই লাগিয়ে সেলাই করতে গেলেই সুঁই ভেঙে যায়। মেশিন চালালেই সুঁই ভেঙে যায়। বিজ্ঞানী পেরেশানিতে পড়ে গেলেন। অনেক চেষ্টা চালালেন। এর কোনো বিহিত করতে পারলেন না। সাধারণ কোনো মানুষ হলে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ত। আশা ছেড়ে দিত। বিজ্ঞানী চিন্তা করলেন, কোনো একভাবে তো

কাজ অবশ্যই হবে। এভাবে না হয় তো ওভাবে হবে। বিজ্ঞানী গবেষণা করতে লাগলেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বিজ্ঞানী নতুন স্টাইলে একটা সুঁই বানালেন। সাধারণ সুঁইয়ের গোড়ায় সুতো লাগানোর ছিদ্র থাকে। বিজ্ঞানী আগায় ছিদ্র লাগালেন।

এবার সিস্টেমমতো মেশিনে সুঁই ফিট করে কাজ শুরু করলেন। ব্যস, চলতে লাগল মেশিন। এখন আর সুঁই ভাঙে না। লোকটি হয়ে গেলেন সেলাই মেশিন আবিষ্কারের জনক। তো তাই বলছি, আমাদের জীবনে চলার পথে বাঁধা আসবেই। তবে এই বাঁধাকে সুকৌশলে অতিক্রম করতে হবে। একভাবে কাজ না হলে আরেকভাবে চেষ্টা করে দেখতে হবে। বসে থাকলে চলবে না। কোনো-না-কোনোভাবে তো আল্লাহ সেই সমস্যা থেকে উত্তরণ করবেনই।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেই আশার আলো

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা মানুষের মাঝে মনোবল তৈরি হয়। সে আশায় বুক বাঁধে। উৎসাহিত হয় এবং বলে, আমি অমুক কাজটা করতে পারব। আমার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন। এই আশার ওপর ভর করেই দুনিয়া টিকে আছে। যারা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে, তাদের মাঝে ভয়ভীতি, আতঙ্ক ও গ্লানি কাজ করে। তারা অল্পতেই ভয়ার্ত হয়ে যায়। কোনো কিছুরই পরোয়া করে না। শরীয়ত এমন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে নিষেধ করেছে। কারণ, এই নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা মানুষকে হতাশ করে দেয়। আর শরীয়ত হতাশাকে কাফেরদের রীতি বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

কাফের সম্প্রদায় ছাড়া কেউ আল্লাহ থেকে নিরাশ হয় না।[১২৯]

তাই মুমিন সব সময়ই মনোবলসম্পন্ন হওয়া চাই। আমরা যখন দৃঢ় মনোবল নিয়ে জীবনযাপন শুরু করব, তখন আল্লাহ আমাদের সকল পথ খুলে দেবেন। হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে–

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

'আমার বান্দার সাথে আমি তার ধারণামাফিক আচরণ করে থাকি।'

---

১২৯. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৭

বান্দা যদি আল্লাহর ব্যাপারে উত্তম ও কল্যাণের ধারণা রাখে, আল্লাহ তার সাথে উত্তম ও কল্যাণকর ব্যবহার করবেন। আর যদি বান্দা আল্লাহর প্রতি বদধারণা পোষণ করে, তবে আল্লাহ তার সাথে তেমন ব্যবহারই করবেন। তার সাথে কঠিন ব্যবহার করবেন। তাই ধারণা ও ভাবনাটা ভালো থাকা উচিত।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা শত্রুকে জয় করা যায়

বাইবেলে একটি ঘটনা আছে। তালুত (আ.) আল্লাহর পয়গম্বর ছিলেন। ঘটনাটির ইঙ্গিত কুরআনুল কারীমেও বিদ্যমান আছে। তবে বাইবেলের মধ্যে ঘটনাটার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে যে, তালুতের সাথে জালুতের মোকাবেলা হলো। জালুত অত্যন্ত উদ্ধত ও দাম্ভিক ছিল। যুদ্ধংদেহী অবস্থা সব সময় তার মাঝে বিরাজ করত। লোকটা প্রচণ্ড প্রতাপশালী ও জালেম ছিল। তালুত (আ.) তার মোকাবেলা করতে এলেন। সামান্য কিছু সৈন্য ছিল তালুতের সাথে। জালুতের সাথে ছিল বিশাল বাহিনী। তালুত বৃদ্ধ ও দুর্বল ছিল।

মানুষের বয়স যেমন হয়, তার কার্যক্রমও তেমনই হয়। তালুত (আ.) যখন জালুতকে দেখলেন, তখন তিনি জালুতের দাম্ভিকতা ও উদ্ধত রূপ বুঝে ফেললেন। বাইবেলের ভাষা এই যে, জালুতকে দেখেই তালুত (আ.) বললেন,

It is very difficult to kill him, because he is very big.

দৈহিক দিক থেকে জালুত তো অনেক বড়। ওকে মারা ও ঘায়েল করা মুশকিল হবে।

ওই সময় তালুতের সাথে এক নওজোয়ান ছিল। নাম তাঁর দাউদ (আ.)। হযরত দাউদ (আ.) জালুতকে দেখে মুচকি হেসে বললেন,

It is very easy to kill him, because he is very big. I will never miss him.

এর দেহটা বড় আছে; একে মারা সহজ হবে। আমার নিশান লক্ষচ্যুৎ হবে না।

বাস্তবেও তা-ই হলো। হযরত দাউদ (আ.) তার গায়ে একটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। সেটা জালুতের মাথায় গিয়ে আঘাত হানল। সেখানেই সে মরে গেল। এভাবেই তালুত (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করেছেন। সত্যি বলতে কী, যে লোকদের মাঝে আত্মবিশ্বাস থাকে, দৃঢ়

মনোবল থাকে এবং যারা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, আল্লাহ তাদের জন্য পথ খুলে দেন। কঠিন কাজ তাদের জন্য সহজ করে দেন।

ক্ষতিকে লাভে পরিণত করার ক্ষমতা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার লোকসানকে লাভে পরিণত করার এক অপার ক্ষমতা দান করেছেন। যেকোনো মানুষই তার ইচ্ছেশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা দ্বারা ক্ষতি ও লোকসান থেকে বেঁচে যেতে পারে। আমাদের মধ্যে কেউ যদি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির লোক থেকে থাকি, তাহলে আমরা দ্রুত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে ফেলি। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনযাপনে সচেষ্ট হই। এর বরকত সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করতে পারব আমরা।

হৃদয় জগতে বিপ্লব

হযরত গঞ্জেবখশ নামে লাহোরের অনেক বড় একজন বুযুর্গ অতীত হয়েছেন। তার উসিলাতেই সেই এলাকাতে আজ দীন আগমন করেছে। তার আসল নাম ছিল আলী হাজবিরি। তাঁর ব্যাপারে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরি (রহ.) বলেছেন,

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل کاملا را راہ نماں

হযরত গাঞ্জেবখশ তো ছিলেন সারা জাহানের বরকত। তিনি ছিলেন আল্লাহর নূরপ্রাপ্ত বান্দা।

শত অযোগ্য লোকদেরও তিনি কামেল বুযুর্গ বানিয়ে দিতেন।

অত্যন্ত উঁচু মাকাম ও রূহানিয়াত আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন। একবার হযরত আলী হাজবিরি একটি দরিয়া পার হবেন। সিন্দু নামক দরিয়া পার হতে অন্তত এক বা পৌনে এক ঘন্টা সময় লেগে যাবে। তখন তো নৌকা পালের সাহায্যে চলত। ইঞ্জিন ছিল না। পানির স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে নদী পার হতে হতো।

তো হযরত নৌকায় বসলেন। সফর শুরু করলেন। বাতাস তীব্র বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। তার মাথায় টুপি ছিল। বাতাসে যেন টুপি পড়ে না যায় তাই তিনি টুপিটি খুলে পকেটে নিয়ে নিলেন। যিকির ও মোরাকাবায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

তার মাথা মুণ্ডনকৃত ছিল। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল মুণ্ডিত মাথাটা। হযরতের এই মাথায় একটি বাচ্চা এসে হাত বোলাল। সে এমন মসৃন মাথা দেখে দ্রুত তার বন্ধু-বান্ধবদের বলে দিল। বাচ্চারা সবাই এসে তার মসৃন মাথায় হাত বোলাতে লাগল। শেষে একটা বাচ্চা এসে হাত বুলিয়ে একটি টোকা দিল। সব বাচ্চা এটা দেখে হেসে দিল। আল্লাহর এই বান্দা তো যিকির ও গভীর মোরাকাবায় মগ্ন। তিনি উপলব্ধিই করতে পারলেন না, বাচ্চারা কী করছে!

অন্য একটি বাচ্চা এবার একটা থাপ্পড় মারল হযরতের মাথায়। নৌকার অন্য যাত্রীরা বাচ্চাদের এই বদমায়েশি দেখে হাসতে লাগল। এবার এটা এক বিরূপ আকার ধারণ করল। বাচ্চারা আসে আর হযরতের মাথায় থাপ্পড় মেরে চলে যায়। সারা নৌকার লোকেরা এটা দেখে হাসতে থাকে। একটা হাসির পাত্র বানানো হলো হযরতকে।

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দার সাথে এমন আচরণ সহ্য করতে পারলেন না। হাদীছে কুদসীতে এরূপ একটি হাদীছও পাওয়া যায়–

مَنْ عَادَىٰ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

যে-ব্যক্তি আমার ওলীর সাথে দুশমনি করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি।

তো আল্লাহ তাদের এসব আচরণ সহ্য করতে পারলেন না। গঞ্জেবখশ (রহ.)-এর অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ইলহাম করলেন, হে আমার প্রিয় বান্দা! এসব লোক তোমার সাথে বেয়াদবি করছে, তোমাকে অসম্মান করছে। তোমার এত ধৈর্য যে,তুমি সব সহ্য করছ। তুমি যদি বদদু'আ কর, তাহলে পুরো নৌকাই আমি উল্টিয়ে দেব।

বর্ণিত আছে, এই ইলহামের সাথে-সাথে হযরত দ্রুত হাত তুললেন এবং আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি উল্টাতেই চান, তাহলে তাদের হৃদয় নামক নৌকাটি উল্টিয়ে দিন। তাদের দিল সুন্দর ও শুদ্ধ করে দিন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করে নিলেন। বর্ণিত আছে, সেই নৌকায় যতজন নারী-পুরুষ সেদিন ছিল, মৃত্যুর পূর্বে সকলকেই আল্লাহ নিজের ওলী বানিয়ে নিয়েছেন।

একে বলে নৈতিকতা। একে বলে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। একে বলে সুশীল, উদার মন-মননের ব্যক্তিত্ব। আল্লাহওয়ালাগণ এমনই হয়ে থাকেন।

বড় কষ্ট ও দুঃভারাক্রান্ত অবস্থায়ও তাঁরা বদদু'আ করেন না। নেক দু'আ করেন।

নাবীয়ে রহমতের রহমতসূলভ দৃষ্টিভঙ্গি

মানবতার ইতিহাসে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শিক রূপরেখার ক্ষেত্রে এবং সুউচ্চ মন-মানসিকতা, রুচিবোধ ও মন-মননের দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজি তায়েফে গমন করেছেন দাওয়াত দিতে। সেখানে নবীজির সাথে তায়েফবাসী কী আচরণ করেছে সেই ইতিহাস আপনারা ভালো করেই জানেন। আহত, রক্তাক্ত ও পিপাসার্ত নবীজি উতবা ও শাইবার আঙ্গুর বাগানে এসে বসে পড়লেন। সেই ব্যথাতুর অবস্থাতেও প্রিয় নবীজি দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْا ضُعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَدَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ!
اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّيْ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِيْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ
اَمْرِيْ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا اُبَالِيْ وَلٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ اَوْسَعُ لِيْ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ
الَّذِيْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ اَوْ
يَحُلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ لَكَ الْعُقْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ

'হে আল্লাহ! তোমার দরবারে আমি আমার দুর্বলতা ও অক্ষমতা স্বীকার করছি। আমি লোকদের মাঝে অপদস্ত ও অপমানিত হয়েছি। হে আরহামুর রাহিমীন! আপনিই তো দুর্বলদের রব। আপনিই তো আমার পরোয়ারদেগার। আপনি আমাকে কার হাওলা করে দেবেন? কোনো অপরিচিত মানুষের, যে আমাকে দেখলে শঙ্কিত হয়ে যায়, মুখ বিবর্ণ করে? নাকি কোনো দুশমনের, যাকে আপনি আমার ওপর শক্তিধর করে দিয়েছেন? হে আল্লাহ! আপনি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন, তাহলে কারও দিকে কোনো পরোয়া আমার নেই। আপনার হেফাযতই আমার জন্য যথেষ্ট।

আপনার কুদরতি চেহারার যে নূর দ্বারা পৃথিবী আলোকিত, সকল অন্ধকার আলোকোজ্জ্বল। যে নূরের বরকতে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবি আসবে, সেই নূরের বরকতে পানাহ চাচ্ছি, যেন আপনি আমার ওপর রাগ না করেন। আপনি আমার ওপর ক্ষুব্ধ না হন।

আপনার অসন্তোষ সে সময় পর্যন্ত দূর করা জরুরি, যে পর্যন্ত আপনি সন্তুষ্ট না হবেন। আপনি ছাড়া কোনো শক্তি নেই কোনো ক্ষমতাও নেই।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করছিলেন, তখন জিবরাঈল (আ.) পাহাড় নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা মিকাঈল (আ.)কে সঙ্গে করে নবীজির সামনে আগমন করলেন। জিবরাঈল বললেন, হযরত! আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে যারা আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, তাদের শেষ করে দেব, এই দুই পাহাড়কে মিলিয়ে দেব। পুরো জনপদকে দুই পাহাড়ের মাঝখানে রেখে ধ্বংস করে দেব। এমন আচরণ করার পরও তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নষ্ট হয়ে গেছে।

আহ! এমন প্রস্তাব শুনেও প্রতিশোধের এমন সুন্দর সুযোগ পেয়েও নবীয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না জিবরাঈল, না আমি এমনটা চাই না। জিবরাঈল বললেন, কেন হযরত? নবীজি বললেন, দেখো, এই লোকেরা আমাকে চিনল না ঠিক। কিন্তু আমি আশা রাখি আল্লাহ তাদের বংশধর থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা আমাকে চিনবে। আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।

দেখুন, সব কিছু কুরবান হোক নবীজির এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। এই সুন্দর সিদ্ধান্তের ওপর কত বড় মহান তিনি।

جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپالے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے

اسے اور کیا نام دے گا زمان ہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے

'দুশমনের হাতে কষ্ট পেয়েও যিনি মাফ করে দেন। দুশমনের আঘাত খেয়েও যিনি দু'আ করে দেন। যামানা তাকে কোন নামে ডাকবে? তাকে রহমতওয়ালা না ডেকে আর কোন নামে অভিহিত করবে?

আল্লাহ তা'আলা নবীয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীনের সামান্য কিছু ছিটে হলেও আমাদের দান করুন। আমাদের মাঝেও নীতি-নৈতিকতা এবং সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি দান করেন। সকলকে ইতিবাচক মনোভাব দান করেন। আমাদের জীবনও এতে কামিয়াব হয়ে যাবে।

سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں

سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں

সালাম ওই মহান সত্তার প্রতি, যিনি রক্তপিপাসুদের ক্ষমা করে দেন।
সালাম সেই মহান সত্তার প্রতি, যিনি গালি শুনেও দু'আ করেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

নবীজির আদর্শই সর্বোত্তম জীবনরীতি

'পৃথিবীর যে-কাজটি প্রিয়নবী যে-পদ্ধতিতে সম্পাদন করেছেন, সেই কাজটি সম্পাদনের জন্য পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম আর কোনো পদ্ধতি নেই। এটি আমাদের একটি সুদৃঢ় দাবি। আমরা এ-দাবি এমনভাবে করতে পারি, যেমন কোনো এক গণিতবিশেষজ্ঞকে যদি প্রশ্ন করা হয়, দুই দুগুণে কত? সাথে-সাথে সে দৃঢ়তার সাথে উত্তর দেবে, চার। সে তার এই উত্তরের ওপর এত অটল যে, সে বলবে উক্ত প্রশ্নের এছাড়া আর কোনো উত্তর নেই, হতে পারে না। এমন দৃঢ়তার সাথেই আমরা দাবিটা করতে পারি এবং করিও। আমরা দাবি করতে পারি, প্রিয়নবী দুনিয়ার যে-কাজটি যেভাবে করতে বলেছেন, সেভাবে সম্পাদন করার চেয়ে উত্তম কোনো পন্থা এই পৃথিবীতে নেই।'

নবীজির আদর্শই সর্বোত্তম জীবনরীতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ۔

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ۔

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا۔

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

গুণকীর্তনকারীর দলে নাম লেখানোর তামান্না

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, সমগ্র মানবসভ্যতার পথপ্রদর্শক রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমগ্র জীবন আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ। মানবজাতি যদি ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য পেয়ে ধন্য হতে চায়, তাহলে তাদের জন্য আবশ্যিকভাবে উচিত হচ্ছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতুলনীয় চরিত্রমাধুরি, স্বভাব ও চালচলন এমনভাবে বাস্তবায়ন করা, যেন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপ প্রিয়তম নবীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মোতাবেক গঠিত হয়ে যায়। নবীর জীবন সবচেয়ে বেশি পূর্ণাঙ্গ। কোনো সফল জীবনের অধিকারী ব্যক্তি নবীজীবনের মতো পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করতে পারেনি।

এই উম্মাহর হাজারো আলেম সীরাত বিষয়ে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। নবীজির জীবনের প্রতিটি প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গকে একেবারে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন তাঁরা। সকলেই নবীজির গুণকীর্তনকারীর

তালিকায় নাম লিখিয়ে নিয়েছেন। আমিও এই তালিকায় নাম লেখাতে চাই। হৃদয়টা চায় নবীজির জীবনের প্রতিটি বিষয়কে এমন উন্মুক্তভাবে খুলে-খুলে বর্ণনা করতে, যেন বিশ্বমানবতা এই আধুনিককালে পথের দিশা পায়, যেন পথচলার পাথেয় পায়।

مرا قائد ہے وہ، زندگی پیغام تھا جس کا
محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا
وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کردی
کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام تھا جس کا

তিনি আমার সরদার এবং আমার নেতা, জিন্দেগির শাশ্বত পয়গাম নিয়ে যিনি আগমন করেছেন।

তিনি মুহাম্মদ। তাঁর কাজই মহব্বত।

চলতে-চলতে তিনি গোটা জাতিকে গন্তব্য দান করেছেন। পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতা থেকেই তার সূচনা ও প্রারম্ভ। আর শেষ পরিণাম পুষ্পিত সাফল্য।

বিশ্বসেরা ব্যক্তিদের অপূর্ণ জীবন

আমরা যখন বিশ্ব ইতিহাসের প্রতি তাকাই, তখন বুঝতে পারি, পৃথিবীতে যত খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে, তাদের মাঝে কতক আছেন বিশ্ববিজয়ী, কতক আছেন বিজ্ঞানী, কতক আছেন আবিষ্কারক। আরও কত প্রকার সফল মানুষ আছেন। কিন্তু প্রত্যেকের বেলায় এই বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, প্রত্যেকের মৃত্যুর পরেই তার ব্যাপারে মানুষ বলেছে, অমুক তো ভালো সাফল্যই লাভ করেছিল। যদি আরও কটা দিন বেঁচে থাকত, তাহলে আরও কিছু সাফল্য সে দেখতে পারত। হয় তারা নিজেরাই নিজেদের জবানে এর সাক্ষ্য দিচ্ছে কিংবা মানুষ তার সত্যায়ন করছে। যেমন দেখুন–

নিউটন বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে কত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং নানাবিধ থিওরি আবিষ্কার করেছেন। তবু মানুষ তার মৃত্যুর পর বলেছে, ইস! যদি নিউটন আর কিছুদিন হায়াত পেতেন, তাহলে আরও জরুরি কিছু জিনিস তিনি জাতিকে উপহার দিতে পারতেন।

আইনইস্টাইনের নাম আপনারা শুনে থাকবেন। বিজ্ঞানের জগতে আজও ইউরোপ তাকে এমন সম্মান ও মর্যাদা দান করে, দীনের ব্যাপারে আমরা

গয়গম্বরগণকে যেমন সম্মান ও মর্যাদা দান করি। কত গুরুত্বপূর্ণ থিওরি তিনি জাতির সামনে পেশ করেছেন। সেই থিওরির ওপর ভর করে মানুষ এত-এত নব্য বিষয় আবিষ্কার করেছে যে, আজ তারা চাঁদের দেশে পর্যন্ত গিয়েছে এবং সেখানে পা রাখতে সক্ষম হয়েছে। তার ব্যাপারেও তো লোকেরা বলেছে, তার জীবনটা যদি আরেকটু দীর্ঘ হতো. আরেকটু হায়াত যদি তিনি পেতেন, তাহলে তার সামনে জ্ঞানের আরও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতো।

আমি সমরকন্দের বাদশাহ তৈমুর লংয়ের মাজার দেখেছি। লোকেরা তাঁর জীবনচরিতের মধ্যে তাকে বিশ্ববিজেতা বলে অভিহিত করেছে। বিশ্ব তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে বিজয়ী রূপে চিনত। তাঁর ব্যাপারেও সেই একই কথা লিখিত হয়েছে– এই দেশ তিনি বিজয় করেছেন। যদি তিনি আরও সুযোগ পেতেন, তাহলে বীরত্বের ঝলক আরও প্রদর্শন করতে পারতেন।

সেক্সপিয়রের জীবনী অধ্যয়ন করে দেখুন। তিনি তাঁর মাতৃভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। কিন্তু লোকেরা তার ব্যাপারেও বলেছে, ইস! তিনি সুযোগ পাননি। তিনি তো আরও উন্নত ও সাহিত্যমানসম্পন্ন বই লিখতে পারতেন।

মোটকথা, যত বড়-বড় কীর্তিমান পুরুষ ও মহাপুরুষই থাকুন না কেন, সবার ব্যাপারে সেই একই বক্তব্য মানুষ প্রদান করবে। সবারই ব্যাপারে বলবে, তিনি আরও সুযোগ প্রাপ্ত হলে আরও উন্নততর বিষয় জাতিকে উপহার দিতে পারতেন। সবার কাজই যেন অপূর্ণাঙ্গ। অন্যরা-ই বুঝে নিয়েছে যে, লোকটি তার কাজ পূর্ণ করে যেতে পারেননি। সেই সুযোগ তিনি পাননি।

মানবতার ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন

সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এমন একজন মহান পুরুষ আছেন, যিনি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার জ্ঞানী-গুণি এবং সুস্থ বোধ ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সামনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে লোকসকল! আমি যে-উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য প্রেরিত হয়েছি, আমি কি আমার সেই দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করতে পেরেছি? তখন উত্তরে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহান ব্যক্তিবর্গ সমস্বরে উত্তর দিয়েছেন, হে আল্লাহর রাসূল! হে প্রিয় হাবীব! অবশ্যই অবশ্যই আপনি আপনার দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করেছেন। আপনি পূর্ণভাবেই আল্লাহর পয়গাম আমাদের মাঝে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। জানা গেল, মাবতার ইতিহাসে এমন একজনমাত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান আছেন, যিনি তাঁর জীবনকে পূর্ণাঙ্গতা দান করতে সক্ষম হয়েছেন।

সেকথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন এবং লোকেরাও তাকে সত্যায়ন ও সমর্থন দিয়েছে। তাই আজ আবশ্যক হচ্ছে, সেই প্রিয়তম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শমতো নিজের জীবনকে পরিচালনা করা এবং লোকদেরও সেমতে পরিচালিত করা। অপূর্ণাঙ্গ জীবনের অধিকারী লোকদের অপূর্ণ আদর্শের পেছনে ছোটাছুটি না করে যাঁর জীবন পূর্ণতা পেয়েছে, তাঁর জীবনমতোই আমাদের জীবনটা সজ্জিত করা উচিত। এতেই রয়েছে উম্মাহর শাশ্বত কল্যাণ ও সাফল্য এবং রয়েছে অনাবিল সমৃদ্ধ জীবনের সন্ধান। এতেই রয়েছে সমগ্র মানবসভ্যতার পথনির্দেশ। সর্ব দিক থেকে প্রিয়তম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন সফল, কর্মময়, বর্ণাঢ্য এবং পূর্ণাঙ্গ।

নতুন আঙ্গিকে সীরাতে নববীর অধ্যয়ন

সীরাত স্টাডি সেন্টারে অনেক বড়-বড় প্রথিতজশা ও বিদগ্ধ আলেম আগমন করেন। বড় চমকপ্রদ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা তাঁরা উপস্থাপন করেন। আমি তো একজন তালিবুল ইল্‌মমাত্র। সীরাতের ময়দানে আমি তো এখনও একজন অন্বেষক স্টুডেন্ট।

বলা যায় প্রাথমিক পর্যায়ের স্টুডেন্ট। এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। ঘরে-ঘরে এখন কম্পিউটার এসে গেছে। ছোট-ছোট শিশুরাও এখন কম্পিউটারে বসে কাজ করছে। স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইন্টারন্যাশনাল টেকনোলজির মহাকাল এখন। বিজ্ঞান ও সাইন্সের প্রভাবে মানুষের ধ্যান-ধারণাই বদলে গেছে। সকলেই প্রত্যেকটি বিষয়কেই সাইন্স ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যাচাই করতে চায়।

আজ নবীজির জীবন ও তার জিন্দেগির সকল কর্মকান্ডকে বিজ্ঞান দিয়ে মাপা হচ্ছে–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ

যাদের বুকে হৃদয় আছে, তাদের জন্য এর মাঝে আছে উপদেশ।[১৩০]

আর যারা হৃদয়হীন, যারা বক্রতায় আচ্ছন্ন, তাদের কোনো উপকার হবে না এই কুরআন দিয়ে, নববী এই জীবন দিয়ে। নবীজির জীবন ধারণ ও গ্রহণ করবার মানসে যদি সীরাত শোনা হয়, নবীজির জীবনের আঙ্গিকে জীবন

---

১৩০. সূরা কাফ : আয়াত ৩৭

পরিচালনা করা হবে এই ইচ্ছে নিয়ে যদি সীরাত শ্রবণ ও অধ্যয়ন করা হয়, তবে ইনশাআল্লাহ সীরাতের আলোচনা আপনাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে। সাইন্সের স্টুডেন্টদের উপকার হবে। শিক্ষিত সমাজও এর দ্বারা ফায়দা পাবে।

মুহতারাম হাজিরীন! বিজ্ঞানের আলোকে সুন্নাহর যৌক্তিকতাশীর্ষক আলোচনা এই বিষয়বস্তু নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পি.এইচ.ডি নিতে পারে। এ নিয়েই আলাদা স্টাডি হওয়া উচিত।

সুন্নাতে নববীর দুই শাখা

সুন্নাতের নববী বিষয়টি দুটি দিক থেকে বিবেচ্য ও আলোচ্য বিষয়।

১. যে-ব্যক্তিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সুন্নাহের ওপর আমল করবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জীবনে নেমে আসবে অবারিত বরকত ও কল্যাণ। ইহকালেও সে সফল হবে, পরকালেও সে সফল হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল, সে এক মহা সাফল্য অর্জন করল।[১৩১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক তরিকামতো জীবন যাপন করা নবীজির আখলাক ও চরিত্রকে অনুসরণ করা এবং নবীজির অভ্যাসগুলোকে নিজেদের অভ্যাস বানানোকেই বলা হয় সুন্নাতের অনুসরণ। চাই সেই অনুসরণ ইবাদতের মধ্যে হোক, লেনদেন, কথাবার্তা ও চালচলনের মধ্যে হোক অথবা চাই আমাদের সামাজিক জীবনের মধ্যে হোক বা ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে হোক। আমাদের জীবনের সর্বত্রই যদি আমরা সুন্নাহকে বাস্তবায়ন করতে পারি, তবেই আমরা সফল হব, তবেই আমরা নাজাত পাব।

মোটকথা, সুন্নাহর একটি দিক তো এই যে, সুন্নাতের ওপর আমল করা হলে দুনিয়ায়ও শান্তি-শৃঙ্খলা আসবে এবং আখেরাতেও সফলতা আসবে। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ পাওয়া যাবে। কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ তা'আলার মকবুল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তাকে জান্নাত দেবেন।

---

১৩১. সূরা আহযাব : আয়াত ৭১

এগুলো শত ভাগ সত্য ও শাশ্বত কথা। এসব বিষয়ে আলোচনা আপনারা আরও বহুবার শুনেছেন। এখন আমার আলোচ্য বিষয় সেটি নয়। আমি ভিন্ন একটি অবস্থান থেকে আলোচনা করতে চাচ্ছি। সুন্নাতে নববীকে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে আলোকপাত করতে চাই।

২. সম্মানিত সুধী! আমার আজকের আলোচ্যবিষয় একটি ভিন্ন দিক। দিকটি এই যে, পৃথিবীর যে-কাজটি প্রিয়নবী যে-পদ্ধতিতে সম্পাদন করেছেন, সেই কাজটি সম্পাদনের জন্য পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম আর কোনো পদ্ধতি নেই। এটি আমাদের একটি সুদৃঢ় দাবি। আমরা এ-দাবি এমনভাবে করতে পারি, যেমন কোনো এক গণিতবিশেষজ্ঞকে যদি প্রশ্ন করা হয়, দুই দুগুণে কত? সাথে-সাথে সে দৃঢ়তা নিয়ে উত্তর দেবে চার। সে তার এই উত্তরের ওপর এত অটল যে, সে বলবে উক্ত প্রশ্নের এছাড়া আর কোনো উত্তর নেই, হতে পারে না। এমন দৃঢ়তার সাথেই আমরা দাবিটা করতে পারি এবং করিও। আমরা দাবি করতে পারি, প্রিয়নবী দুনিয়ার যে-কাজটি যেভাবে করতে বলেছেন, কাজটি সম্পাদন করার তার থেকে উত্তম কোনো পন্থা নেই।

তো ঠিক এমন দৃঢ়তার সাথেই আমরাও দাবিটা করতে পারি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে যে-কাজটি যেভাবে করতে বলেছেন, কাজটি সম্পাদন করার জন্য তার থেকে উত্তম কোনো পন্থা নেই। আমরা অত্যন্ত দৃঢ় পদে অবস্থান করেই এই দাবি উস্থাপন করতে পারি। আমাদের দাবির ক্ষেত্রে কেউ আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। আসুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান থেকে আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। একটি দৃষ্টান্তের দিকে তাকানো যাক।

শয়ন করার সম্ভব্য অবস্থা চারটি

প্রতি দিনই মানুষ ঘুমায়। আসুন, দেখে নিই, শয়ন করার কোন পদ্ধতিটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তম।

দেখুন, শয়ন করার কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। এর সম্ভাব্য অবস্থা চারটি হতে পারে–

১. মানুষ চিত হয়ে শয়ন করে।
২. উপুড় হয়েও হয়তো শয়ন করে।
৩. বাম কাতে শয়ন করতে পারে।
৪. ডান কাতেও শয়ন করে থাকে।

১. চিত হয়ে শয়ন করা : প্রথমত মানুষ হয়তো চিত হয়ে শয়ন করবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কারণ, মানবদেহের মেরুদণ্ডের হাড় একেবারে সোজা নয়। একটু বাঁকা। এক দিক অন্য দিকের তুলনায় সরু। মানবের উদরের একটি ওজন আছে। এর কারণে মেরুদণ্ডের কিছু অংশে ভার বেশি হয়। আর সে-কারণেই এস্থানে হাড়টিকে এমন করে দিলেন যে, এটি সহজেই পেটের ভার বহন করতে পারে। বোঝা বহনের সুবিধার্থে আল্লাহ তা'আলা হাড়টি বেশি মজবুত করে বানিয়েছেন আমাদের পিঠ যে অংশে। সেই অংশ হয়ে হাড়টি ধনুকাকৃতির হয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে। আপনি কোমরে হাত দিয়ে বিষয়টি উপলব্ধিও করতে পারবেন।

যখন মানুষ চিত হয়ে শয়ন করে, তখন তির্যক ভাঁজটি আর থাকে না বা বাঁকা হয়ে থাকা হাড়টি সোজাসুজি অবস্থানে চলে আসে। বরং বক্র আকৃতিটি ওপরের দিকে হয়ে যায়। এই বক্রের ওপরই মানুষের পেটের ওজন নির্ভর করে। তখন মানুষের পুরো ভার ও ওজন এই হাড়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর এটি তো বিজ্ঞানেরই নীতি যে, যদি কোনো বাঁকা জিনিসের ওপর ভারী কোনো বস্তুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেই বাঁকা জিনিসটা সোজা হওয়ার উপক্রম হয় বা সোজা হয়ে যায়। তো তেমনিভাবে চিত হয়ে শয়ন করলে মানুষটির পুরো ওজন গিয়ে মেরুদণ্ডের এই বাঁকা হাড়টির ওপর ভর করে। হাড়টিকে সোজা করে দিতে চায়। এমতাবস্থায় ফল দাঁড়া– ঘাড়ের অংশটি উত্থিত হয়ে থাকে। গর্দানের নিচের অংশে ব্যথা শুরু হয়ে যায়।

বাম কোমরের নিচের অংশটি চেপে যায় এবং এই অংশটিতে ব্যথা শুরু হয়ে যায়।

কোমরের ব্যথা কী? এই যে শরীর চাপা পড়ল হাড়টির ওপর। হাড়টির কিছু-কিছু গিট অন্য গিটের সাথে ঘর্ষিত হয়। এর গোশত চেপে যায়। ফলে কোমরে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। তো চিকিৎসাবিজ্ঞান তথ্য দিচ্ছে, সারাটা রাত শরীরের ভার মেরুদণ্ডের হাড়ে পতিত হয়েছে। আর এর ফলে উঁচু বা নিচুতে এসে এই হাড়টি চাপের মধ্যে ছিল। ফলে হয় গর্দান ও তার থেকে একটু নিচের দিকটা ব্যথাতুর হয়ে যায় অথবা কোমর ও তার নিচের দিকটা ব্যথাতুর হয়ে যায়। বোঝা গেল, এভাবে শয়ন করা মানবপ্রকৃতির বিপরীত। আর তা মানবের জন্য ক্ষতিকর শয়নপদ্ধতি।

২. উপুড় হয়ে শয়ন : দ্বিতীয়ত, যেভাবে শয়ন করা যায়, তা হচ্ছে উপড় হয়ে শয়ন করা। শয়নের এই পদ্ধতিটিও চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যের

জন্য ক্ষতিকর। কারণ, মানবের উদরে রয়েছে অন্ত্রনালি। এই অন্ত্রনালি ও পাকস্থলি থেকে মানবদেহে ভিটামিন ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। আঁতগুলো ডানে ও বামে থাকে। খাদ্য গিয়ে সেগুলোতে জমা হয়। প্রত্যেকটা আঁত চিকন চর্বির মাধ্যমে অন্যটির সাথে সংযুক্ত থাকে। আপনারা ছাগল-গরু জবাইকৃত অবস্থায় দেখেছেন নিশ্চয়। সেগুলোর নাড়িভুঁড়ি একটার সাথে আরেকটা কীভাবে সংযুক্ত তাও হয় তো দেখেছেন। দেখবেন, আঁতগুলো অত্যন্ত পাতলা চর্বির আবরণ দ্বারা একটার সাথে আরেকটা সংযুক্ত। মানুষ যখন উল্টো হয়ে শয়ন করে পেটের ওপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শোয়, তখন আঁতগুলোও উপুর হয়ে ঝুলে থাকে। তার নির্দিষ্ট পজিশন থেকে সরে যায়। আঁতেরও তো একটা ওজন আছে। সংযুক্তিকরণের চর্বি যদি কোনো স্থানে অতি পাতলা থাকে, তাহলে আঁত ঝুলন্ত থাকতে গিয়ে নিচে চলে আসার সম্ভাবনা রয়ে যায়। একটির সাথে আরেকটি জড়িয়ে বা প্যাঁচিয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

হাদীছেও বর্ণিত হয়েছে, উপুড় হয়ে শয়ন করো না। এভাবে উল্টো হয়ে শয়ন করার কারণে আঁতের মধ্যে গিট লেগে যেতে পারে। আল্লাহ না করুন, কখনও যদি গিরা পড়ে যায়, তাহলে তো বড় ধরনের অপারেশন করানো আবশ্যক হয়ে যাবে।

ডাক্তারগণও অধুনা এই তথ্য দিয়েছেন যে, উল্টো শয়নের কারণে আঁতে গিট লেগে গেছে এমন রোগীও আমাদের কাছে আসে। এদের অপারেশন করতে হয়। শতের মধ্যে একজনও যদি এই সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলেই তো বলা যাবে উল্টো শয়ন করার ক্ষতিকর দিক আছে। উপুড় হয়ে শয়ন করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এতে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. বাম কাতে শয়ন : শয়ন করার তৃতীয় ধরনটি হচ্ছে বাম কাতে শয়ন করা। মানুষ বাম কাতে শয়ন করলে তার হৃৎপিণ্ডটা নিচে পড়ে যায়। আর সারা দেহ ও তার ভার হৃৎপিণ্ডের ওপর থাকে। কারণ, মানবের হৃৎপিণ্ড তার দেহের বাম পাশে এবং বুকের বাম দিকে থাকে। বাম কাত হয়ে শয়ন করলে হৃৎপিণ্ড নিচে পড়ে যায় আর সারা দেহ তার ওপরে চলে আসে। হৃৎপিণ্ডের ওপর তখন চাপ পড়ে। সারাটা রাত এভাবে থাকলে সারাটা রাত নিচে থেকেই হৃৎপিণ্ডটা পাম্প করতে হয়, স্পন্দিত হতে হয়। এভাবে শয়ন করলে দু-প্রকার ক্ষতি হয়।

১. মানুষের অন্তর যেহেতু তখন চাপা পড়ে থাকে, তাই ঘুম তখন তার এমন আকার ধারণ করে যে, সহজে জাগিয়ে তোলা যায় না। তার হৃৎপিণ্ডের

গভীরে ডাক পৌঁছাতে তখন সময় লাগে। নামাযের জন্য ডাকলে সামান্য উ করেই আবার ঘুমিয়ে পড়ে। জাগ্রত হতে সময় লাগে। আপনি তাকে জাগিয়ে গেলেও সে বলবে, তুমি তো জাগাওনি আমাকে। এমন অবস্থার ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ তার মেধা, ব্রেন কোনো কাজ করে না। সে হুঁশ ফিরে পেতেও তখন সময় লাগে। মাথা একটা সময় পর্যন্ত স্থবির হয়ে থাকে। কাজ করে না। কিছুক্ষণ পর সে পূর্ণ চেতন ফিরে পায়। বাম কাতে শয়নের বড় ধরনের এক ক্ষতি এটা।

২. বাম কাতে শয়ন করলে বেশির ভাগই খারাপ ও ভয়ংকর স্বপ্ন দেখা যায়। কারণ, হৃৎপিণ্ডটা চাপের মধ্যে থাকার কারণে মনে হয় যেন কেউ তার টুটি চেপে ধরছে। কেউ তার ওপর ভারী জিনিস ফেলছে। হাতি বা মহিষ তার পিছু ধাওয়া করছে। কেউ যেন তাকে মেরে ফেলতে চাইছে। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ-হঠাৎ চমকে উঠতে দেখা যায়। বাম কাতে শয়নকারীরা খারাপ ও ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, সে বাম কাতে শুয়েছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানই তো বলে দিচ্ছে, বাম কাতে শয়ন করলে মানুষ খারাপ ও ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে। হৃৎপিণ্ড চাপে থাকে। বোঝা গেল, বাম কাতে শয়ন করাও মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয়।

৪. ডান কাতে শয়ন করার উপকারিতা : শয়ন করার সম্ভাব্য চতুর্থ ধরন হচ্ছে ডান কাধে শয়ন করা। এই পদ্ধতিতে শয়ন করলে পুরো দেহের ভার নিচে থাকে আর হৃৎপিণ্ড থাকে উপরে। ফলে কোনোরূপ চাপের নিচে থাকে না হৃৎপিণ্ড। পাম্প করতে সহজ হয় তখন। স্পন্দিত হতে পারে অনায়াসেই। এমন ঘুম মজাদার হয়। এমন ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মস্তিষ্ক স্থবির হয়ে থাকে না। জাগ্রত হওয়ার সাথে-সাথে পূর্ণ হুঁশ তার বিদ্যমান থাকে। এমন ঘুম থেকে জাগ্রত করলে সহজেই মানুষ জেগে যায়। কারণ, চাপা পড়ে থাকা হৃৎপিণ্ড নয় এটি। ফলে অল্পতেই আওয়াজ হৃৎপিণ্ডকে স্পর্শ করতে পারে। গাড়ির স্পিড কম হলে তাতে ভারী জিনিস রাখলে বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি বাম কাতে শয়ন করলে হৃৎপিণ্ডের চাপ থাকে বলে এটি ধীরগতিতে স্পন্দিত হয়। এখন সামান্য ভার পড়লেই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ডান কাতে শয়ন করলে এমন আশঙ্কা মোটেই থাকে না। এই হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত স্পর্শকাতর গোশতের টুকরা। এটি স্পন্দিত হওয়ার ফলেই সারা দেহে শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালিত থাকে। রক্তের সঞ্চালন কখনও বন্ধ হয়ে গেলে লোকটি মারা যাবে।

শয়ন করার উত্তম পদ্ধতি

ডান কাতে শয়ন করাই সবচেয়ে উত্তম। এভাবে শয়ন করলে তিনটি উপকার হয়।

১. এমন বান্দার ঘুম অঘোর হয় না। ঘুমের মধ্যে ভারসাম্য থাকে। ফলে ডাকলে সহজেই টের পাওয়া যায়। এলার্ম বেজে উঠলে সহজেই জাগ্রত হয়ে যায়।

২. এমন মানুষ ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে না।

৩. এমন পজিশনে ঘুমালে সামান্য ঘুমিয়েও বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। অল্প নিদ্রায়ও শরীর তাজদম হয়ে ওঠে। যেন অনেক ঘুমিয়েছে এমন আরামবোধ হয় শরীরে। এমন ঘুমে দশ মিনিটে দুই ঘন্টার ঘুমের স্বাদ পাওয়া যায়।

তাই আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের জন্যে শয়ন করার উত্তম ও উন্নত পদ্ধতি হচ্ছে ডান কাতে শয়ন করা। এটিই আমাদের প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক সুন্নাত। আজকে আধুনিক বিজ্ঞান সুদীর্ঘ ও গভীর গবেষণা করে একথাই সাব্যস্ত করেছে যে, নবীজির ওই সুন্নাতটিই সর্বোত্তম পদ্ধতি ঘুমের ক্ষেত্রে। আমরা দেখেছি, বিজ্ঞান যেখানেই কোনো সফলতার সন্ধান পেয়েছে, সেখানেই সফলতাটা ইসলামে পেয়েছে। যখনই সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে, সেখানেই নবীজির কদমের চিহ্ন দেখেই পেয়েছে। তাই বোঝা যায়, যে-কাজ নবী কারীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে-পদ্ধতিতে করেছেন, সেই কাজ সম্পাদন করার এর চেয়ে আর কোনো উত্তম পদ্ধতি নেই।

রৌদ্রস্নান ও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ

বছরকয়েক পূর্বে ইউরোপের লোকেরা মুসলমানদের উপহাস করে বলত, ছুটির দিনগুলো তোমরা ঘরে বসে কাটিয়ে দাও। আনন্দ ভ্রমণে সমুদ্রতীরে যাও না। সূর্যের আলোতে রৌদ্রস্নান কর না। কারণ, এর দ্বারা লোমকূপগুলো প্রসারিত হয়। তা ছাড়া আরও বহুবিদ উপকার এতে রয়েছে। মুসলমানরা বলে, আমরা এসব কাজ করি না। তারা বলে, আরে তোমরা তো সেকেলে স্টাইলের লোক। আধুনিক বিজ্ঞানের উপকার তোমরা কিছুই বোঝ না।

কিছু দিন পর পুরো বিশ্ব মিলে গবেষণা করল। বিষয়টা হলো, এত-এত রোগ কোথা থেকে সৃষ্টি হয়। সেই গবেষণা দ্বারা বোঝা গেল, গোটা বিশ্বের মধ্যে দ্রুত সংক্রমিত এবং অধিকহারে চর্মক্যান্সার রয়েছে ইউরোপে। এবার

তাদের পেরেশানি শুরু হলো। এখানে এমন করে চর্মক্যান্সার কেন সংক্রমিত হচ্ছে? আমাদের এখানে তো চর্মবিশেষজ্ঞ ডাক্তারও সহজে পাওয়া যায় না। সারা শহরে এমন ডাক্তার আছে দু-একজন। আর ইউরোপে তো পথে-পথেই এসবের ওপর পারদর্শী ডাক্তার রয়েছে। সেই ইউরোপের লোকেরা চিন্তিত হয়– আমাদের এ দেশে চর্মক্যান্সার এমনভাবে সংক্রমিত হচ্ছে কেন?

এ-বিষয়ে সুদীর্ঘ গবেষণার পর তারা অবগত হলো, এর কারণ রৌদ্রস্নান। যে-রোদ মানুষের দেহে সরাসরি পতিত হয়, তার মাঝে আলট্রা ওয়াল্ট রশ্মি থাকে। যখন সূর্যের আলোকধারা শরীরে পতিত হয়, তখন সেই পদার্থকে শরীর শুষে নেয়। এর কারণে শরীরের চামড়ার ভেতরে সূর্যকিরণ থেকে পতিত সেই পদার্থ ক্যান্সাররূপে প্রকাশিত হয়।

এই গবেষণা যখন সামনে এল, তখন ইউরোপের মানুষ রৌদ্রস্নান ছেড়ে দিল। এখন আবার কিছু কোম্পানি বলছে, আমরা একটা ক্যান্সার প্রতিরোধক শামিয়ানার ব্যবস্থা করেছি। এর নিচে এসে রৌদ্রস্নান করলে আর ক্যান্সারের আশঙ্কা থাকবে না। তাই এখন ডাক্তাররাও ঘোষণা দিয়েছে, যারা রৌদ্রস্নান করতে চাইবে, তারা ওই শামিয়নার নিচে গিয়ে রৌদ্রস্নান করবে।

এবার বলুন, প্রত্যেকের হাতে কি শামিয়ানা ধরিয়ে দেওয়া যাবে? প্রত্যেকের হাতে কি ছাতা ধরিয়ে দেওয়া যাবে? কত রকম ব্যবস্থাপনা নিয়ে এখন যেতে হবে সমুদ্র সৈকতে রৌদ্রস্নান করতে! খরচও এর কারণে বেশি পড়ে। নিজেকে রক্ষা করাও কঠিন হয়ে গেছে। এবার বুঝুন, রৌদ্রস্নানের ফায়দা কতটুকু আর ক্ষতি কতটুকু। এবার আমাদের কথা বলার পয়েন্ট দিয়ে দিলেন আল্লাহ তা'আলা। এখন আমরা বলতে পারি, সমুদ্রভ্রমণে রৌদ্রস্নান করতে যাই না দেখে তোমরা তো বহু উপহাস করতে আমাদের? এবার বোঝো। আধুনিক বিজ্ঞানই বলে দিচ্ছে, সমুদ্রতীরে রৌদ্রস্নান শেষ পর্যন্ত ক্ষতিকরই প্রমাণিত হলো।

আজ আমরাও তেমনি প্রথমে এদিক-ওদিক কত ছোটাছুটি করি। কত বাদ-মতবাদ ও গ্রহণ করি। পরিশেষে আবার ঠিকই ফিরে আসতে হয় মাহবুবে আলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে দুয়ারে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

যে-পানি সূর্যের তাপে গরম হয়েছে, তার দ্বারা তোমরা উজু করো না।

মানুষ আশ্চর্য হয়ে ভাবতে শুরু করেছে। আগুনে গরম হওয়া পানি দিয়ে উজু করা নিষেধ নয়। নবীজি এই পানি দিয়ে উজু করতে নিষেধ করেননি।

কিন্তু সূর্যের তাপে গরম হওয়া পানি দিয়ে উজু করতে নিষেধ করেছেন। কেন? মানবজ্ঞান এর কোনো সমাধান আবিষ্কার করতে পারে না। অথচ বাস্তব কথা হলো, সূর্যের তাপে গরম হওয়া পানিতে সূর্যের আলোকরশ্মি থেকে পতিত সেই আল্ট্রাওয়ালেট যার কারণে ক্যান্সার হয়, সেই পদার্থটাই এখানে সরাসরি পানিতে পতিত হয়। তাই মানুষ যদি এটা ব্যবহার করে, তাহলে ওই আলোকরশ্মি থেকে উৎসারিত প্রভাব মানুষের মাঝে স্পর্শ করে। এবার এই আধুনিক যুগে এসে স্পষ্ট হয়ে গেছে, কেন আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যের আলোয় উত্তপ্ত পানি দিয়ে উজু করতে নিষেধ করেছেন।

মেদ কমানোর বৈজ্ঞানিক পন্থা

নিউইয়র্কে আমার এক বন্ধু হার্টবিশেষজ্ঞ। একবার আমি তার অফিসে বসে আছি। সেখানে কিছু বিজ্ঞাপন ও ওয়ালপেপার ঝোলানো ছিল। সেখানে লেখা ছিল, এই মেডিকেলটি এসোসিয়েশন ওফ আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত। তার মানে, এখানে সুনিপণ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এবং মডার্ন রিচার্সের ওপর নির্ভরশীল কথা লেখা। আমি এসব পড়তে শুরু করলাম। আমার আবার একটা অভ্যাস এই যে, যা-ই পাওয়া যায় তাই পড়তে থাকি। তো ওখানে শিরোনামটা বড়ই হৃদয়গ্রাহী ছিল; তাই পড়লাম। লেখা রয়েছে–

আপনি সহজেই আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করুন।

তার মধ্যে বড় আশ্চর্য রিচার্স করা কথা লিখা ছিল–

যে নিজের অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে চায় অথচ শারীরিক ব্যায়াম করতে পারে না বা ব্যায়াম সেন্টারে যেতে পারে না। অধিক খাবার গ্রহণ পরিত্যাগ করতে পারে না আবার স্বাস্থ্যনিয়ন্ত্রণের ওষুধও ব্যবহার করতে পারে না, তার জন্য একটি সহজ পদ্ধতি হলো, সে খাবার ভালো করে চিবিয়ে-চিবিয়ে খাবে।

আমি যখন এই কথাটা পড়লাম, বললাম, এ তো আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। হাদীছ শরীফে এসেছে– নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকমা নিতেন, তখন তা খুব ভালোভাবে চিবিয়ে-চিবিয়ে খেতেন। তারপরই আরেক লোকমা মুখে নিতেন।

পেট ভরেছে কিনা সিদ্ধান্ত নেয় মস্তিষ্ক

ওরা এরও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। যখন মানুষ খাবার গ্রহণ করে, তখন কে বুঝতে পারে তার পেট ভরেছে কি-না? এই সিদ্ধান্তটা মানুষের পেট

গ্রহণ করে না। বরং তার মস্তিষ্ক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কীভাবে মস্তিষ্ক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে?

মস্তিষ্কের মাঝে দুভাবে সিগনাল আসে। এক মুখের দিকে থেকে সংকেত আসে। মুখে এমন একটা ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা দাঁত খাদ্য চিবোয়। মুখ যতবার চর্বন করে, ততবার সে শক্তি গণনা করতে পারে। আর এই গণনার হিসাব মস্তিষ্কের কাছে চলে যায়। মস্তিষ্কের কাছে সংবাদ পৌঁছে যায়, খুব উদর পুর্তি করে খাবার গ্রহণ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় সংকেত পেট থেকে আসে। এটা এভাবে যে, আমাদের পেটের ওপরভাগে কিছু গ্রহণক্ষমতা এবং অনুভবশক্তি আছে। এই শক্তির মাধ্যমে মস্তিষ্কের সংবাদ চলে যায় যে, পেট ভরে গেছে। তবে মস্তিষ্কের কাছে এই সংবাদ প্রায় আট মিনিটের মাথায় গিয় পৌঁছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কোনো একটা জিনিস এখন মুখে নেন এবং তা ভক্ষণ করেন, তাহলে প্রায় আট মিনিটের মাথায় গিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে সংবাদ পৌঁছবে, জিনিসটি ভক্ষণের কারণে আপনার পেট কতটুকু ভরেছে।

আর আজ আমরা কী করি? মাশাআল্লাহ! যখন দস্তরখানে বসি, তখন ডানে-বামে না তাকিয়ে একেবারে দস্তরখানা চেটেপুটে সাবাড় করে ফেলি। ভাবখানা এমন হয়, যতবেশী পেটে নেওয়া যায়, ততই ভালো। প্রয়োজনের চেয়ে অধিক খেয়ে বসি। তখন তো বোঝা যায় না। সাত-আট মিনিট পরেই মস্তিষ্ক আমাদের তথ্য দেয়, খাবার অধিক হয়ে গেছে। তখনই আমরা টের পাই, ওহ হো! আজ তো বেশি খাওয়া হয়ে গেল। এই যে ব্যাপারটা! এটা কেন হয়? কারণ, মস্তিষ্কে সংকেত পৌঁছে আট মিনিট পর। আর তখনই বোঝা যায়, এতক্ষণে খাবার বেশি চলে গেছে পেটে। এর একটি সহজ উদাহরণ লক্ষ করুন–

মনে করুন, আপনি খাওয়া শুরু করলেন। আপনি পাঁচ-সাত লোকমাই মাত্র নিয়েছেন। এমন সময় কোনো ফোন এল। আপনি কথা বলার জন্য উঠে চলে গেলেন। পাঁচ-দশ মিনিট ফোনে কথা বলার পর আবার খেতে এসে অনুভব করবেন, এখন আর আপনার চাহিদা নেই। আমাদের ভাষায় আমরা বলি ক্ষুধা মরে গেছে। আরে ভাই! ভুক মরে গেছে কী জিনিস? আসলে তো পাঁচ-দশ মিনিট বিরতি হয়েছে। এরই মধ্যে খাবার গ্রহণের সংকেত মস্তিষ্কে চলে গেছে, আর খাওয়া যাবে না। এভাবে আস্তে-আস্তে চিবিয়ে-চিবিয়ে যদি আমরা আরামের সঙ্গে খাবার খেতে থাকি, তাহলে আমরা পরিমাণমতো

খাবার গ্রহণ করতে পারব এবং এরই মধ্যে মস্তিষ্কে খাবার গ্রহণ করা যাবে কিনা এই সংকেত পৌঁছে যাবে। এভাবে আমরা অত্যধিক খাবার গ্রহণের মসিবত থেকেও রক্ষা পেতে পারি।

অধিক খাবারের কারণেই শরীরে চর্বি জমে যায়। মূলত আমাদের যতটুকু প্রয়োজন আমরা তাড়াহুড়ার কারণেই তার দশ গুণ বেশি খেয়ে বসি। পরে দেখি আর নড়াচড়া-ই করতে পারি না। আমাদের মুখ একটি ইউনিটের মতো। দাঁত তার মধ্যে লোকমাগুলোকে ক্যারেস করতে থাকে। একটি লোকমাকে যখন বারবার চিবানো হয়, তখন মস্তিষ্ক হিসেব রাখে কতটা সময় থেকে দাঁত চিবানোর কাজ করে চলছে। তাই এক লোকমা চিবানো হোক আর দশ লোকমা চিবানো হোক মস্তিষ্ক তার হিসাব করে রাখে এবং সামনে আর চিবানো যাবে কি-না সেই তথ্য দেহকে প্রদান করে।

এখন আপনি যদি একটি লোকমা মুখে দেন; তারপর ভালো করে চিবিয়ে তারপরই সেই লোকমা ভক্ষণ করেন, তারপর দ্বিতীয় লোকমা মুখে দেন। আগের মতোই ভালো করে চিবিয়ে পরে আরেক লোকমা মুখে দেন। এভাবে ধীরে-ধীরে খেতে থাকেন, তাহলে দেখা যাবে আপনি দশ মিনিটে যা খেয়ে থাকুন আপনার মস্তিষ্ক আপনার খাবার আর গ্রহণ করা যাবে কি-না এই সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে। এতে একটি চাপাতি খেলেই আপনার উদর পুর্তি হয়ে যাবে। আপনি অনুভব করবেন, আপনার পেট ভরে গেছে। আপনার ক্ষুধা নিবারিত হয়ে গেছে। ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন আপনার হবে না। ডায়েট করার প্রয়োজন আপনার হবে না।

পাকস্থলিকে ডাবল কষ্ট দেবেন না

আরেকটি কথা স্মরণ রাখুন, আমরা লোকমা যখন মুখে চিবুই এবং ভক্ষণ করি, তখন আমাদের পাকস্থলির কাজ হয় শুধু হজম করা। আর আমরা যদি পুরোপুরিভাবে লোকমাটা না চিবুই, তাহলে চাপটা গিয়ে পড়ে পাকস্থলির ওপর। পাকস্থলি টের পায় তখন। দাঁতের পেষার কাজটাও তখন পাকস্থলির ওপর চাপে। আর হজম করার কাজ তো করতে হয়ই। এভাবে তো আমরা পাকস্থলিকে ডাবল কষ্টে ফেলে দিই, যার ফলে পাকস্থলির ওপর চাপ বেশি পড়ার কারণে পাকস্থলি পূর্ণরূপে খাবারগুলো পিষতে পারে না, যার কারণে খাবার ভালোভাবে হজমও হয় না। পাকস্থলি তখন প্রত্যেকটি জিনিসকেই চর্বি বানিয়ে দেয়। এরপরই মানুষ বলতে থাকে, ভাই খেতে পারি না; পেট বেড়ে যায়, মেদ বেড়ে যায়। তো দেখুন, খাবার গ্রহণ তো আপনার মুখের কাজ আর হজম করা আপনার পাকস্থলির কাজ।

ডাক্তারগণ বলেন, যে নিজের ওজন কন্ট্রোল করতে চায়, তার উচিত ভালো করে চিবিয়ে খাবার খাওয়া। খাবার খাবে কিছুটা সময় নিয়ে এবং পেটে যে খাবার গিয়েছে, তার উপযুক্ত সংকেত যেন মস্তিষ্কে পৌঁছে। যদি এভাবে খাবারটা খাওয়া যায়, তাহলে তার পেটে অতিরিক্ত চর্বি জমবে না। অন্যথায় পেট বেড়ে যাবে। আবার এতে হার্টএটাকও হতে পারে। এতে তো আসলে আমাদের মসিবতটা আমরাই খরিদ করে থাকি।

বোঝা গেল, যেখানেই আমরা আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে, তাঁর সুন্নাতকে ছেড়ে দিই, সেখানেই আমরা হোঁচট খাই। আমরা নিজেরাই নিজেদের মুসিবত টেনে আনি। কতই-না উত্তম হতো যদি আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনা করতাম। এতে আমাদের দুনিয়াবি স্বাস্থ্যগত উপকার তো হতোই; পাশাপাশি দীনি উপকারও অর্জিত হতো।

মেনে না নিয়েই সুন্নাহর ওপর আমল চলছে

এখন ইউরোপে কোনো ব্যক্তি খানা খাওয়ার জন্য বসলে এক ঘন্টা সময় আনুমানিক ব্যয় করে। অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরভাবেই খাবার গ্রহণ করে। তারা বলে, এতে খাবার খাওয়া যায় কম। আর তাই ওজন কম হয় মানুষের। তো দেখুন, তারা কিন্তুমেনে না নিয়ে, রাসূলের আদর্শকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করে পরোক্ষভাবে আমল করে যাচ্ছে সুন্নাতের ওপর।

চোখের মণির চিকিৎসা

একটু চিন্তা করুন ভাই ও বন্ধুগণ! একজন মানুষ যখন সকালবেলা নিদ্রা থেকে ওঠে এবং ফজরের নামায পড়ার জন্য তার উজুর প্রয়োজন হয়, তখন সে উজুর সময় মুখে পানি দেয়। আজ ডাক্তাররা বলে, মানুষের চোখের সাদা অংশটা এবং কালো মণিটা মানুষের অবলোকনের কাজ করে। আর এ দুটা ভালো রাখার জন্য এবং এগুলোর কার্যক্ষমতা মজবুত রাখার জন্য সকালে চোখে পানির ছিটা দেওয়া উচিত। কারণ, ওই সময় পরিবেশে এমন একটি পদার্থ থাকে, যা পানির সঙ্গে মিশে মানবের চোখের মধ্যে চলে যায় এবং মানবের দৃষ্টিশক্তিকে ঠিক রাখে। যাদের ফজর নামায পড়ার অভ্যাস আছে, তারা এই ফায়দাটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

মেসওয়াক ও আধুনিক বিজ্ঞান

একটা মানুষ নামাযের জন্য উজু করার সময় তো মেসওয়াকও ব্যবহার করে। এর মাঝেও বড় বিস্ময়কর উপকারিতা আছে।

আজ থেকে বছরকয়েক আগে ইউরোপের চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্য ছিল, প্রত্যেক মানুষের উচিত নিদ্রা থেকে উঠেই মেসওয়াক বা ব্রাশ ব্যবহার করা। আজ এসে সেই চিকিৎসাবিজ্ঞানই তথ্য দিচ্ছে, শয়ন থেকে সকালে জাগ্রত হয়ে মেসওয়াক বা ব্রাশ ব্যবহার করা হোক বা না হোক শয়নের পূর্বে রাতে অবশ্যই-অবশ্যই মেসওয়াক করতে হবে। অর্থাৎ– ভোরে মেসওয়াক করার চেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে রাতে শয়নের পূর্বে মেসওয়াক করা। কারণ কী? বলা হয়, মানুষের দাঁতের ফাঁকে যে খাদ্যকণাগুলো লুকিয়ে থাকে, সেগুলো রাতভর জমে থেকে দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি করে ফেলে। আবার মানুষের দাঁতের ভেতরের অংশে ব্যাকটেরিয়া থাকে। সেগুলো দিনের বেলা মানুষ অনবরত মুখ নাড়াতে থাকে, কথা বলতে থাকে, খাবার গ্রহণ করতে থাকে বলে কোনো কাজ করতে পারে না। কিন্তু রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তখনই সেগুলো ক্রিয়া করতে শুরু করে। যতক্ষণ সে শুয়ে থাকে, ততক্ষণ সেগুলো তার দাঁতকে নষ্ট করে তোলে। আবার দাঁতের ফাঁকের খাদ্যকণাগুলোই ব্যাকটেরিয়া হয়ে যায়। এগুলো মানুষকে নানা রকম রোগে আক্রান্ত করে দেয়। তাই আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, রাতের বেলা মেসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে ঘুমানো আবশ্যক।

এই গবেষণা প্রতিবেদন আমি যখন পড়লাম, তখন আমার হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কথা স্মরণ হয়ে গেল। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শয়নের পূর্বে মেসওয়াক করতেন। আবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে একবার মেসওয়াক করতেন এমনও নয়; বরং প্রতি নামাযের পূর্বেই তিনি মেসওয়াক করতেন। সে হিসেবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে দৈনিক কম পক্ষে পাঁচবার মেসওয়াক করতেন।

অপরিচ্ছন্ন মুখে রোগ সৃষ্টি হয়

আধুনিক ডাক্তারগণ বলেন, পেটের অধিকাংশ রোগই দাঁতের অপরিচ্ছন্নতার কারণে সৃষ্টি হয়। বাস্তবেই যে মেসওয়াকে অভ্যস্ত না হয়, তার পেটে কোনো-না-কোনো রোগ অবশ্যই থাকবে। তাই রোগমুক্ত থাকার

জন্যও চাই মেসওয়াক। কারণ, এটি আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। আজ ইউরোপ-আমেরিকার ছোট-ছোট বাচ্চাদের বোঝানো হয়, যেন তারা শয়নের পূর্বে অবশ্যই মেসওয়াক করে। মুখ ও দাঁত পরিচ্ছন্ন করে নেয়।

তো দেখুন, আগে তারা শুধু ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পর দাঁত মাজার কথা বলত। এটিও নবীজিরই আদর্শ ছিল। তারপর তারা এখন বলে রাতে শয়ন করার পূর্বেও মেসওয়াক করতে হবে। এটিও আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই তরিকা।

দেখুন, বিজ্ঞান গিয়ে যে স্থানটিতে স্পর্শ করে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেখানে গিয়ে দাঁড়ায়, সেখানেই দেখা যায় আমাদের প্রিয়তম নবীর পবিত্র সুন্নাতের পদাঙ্ক। সেখানেই দেখা যায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ।

ঘাড় মাসেহ করার স্বাস্থ্যগত উপকার

একজন মানুষ যখন উজু করে, তখন মেসওয়াকের পাশাপাশি আরও অনেক কাজ করে। গর্দানও মাসেহ করে। চেহারা ধোয়, নাকে পানি দেয়, কুলি করে, কান মাসেহ করে। দিনে অন্তত পাঁচবার এসব করতে হয়।

এখন আলোচনা করব গর্দান মাসেহের দ্বারা মানুষের কী উপকার হয় সেই বিষয়ে।

মানবের গর্দান শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে সমস্ত শরীরের রগগুলো জোট হয়ে উপরের দিকে মাথায় চলে গেছে। এর সাথে আবার মেরুদণ্ডের হাড়ের সাথেও সম্পর্ক রয়েছে। তাই মানবদেহের গর্দানের এই পেছনের অংশটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কেউ যদি এই অংশটাকে শুকনো রাখে, তখন এই শুকনো অবস্থাটা অনেক সময়ই মেরুদণ্ডের মধ্যে খিঁচুনি তৈরি হয়। এর ফলে মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাই ডাক্তাররা বলেন, দিনে এক-দুবার অন্তত গর্দান ধৌত করো। আল্লাহু আকবার!

তারা গর্দানে পানি দেওয়ার কথা তো আজ বলছে। অথচ আমরা উজুর মধ্যে প্রতিদিন পাঁচবার করে গর্দানে পানি দিয়ে থাকি। আমাদের নবীজি আমাদের সেই পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। তো আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে-বিষয়টি শিখিয়ে দিয়েছেন ১৪শত বছর পূর্বে, আজকের বিজ্ঞান তাকে বাধ্য হয়ে মান্য করছে এবং বলছে, এটা স্বাস্থ্যের

জন্যই খুবই উপকারী। দেখুন, আমরা এই আমল করে আসছি সুন্নাত হিসেবে। অথচ তা আমাদেরকে দৈহিকভাবেও উপকৃত করছে। আর এখন আজ বিজ্ঞান সেই সুন্নাতগুলোকে স্বাস্থ্যসম্মত বলে প্রমাণিত করছে।

উজুর অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে আমাদের উপকারসমূহ

দেখুন, একজন মানুষ যত বড়ই শিক্ষিত হোক। এক দিনে সে কয়েকবার গোসল করে না। বরং অফিসের আগে সে একবার হয়তো গোসাল করবে। অথচ মানুষের কিছু অঙ্গ এমন আছে সব সময়ই এগুলো বস্ত্রহীন থাকে। কারণ, এগুলো দিয়ে কাজ করতে হয়। যেমন–

১. চেহারা বস্ত্রহীনভাবে খোলা থাকে।

২. কনুই পর্যন্ত হাত খোলা থাকে। কারণ, হাত দিয়ে মানুষ কাজ করে।

৩. পা টাখনু পর্যন্ত খোলা থাকে।

৪। আবার কাজ করার সময় মানুষের মাথাও খোলা থাকে অনেক সময়।

তো নামায পড়ার সময় মানুষের এই খোলা অঙ্গগুলো দৈনিক পাঁচবার ধৌত করতে হয়। পরিবেশের যত দূষণ যত ময়লা সব কিন্তু এই খোলা অঙ্গগুলোতে লাগে। আল্লাহ তা'আলার কী আজব কারিশমা!

আমাদের তো খবরই নেই, এই উজুর মাধ্যমে আমাদের পরিচ্ছন্নতার কাজটা কত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সহকর্মীদের কারও টিবি রোগ থাকতে পারে। কারও আলসার থাকতে পারে। কারও মুখে ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে অথবা অন্য কোনো ভাইরাসও থাকতে পারে কারও শরীরে। আমাদের তো খবরও থাকে না, সেসব আমাদের শরীরে কীভাবে লেগে যায়। সেসব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আমরা যদি অঙ্গগুলো দিনে একবার ধৌত করতাম, তাহলে ততটা সুরক্ষিত থাকত না পাঁচবার ধৌত করার কারণে যতটা সুরক্ষিত থাকে। most heigenic way of living শরীর সুরক্ষিত রাখার সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হচ্ছে, আপনার খোলা অঙ্গগুলো দিনে কমপক্ষে পাঁচবার ধৌত করুন। আপনি যদি আল্লাহর কাজ করেন, তাহলে ফায়দাটা কিন্তু আপনারই হবে। নবীজির সুন্নাত আপনি পালন করলেন; কিন্তু ফায়দা হবে কার? আপনার।

উজুতে ডায়াবেটিস রোগীর উপকার

আমার এক বন্ধু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ছিলেন। তাকে ডাক্তার দিকনির্দেশনা দিলেন, আপনার পাগুলো প্রতিদিন কয়েকবার ম্যাসেজ

করবেন। প্রতিদিন পাগুলো কয়েকবার টেপাবেন। কারণ, ডায়বেটিসের কারণে পায়ের রক্ত সঞ্চালনের পথগুলো সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে প্রতিটা অণুতে রক্তপ্রবাহ বহাল থাকে না। সেজন্যে পাগুলো কয়েকবার করে দৈনিক মেসেজ করতে হয়।

আবার ডাক্তার বলেন, পায়ের দিকে খেয়াল রখেতে হবে, যেন কোনো রূপ আঘাত না লাগে। জখম না হয়। তো পা টেপানো এবং জখম হলো কিনা এগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক বান্দার জন্য একটা অতিরিক্ত কাজ। অথচ যে-বান্দা নামাযী মানুষ এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক সুন্নাতের ওপর আমলকারী তাঁর এই অতিরিক্ত কাজটা এমনিতেই সম্পন্ন হয়ে যায় নতুন করে কোনো কিছু করতে হয় না। কীভাবে? আমরা দিনে অন্তত পাঁচবার পদযুগল মলে-মলে ধৌত করতে হয়। যখন ভালো করে ঘষে-মেজে পাগুলো ধুই, তখন মেসেজের কাজটাও হয়ে যায়। এমনিভাবে রক্ত প্রবাহে কোনো প্রবিন্ধকতা যদি তৈরি হয়ে থাকে, তবে তাও নিজে-নিজেই সচল হয়ে ওঠে।

দেখুন, কোনো কাফেরের যদি ডায়বেটিস হয়, তাহলে নিজ থেকেই সে কয়েকবার করে পা মেসেজ করতে হয়। অথচ কোনো মুসলমানের যদি এই সমস্যা দেখা যায়, তাহলে উজুতে পাঁচবার করে মেসেজ হয়ে যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য উজু করার সময়। বেনামাযীদের জন্যও এটি কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, নিজে থেকে এভাবে চার-পাঁচবার দৈনিক পা চেক করা, মেসেজ করা এটা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। তো সে কারণে তারা পুরোটা শরীরের খবর সারা দিন রাখতে হয়। অথচ এটা কষ্টকর ব্যাপার। অনেক সময় খবরই থাকে না শরীরের কোথাও জখম হয়ে গেল কি-না।

আমার সেই বন্ধু যখন এসে বলল, ডাক্তার সাহেব আমাকে এই এই নির্দেশনা প্রদান করেছেন, তখন আমি বললাম, আরে আল্লাহর বান্দা! কত দারুণ কথা! তুমি কী প্রয়োজনে দৈনিক পাঁচবার তোমার পা টেপাবে, মেসেজ করবে, চেক করে-করে দেখবে? তার চেয়ে তুমি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ো। এতে তোমার পা ধৌত করাও হয়ে যাবে। উজুর ছাওয়াব নামাযের ছাওয়াবও হয়ে যাবে। আবার তোমার পা মেসেজ করা তোমার পা চেক করা গুইসবও হয়ে যাবে। কারণ, উজুকারী ব্যক্তি নিজের পাগুলো মলে-মলে ধৌত করে, খেলাল করে আর সে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচবার পা ধৌত করবে। সে তো পায়ে কোনো সমস্যা হয়ে গেল কি-না তার খবর সহজেই পেয়ে যাবে।

আমি আমার বন্ধুকে বললাম, তুমি ডাক্তারকে গিয়ে বলে দিয়ো, ডাক্তার সাহেব! এ নির্দেশনা না দিয়ে কেন আপনি রোগীকে বলে দেন না যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ুন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে উজু করুন; তাহলে আপনাদের এই ফায়দাটিও হয়ে যাবে আবার আপনাদের ছাওয়াবও হয়ে যাবে।

বন্ধু বলল, আমি এ বিষয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব। ডাক্তার ছিল হিন্দু। ডাক্তারকে এভাবে উজুর কথা বলল আমার বন্ধু। উজুর পদ্ধতি, উজুর ফায়দা তার সামনে তুলে ধরল। তখন হিন্দু ডাক্তার বড় আশ্চর্যন্বিত হয়ে গেল এবং বলল, তোমাদের বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও উজু করে এবং বুড়োরাও উজু করে? বন্ধু বলল, হ্যাঁ করে তো। হিন্দু ডাক্তার বলল, আরে তাহলে তো তোমাদের আমলকারী মুসলমানরা বহু রোগ-বালাই থেকে রক্ষা পেয়ে যায় এমনিতেই। আর এভাবে তোমারও যদি উজু করার অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে প্রতিদিন তোমারও মেসেজের প্রয়োজন নেই।

দেখুন, আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের ওপর আমল করছি। আর এমনিতেই তার দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ক্ষতিকর দিক থেকে রক্ষা করছেন। দেখতে পেয়ে ছুটে এসে এই সুন্নাতকেই আকড়ে ধরছে। এই আদর্শকেই গ্রহণ করছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলামকেই মান্য করছে।

একজন নোবেলবিজয়ীর বিপরীত বুঝ

একজন নোবেলবিজয়ী ব্যক্তি। তাঁর ইন্টারভিউ নেওয়া হলো। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি নোবেলবিজয়ী হলেন কী করে? লোকটি জবাবে বলল, আমি একটি স্পেশাল ব্যায়াম করি। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যায়াম? বলল, আমি প্রতি দিন আনুমানিক ১৫ মিনিট উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মাথা নিচে থাকে আর পা থাকে উপরে। জিজ্ঞেস করা হলো, কেন এটা করেন? লোকটি বলল, স্বাভাবিক অবস্থায় তো অন্তরটা নিচে হয়। আর মাথা উপরে হয়। এ-ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের নিচের দিককার অঙ্গগুলোতে সহজে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে। আর এই যে মস্তক; এটা তো দেহের উপরিভাগের অংশ। তাই এ পর্যন্ত রক্ত প্রবাহিত হওয়া অত্যন্ত জটিল বিষয়। তো মস্তিষ্কের মধ্যে যতটা প্রেসারের সঙ্গে রক্ত সঞ্চালিত হওয়া প্রয়োজন ততটা প্রেসারের সঙ্গে রক্ত চলাচল করতে পারে না। তাই আমি যখন উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, তখন আমার মস্তক নিচের দিকে থাকে আর হৃৎপিণ্ড তখন উপরের

দিকে থাকে। তাতে আমার দেহের সমস্ত রক্ত আমার মস্তিষ্কে এসে যায়। আমার মাথার কোষে-কোষে সেই রক্ত পৌঁছে যায়। সে কারণে আমার মাথা ভালো কাজ করে। আর এ-কারণেই আমি নোবেল পুরস্কার পেয়েছি।

আমি এই ইন্টারভিউ প্রতিবেদন যখন পড়লাম, তখন বললাম, পাগল বুঝি এমনও হয় মানুষ। যদি প্রতিদিন পাঁচবার করে নামায পড়ার অভ্যাস থাকত, তাহলে তার এই ব্যায়াম বারবার করার প্রয়োজন হতো না। সারাটা দিনে এমন কোনো পরিস্থিতি মানুষের আসে না যে, সে মস্তক নিচে করতে হবে। সর্বদা মাথা উপরে আর হৃৎপিণ্ড তো নিচেই থাকে। কিন্তু নামাযের সেজদায় মানবের মস্তক নিচে এবং তার হৃৎপিণ্ড উপরে থাকে। তাই যদি সামান্য লম্বা সেজদা করা হয়, তাহলে মানুষের নিজের কানের মধ্যে চেহারার মধ্যে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করা যায় যে, রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে। তো অবস্থা তো এই হয় যে, সেজদা অবস্থায় মানুষের মাথায়, চেহারায় এবং উপরিভাগে রক্ত বেশি প্রবাহিত হয় এবং প্রত্যেকটা কোষে গিয়েই রক্ত একটি নতুন সঞ্চালন সৃষ্টি করে। তাই তো দীর্ঘ ও লম্বা সেজদাকারীদের চেহারায় আল্লাহ তা'আলা এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও দীপ্তিময় অবস্থা দান করে দেন।

নেককার বান্দাদের চেহারার ঔজ্জ্বল্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

আমার সঙ্গে একজন ডাক্তারের সাক্ষাৎ হলো। সে বলতে লাগল, হুজুর! ইসলাম ধর্মের মধ্যে বলা হয়েছে সালেহীনের চেহারায় এক অন্য রকম সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকে। আমি বললাম, এটা অত্যন্ত সত্য ও বাস্তব কথা। বলতে লাগল, আমি একজন মেডিকেল ডাক্তার! আমি এখানে আমেরিকায় ডাক্তারি করেছি। আমি এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করছি। বুঝলাম, বাস্তবেই এমন লোক যারা লম্বা সেজদা করে। সেই লম্বা সেজদার কারণে তাদের চেহারার ওপর মস্তিষ্কের ওপর এবং মানবের ঊর্ধ্বদেশের অঙ্গগুলোর মধ্যে পরিমাণমতো রক্ত প্রবাহিত হয়। এ-কারণেই এমন লোকদের চেহারা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তরতাজা মনে হয়। বৃদ্ধ বয়সেও তার চেহারাটা তরুণের চেহারার মতোই দেখায়। এর পর লোকটি হেসে উঠে বলল, আমি আপনাকে কি একটি কথা বলতে পারি? বললাম, বলুন! যদি নারীরা জানতে পারত, দীর্ঘ সেজদা করার কারণে আমাদের চেহারা কতটা সতেজ ও তরতাজা দেখা যায়, তাহলে তারা কত কত ঘন্টা যে দৈনিক

সেজদা করে কাটিয়ে দিত, তা আল্লাহই ভালো জানেন। দামি দামি প্রসাধনী থেকে তারা ফিরে আসত।

দেখুন, আমাদের ইবাদাতগুলোর রহস্য কথা এবং জ্যোতির্ময়তা।

সিরকা ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা

সিরকা হচ্ছে আঙ্গুর অথবা আখ থেকে তৈরী এক জাতীয় চাটনি। খাবারের সঙ্গে উপখাদ্য হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হয় এবং ভক্ষিত হয়।

একদিন আমি নিউইউর্ক থেকে প্রকাশিত টাইম্‌স ম্যাগাজিন পড়ছিলাম। তিন কলামের একটি খবরের ওপর আমার চোখ আটকে গেল। আমি লেখাটি পড়লাম–

Burn your extra Fat with the use of viniger

সিরকা ব্যবহারের দ্বারা শরীরের অতিরিক্ত চর্বি এবং মেদ কমে যায়।

আমি বড় বিস্মিত হলাম। আমি বললাম, সিরকা ব্যবহার করা তো আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। কোনো দাওয়াতই নবী যুগে সিরকার আপ্যায়ন ছাড়া হতো না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে-ঘরে সিরকা আছে, সেই ঘরে তরকারি আছে। আমি পুরো নিবন্ধটি পাঠ করলাম। সেটাতে লেখা ছিল, যদি মানুষ প্রতিদিন এক চা চামচ পরিমাণ সিরকা ব্যবহার করে, তাহলে সে কখনও মোটা হয়ে যাবে না।

সিরকা ব্যবহারের কয়েকটা পদ্ধতি আছে। যেমন–

পানিতে, তরকারিতে অথবা সালাদের মধ্যে ঢেলে। অবশ্য সালাদের সাথে মিশিয়ে খেলে গলা জ্বলে। এজন্য সিরকা ব্যবহার করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, অর্ধ গ্লাস পানি নিয়ে এক চুমুক পরিমাণ সিরকা তাতে ঢেলে দিতে হবে এবং এভাবে মিশিয়ে-মিশিয়ে প্রতি দিন পান করতে হবে। এটা ২৪টা ঘণ্টা অতিরিক্ত চর্বি জন্ম হওয়াকে প্রতিরোধ করবে। তাই ডাক্তার যাদের ওজন কমানোর নির্দেশনা প্রদান করেছেন; তারা ব্যায়ামও করে থাকেন; কিন্তু কোনো ফায়দা হচ্ছে না। হাঁটাহাঁটিও করে তারা, তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ এবং সাধ্যের আওতায় রয়েছে এই ব্যবস্থাপনা। তাদের উচিত হবে সিরকা ব্যবহার করা।

মুসলমানরা আজ সিরকা ব্যবহারের অতটা গুরুত্ব দেয় না। এই খবর ছাপার পরে আমেরিকার ষ্টোরগুলোতে সিরকার দাম বেড়ে গেছে। আমি

আমেরিকান ও ইউরোপিয়ানদের দস্তরখানে সিরকা ব্যবহার হতে দেখেছি। আমি একজন আমেরিকানের কাছে জানতে চেয়েছি, তোমরা কেন সিরকা ব্যবহার কর? সে উত্তর দিল, এতে অনেক উপকার ও ফায়দা রয়েছে। আমরা তাই উপখাদ্য হিসেবে এটি খাই। আমি তাকে বললাম, আহ! অনিচ্ছায়ও আজ তোমরা সুন্নাত মান্য করছ। লোকটা বলল, তুমি কী বলতে চাচ্ছ? আমি বললাম দেখো! আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সিরকা ব্যবহার করা। যেহেতু তুমিও তা ব্যবহার করছ। তাই তোমাদের গবেষণায় আমাদের মতটা আরও মজবুত হয়ে গেল, নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। লোকটি বলল, বিষয়টি নোট করে রাখো। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

যাইতুনের তেলও বিস্ময়কর চিকিৎসা

কিছু-কিছু লোকের হাই কোলেস্টরলের প্রবলেম আছে। এমন লোকদের ডাক্তার বলে থাকেন, তোমরা পরাটা খাবে না, ডিম খাবে না। লাহোরে আমার এক বন্ধু আছেন। নাম ডাক্তার শাহেদ উওয়াইস! প্যাথলজিস্ট! তার ল্যাবরটরিতে লোকেরা টেস্ট করানোর জন্য আসে। বন্ধু আমাকে বলল, হযরত! আমি শত রোগীর ওপর একটা জরিপ চালিয়েছি। তাদের কোলোস্টরল আমি চেক করেছি। তারপর তাদের ব্যাপারে ওষুধ হিসেবে যাইতুনের তেল সেবনের সিদ্ধান্ত দিয়েছি। তরকারিও যাইতুন তেল দিয়ে পাকানোর কথা বলেছি। যদি মন চায় তবে পরাটাও যাইতুন তেল দিয়ে ভেজে খেতে বলেছি। এছাড়া সালাদের মধ্যেও যাইতুনের ব্যবহার কাম্য। ৪০ দিন পরে আমার থেকে টেস্ট্র করে নিতে বলেছি। সে বলল, এভাবে আমি একশত রোগীর চিকিৎসা করেছি এবং তাদের সবার কোলোস্টরল লেভেল ২০০ থেকে কমে গেছে।

বন্ধু যখন একথা বলল, আমি বড় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আল্লাহ তা'আলা যাইতুনের তেলে এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন! আরে! আমরা তো জানি, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের যাইতুনের কসম করেছেন,

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ

'ডুমুর ও জলপাইয়ের কসম!'

আমি তখনই উপলব্ধি করলাম, যেহেতু আল্লাহ এর নাম নিয়ে কসম করছেন, তাহলে নিশ্চয় এতে কোনো-না-কোনো ফায়দা তিনি রেখেছেন।

মোটকথা, এমনটা হলো কেন?

আমি একবার একটি গবেষণা নিবন্ধ পাঠ করলাম। তাতে একথাটার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ছিল। বিষয়টিকে মেডিকেল টেকনোলজি ব্যবহার করে বোঝানোর পরিবর্তে আমি নিজস্ব ভাষা ও বর্ণে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে উপস্থাপন করছি।

সেই গবেষণাধর্মী নিবন্ধটিতে লেখা ছিল, যাইতুন তেলের বৈজ্ঞানিক ফর্মুলায় একটি খালি চেয়ার। সেই চেয়ারের জায়গাটা একেবারেই এমন, যেমনটা বেড কোলেস্টরল হয়ে থাকে। তাই এই বেড কোলেস্টরল ওই চেয়ারের পজিশনে গিয়ে ফিট ও সংয়োজিত হয়ে যায় এবং ওই যাইতুন তেল তাকে শরীর থেকে বাইরে বের করে দেয়।

এর দ্বারা বোঝা গেল, যাইতুনের তেল কোলেস্টরল লেভেলকে কমিয়েই দেয় না; বরং বন্ধ শিরা-উপশিরাগুলো চালু করার কাজটিও করে দেয়। এজন্য এখন বাইরের দেশগুলোতে হৃদরোগে তারা যাইতুনের তেল ব্যবহার করে এবং ডাক্তাররা এর নির্দেশ দেয়। তাই তো এ-সময়টাতে এসে যাইতুনের তেলের প্রসার ইউরোপে বেড়ে গেছে। কানাডায় একটি গবেষণা এই হয়েছে মানবজীবনে কোন তেল কতটা ব্যবহার হয়। সেই গবেষণায় দেখা গেছে, সে-সময় সমগ্র কানাডায় যাইতুনের তেলই বেশি ব্যবহার হয়। কারণ, সে দেশের মানুষেরা দেখল, যদি যাইতুন ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা হৃৎপিণ্ডকে নবভাবে সঞ্চালিত করে তোলে। যয়তুন হার্টএটাকের রোগে যথেষ্ট উপকার প্রদান করে। তাই তো বলা যায়, আজ ওরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের ইসলামকে মান্য করছে, সুন্নাত মান্য করছে। স্মরণ রাখুন, যাইতুনের তেল ব্যবহার করা একটি মহান সুন্নাতও বটে। নবীজি যাইতুনের তেল বেশি-বেশি ব্যবহার করতেন।

গবেষণায় আমাদের দুর্বলতা

আমাদের যুবকদের অবস্থাটা এই যে, তারা সুন্নাতের বৈজ্ঞানিক উপকারিতাগুলো সম্পর্কে অনবহিত থাকে বলে সুন্নাত মান্য করতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে সংকোচ বোধ করে। তারা Down feel করে। তারা ভাবে, আমাদের সেকেলে দেখাচ্ছে। আরে হে আল্লাহর বান্দারা! এটি আমাদের দুর্বলতা। আমরা গবেষণাধর্মী চেতনায় সমৃদ্ধ হতে পারিনি। আমাদের এই গুণীবর্গ যদি এর ওপর রিচার্স করত এবং এ নিয়ে তারা যদি গবেষণাধর্মী

ব্যাখ্যা ও সুন্নাতগুলোর উপকারিতা আমাদের সামনে, বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করতে পারত, তাহলে তো বর্তমান কুফরি বিশ্ব সেই কবেই ইসলাম কবুল করে নিত। এটা আমাদের দুর্বলতা, অযোগ্যতা ও অদক্ষতা। এটি আমরা ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্যকে, প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতগুলোকে সুন্দর পদ্ধতিতে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি।

আমরা সে রকম যোগ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে অবগত বাহিনী তৈরি করতে পারিনি। এমন একটি দল আমরা তৈরি করতে পারিনি, যারা এক দিকে হবে ইল্‌মের ময়দানে দুরন্ত ও প্রাজ্ঞ আলেম, অন্য দিকে তারাই হবে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও সাইন্সের সূক্ষ্ম বিষয়ে সম্যক অবগত। যারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাতে ব্যাখ্যা করে তার লাভ ও উপকারিতা অকাট্যভাবে পেশ করবে সমগ্র জাহানে। সমগ্র বিজ্ঞানজগতকে উদ্বুদ্ধ করবে ইসলাম ও প্রিয়তম নবীজির সুন্নাহর প্রতি। আমাদের এই দুর্বলতার কারণেই আমাদের তরুণ সমাজ সুন্নাহের অনুসরণ করতে গিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে। সংকোচ বোধ করে। এ-কারণে এক সময় সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে তারাই হয়ে যায় অন্যায় পথের পথিক। আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো তাঁদের সামনে খোলাসা করে দিলেই পরে দেখা যায় আল্লাহর তাওফীকে তাদের হিম্মত সুদৃঢ় হয়ে যায়। তারা হৃদয়ে একটা শক্তি পায়। তারপরই তারা বলে, হুযুর! এখন সুন্নাতের ওপর আমল করার জযবা অত্যন্ত বেশি বেড়ে গেছে। একিন মজবুত হয়ে গেছে। ফলে তারা নিবিড়ভাবে সুন্নাহের অনুসরণ ও অনুকরণে মশগুল হয়।

বোঝা গেল, জাতিকে সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাগত ও জাগতিক উপকারিতাও খুলে-খুলে বলা অত্যন্ত জরুরি।

আজওয়া খেজুরের উপকারিতা এবং অজানা কথা

আমার এক দোস্তের হৃৎপিণ্ডের সমস্যা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। ডাক্তার বললেন, যেকোনো সময় হার্টএর্টাক হতে পারে। তারা ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে ফোন করল, বলতে লাগল, হযরত! বড়ই কঠিন অবস্থা; আমাকে কিছু বলুন। আমি সাথে-সাথে তো দু'আ করতে শুরু করলামই; পাশাপাশি সীরাতে রাসূলের দিকে দৃষ্টি দিলাম। ভাবলাম, নবীজির জীবনাদর্শের মধ্যে কোনো-না-কোনো আলোকরেখা পেয়ে যাব। আমি নবীজির সীরাত গ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করলাম। হঠাৎ এমন একটা বিষয় আমার চোখে পড়ে গেল যে, আমি আশায় বুক বাঁধতে সক্ষম হলাম।

হযরত সাদ (রাযি.) একজন সাহাবি। নবীজির খেদমতে হাজির হলেন। আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমার বুকে অসুখ। ব্যথা করে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। হাঁপানি হচ্ছে, বুকটা কেমন ধপধপ করে। শুনে নবীজি বললেন, এটা হৃদরোগ। এ হাদীস পড়ে বুঝলাম, হার্টএর্টাকের সমস্যা দুনিয়ায় সর্বপ্রথম নবীজি আলাইহি সালামই ধরেছেন। বুকের ব্যথার সঙ্গে হাঁপানি ও শ্বাসকষ্টের সম্পর্ক চৌদ্দ শত বছর পূর্বে কে জানত। কিন্তু নবীজি তো ঠিকই বলে দিলেন, এটা হৃদরোগ। এবার সাহাবি বললেন, ওগো আল্লাহর রাসূল! এখন আমার করণীয় কী?

নবীজি ইরশাদ করলেন, তুমি আজওয়া খেজুর খাও। তিনি সেই খেজুর ভক্ষণ করলেন। সামান্য সময়ের মধ্যেই তাঁর সমস্যা দূর হয়ে গেল। আমি যখন হাদীছটি পাঠ করলাম, তখন চিন্তা করলাম, নিশ্চয় কোনো-না-কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে এখানে। মনে হয় এতে কোনো নেয়ামত বিদ্যমান আছে। আমি বুঝলাম, খেজুরের বিচিগুলোতে কোনো ফায়দা অবশ্যই আছে। আমি জানলাম, খেজুরের বিচি পিষে নিজে খাওয়া, উট, ঘোড়াকে খাওয়ানো ছিল আরবদের অভ্যাস। হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি খেজুরের বিচি পিষতেন এবং নিজের উটকে খাওয়াতেন। আবার মানুষও যখন খাবারের অন্য কোনো উপাদান না পেত, তখন এই বিচি পিষে তা নিজেরাই ভক্ষণ করত।

তাই আমি আমার পরিচিত ওই হাজী সাহেবকে বললাম, আমি একটি ওষুধ আপনার কাছে পাঠাচ্ছি আপনি এটা সেবন করবেন। আমি আজওয়া খেজুরের ৪০টি বিচি নিলাম এবং এগুলো পাউডার বানিয়ে ফেললাম। তারপর ক্যাপসুল সিস্টেমে এগুলোকে পেকেট করলাম। ক্যাপসুলগুলো হাজী সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। নির্দেশনা দিলাম প্রত্যেক খাবারের পরে একটি করে ক্যাপসুল খাবেন। তারপর আমি এমন করে আরও কিছু ক্যাপসুল পাঠালাম। আল্লাহর কুদরতে ৪০ দিন পরেই চেকআপ করে দেখা গেল, তার হাঁপানির মাত্রা রোগ ৩০০ থেকে ১৮.৫-এর ভেতর চলে এসেছে।

ডাক্তাররা তার এই রিপোর্ট দেখে বড় হতবাক হলো। বলল, আবার পরীক্ষা করানো হোক। আবারো পরীক্ষা করানো হলো। দেখা গেল, এখনও তার কোলেস্টরল ১৮.৫। এই ওষুধটা পরে আমি আরও অনেকের মধ্যে প্রয়োগ করেছি। শত ভাগ লোকেরই তাতে ফায়দা হয়েছে। দেখুন, আল্লাহ তা'আলা খেজুরের বিচিতে আরোগ্য রেখেছেন।

নবীয়ে রহমতের নামে রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছি

করাচিতে আমার কাছে একজন ডাক্তার এলেন। বলতে লাগলেন, হযরত! আমি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। আমি হৃদরোগের রূহানী চিকিৎসায়ও বিশেষজ্ঞ হতে চাই। তাই আপনার নিকট বাইআত হতে এসেছি। আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলাম। আমি তাকে বললাম, তোমার পরিচয়টা তো আগে দেবে। লোকটি বলল, আমি অমুক বিষয়ে ডক্টরেট অর্জন করেছি। আমার পেশায় আমি এত যোগ্যতা অর্জন করেছি যে, আমি সৌদি আরবের রাজপরিবারের হার্ট বিষয়ের ডাক্তার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। আমি কিং আব্দুল আযীয থেকে নিয়ে ৩৬ বছর পর্যন্ত তাদের বিশেষ ডাক্তার হিসেবে নিযুক্ত আছি। আমি এখন রিটায়ার হয়ে গেছি। চিন্তা করলাম, করাচিতে এখন গরিবদের ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করব।

আমি বললাম, আমার কাছে একটা ওষুধ আছে; তুমি তা ব্যবহার করো এবং লোকদের চিকিৎসা করিয়ে বলো এটা কত উপকারী। আমি তাকেও ক্যাপসুলগুলো দিলাম। এক সপ্তাহ পরে এসে সে বলল, হযরত! এই ওষুধ রেজিস্ট্রেশন করে তার লাইসেন্স নিয়েছেন কি? বললাম, না তা তো নেওয়া হয়নি। সে বলল, দ্রুত রেজিস্টেশন করিয়ে নিন। কারণ, এটা যদি অন্যরা উৎপাদন করতে শুরু করে, তাহলে তো লক্ষ-লক্ষ ডলার উপার্জন করতে পারবে।

আমি বললাম, আমার তেমন কিছু করবার কোনো প্রয়াজন নেই। যাও চৌদ্দশত বছর পূর্বে নবীয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামেই এটি রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। এই মহা নেয়ামত আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ থেকে পেয়েছি। আর আমি চাচ্ছি ডলার আসার পরিবর্তে আমি আমার মাহবুব আলাইহিস সালামের নেসবতে একথা দুনিয়াবাসীকে পৌঁছে দিতে চাই যে, প্রিয়তম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফরমানের কারণে আমার আল্লাহ এই ওষুধের মধ্যে আরোগ্য লাভের উপাদান গচ্ছিত রেখেছেন।

আমার তো একথা বলবার অধিকার রয়েছে যে, আজকের এ বিকশিত বিজ্ঞান একটি স্থানে এসে অবশ্যই থমকে দাঁড়াবে আর সেই স্থানটি হচ্ছে আমাদের প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের ছাপ।

তেজের সঙ্গে চলার শারীরিক উপকার

কয়েক বছর আগের কথা। ডাক্তাররা নীতি প্রণয়ন করল, জগিং করতে হবে। সকালে দৌড় দেওয়া, সকালে হাঁটা ও জগিং করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। ফলে এর জন্য এক রকম মেশিন আবিষ্কার হলো, যেটা দেখতে সাইকেলের মতো। এটাতে নিয়মমতো জগিং করা যায়। সকলে সেই মেশিন সংগ্রহ করে নিল। এখন অনেক মানুষই সকালে দৌড় দেওয়া এবং জগিং করার রুটিন তৈরি করেছে। দিন হোক বা রাত হোক, সকাল হোক আর সন্ধ্যা হোক, দুপুর হোক আর বিকাল হোক সব সময় কোনো-না-কোনো নারী বা পুরুষ পথে-পথে দৌড়াচ্ছে। দ্রুততার সাথে হাঁটছে। মানুষ ছুটছে। রুটিনমতো তা করতে হয়। এসব লোকদের শরীরটা সুস্থও থাকে বেশি।

এবার ডাক্তারদের কাছে এমনসব লোক আসতে শুরু করল, যাদের পায়ে সমস্যা। হাড়-জোড়াগুলোতেও নানান সমস্যা দেখা দিল। ডাক্তারগণ গবেষণা করতে লাগল। পরে খবর পাওয়া গেল, পা ও জোড়ায় সমস্যা যাদের, তারা ওইসব লোক, যারা বেশি দৌড়াত, যারা সকাল-বিকাল দৌড়াতে থাকত এবং জগিং করত। কারণ, দৌড়ানোর সময় দেহের চাপ এসে পায়ে পড়ত। ফলে পায়ের মধ্যে আঘাত লাগত। জোয়ানকালে তো বোঝা যেত না। কিন্তু যে-ই বুড়ো হতে শুরু করল, তখন সেই ব্যথা ও আঘাত মাথা চাড়া দিয়ে প্রকাশিত হতে লাগল। তখনই বোঝা গেল, পায়ের ওপর চাপটা বেশিই পতিত হয়েছে। হাড়ের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম থাকে, তা বেশি খরচ হয়ে গেছে। ফলে পা অকেজো হতে চলছে।

এই সমস্যা দেখা দেওয়ার পর ডাক্তারগণ বলতে শুরু করেছে, জগিং থেকেও Brisk wolk উত্তম। প্রাতভ্রমণে দ্রুত সঞ্চালনার সাথে হাঁটাও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। Brisk wolk বলা হয় একটু দ্রুত হাঁটাকে। একবারে দৌড়ানোও নয়। আবার একেবারে ধীরশতে হাঁটাও নয়। সামান্য দ্রুত গতির সাথে হাঁটা। ডাক্তারদের রিচার্স অনুযায়ী মানুষের জন্য উত্তম হলো দ্রুত গতিতে হাঁটা এবং এটাই উত্তম ব্যায়াম।

এদিকে আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই, নবীজি আলাইহিস সালাম যখন চলতেন, তখন এত দ্রুত চলতেন যে, মনে হতো যেন তিনি নিচ থেকে ওপরে বা উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানে অবতরণ করছেন। অর্থাৎ– যেমন মানুষ উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে অবতরণ করে, তেমনই একটু গতির সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা হাঁটতেন। আজ বিজ্ঞানের দীর্ঘ গবেষণা নানারূপ টালবাহানার পর একথাই প্রমাণিত হলো যে, নবীজির তরিকায় দ্রুত গতির সাথে হাঁটা-ই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

হালকা ব্যায়াম ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

একটা সময় এমন ছিল, যখন বলা হতো, মানুষের উচিত সকাল বেলা উঠে ব্যায়াম করা। তো এ লক্ষ্যে মানুষ নিজেদের ঘরে ব্যায়ামের মেশিন সংগ্রহ করেছে। নারী-পুরুষ সকলেই ব্যায়াম করত। নারীরাও দৌড় ইত্যাদিতে মশগুল হতো। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান তো ভিন্ন তথ্য প্রদান করতে শুরু করেছে। বর্তমান বিজ্ঞান বলে–

২৪ ঘণ্টার কোনো একটা সময়ে দীর্ঘক্ষণ ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বরং সারা দিনের মধ্যে কিছু সময় পরপর হালকা ব্যায়াম করাই স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে উপকারী এবং এটিই স্বাস্থ্যের অনুকূল পদ্ধতি।

কারণ, ব্যায়ামের মূল বিষয় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ানো। স্পন্দন ও ধপধপানি হৃদয়ের মধ্যে সাধারণত ৭০বার করে হয়ে থাকে। অথচ ব্যায়ামের কারণে ১২০ পর্যন্তও হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হতে পারে। ১২০ পর্যন্ত প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হওয়াটাই স্বাস্থ্যের জন্য সর্বোচ্চ উপকারী সংখ্যা। কিন্তু এর চেয়ে বেশি হয়ে গেলে তা আবার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি হৃদয়ের গণনা সংখ্যা ১৫০ সংখ্যায় দাঁড়ায়, তাহলেই তা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়। আর যদি সংখ্যাটা ১৭০ -এ দাঁড়ায়, তাহলে তো আরও ক্ষতিকর হয়ে যায়। আর যদি এই সংখ্যা ১৮০ তে চলে যায়, তাহলে হার্টের প্রবলেম আছে ধরে নিতে হবে। তাই ব্যায়াম বেশি হলে ধপধপানিটাও বেড়ে যায়। তাই ডাক্তাররা বলেন, এ-পরিমাণ ব্যায়াম করবে যে, স্পন্দিত হওয়ার সংখ্যাটা অন্তত ১২০-এর ভেতর থাকে।

আমাদের হৃৎপিণ্ড একটা পাম্পের মতো। এটা একবার প্রসারিত হয় আবার সংকুচিত হয়। এভাবেই চলতে থাকে। এভাবেই এই হৃৎপিণ্ড প্রাণীর দেহে রক্ত সঞ্চালনা অব্যাহত রাখে। রক্ত সাপ্লাই দিতে থাকে।

যখন হৃৎপিণ্ডের শক্তি বেড়ে যায়, তখন স্পন্দনের সংখ্যা ৭০ থেকে ১২০-এ গিয়ে দাঁড়ায়। এতে রক্তের ধারা ও প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। রক্তের সঞ্চালনার গতি বেড়ে যায়। এতে আমাদের শিরা-উপশিরা ও রগের মধ্যে রক্ত চলাচলের পথে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে এই

দ্রুত সঞ্চালনা এবং এই তীব্র গতি ও প্রবাহ সেই প্রবিতবন্ধকতাকে ধাক্কা মেরে দূর করে দেয়। আমাদের শিরা-উপশিরা তখন সচল হয়ে ওঠে। আপনারা পানি চলাচলের পাইপ নিশ্চয় দেখেছেন। এটা কোনো অংশে সাধারণ কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে জোরে পানি প্রবাহিত করলে প্রতিবন্ধকতাটা দূর হয়ে যায় কি-না। নিশ্চয়। ঠিক তেমনি আমাদের অবস্থাও। যখন আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন ১২০ সংখ্যাতে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন শিরা-উপশিরার সকল বাঁধন সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে যায়।

তাই ব্যায়াম এমন পরিমাণে করা উচিত, যাতে দেহের ওপর চাপ পড়ে পরিমাণমতো। এমন যেন হয় যে, তার দ্বারা ১২০ সংখ্যক পরিমাণে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়। বেশি যেন না হয়ে যায়। এত বেশি ব্যায়াম করবে না যে, ১৫০-১৬০-১৭০ পরিমাণে স্পন্দনের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায়। তাই তো ডাক্তারগণ বলেছেন, একটা সময়েই বেশি ভারী ব্যায়াম করে ফেলবেন না। বরং হালকা ব্যায়াম করা হবে এবং তা কয়েক ঘন্টা পর পরই করবে। কয়েক ঘন্টা পরপরই রক্ত ধারা চালু করার জন্য সামান্য ব্যায়াম করে নেওয়াই স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী।

আমার এক বন্ধু জাপান গেল। সেখানে কয়েকজন ডায়রেক্টরের সঙ্গে তার মিটিং ছিল। মিটিংয়ে সে এক-দুই ঘন্টা বসেছিল। তারপর ওই বন্ধু বলল, কিছুক্ষণের জন্য সকলকে ব্যায়াম করার জন্য ছুটি দেওয়া হলো।

বন্ধু বড় হতবাক হলো। দেখল, জাপানি মানুষগুলো নিজ-নিজ চেয়ারের পাশেই হাত পা ওপর-নিচ করে করে ব্যায়াম করতে লাগল। হালকা ব্যায়াম করে নিল সকলে। সময় শেষ তো সাথে সাথে সকলে চেয়ারে বসে গেল। তারপর আবার দীর্ঘ দু-তিন ঘন্টা মিটিং করল। তারপর আবার আগের মতোই হালকা ব্যায়ামের ছুটি দেওয়া হলে আবার সকলে হালকা ব্যায়াম করে নিল। এভাবে বিরতি দিয়ে দিয়ে ব্যায়াম করার ছুটি দিয়ে দিয়ে মিটিং চলতে থাকল।

বন্ধু বলেন, আমি তাদের বললাম, কেন এমন করা হলো? তারা উত্তর দিল, মডার্ন রিচার্স-এর মাধ্যমে প্রমাণিত, এক সঙ্গে বেশি পরিমাণে ব্যায়াম করা ক্ষতিকর। তাই বারবার হালকা-হালকা ব্যায়াম করা উচিত। কয়েক ঘণ্টা পরপর হালকা ব্যায়াম করতে পারলেই শরীর বেশি সুস্থ থাকে। আমার বন্ধু বলল, একথা শুনে আমি অন্তরে-অন্তরে একথা ভাবতে লাগলাম যে, এই লোকগুলো দিনে চার-পাঁচবার ব্যায়াম করে। এরা যদি মুসলমান হয়ে যেত

এবং দিনে অন্তত পাঁচবার নামায পড়ত, তাহলেই তো তাদের সেই হালকা ব্যায়ামের কাজ হয়ে যেত। আর আখেরাতের পথের প্রাপ্তিও সংগ্রহ হয়ে যেত। কথা তো বাস্তব। আমরা কতটা অজ্ঞাতসারে হালকা ব্যায়ামের কর্মটা নামাযের মাধ্যমে করে ফেলছি। আল্লাহর হুকুম মান্য করে আজ আমরা এই মহা নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহু আকবার!

নতুন চাঁদদর্শন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা

আমি একটি সাইন্সের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। আশা করি উপকারে আসবে সকলের।

রমযান শরীফের রোযার ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ

'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো আর চাঁদ দেখেই রোযা সমাপ্ত করো।'

আজকাল চাঁদ দেখা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। এ-ক্ষেত্রে দুটা মতবাদ তৈরি হয়ে আছে। এখন একদল বলতে লাগল, আমরা চাঁদ দেখলেই পরে রোযা রাখব এবং চাঁদ দেখলেই পরে রোযা ভঙ্গ করব। এই দলটিই সঠিক পথে আছে।

আবার একটি নতুন দল আত্মপ্রকাশ করল। এরা বলতে লাগল, এখন তো মানুষ চাঁদের দেশে চলে গেছে। তাই আমরা অতি সহজেই সারা বছরের কার্যক্রমকে সিডিউল করে নিতে পারি। কোন দিন চাঁদ উঠবে তাও তো আমরা বুঝব। তাই সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের কার্য পরিচালনা করব। আজকের এই যুগে আর চাঁদ দেখার প্রয়োজন নেই। দেখুন, এই মতাদর্শের ওপর এখন আমলও চলছে। কিছু দেশে এমন হয় যে, রমযান মাস শুরু হওয়ার বহু আগে মানুষ বলে দেয়, অমুক দিন তারাবীহ হবে। অমুক দিন ঈদ হবে। তাই তো নানা দেশে দুভাবে এখন ঈদ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় এই নতুন দলটি বলে কি, এখন তো আমরা কম্পিউটারেই সব নির্ণয় করে ফেলতে পারি। সবই আমরা এখন আগে থেকেই জেনে যাই ও বুঝে যাই। সারা বিশ্বের জন্য চাঁদ উদয় নির্ণয় করা এখন সময়ের ব্যাপার শুধু। তো তারা তাদের এই চাঁদের তথ্য দিচ্ছে যে, এখন চাঁদের খবর আসমানের দিকে সামান্য উঠলেই পাওয়া যায়। এ-খবরের ভিত্তিতে তারা বলে বেড়ায়, অমুক দিন রোযা শুরু হবে। অমুক দিন ঈদ সংগঠিত হবে।

একবার আমি এমন এক জায়গায় গেলাম, যেখানে অভিজ্ঞ ২৭ জন মেডিকেল ডাক্তার বিদ্যমান ছিল। তাদের মাঝে আমার বয়ান করার সুযোগ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এমন মেহেরবানি করলেন যে, পরে তারা সব ডাক্তারই বাইআত হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের জিন্দেগি বদলে দিয়েছেন।

সেখানে এই নব চাঁদ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তারপর ওই ডাক্তাররা বলতে লাগল, হযরত! আজকের এই আধুনিক যুগে চাঁদ দেখার জরুরত কী? আমাদের তো এখন আধুনিক প্রযুক্তিগত জিনিস-পত্রের অভভা নেই। আমি বললাম, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ

'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখে রোযা রাখা ক্ষান্ত করবে।'

এজন্য আমাদের সামনে তো একটি অতি সহজ ও সরল মূলনীতি আছেই যে, আমরা ওই হাদীছের ওপর আমল করব। তাদের মধ্যে থেকে একজন ডাক্তারের কুরআন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান ছিল। তিনি বললেন, আজকের যুগেও আপনি এমন কথা বলবেন? অথচ আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পারদর্শী। আজও কি চাঁদ দেখার প্রয়োজন রয়েছে? আজ তো বান্দারা আগে থেকেই কোন দিন কী হবে সে সংবাদ লাভ করে ফেলতে পারে অতি সহজেই। তাই অবশ্যই জেনে থাকবে চাঁদ কোন দিন উদিত হবে।

এসব কথা শুনে আমি তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। আমি বললাম, আমাদের সামনে কিছুকাল পূর্বে এই সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল। আমরা বললাম, আমরা নিজেরা এটা নিয়ে রিচার্স করে দেখব, বাস্তবতা কী? দেখা গেল, চাঁদের দিনগুলো পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর শেষ একটি দিন এমন হয় যে, চাঁদ দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। এটি কালো ও ঘোর অমানিশায় ডুবে থাকে। দৃষ্টিগোচর হয় না। সাইন্সের পরিভাষায় একে Birth of new moon (নতুন চাঁদের জন্মদিন) বলা হয়। নতুন চাঁদের জন্ম দিন এটি। এই ব্যাপারটি বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের ভাইয়েরা ভুল করে ফেলেন। তারা Crest যে চাঁদ সেই চাঁদকে নব চাঁদ বলে দেন। অথচ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা কিন্তু নব চাঁদ নয়। আরবিতে হিলাল তথা চান্দ্রমাসের প্রথম চাঁদ এবং নব চাঁদের মাঝে প্রভেদ আছে। চাঁদ যখন কমতে-কমতে এক সময় দৃষ্টির

আড়ালে চলে যায়, তখন সেটাকে বলা হয় Birth of new moon। তখন চাঁদ জন্ম গ্রহণ করে।

চাঁদ একটা সময়ে মানুষের সামনে আসার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন চাঁদ মানুষের চোখে ধরা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। অনেক সময়েই চাঁদের জন্ম নিতে ২০ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আবার কখনও-কখনও ১২/১৪ ঘন্টাতে হয়ে যায়। এ-সময়টা চাঁদ দেখা যেতেও পারে। আবার দেখা নাও যেতে পারে। এবার বলুন ওই সময়টার ব্যাপারে বিজ্ঞান কী সমাধান পেশ করবে?

একবার এমন একটি কঠিন সমস্যা আমেরিকায় দেখা দিল আর ঘটনাচক্রে আমিও তখন আমেরিকায় ছিলাম। আমাকে সকলে একই প্রশ্ন করছিল যে, বলুন, চাঁদ কি তখন দেখা যাবে? না, দেখা যাবে না। যদি বলেন, চাঁদ দেখা যায়, তাহলে তো আমরা সে হিসেবে রোযা রাখব, ঈদ পালন করব। আর যদি বলেন, চাঁদ দেখা যায় না, তাহলে তো আমরা রোযা রাখব না, ঈদ করব না। তাদেরকে আমরা জবাব দিয়েছি, আমরা চাঁদ দেখার চেষ্টা করতে থাকব এবং এই প্রচেষ্টা এখনও আমাদের অব্যাহত আছে ও থাকবে। যেন সুন্নাতের ওপর আমল হয়ে যায় এবং আমরা Space museum তথা চাঁদহীন দিন বা সময়ের ব্যাপারে অবগত হতে পারি।

ওয়াশিংটনে কয়েকটা জাদুঘর আছে। সেগুলোকে Smithsonion Scries of mouseums বলা হয়। সারা দুনিয়ার মানুষ এই জাদুঘরগুলো দেখার জন্যে গমন করে। সেগুলোর মধ্যে একটি আছে Space museum শূন্য জাদুঘর। সেখানে এমন একটি ডিপার্টমেন্ট আছে, যেখান থেকে শূন্যে চলমান সর্ব প্রকার আবর্তন-বিবর্তন এবং মহাশূন্যের সর্বপ্রকার সংবাদ সংগ্রহ করা যায়।

আমি আমেরিকায় ছিলাম। আমি এই মহাশূন্য জাদুঘর তাদের ভাষায় যেটাকে স্পেস মিউজিয়াম বলে। আমি সেখানে ফোন করলাম। সেখানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমি নিজে কথা বললাম। তাদের আমি বললাম, আমি আমেরিকার অমুক স্থানে আছি। এই সময়টায় কি আমি Crest moon হেলাল চাঁদ বা নব চাঁদ দেখতে পাব? তারা আমাকে সন্ধান দিল, চাঁদ ঠিক যে দৃষ্টিতে চলছে, এটি এমন একটা অবস্থা যে, চাঁদ দেখা যেতেও পারে আবার দেখা নাও যেতে পারে। আমি বললাম, খুলে বলুন–

তারা আমাকে একটা মোটা কথা বোঝাল। বলল, চাঁদটা যে-কক্ষপথ হয়ে চলছে, সেটা একটা মাত্র পথের মতো নয়। বরং এভাবে বুঝে নিন যে,

পাঁচশত কি.মি-এর একটি দীর্ঘ প্রশস্ত স্থান। এই স্থানটির ভেতর দিয়ে চাঁদটি পথ অতিক্রম করবে। অর্থাৎ– নিকটবর্তী স্থান হয়ে কাছাকাছি জায়গা দিয়েও অতিক্রম করতে পারে আবার দূরবর্তী স্থান হয়েও অতিক্রম করতে পারে? আবার মনে করুন, ওই কক্ষপথ তো সাধারণ একটি রেখা মাত্র নয়। কয়েক কিলোমিটার প্রশস্ত সেই কক্ষ পথ। সেখানে চাঁদ একেবারে ঠিক ঘুর্ণয়নশীল জিনিসের মতো চলছে না। তাই কাছ দিয়েও যেতে পারে আবার দূর দিয়েও যেতে পারে। এজন্য যে, চাঁদের মধ্যে প্রকম্প আসে। চাঁদের নিজের মধ্যে কয়েকটি প্রসেস হতে পারে। মনে হয় যেন চাঁদ তো নয়, কক্ষপথ হয়ে চলছে এটম বোমা।

তাই চাঁদের পজিশন নানা রকমের ও নানান ধরনের হতে পারে। সুতরাং আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারছি না, চাঁদটি ঠিক দেখা যাবে কি-না।

তাদের একটি Novel observatory সামুদ্রিক বিষয়ের গবষেণা কেন্দ্র আছে। সমুদ্রে অবস্থানকারীদের চাঁদের তথ্য আদান-প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কারণ, চাঁদের ১৪তম তারিখে High tide জোয়ার-ভাটা এসে থাকে। High tide এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ-সময়টাতে সমুদ্রের তর্জন-গর্জন ও উত্তাল অবস্থা বেশি থাকে। তাই জাহাজের পরিচালকদের এই সংবাদ থাকতে হয় যে, High tide কবে হবে। Low tide এবং অর্থাৎ নিম্ন চাপ কবে হবে। তাই ওই গবেষণাকেন্দ্র থেকে জাহাজচালকগণ চাঁদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়। তাই তো আজকের পৃথিবী বলে দিচ্ছে, We trace each inch the trajectory of moon আমরা চাঁদের দেশে চাঁদের এক একটি ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা নিয়েও গবেষণা চালাচ্ছি।

তাই আমাদের কাছে চাঁদের ব্যাপারে সর্বদা তাজা-তাজা খবরাখবর বিদ্যমান থাকে। আমি নিজে ওই সামদ্রিক বিষয়ে গবেষণাকেন্দ্রে ফোন করেছি। তারা সংবাদ দিল, আমাদের কম্পিউটার সেকশন এর মাধ্যমে আপনাকে এর জবাব দেওয়া যাবে। ফলে আমিই কম্পিউটার সেকশনে যোগাযোগ করলাম। আমি বললাম, অমুক স্থান থেকে বলছি, আমি আজই আমার চোখে চাঁদ দেখতে চাচ্ছি। আপনি বলুন, এখন এই চান্দ্রমাসের শেষ মুহূর্তে নতুন মাসটির চন্দ্র দেখার জন্য আমি কী করতে পারি এবং কীভাবে চাঁদ দেখতে পারি। সেই অফিস থেকে বলা হলো, আরে ভাই! আমরা তো তা বলতে পারব না। কারণ, এখন মাসের এমন অবস্থা যে, চাঁদ দেখা যেতেও পারে, নাও দেখা যেতে পারে। আমি বললাম, ব্যাপারটি এমন কেন?

তারা আমাকে অফিস থেকে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করল এবং আমার সামনে বিস্তর ব্যাখ্যা তুলে ধরল।

তাদের বক্তব্য এমন–

দেখুন, আমরা যখন চাঁদের Trajectory তথা কক্ষপথ পরিমাপ করি। তখন কিন্তু আমাদের সামনে একেবারে সুস্পষ্ট কোনো সংবাদ সাথে-সাথে উদ্ভাসিত হয় না। আমাদের কাছে একটি mather matical model আছে। এটাকে আমরা mather moticel simulatroও বলে থাকি। ওটা-ই কিন্তু অ্যাকুয়েশেনস। এর একটা হিসাব-নিকাশের ব্যাপার আছে। সেই mather moticel equations পরিমাপ হচ্ছে ১০,০০০ অ্যাকুয়েশন্স। একে আমরা ক্যালকুলেট করে, হিসাব ও প্লাস-মাইনাস করে বলতে পারব, ঠিক চাঁদটি এখন কোথায় আছে। কিন্তু তার মধ্যে Six thous and vriables তথ্য ৬,০০০ আবর্তন ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যে-ব্যক্তিরা mather matics ম্যাথমেটিকস নিয়ে পড়াশোনা করে, তারা জানে, কিছু তথ্য সুনির্দিষ্ট এবং তার নিজস্ব পরিমাপ আছে। যেটা একেবারেই স্থির। আবার কিছু variables তথ্য আবর্তন ও বিবর্তনশীল পরিমাপ আছে। তো তথাকেন্দ্র থেকে আরও বলা হয়েছে, ৬ হাজার আবর্তনশীল পরিমাপক তার রয়েছে এবং কোনো একটা অবর্তনের অবস্থানের মাঝেই পরিবর্তন এসে যায়। তথ্যকেন্দ্র থেকে বলা হলো। যেহেতু চাঁদের কক্ষপথেই অবর্তন করার পরিমাপটা ৬ হাজার এবং হাজার স্থানের কোনো একটি হয়েই চাঁদ অগ্রসর হতে পারে এবং চলে যেতে পারে, তাহলে কে কীভাবে গ্যারান্টি দিয়ে বলবে যে, চাঁদটা এই সময়ও এ এই দিনে ঠিক এই স্থানে আছে বা থাকবে? তাই আমরা ১০০% গ্যারান্টির সাথে বলতে পারি না, চাঁদের অবস্থান কোথায়। যদিও আমরা আজ চাঁদের দেশেও পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি। আমরা তো চাঁদের ওইসব আবর্তিত অবস্থার ওপর গবেষণা করেই একটি সিদ্ধান্ত দিতে হবে এবং দিতে হয়।

আমি সঙ্গে-সঙ্গে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলাম, আমার জান, আমার প্রাণ কুরবান হয়ে যাক আমার প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যারা মহাবিজ্ঞানী হয়ে আজ চাঁদের দেশে পৌঁছে গেছে, আজ তারাও মেনে নিচ্ছে, ছয় হাজার আবর্তনশীল পথ রেখার মধ্যে থেকে প্রত্যেকটার মাঝেও পরিবর্তন আসতে পারে এবং এর কারণে চাঁদের লোকেশন ও ঠিকানা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই আমরা অ্যাকুয়েশন্স-এর ওপর কোনোরূপ ভরসা

করতে পারি না। যদি এর কোনো ফয়সালা বা সমাধান করতে হয়, তবে তা এভাবে করতে হবে যে, আমরা বাহ্যিক অবস্থাটা দেখে সমাধান পেশ করতে হবে। বাহ্যিক অবস্থা ছাড়া সমাধান করার আমাদের আর পথ নেই। একথাটাই বলে গেছেন আমাদের নবীজি সেই চৌদ্দশত বছর আগে–

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা সমাপ্ত করো।

বোঝা গেল, এই যে এত-এত রিচার্স, এত-এত গবেষণা, এত কিছুর পরও কী করতে হলো? অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের পেয়ারা হাবীবের সুন্নতই মানতে হলো।

তো সামুদ্রিক বিষয়ের গবেষণা কেন্দ্র থেকে আসা তথ্য শুনে আমরা এখন অবলীলায় বলতে পারলাম, নতুন করে প্রমাণিত হলো, আমাদের নবীজির কথাই বিন্দু-বিস্বর্গে সত্যে পরিণত হলো। বোঝা যায়, আমরা বিজ্ঞানের যতই পারদর্শী হই, শেষ পর্যন্ত তো আমাদের প্রিয়তম নবীর সামনেই হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। আমাদের সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের কথাই তো শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়।

হে নব প্রজন্ম! হে তরুণদল! আমরা সাইন্স পড়ছি। তবে আমাদের তো উচিত সাইন্সের সাথে আমাদের নবীজির সুন্নাতের সাইন্স নিয়েও পড়াশোনা করা। নবীজির সুন্নাতের যে অফুরন্ত ফায়দা ও কল্যাণ তা অনুভব করবার চেষ্টা করা। মানবের সামনে, জনতার সামনে, সুন্নাতের সেই অবরিত সাফল্য ও সউষ্ণ প্রাপ্তিকে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করা, যেন সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে জিন্দেগি পরিচালনাকারী আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং অনুপ্রেরণার সাথে সুন্নাতের অনুসরণ করে চলতে পারে। কারণ, তারা তো সুন্নাত না মেনে দুনিয়াবি লোকসান ও পার্থিব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে আবার আখেরাতের লোকসান ও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

এসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোর ফায়দা ও লাভের কথা চিন্তা করুন। তাদের সুন্নাতের পথে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করুন। যে-মানুষটা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করছে, বিজ্ঞানের আলো তার কাছে পৌঁছতে পারেনি, তাহলে তাকে তামাম দুনিয়া ও পার্থিব বিষয়সমূহ কোনো উপকার প্রদান করতে পারল না ঠিক; কিন্তু আমাদের প্রিয়তম মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক সুন্নাত ওই মানুষটাকেও উপকৃত করতে পারে। দুনিয়ার সকল উপায় ও উপকরণ থেকে বঞ্চিত মানুষটাকেও আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সর্বপ্রকার সহায়তা করে সাহায্য করে এবং লাভবান করে।

যদি সেই পাহাড়ের চূড়ায় বসেও লোকটি সুন্নাত মতো আমল করে, সেখানে বসেও সে ফায়দা পাবে। সমগ্র মানবসভ্যতার করুণার আধার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শে রয়েছে মানবতা ও কৃষ্টি-কালচারের অফুরন্ত ফায়দা ও উপকারের উপকরণ। অন্তত এজন্যেও তো আমাদের উচিত হবে, আপন মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক-একটি সুন্নাতের ওপর আমল করে আল্লাহর নৈকট্য ও গ্রহণযোগ্য হয়ে যাই আবার জাগতিক উপকার ও ফায়দাও প্রাপ্ত হয়ে যাই।

নামাযের রাকাতসমূহ ও বিজ্ঞানের গবেষণা

যখন মানুষ রাতে নিদ্রা যায়, তখন তার রক্ত সঞ্চালনাও কমে যায়। আর যখন নিদ্রা থেকে মানুষ সকালে ওঠে, তখন শরীরের মধ্যে সুগার লেভেল ডাউন হয়ে যায়। তার ব্লাডপ্রেসারও কিছুটা ডাউন হয়ে যায়। তাই ডায়বেটিক রোগীদের ডাক্তার বলে থাকেন, সকালে উঠেই আপনারা আপনাদের ডায়বেটিক চেক করাবেন। কতটুকু ডাউন হলো দেখবেন। আবার এই সময়টাতে যখন ডায়াবেটিকও ডাউনে থাকে আবার ব্লাডপ্রেশারও ডাউনে থাকে, তখন এগুলোর সঠিক ক্রিয়াশীলতা ও সঞ্চালনা শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য চাই ব্যায়াম। আল্লাহ ব্যায়ামের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এই ব্যায়ামকে ফজর নামায বলি। এই নামাযের রাকাতসংখ্যা মাত্র চার। কারণ, লেভেল তো ডাউন হয়েই আছে। তাই ব্যায়াম একেবারে বেশি করবার দৈহিক কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেইমাত্র দিন এসে গেল, আমরা নাস্তা খেলাম। আবার দুপুরের খাবার খেলাম। এখন দুপুরের খাবারের পর তো আমাদের ডায়াবেটিক ও ব্লাডপ্রেশার দুটাই হাই হতে শুরু করে। তখন আল্লাহ তা'আলা কিছু পরিমাণ বেশি রাকাতওয়ালা একটি নামাযের নির্দেশ দিলেন, আমরা যাকে যোহর নামায বলি। ১২ রাকাত নামায এ ওয়াক্ত পড়তে হয়। কারণ, হ্যাঁ, যেন বলে দেওয়া হচ্ছে, আরে ভাই! এখন আর তোমার চার রাকাতে কাজ হবে না। তুমি খাবার গ্রহণ করেছ। শীরের এখন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। তুমি এই নাস্তা খেয়েছ, ওই আইসক্রীম খেয়েছ, চা খেয়েছ। তাই এখন চার রাকাত নয় ১২ রাকাত পড়াই তোমার কাজ। তাই তুমি ১২ রাকাত নামায পড়ো। এদিকে আমরা যখনই বারো রাকাত নামায পড়ে নিই, তো আমাদের ডায়াবেটিক ও ব্লাডপ্রেশার নিয়ন্ত্রণে আসতে সহায়তা করে।

আবার আসর নামাযের সময় বারো রাকাত নামাযের প্রয়োজন নেই। বরং ৮ রাকাতের জরুরত। তবে ৪ রাকাত দিয়েও কাজ হয়ে যাবে। আর বাকি চার রাকাত যদি পড়তে পার, তাহলে ভালো না পড়তে পারলে সমস্যা নেই। অর্থাৎ– চার রাকাত ফরজ এবং বাকি চার রাকাত সুন্নাত এবং এটা গায়ের মুআকাদ্দা। অর্থাৎ– আসরের সময় ব্যায়ামের পরিমাণটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এবার এই আসরের নামাযের পর আমরা কিছু নাস্তা করি। বিকালে উত্তপ্ত চায়ের কাপে চুমুক দেই। বিস্কুট-পানি গ্রহণ করি। তারপরই সূর্যডুবি হয়। এবার হুকুম দেওয়া হয়েছে মাগরিব নামায আদায় করতে। ৭ রাকাত নামাযের বিধান দেওয়া হয়েছে এখানে। কারণটা হচ্ছে, চা হলো, বিস্কুট হলো, হালকা কিছু নাস্তা পানি হলো। এর ফলে শরীরের কোলেস্টরল লেভেল এমন হাই হয়ে গিয়েছে যে, এখন শরীরই দাবি করে পূর্বের তুলনায় এখন ব্যায়ামটা একটু বেশি হোক। তাই এখন ব্যায়ামটা একটি বেশি হোক। তাই এখানে এখন আগের তুলনায় কিছুটা বেশি ব্যায়াম দেওয়া হয়েছে। শরীরের চাহিদা মোতাবেক এখানে ৭ রাকাত আদায় করতে হয়। পারলে আরও কিছু আওয়াবিন পড়তে পারলে ভালো।

এবার মাগরিবের পর সকল কাজ শেষ করে আমরা ডিনার করি। রাতে খাবার গ্রহণ করি এবং শয়নের জন্যে মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে যাই। বেশ জমজমাট একটি খাবার আমরা রাত্রে খাই। এবার শয়নের পূর্বে শরীরটাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করে তারপর শয়নের লক্ষেই আল্লাহ তা'আলা এখানে ১৭ রাকাত নামাযের আদেশ দিয়েছেন। দুপুরে খাবার হয়েছে আর তখন নামায ১২ রাকাত ছিল। আর রাতের খাবারের পর ১৭ রাকাত নামায দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, দিনে ১২ রাকাতের পর তো আমরা জাগ্রত থাকি, কাম-কাজ করি। সেখানে কোলেস্টরল লেভেল এবং সুগার লেভেল তথা ব্লাডপ্রেশার এবং ডায়াবেটিক হাই হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং রাতে তো খেয়ে-দেয়ে শুয়ে যেতে হবে। সেজন্য এখানের খাবারের পর ব্যায়ামের মাত্রা বেশি হওয়া চাই, যেন শরীরের ওপর এর কসরত বেশি পড়ে।

রামাযানুল মোবারকে আমরা সারাটা দিন রোযা রাখি। অভুক্ত থাকি। আর ইফতারের সময় হলে খেজুর খাই, শরবত খাই, রূহ আফজা খাই। কেউ কাবাব-কিমিয়া খাই। মোটকথা, সকলেই সাধ্য মতো ভালো কিছু খাওয়ার চেষ্টা করি রমযান মাসে। তাই এতো খাবার গ্রহণের পর শরীরের ব্লাড, ডায়াবেটিক সবই হাই হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। তাই এখন ১৭

রাকাতে আর চলবে না। ১৭-এর সঙ্গে আরও ২০ রাকাত তারাবীহ নামায পড়তে হবে। কারণ, কোলেস্টরল লেভেল ও সুগার লেভেল এখন অনেক হাই হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই এই সময়টাতে দৈহিক কসরত অনেক বেশি করতে হবে। তা না হলে শরীরের গতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে না।

আল্লাহর শান দেখুন! এক বান্দা তার আবাসস্থল থেকে সফরে বের হলো। মানুষটা যখন সফরে থাকে, তখন সে দৌড়ঝাঁপের ওপর থাকে। কখনও এ দিকে যায় কখনও সেদিকে যায়। এভাবে তার শীরের ওপর প্রচুর চাপ পড়ে, যার কারণে তখন আর শরীরের ডায়াবেটিকও বাড়তে পারে না, আবার প্রেশারও বাড়তে পারে না। বরং তখন এসবের পাওয়ার ডাউন হয়ে যায়। আমাদের দয়াময় আল্লাহ তো সবই জানেন, বুঝেন। তাই তিনি এ-সময়টাতে নামায নামক এই ব্যায়ামের পরিমাণটাও কমিয়ে দিলেন। জামাতের কষ্ট সে করতে বাধ্য নয় আবার চার রাকাতের নামায পড়তে হবে দুরাকাত। অর্ধেক তার জন্য মাফ করে দেওয়া হয়েছে। বোঝা গেল, আমাদের আল্লাহ আমাদের যে নির্দেশই দিচ্ছেন তার মধ্যে আমাদের মানব সমাজের কল্যাণ ও প্রশান্তিই নিহিত রয়েছে। তাই যদি আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও বরকতময় সুন্নাতের ওপর আমল করতে পারি এবং এভাবে সুন্নাত তরিকা মতো জীবন পরিচালনা করতে থাকি, তাহলে অতি স্বাভাবিকভাবে এমনিতেই কিছু ফায়দা আমরা পেয়ে যেতে সক্ষম হব। সেসব ফায়দার খবর আমরা বুঝতে পারি আর নাই পারি। আজ আমরা দুনিয়ার দুয়ারে দুয়ারে শান্তি ও প্রশান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি এবং বারবার বান্দার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ব্যর্থ ও প্রতারিত হচ্ছি। শেষ পর্যন্ত সব স্থান থেকে ব্যর্থ হয়ে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পথ ও পদ্ধতির সামনেই মাথা নত করে দিতে হয়। ইসলামের সামনেই মস্তক অবনত করে দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কদমেই নিজেকে সঁপে দিতে হয়। নবীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলতে হয়।

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی

کرے جرم خانہ خراب کو ترے عفو بندہ نواز میں

শান্তি ও প্রশান্তি তো পাইনি কোথাও। তোমারই পথে পেয়েছি দিশা। তোমার রাহে চলে আজ হয়েছি আমি রাহী। আমার ওই গুনাহের ঘর গোনাহের মনযিল তোমারই দয়া ও ক্ষমাধন্য।

বড়-বড় বিজ্ঞানী আর মহাপণ্ডিতদের ওইসব রিচার্স আর গবেষণাগুলো আজ কোথায়?

আমি তো দেখতে পাচ্ছি, সব গবেষণা ও পাণ্ডিত্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। এসেই সাজারায়ে তাইয়েবা সেই পবিত্র বৃক্ষের নিচেই সবাই আশ্রয় গ্রহণ করছে। আল্লাহ তা'আলা সেই গাছের ছায়ায় আমাদের আগেই আশ্রয় দিয়েছেন। আর ওরা বান্দার দুয়ারে-দুয়ারে ফিরে-ফিরে ব্যর্থ হয়ে এখন এসেছে এই সুশীতল শান্তিময় ছায়ায়। আল্লাহ সকলকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক জীবন যাপন করে দুনিয়াতেও সাফল্য ও কামিয়াবি অর্জনের তাওফীক দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ ও সাফল্য অর্জনের তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ইল্‌ম ও জ্ঞানে বড় হও

'আত্মপূজা, রিপুপূজা, পুরুষপূজা, নারীপূজা সব মূর্তিপূজার মতোই হারাম। রব্বে কারীমের পূজারি হওয়া এক ভিন্ন জিনিস।

আমাদের রবপূজা শিখে নিতে হবে। নিজের কামরিপুর পূজা না করা উচিত। রব্বে কারীমের মর্জিমতো আমল করা আমাদের জন্য আবশ্যক। এটি অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। যে তালিবুল ইল্‌ম তার নফসের লাগাম টেনে ধরতে পারবে, নিজের নফসের গলায় যে লোহার শিকল বেঁধে দিতে পারবে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দানের দুয়ার, ইল্‌মের দুয়ার খুলে যাবে।

যদি এই তিন জিনিস আমাদের এসে যায়, তাহলে আমরা ইল্‌মে-জ্ঞানে বড় হতে পারব, মহান হতে পারব। 'রাসেখ ফিল' ইল্‌ম তথা ইল্‌মে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে পারব।'

ইল্‌ম ও জ্ঞানে বড় হও

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ـ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرُ : وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ـ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخِرَ : كُوْنُوْا رَبَّانِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ـ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

কিতাবুল্লাহর সংরক্ষক

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ

'আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ফয়সালা দিত।'[১৩২]

رَبَّانِيُّوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য রবওয়ালা, আল্লাহওয়ালা। احبار শব্দটি حبر-এর বহুবচন। অর্থ ইল্‌মওয়ালা, জ্ঞানবান। তো এই ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা কিতাবুল্লাহর হেফাযত করবে। তারা কুরআনের প্রতিটি আয়াতের হেফাযত করবে। তারা প্রতিটি আলফায ও শব্দকে হেফাযত করবে। কুরআনে

---

১৩২. সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪

অর্থসমূহ হেফাযত করার দায়িত্বও এই ওলামায়ে কেরামের যেমনভাবে হাফেয সাহেবান কুরআনের শব্দগুলো হেফয করে সংরক্ষণ করে। আর ওলামায়ে কেরাম কুরআনের অর্থকে হেফাযত করে। তেমনিভাবে মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীছের শব্দকে হেফাযত করে এবং সংরক্ষণ করে। আর ফুকাহায়ে কেরাম হাদীছের অর্থ ও মর্মকে সংরক্ষণ করে। হাদীছ বলা হয় কথাকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যকে। আর ফিকহ বলা হয় রাসূলের ওই হাদীছের মর্ম ও অর্থকে। বলতে হয় ফিকহ বলা হয় হাদীছের বুঝকে।

فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا

ওই দলটির কী হলো যে, তারা কথা বুঝতে পারছে না।[১৩৩]

কোন কথার কী মর্ম এবং কোন কথাকে কীভাবে উপলব্ধি করবে সেই বিষয়টি শিক্ষা-দিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অর্জন করে নিতে হয়। যে-সন্তান আজ ছাত্র হয়ে ওস্তাদের সামনে পড়াশোনা করছে, সে-ই অনাগত ভবিষ্যতে দরসের মসনদে আরোহণ করে অন্যদের পাঠ দান করবে।

নিয়তের গুরুত্ব

প্রত্যেক আমলের শুরুটা হয় নিয়তের মাধ্যমে। তাই আজকের এই মাহফিলেও তোলাবায়ে কেরাম সহীহ নিয়ত করে বসা উচিত। মানুষ যে-পথ দিয়ে অতিক্রম করে যায়, তার পাশে নিচু একটি স্তূপ তার নজরে আটকে যায়। আর যে-পথ দিয়ে অতিক্রম না করে, সে পথের পাহাড়ও তার দৃষ্টিগোচর হয় না। নিয়তকে সহীহ করে নেওয়াই হচ্ছে আমলের মূল ভিত্তি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আমাদের আকাবিরীন হযরত নিয়তের আলোচনায় অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন।

নিম্নে কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো।

হযরত উমর (রাযি.) ইরশাদ করেছেন–

لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهٗ

যে বান্দার কোনো নিয়ত নেই, তার কোনো আমল নেই।

---

১৩৩. সূরা নিসা : আয়াত ৭৮

ইয়াহয়া ইবনে কাছীর (রহ.) ইরশাদ করেছেন, নিয়ত করা শেখো। কারণ, নিয়ত আমল করার চেয়ে বেশি ফযিলত ও মর্যাদা রাখে।

দাউদ তাঈ (রহ.) একজন বড় মাপের ওলী ছিলেন। তিনি ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ফিক্হের উদ্ভাবনকর্মে যে-মজলিস তৈরি করেছেন, সেই মজলিসের ৪০ সদস্যের একজন ছিলেন দাউদ তাঈ (রহ.)। সেই মজলিসের মধ্যে হযরত আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতো গভীর জ্ঞানের অধিকারী হাদীছবিশারদ ছিলেন। কাসেম ইবনে মুঈন ও মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহ.)-এর মতো আরবি ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন। ইমাম যুফার (রহ.)-এর মতো কিয়াস ও ইস্তেহসানের বাদশাহ ছিলেন।

সেই মজলিসে দাউদ তাঈ (রহ.)-এর মতো তাক্ওয়ার পাহাড় ছিলেন। এই দাউদ তাঈ (রহ.) বলেছেন–

حسن نیت پر خیر کا مجموعہ ہے

উত্তম নিয়ত সকল কল্যাণের সমষ্টি।

সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) বলেছেন, আমি আমার নিয়তকে পর্যবেক্ষণ করি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই করি। কারণ, নিয়ত সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকে। অর্থাৎ– আমি শুধু নিয়ত করেই বসে থাকি না। বরং নিয়তকে পর্যবেক্ষণও করে দেখি।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-এর নিকট এক বুযুর্গ আগমন করতেন। তাঁর নাম ছিল আবু হাশেম সূফী (রহ.)। ইমাম সাহেব বলতেন, যদি আবু হাশেম সূফী না হতো, তাহলে আমি রিয়া তথা লোকদেখানো বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় শিখতে পারতাম না।

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসে বোঝা যায় রিয়া কাকে বলে এবং একথাও বোঝা যায় যে, সহীহ নিয়তের মূল মর্ম কী?

ইউসুফ ইবনে আসবাত বলতেন, নিয়ত ঠিক করা বড়-বড় আমল থেকেও মুশকিল বিষয়।

ইমাম আযম (রহ.)-এর শাগরেদ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বলতেন,

নিয়ত সহীহ হলে ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত বড় আমলে পরিণত হয়। আর নিয়ত সহীহ না হলে বড় আমলও আল্লাহর নিকট মূল্যহীন আমলে পরিণত হয়।

ইল্‌ম অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়তের শাখা-প্রশাখা

ছাত্র ভাইদের নিয়ত কী হওয়া চাই?

কী হবে তালিবুল ইল্‌মদের নিয়ত?

আমরা আলেম হয়ে খতীব হব।

আমরা আলেম হয়ে ফকীহ হব।

আমরা আলেম হয়ে বক্তা হব।

আমরা আলেম হয়ে ইমাম হব।

না, না। নিয়ত তো বরং এমন হবে যে, আমরা ইল্‌ম শিক্ষা করে আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যতকে রাজি ও খুশি করব।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কোন কাজটি আমি কীভাবে কারতে পারব, কিতাব পড়ে তো আমি তা-ই শিক্ষা করব। এই ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্যই আমি ওস্তাদের খেদমতে হাজির হব। যখন আপনি এই নিয়ত্যের সাথে পড়বেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আমলের তাওফীকও দান করে দেবেন।

নিয়ত্যের শ্রেষ্ঠত্ব আমলের ওপর

সকল আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপর। একটি বাণী–

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ

মুমিনের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

১. মুমিন যখন কোনো নেক আমলের নিয়ত করে, সাথে-সাথে তার আমলনামায় একটি নেক ওই আমলের নিয়তের কারণে লিখে দেওয়া হয়। যদি পরে ওই আমলটি করা হয় এবং রিয়ার কারণে আমলটি অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়; অর্থাৎ– আমলের কারণে এ-ক্ষেত্রে তার ছাওয়াব যদি অর্জিত না হয়; কিন্তু সে নিয়তের কারণে তো ছাওয়াব প্রাপ্ত হচ্ছে।

২. দ্বিতীয় দিক এই যে, নিয়তের মাঝে স্থায়িত্ব আছে। নিয়তের মাঝে দৈর্ঘ আছে, গভীরতা আছে। আর আমলের মধ্যে তা নেই। কারণ, একজন মানুষ হয় শত বছর নেক আমল বাস্তবায়ন করতে পারবে। এর চেয়ে বেশি তো পারবে না। অথচ এই মানুষটি কোটি-কোটি, অজস্র-অগণিত নেক আমলের নিয়ত করতে পারবে। নিয়ত করতে তো বাধা নেই। এমনিভাবে গুনাহের কাজও একজন মানুষ বাস্তবায়ন করতে পারবে সর্বোচ্চ শত বছর। তো দেখুন, সারা জীবন বদ-আমল করার কারণে একটি মানুষ স্থায়ীভাবে

জাহান্নামী হয়। আবার শত বছরের এই জীবনটাতে নেক আমল করলে লোকটি জান্নাতী হয়। তো এই যে সীমাবদ্ধ জীবন এ-জীবনে নেক করার কারণে জান্নাতী হওয়া এবং বদ করার কারণে জাহান্নামী হওয়া এটা কেন?

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি শত বছর নেক কাজ করে কাটিয়েছে, তার দিলে নিয়ত ছিল এমন যে, যত দিন এ-জীবন বাকি থাকবে, তত দিন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুকুমের অনুসরণ করে যাব। এই যে অনন্ত এ নিয়ত এর কারণেই বান্দা অনন্তকাল জান্নাতে থাকবে। আর যে লোক শত বছর কাটিয়ে দিল গুনাহের কাজে তার নিয়ত ছিল, যত দিন এ জীবন আছে এভাবে পাপের পথেই চলব, গুনাহের পথেই হাঁটব। এই অনন্ত নিয়তের কারণে এ লোকটা অনন্তকাল জান্নাতে।

দেখুন, আমলের নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। কিন্তু নিয়তের কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। এতে বোঝা যায়, নিয়ত কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আমল থেকেও বেশি মর্যাদাবান হয়ে যায়।

ওলামায়ে কেরাম আরেকটি কারণ এই লিখেছেন যে, মানুষ আমল যেকোনো অঙ্গের মাধ্যমেই করতে পারে। আর নিয়ত শুধু কলবের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর কলব যেহেতু সকল অঙ্গের শ্রেষ্ঠ, তাই নিয়ত ও আমলের চেয়ে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ।

নিয়তের গরমিল আমলকে বরবাদ করে দেয়

আমার তালিবুল ইল্‌ম ভাইয়েরা! একটি কথা স্মরণ রাখবেন, সিরকা যেভাবে মধুকে বিনষ্ট করে দেয়, ঠিক সেভাবেই নিয়তের গরমিল মানুষের আমলকে বরবাদ করে দেয়। আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, মানুষ যদি ছটাকের ওজন হিসাব করে তার আমলের ওপর মেহনত করে, তাহলে মনের ওজন হিসাব করে তার নিয়তের ওপর মেহনত করা উচিত এবং জরুরি। আমাদের নিয়ত এমন হওয়া উচিত যে, আমরা যা কিছু করব আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাতের সন্তুষ্টির জন্য করব। তবে এর উদ্দেশ্য কখনও এ নয় যে, শুধু নিয়ত করলে কাজ হয়ে যাবে। নিয়ত করার নাম তো কাজ নয়।

মনে করুন, কেউ সফরের নিয়ত করেছে অমুক স্থানে; কিন্তু সে তার পা-ই নাড়াল না, একদম কদমই উঠাল না, তাহলে লোকটি তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। তেমনিভাবে মানুষ যদি শুধু তামান্না-ই করতে থাকে, জান্নাত পাব, জান্নাতে যাব; কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার কাজ না করে, তাহলে এটা হবে বেকুবি। কারণ, এর জন্য আমল জরুরি।

নেক আমলের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

এ-কারণেই ঈমান আনয়নের সঙ্গে-সঙ্গে আমলে সালেহ তথা নেক আমল করার জন্য বান্দাকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

পবিত্র কালামে ইলাহীতে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে আছে জান্নাতুল ফিরদাউস।[১৩৪]

আরেক স্থানে ইরশাদ হয়েছে–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

অতএব, যে-ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে।[১৩৫]

নেক আমলের কারণেই আল্লাহর দরবারে বান্দার জন্য ইয্যাত ও সম্মান নির্ধারিত হয়। তেমনিভাবে কাফেররা কেয়ামতের দিন আমল না থাকার কারণে অদ্ভুত রকমের পেরেশানির মধ্যে পড়ে যাবে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

যদি আপনি দেখতে পান ওই সকল পাপীদের, যারা আপন রব্বে কারীমের সামনে লজ্জার কারণে মস্তক অবনত করে দাঁড়াবে।[১৩৬]

আর তারা বলবে-

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا

হে আমাদের রব! এখন আমরা নিজেরাই দেখে নিয়েছি।[১৩৭]

وَسَمِعْنَا

এখন আমরা নিজেরাই শুনে নিয়েছি।[১৩৮]

---

১৩৪. সূরা মারয়াম : আয়াত ১০৭
১৩৫. সূরা মারয়াম : আয়াত ১১০
১৩৬. সূরা সাজদাহ : আয়াত ১০
১৩৭. সূরা সাজদাহ : আয়াত ১২
১৩৮. সূরা সাজদাহ : আয়াত ১২

فَارْجِعْنَا

আমাদের দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়ে দিন।[১৩৯]

نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

আমরা সৎ কাজ করব, আমাদের পূর্ণ ইয়াকীন ও বিশ্বাস অর্জিত হয়ে গেছে।[১৪০]

তো বোঝা গেল, কেয়ামতের দিন পাপিষ্ঠরা ও তামান্না করবে, আহ! আমাদেরও যদি নেক আমল থাকত। আমরা যদি নেক আমল নিয়ে আসতে পারতাম!

কেয়ামতের দিন মানুষ অনেক আফসোস করবে। সেজন্যেই তো কেয়ামত দিবসের আরেক নাম হচ্ছে يَوْمَ الْحَسْرَةِ তথা আফসোস দিবস! অনেক আফসোস হবে সেদিন। এই-এই নেক আমল যদি আমরা করতাম।

يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম।[১৪১]

يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

দুর্ভাগ্য আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।[১৪২]

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا

আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।[১৪৩]

বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আফসোস ওই আলেমের হবে, যাদের কথা শুনে লোকেরা আমল করেছে, জান্নাতে গেছে। অথচ সেই আলেম নিজে আমল না করার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই তো এক সাহাবি বলেন, অতি দ্রুত একটি যামানা এমন আসবে যে, তোমরা দেখবে, জাহেলরা বড় ইবাদাতগুজার হবে। আর সময়ের আলেমগণ বদকার

---

১৩৯. সূরা সাজদাহ : আয়াত ১২
১৪০. সূরা সাজদাহ : আয়াত ১২
১৪১. সূরা ফুরকান : আয়াত ২৭
১৪২. সূরা ফুরকান : আয়াত ২৮
১৪৩. সূরা ফুরকান : আয়াত ২৯

হবে। তাই ইল্‌মের ওপর আমল করে-করে জীবন পরিচালনা করা অত্যন্ত জরুরি। এটা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে জরুরত।

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

আমল দ্বারা জিন্দেগি গঠিত হয়। জান্নাতও পাওয়া যায় এবং জাহান্নামী হতে হয়।

যে আমল আজ আমরা করছি, সেই আমলই কেয়ামতের দিন আমাদের জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের ফয়সালা করবে।

আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, আমাদের প্রতিটি পদচারণা আমাদেরকে হয়তো জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দিচ্ছে অথবা জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিচ্ছে। যদি শরীয়ত মোতাবেক আমল করি, তাহলে জান্নাতের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আর যদি নফসের অনুসরণ করি, শয়তানের পথে চলি, তাহলে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

হাদীছের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়, ইল্‌ম অনুযায়ী আমলকারী বান্দা আল্লাহর বন্ধু। তাই প্রতিটি মানুষ আশ্রয় চাইবে যেন তার ইল্‌ম তার জিহ্বায়ই থেকে না যায়। বরং হৃদয়েও যেন ইল্‌মের প্রভাব পড়ে। আমাদের আকাবিরে কেরাম বলতেন, দুনিয়ায় প্রত্যেকটি মানুষেরই একটি প্রিয় কাজ ও প্রিয় বিষয় থাকে। আমাদের প্রিয় বিষয় ও প্রিয় কাজ হচ্ছে নেক আমল। যেখানেই নেক আমল দেখা যাবে, আমরা সেই নেক আমলটা কার্যকর করব।

তাই আমাদের উচিত নেক আমলের অন্বেষণে থাকা। যত বেশি নেক আমল করা যায় এর জন্য সচেষ্ট থাকা ব্যবসায়ী যেমন যেখানে লাভ দেখে, সেখানেই কাজ চালায়। নেক আমল আমাদের ব্যবসার মাল। যেখানেই লাভ দেখব, আমরা সেই লভ্যাংশ অর্জনের চেষ্টা করব। খুঁজে-খুঁজে নেক কাজগুলো আমরা আমাদের জীবনে বাস্তাবায়ন করব। একটি আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা সবার মাঝেই থাকে। সেই আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা আমরা নেক কাজে ব্যয় করব। মানুষের হাতে সময় কম থাকলে মানুষ একটু দ্রুত গতিতে কাজ করে। মনে করুন, ছাত্ররা যখন পরীক্ষা দেয়। হাতে যদি সময় কম থাকে, তাহলে সে দ্রুত লিখতে থাকে। আমাদের জীবনের সময় অনেক কম। এই দুনিয়াটা আমাদের পরীক্ষা হল। অল্প সময় অনেক সামানা এখান থেকে সংগ্রহ করতে হবে। তাই বেশি-বেশি নেক আমল করতে হবে। নেক আমলই আমাদের আখেরাতের সামানা। আবার সব সময় এমন আমল করতে চেষ্টা করব, যে আমলে কষ্ট কম হলেও ছাওয়াব বেশি পাওয়া যায়।

ইল্‌মে গভীরতা অর্জনে সহায়ক তিনটি বিষয়

তাফসীরে জালালাইন শরীফের টীকায় লেখা আছে, রুসূখ ফিল ইল্‌ম তথা গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্য তিনটি জিনিস জরুরি।

১. তাক্‌ওয়া : প্রথমত বান্দার মধ্যে তাক্‌ওয়া থাকতে হবে।

اَلتَّقْوٰى فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ

তাক্‌ওয়া তো এমন বিষয় যার সম্পর্ক বান্দা ও আল্লাহর মাঝে বিধ্যমান।

তাক্‌ওয়া আসলে কোনো বিষয় কার্যকর করার নাম নয়। তাক্‌ওয়ার সহজ পরিচয় হলো, এমন কাজগুলো থেকে বিরত থাকার নাম তাক্‌ওয়া, যে কাজ করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়।

অন্তরের সাক্ষ্যদান

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় কি-না একথার সাক্ষ্য প্রদান করে মানুষের অন্তর। আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানবজাতিকে যে কলব ও হৃদয় দান করেছেন, তা মানবজাতিকে সঠিক অবস্থার সংবাদ প্রদান করে। তাই তো বলা হয়, যদি তুমি তোমার প্রকৃত অবস্থা অবগত হতে চাও, তাহলে তোমার হৃদয় থেকে তুমি সাক্ষ্য চাও। হৃদয় সাক্ষ্য দেবে সত্য সংবাদের। এ হৃদয় কোনো আপন পর বুঝে না। সে সর্বদাই সত্য বলে। তাই আমরা আমাদের অবস্থা এবং অবস্থান জানতে হলে আমাদের দিলের দিকে হৃদয়ের দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। এখান থেকে সর্বদা সত্য সাক্ষ্য নিসৃত হবে। হৃদয়ের বিচারের চেয়ে বড় বিচার নেই পৃথিবীতে। তাই তো আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলতেন, সময়ে-সময়ে নিজের হৃদয়ের আদালতে নিজেকে দাঁড় করিয়ে নিজের বিচার নিজের হাতেই করিয়ে নিয়ো। ভেতর থেকে একটা সঠিক সাক্ষ্য তুমি পাবে। সেখান থেকে দুধকে দুধ বলেই সংবাদ আসবে। পানিকে পানি বলেই সংবাদ আসবে। আর সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলেই সাক্ষ্য আসেব।

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ اَفْتَاكَ الْمُفْتِيُوْنَ

তুমি তোমার হৃদয়কে জিজ্ঞেস করো। তোমার হৃদয় তোমাকে সাক্ষ্য দেবে। যদি অন্য কেউ তোমাকে না বলে।

তাক্ওয়ার গুরুত্ব

তাক্ওয়া সম্পর্কে কুরআনে যতটা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অন্য কোনো আমল সম্পর্কে মনে হয় ততটা গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। একেকটা আয়াতে দুই দুইবার কোথাও তিন-তিনবারও তাক্ওয়া ইখতেয়ারের হুকুম প্রদান করা হয়েছে। কত আশ্চর্য কথা এটি। যদি পুরাটা কুরআনে আল্লাহ তা'আলা শুধু একটিবারই তাক্ওয়ার হুকুম দিতেন, তাতেও তো তাক্ওয়া ইখতিয়ার করা মানুষের জন্য ফরজ সাব্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রায় সব আয়াতের পরেই اِتَّقُوا اللهَ اِتَّقُوا اللهَ اِتَّقُوا اللهَ বলেছেন। কোথাও এক আয়াতের পরে দুবারও তাক্ওয়ার হুকুম প্রদান করেছেন। কোনো মানুষ যদি তার বক্তব্যে কোনো একটি বাক্য দুবার বলে, তাহলে সেই কথাটির গুরুত্বই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের জন্য সে কী প্রেরণ করে তা চিন্তা করা।[১৪৪]

দেখুন, আয়াতটার শুরুটাই তো اِتَّقُوا اللهَ শব্দ দিয়ে। আবার শেষও হয়েছে اِتَّقُوا اللهَ শব্দের মাধ্যমে। এখানে ঈমানদারদের লক্ষ করে কথা বলা হয়েছে।

এই জায়গাটি ছাড়া বাকি সবখানে 'হে লোকসকল'! বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ

হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো।[১৪৫]

তাক্ওয়ার কথা এখানেও বলা হয়েছে দুবার।

---

১৪৪. সূরা হাশর : আয়াত ১৮

১৪৫. সূরা নিসা : আয়াত ১

বরকত অর্জন ও তাক্ওয়া

তাক্ওয়া ইখতিয়ার করার কারণে মানুষের জীবনে এক অফুরন্ত বরকতের ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। আজ আমাদের জীবনে যত পেরেশানি, দুঃখ, কষ্ট ও বঞ্চনা সবই তাক্ওয়া না থাকার কারণে। আজ সম্পদে বরকত নেই। আমাদের মুখস্থ শক্তিতে বরকত নেই। আমাদের সম্মানে বরকত নেই। আমাদের সুস্থতায় বরকত নেই। ধীরে-ধীরে বরকত আরও শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাক্ওয়ার কারণে বরকত অবতীর্ণ হয়। আর গুনাহের কারণে বরকত নষ্ট হয়ে যায়। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

যদি গ্রামবাসীরা তাক্ওয়া ইখতিয়ার করত, তাহলে আমি আসমান ও জমিন থেকে তাদের জন্য বরকতের দ্বার খুলে দিতাম।[১৪৬]

আল্লাহওয়ালাদের প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই বরকত হয়ে থাকে। কারণ, তাঁরা রাসেখীন ফিল ইল্ম। তাঁরা জ্ঞানী। তাঁদের সময়ের মধ্যে বরকত হয়। তাঁরা অল্প সময়ে অধিক কাজ করতে পারেন। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুন–

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর ৯২৫টি কিতাব দারুল উলূম দেওবন্দের লাইব্রেরীতে বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো তিনি কারও সহায়তা ছাড়াই লিখেছেন। আর যেগুলো তিনি তাঁর ছাত্র বা খলিফাদের নির্দেশনা দিয়ে লিখিয়েছেন, সেগুলোর সব মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭০০। আমরা হয় তো এত সংখ্যক কিতাব এখনও পড়তেই পারিনি।

আমাদের বুযুর্গদের মধ্য থেকে একজন এমন ছিলেন, তিনি এত কিতাব লিখেছেন যে, তিনি যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন তাঁর হায়াতের সময় ও দিনগুলোর সাথে তার কিতাবের পৃষ্ঠাকে ভাগ দেওয়া হয়েছে। পরে দেখা গেছে, গড়ে প্রতি দিনের ভাগে ২০ পৃষ্ঠা করে পড়েছে। ভাই! নতুন একটি কিতাব ২০ পৃষ্ঠা লেখা কোনোভাবেই সহজ কাজ নয়। এটিই হচ্ছে তাঁদের জীবনের বরকত।

তাদের মুখস্থ শক্তির মধ্যেও অফুরন্ত বরকত হতো। আবু যুরআহ (রহ.)-এর একজন শাগরেদ একবার রাতের বেলা দেরি করে ঘরে এলেন।

---

১৪৬. সূরা আরাফ : আয়াত ৯৬

বিবি সাহেবা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জাগ্রত হয়ে তার সঙ্গে বিতণ্ডায় লিপ্ত হলো, কেন দেরি করে ঘরে আসা হলো। তিনি জবাব দিলেন, দরসের মধ্যে দেরি হয়ে গেছে। বিবি বললেন, তোমার ওস্তাদই তো কিছু অর্জন করতে পারেনি। তুমি আর কী অর্জন করবে? বুযুর্গ রেগে গিয়ে বললেন, আচ্ছা! আমার ওস্তাদের যদি এক লক্ষ হাদীছ মুখস্থ না থাকে, তাহলে তুমি তিন তালাক।

রাত শেষ হলো। নতুন দিন এল। এবার স্থির মেজাজ শীতল হলো। বিবি জিজ্ঞেস করল, তালাক পতিত হয়েছে কি-না? শর্তযুক্ত তালাক– যদি ওস্তাদের এক লক্ষ হাদীছ মুখস্থ না থাকে তাহলে তিন তালাক। স্বামী ওস্তাদের নিকট গিয়ে বললেন, হযরত! এই-এই ঘটানা। আপনার কি এক লক্ষ হাদীছ মুখস্থ আছে? হযরত মুচকি হেসে বললেন, তোমার বিবাহ অটুট আছে। তোমার স্বামী-স্ত্রী-ই আছ। কারণ, এক লক্ষ হাদীছ তো আমার এমনভাবে মুখস্থ আছে, যেমনভাবে তোমাদের সূরা ফাতেহা মুখস্থ আছে।

জমিনের সৌন্দর্য ও তাক্ওয়া

স্মরণ রাখবেন, আসমানের সৌন্দর্য সিতারার মধ্যে। জমিনের সৌন্দর্য পরহেযগারদের মধ্যে। আমরা আকাশের দিকে তাকালে তারকারাজিকে যেভাবে ঝিকমিক করতে দেখি, তেমনিভাবে আসমানবাসীরা জমিনের দিকে তাকালে পরহেযগার বান্দাকে তারকারাজির মতো ঝিকমিক করতে দেখে।

লেনদেন ও তাক্ওয়া

তাক্ওয়া শুধু খাওয়া, পান করা পর্যন্ত শেষ নয়। এ-পর্যন্তই তাক্ওয়া সীমাবদ্ধ নয়। সারা জীবনের সমগ্র বিষয়েই তাক্ওয়ার হুকুম বিস্তৃত।

মুআমালা তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে তাক্ওয়া ইখতিয়ার করতে হয় বিশেষভাবে। ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর জীবন অধ্যয়ন করে দেখুন। তাক্ওয়া কী জিনিস তা যদি বুঝতে হয়, তাহলে ইমাম আযম (রহ.)-এর জিন্দেগি দেখুন। প্রথমে তাঁর কাপড়ের দোকান ছিল। এক দিন যোহরের নামাযের সময় দোকান বন্ধ করে তিনি নামাযে যাচ্ছিলেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, নোমান সাহেব! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর দিলেন দোকান বন্ধ করে দিয়েছি? আজ আর খুলব না। তাই একেবারে গুছিয়ে বন্ধ করে ফেলেছি। কেন? কী হয়েছে?

লোকটি বলল, না, কিছু না। কিন্তু এত দ্রুত কেন আজ দোকান বন্ধ করে দিচ্ছেন?

ইমাম সাহেব বললেন, আজ আকাশ বড় মেঘলা। আকাশে মেঘ থাকলে আলো ঠিকমতো থাকে না। দোকানে আলো প্রবেশ করে না। ফলে গ্রাহক কাপড়ের ভালো-মন্দ সঠিকভাবে বিচার করতে পারে না। তাই দোকান বন্ধ করে দিচ্ছি যেন কমদামি কাপড়কে বেশি দামি কাপড় মনে করে কেউ ধোঁকা না খায়। এই উম্মতে ব্যবসার মহান শিক্ষক তো হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)। তারপরের শিক্ষকই হচ্ছেন হযরত ইমাম আযমন আবুহানীফা (রহ.)। হযরত আবুবকর না হয় হযরত আবুহানীফা এই দুজনই হচ্ছেন এই উম্মাতের ব্যবসাশিক্ষার মহান শিক্ষক। তাঁরা উম্মতকে ব্যবসা শিখিয়েছেন।

সাবধানতা অবলম্বন করা-ই তাক্ওয়া

মানুষের উচিত প্রত্যেক কাজে সতর্ক থাকা এবং সন্দেহযুক্ত কাজে নিজেকে না জড়ানো। এর থেকে বেঁচে থাকা। যেমন– গায়রে মাহরাম নারীর চেহারা দেখা হারাম। যদি নারী বোরকাবৃত থাকে, তাহলে তার ওপর দৃষ্টি পড়লে গুনাহ হবে না। তবে তাক্ওয়া হলো এমন নারীর দিকেও না তাকানো। তাঁর এই বোরকা বা কাপড়ের দিকেও না তাকানো এর নামই হচ্ছে তাক্ওয়া। মোটকথা, ভিন নারীর চেহারা দেখা তো দূরের কথা, তার কাপড়ও না দেখা তাক্ওয়া। এরূপ তাক্ওয়াবান ব্যক্তিরা-ই হতে পারবে আল্লাহর ওলী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

মুত্তাকীরা-ই আল্লাহর ওলী এবং প্রিয় বান্দা।[১৪৭]

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের আমলই কবুল করেন।[১৪৮]

২. বিনয়

তালিবুল ইল্মের জন্য দ্বিতীয় যে-জিনিসটি জরুরি, তা হচ্ছে বিনয়ও নম্রতা। আর এই নম্রতা বা বিনয় মানুষও তার চার পাশের মানুষগুলোর মাঝেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরবিতে এভাবে বলা হয় –

---

১৪৭. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৪

১৪৮. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৭

فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ

বান্দা ও বান্দার চারপাশের মাঝেই এ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অন্যের সামনে নিজেকে মাথাওয়ালা না রেখে নিজেকে স্বাভাবিক রাখা এবং নিজের ভাবনা ও ইচ্ছাকে এবং নিজের সিদ্ধান্ত ও মতামতকে অতি সাধারণ মনে করার নামই বিনয়।

বড় হওয়ার পথ ও পদ্ধতি

সবারই মন চায় বড় হয়ে থাকি। মাথাওয়ালা হয়ে থাকি। নফস নিজেকে সবার বড় মনে করে।

স্মরণ রাখা চাই, যে বড় হতে চায়, তার উচিত আগে নিজেকে ছোট বানানো। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা তাকে বড় বানিয়ে দেবেন। ছোট বানিয়ে রাখার মাঝেই রয়েছে আগামী দিনে বড় হওয়ার উপাদান।

কথায় আছে-

زمین کی طرح جس نے عاجزی وانکساری کی

خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسماں ہو کر

যে জমিনের মতো বিনয়ী হলো,

খোদার রহমত তাকে আকাশে উঠিয়ে দেবে।

তো বিনয়ী হওয়ার এই সবক আমরা ওপর থেকে পেয়েছি, হাদীছ থেকে পেয়েছি।

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

যে আল্লাহর জন্য তাওয়াযু' বা বিনয় অবলম্বন করল, আল্লাত তাঁকে উন্নতি ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করবেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাবার খেতে বসতেন, তখন তিনি ঠেস লাগিয়ে বসতেন না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

আমি তো আল্লাহর রিযিক ভক্ষণের সময় তেমন করে বসেই ভক্ষণ করি যেমন করে গোলাম তার মালিকের সামনে বসে খাবার ভক্ষণ করে।

হযরত উমর (রাযি.) দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَّفِيْ عَيْنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

হে আল্লাহ! আমাকে আমার দৃষ্টিতে ছোট করে দিন এবং লোকদের দৃষ্টিতে বড় করে দিন।

কোনো মানুষ অন্যের কাছে আল্লাহর কথা তখনই পৌঁছে দিতে পারে, যখন তার মর্যাদা মানুষের সামনে বিদ্যমান থাকবে। সেজন্যই হযরত উমর (রাযি.) লোকদের চোখে বড় করে দিতে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন।

আজ আমাদের ও সমাজের অবস্থা তো এই যে, লোকদের দৃষ্টিতে মানুষ অত্যন্ত নীচু ও হীন থাকে আর নিজের দৃষ্টিতে নিজেকে সে অনেক বড় মনে করে। আমাদের মাথায় এখন সর্বদা-ই একথা ঘূর্ণায়মান থাকে যে,

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

আমি অন্যের চেয়ে উত্তম।[১৪৯]

আমরা কয়েকটা ছাত্র পড়াচ্ছি তো নিজেকে নিজে কত কিছু ভাবতে শুরু করেছি। অন্যের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করছি। আমরা প্রত্যেকে কেন নিজেকে এত বড়, শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ভাবতে শুরু করেছি? কেন অন্যকে আমরা ছোট ভাবি? হীন ভাবি? কেন অন্যের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিই? অন্যের ইচ্ছে, স্বপ্ন ও চাহিদাকে মূল্যায়ন করি না। আজ আমরা এক শিক্ষক অন্য শিক্ষককে খামোখা অযোগ্য মনে করি। এক ছাত্র অন্য ছাত্রকে বোকা মনে করি। খামোখাই আজ আমরা নিজেকে নিজে বড় ও শ্রেষ্ঠ ভাবি। অথচ জানি না, আমার এই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি কি?

মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, ছাত্ররা তো প্রত্যেকে আসহাবে কাহ্ফের সদস্যের মতো থাকবে।

আসহাবে কাহ্ফের বরকতে আল্লাহ তা'আলা কুকুরকেও জান্নাতি বানিয়ে দিয়েছেন। অন্যকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে, অন্যকে মূল্যায়ন করে দেখুন আল্লাহ বান্দাকে কী নেয়ামত ও অফুরন্ত বরকতে সমৃদ্ধ করেন এবং কতটা উচ্চ মাকামে আসীন করেন। একটু চেষ্টা করে দেখুন।

আমাদের মাশায়েখে কেরাম তো আমাদেরকে ছোট হওয়ার তরিকা শিখিয়েছেন। আজ আমরা নিজেকে আড়াল করতে পারি না। সংবাদপত্রের লোকদের গিয়ে বলি আমার খবরটি তিন কলামে হওয়ার দরকার ছিল। কেন

---

১৪৯. সূরা সোয়াদ : আয়াত ৭৬

এক কলামে দেওয়া হয়েছে? এভাবে নিজেকে আমরা ফুটাতে চাই। অথচ এভাবে তো ইয্যাত-সম্মান কিছুই পাওয়া যায় না। আসলে নিজেকে ছোট করার মাঝে মূল ইয্যাত ও সম্মান।

ফকিরি শান নিয়ে ইসলামের ওকালতি

একবার হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)কে দাওয়াত দেওয়া হলো, আপনি শাহজাহানপুর আসুন। দীন ইসলামের দাওয়াত দিন। সেখানে খৃস্টানরাও আগমন করবার কথা ছিল। হিন্দুদেরও আসার কথা ছিল। এছাড়াও আরও অন্য সব ধর্মের লোকদেরও আসার কথা ছিল। সেখানে বিশাল সমাবেশ। সকল ধর্মের লোকেরা কথা বলবে। নিজ নিজ ধর্মের মাহাত্ম্য বয়ান করবে। 'শাহজাহানপুরের বহস' নামে একে অবিহিত করা হয়।

হযরত নানুতবি (রহ.) চলতে শুরু করলেন। তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, একদিন পূর্বে আমি রেলযোগে সেখানে পৌছব ইনশাআল্লাহ। তিনি পথ চলছেন। আর মাত্র দুই স্টেশন আছে। এমন সময় মনে হলো, আমি তো তাদের বলে দিয়েছি, আমি রেলযোগে একদিন আগে আসব। তারা হয়তো আমাকে অভিনন্দন জানাতে অগ্রসর হবে। আর আমি তো অভিনন্দনের উপযুক্ত নই। তাই তিনি এক স্টেশন আগেই নেমে যাবেন বলে খেয়াল করলেন। তারপর আর মাত্র পাঁচ মাইল পথ থাকবে। সেপথ পায়ে হেঁটে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

যা ভাবনা তা-ই কাজ। তিনি এক স্টেশন আগেই গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। পায়ে হেঁটে পথ চলতে লাগলেন। কিন্তু পথে একটা নদী পড়ল। ওই নদী তার পার হতে হবে। নদীতে কোনো পুল নেই। তিনি পাজামা পরে নদী পার হলেন এবং লুঙ্গি পরে নিলেন। পাজামা শুকাতে দিয়ে দিলেন। ভাবলেন, এভাবে তো আমার দেরি হয়ে যাবে। সময় নষ্ট হবে। তাই নিজের লাঠিটি কাঁধে ঝুলিয়ে তাতে পাজামা লটকিয়ে দিলেন এবং পথ চলতে থাকলেন।

একজন ইসলামের বাহক চলছেন ফকিরের বেশে। আল্লাহর যিকির করতে-করতে তিনি পথ চললেন। বড় আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। পাহাড়সম ছিল তার ইল্ম। কিন্তু শেষ এই ফকিরি বেশেই তিনি পৌছেছেন বহসের ময়দানে। তিনি শহরে পৌছে একটি রুম ভাড়া করে

নিলেন রাত্রি যাপনের জন্য। উদ্দেশ্য, পর দিন তিনি দ্রুত পৌঁছে যাবেন আপন গন্তব্যে।

এদিকে লোকেরা তাকে এগিয়ে নিতে এল। তারা দেখল, ট্রেন স্টেশেন এসেছে ঠিক; কিন্তু তিনি তো এখনও আসেননি। তাঁরা হয়রান ও পেরেশান হয়ে গেলেন। এদিক-ওদিক খোঁজ করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন, তিনি বললেন, শোনো ভাইয়েরা! হয়তো আমাদের মেহমান ট্রেন না পেয়ে বিকল্প পথে চলে এসেছেন এবং আমাদের এলাকায় পৌঁছে গেছেন।

অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো। এক পর্যায়ে যেখানে মানুষ রাত যাপনের জন্য রুম ভাড়া নেয়, সেখানে পৌঁছল এবং দেখতে পেল, হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর ছদ্মনাম খুরশিদ হাসান এন্ট্রি করা আছে। ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করা হলো, কে এই ব্যক্তি? বলল, অত্যন্ত হ্যাংলা-পাতলা সরল ও সাধাসিধে এক ব্যক্তি এসেছে গ্রাম থেকে। যেলোকটি তাদের মধ্যে বড় আলেম ছিলেন, তিনি ধরে ফেললেন, ইনিই কাসেম নানুতবি।

আলেম লোকটি রুমনম্বর মিলিয়ে সেই রুমে গিয়ে দেখলেন, আল্লাহু আকবার! হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) রুমে বিদ্যমান। জিজ্ঞেস করা হলো, হযরত আপনি এখানে? আমরা তো আপনাকে স্বাগত জানাতে স্টেশনে গিয়ে বসে ছিলাম। হযরত বললেন, তোমরা ইস্তিকবাল করবে জেনেই তো আমি ওই স্টেশনে গেলাম না। তারপর হযরত একটি আশ্চর্য কথা শোনালেন। কথাটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। বললেন–

'কয়েকটা শব্দ পড়ালেখা করেছি। মানুষর সেই সংবাদ জেনে গেছে। অন্যথায় কাসেম নিজেকে এমনভাবে মিটিয়ে দিত যে, কেউ তার পরিচয়ও জানত না।'

দারুল উলূম দেওবন্দের তালিবুল ইল্‌মের বিনয়

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী যে-বছর দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দাওরায়ে হাদীছ সমাপ্ত করেন, সে-বছর ছাত্রদের দস্তারবন্দি করার জন্য একটি জলসার আয়োজন করল দারুল উলূমের পরিচালনা পরিষদ। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হলেন। শাইখুল হিন্দ (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, আশরাফ আলী! কী জন্য এসেছ?

হযরত থানভী বললেন, হযরত! আমরা শুনতে পেয়েছি, দারুল উলূম দেওবন্দের পরিচালনা পরিষদ নাকি আমাদের দস্তারবন্দির জন্য একটি জলসার আয়োজন করতে যাচ্ছে। আমাদের মতো নালায়েক বান্দাদের দস্তারবন্দি হবে এতে তো দারুল উলূমের বদনাম হয়ে যাবে। তাই আপনি দয়া করে তাদের নিষেধ করে দিন।

একথা শুনে শাইখুল হিন্দ ভিন্ন জগতে চলে গেলেন। বলতে লাগলেন, আশরাফ আলী! আজ তুমি আমাদের সামনে আছ; তাই নিজেকে চিনতে পারছ না। আমরা যখন থাকব না, তখন দেখবে, বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারবে, তুমিই তুমি। তোমার তুল্য কেউ নেই তোমার চার পাশে। পরে বাস্তবেই এমন একটা দিন এল, তখন আশরাফ আলী থানভীই হয়ে গেলেন যামানার একক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সমতুল্য কাউকে পাওয়া গেল না। তিনি নিজেকে নিজে এমনভাবে ওস্তাদের সামনে মিটিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাঁকে মর্যাদার সুউচ্চ আসন দান করেছিলেন। কবি বলেছেন–

تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو! صراحی سے
کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی

হে লোকেরা! সুরাহি থেকে শিখে নাও বিনয়ের পদ্ধতি। আহ! মহা ফুয়ূয লাভ করে সে; গর্দানও তার নত হয়ে যায়।

এক কবি বলেছেন এভাবে–

جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں
صراحی سرنگوں ہو کر بھر کرتی ہے پیمانہ

আধ্যাত্মিক পুরুষগণ সব সময়ই মাথা নত করে রাখে। সুরাহি তো মাথা ঝুঁকিয়ে খালি করে ফেলে পানপাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত সুরাহির মাথা না ঝোঁকে ততক্ষণ সে তৃপ্ত হয় না। এমনিভাবে আমাদের ভেতর যদি বিনয় আসে, তাহলে আল্লাহ আমাদের মাঝেও ইল্‌মের ঝরনাধারা প্রবাহিত করে দেবেন।

৩. যুহ্‌দ বা দুনিয়াবিমুখতা

তালিবুল ইল্‌মের মাঝে তৃতীয় পর্যায়ে যে-গুণটি থাকা অপরিহার্য, তা হচ্ছে যুহ্‌দ তথা দুনিয়াবিমুখতা। দুনিয়ার প্রতি তার মাঝে কোনো মোহ থাকবে না, আকর্ষণ থাকবে না।

একে আরবিতে এভাবে বলা যায়–

فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّنْيَا

'বান্দা ও দুনিয়ার মাঝে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।'

যুহ্দ কাকে বলে

যুহ্দ মানে এই নয় যে, জিনিস কম হবে। বরং যুহ্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার খাহেশাত ও চাহিদা কম হবে। কেয়ামতের দিন তো এমন কিছু লোকও হবে, যারা দুনিয়ার হিসাবে হবে ফকির; অথচ কেয়ামতের দিন তাকেও হাশরের ময়দানে দাঁড় করানো হবে পথভ্রষ্ট কারুনের সঙ্গে। কারণ, লোকটা ফকির হলেও তার চাহিদা ছিল কারুনের মতো। আবার আনেক মানুষ এমন থাকবে, যারা হবে দুনিয়ার বাদশাহ; অথচ কেয়ামতে তাদের দাঁড় করানো হবে আল্লাহওয়ালা ও দুনিয়ারবিমুখ নিঃস্ব বান্দাদের কাতারে। কারণ, তার দিলে মালের প্রতি মহব্বত ছিল না। তার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ছিল না। ছিল না কোনো চাহিদা। এরই নাম হচ্ছে যুহ্দ। ছাত্র ভাইদের বিষয়টি ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত। এর হাকীকত ও মর্মকে ভালো করে অন্তরে গেঁথে নেওয়া দরকার।

অল্পে তুষ্ট হওয়ার ফযীলত

দেখুন! আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আমাদের বড় সুন্দর, চমৎকার ও সর্বোত্তম কাজের জন্য নির্বাচিত করেছেন। আমরা আখেরাত অন্বেষী হব। দুনিয়ার অন্বেষণ ছেড়ে দেব। দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করব। দুনিয়া অন্বেষণ এক জিনিস আর খোদার তালাশ ভিন্ন জিনিস।

আমরা তো আল্লাহকে অন্বেষণ করা ও আল্লাহকে খোঁজার পথে এসেছি। তাই রিযিকের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ত্যাগ ও কুরবানি পেশ করতে হবে। সেই কুরবানিটুকু আমরা সাদরে বরণ করে নিতে হবে। লোকেরা আমাদের নানান কথা বলবে তো ঠিক; তবে সামান্য এই দুনিয়ার ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং অল্পে তুষ্ট থাকতে পারা অত্যন্ত বড় নেয়ামত। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

যে-ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে সামান্য রিযিকের ওপর সন্তুষ্ট হবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, কেয়ামতের দিন তার সামান্য আমলের ওপরও আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا

আমরা আল্লাহর বণ্টনের ওপর সন্তুষ্ট।

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা বড়ই রহমত করেছেন। তিনি আমাদের দীনের জন্য নির্বাচন করেছেন। আমরা আল্লাহ তা'আলার ওপর করুণা করিনি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর বড় ইহসান ও করুণা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। কবির ভাষায়–

منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی

منت از و شناس کہ در خدمت گزار شتن

তুমি এই বলে লম্বা কথা বলো না যে, তুমি বাদশাহর খেদমত করো। আরে বাদশাহর খেদমত করার জন্য তো কত মানুষ লালায়িত। তোমার ওপর এটা বাদশাহর বড় অনুগ্রহ বরং তুমি বলো বাদশাহ আমাকে তার খেদমতের জন্য কবুল করেছেন।

সমস্ত গুনাহের মূল

দুনিয়ার মহব্বতকে অন্তর থেকে বের করে দিতে হবে। কারণ, এটি সমস্ত গুনাহের মূল। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

'দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত গোনাহের মূল।'

যদি অন্তরে দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা কম হয়, তাহলে ইল্‌ম সহজে অর্জিত হয়। যদি তালিবুল ইল্‌ম ইল্‌মের অন্বেষণে মগ্ন না হয়, তাহলে তার ইল্‌ম অর্জিত হবে না। আর যেটুকু অর্জিত হবে, তা ইল্‌মে নাফে' তথা উপকারী ইল্‌ম হবে না। সেটা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

ওলামায়ে কেরামের রিযিকের ধারা

প্রিয় তালিবুল ইল্‌ম ভাইয়েরা! মনে রাখবে, তোমার তাকদীরে যা লেখা আছে, তা অবশ্যই তুমি পাবে। লোকেরা তো বলে, আলেম হলে, মাদরাসায় পড়লে কী খেয়ে বাঁচবে, কোথা থেকে খাবে? এমন কথা যারা বলে, তারা হয় জাহেল, নাহয় জেনে-বুঝেও না জানার ও না বোঝার ভানকারী। আরে ভাই! আলেম হয়েও যদি রিযিক না পাই, তাহলে রিযিক পাব কবে? আপনি পারলে

একটা প্রমাণ দেখান, কোথাও কোনো আলেম বা হাফেয ক্ষুধা-পিপাসায় কাতরাতে-কাতরাতে মরে গেছে। একটা দৃষ্টান্তও এমন দেখাতে পারবেন না। আরে ভাই! অধিক খেয়ে মারা গেছে, বেশি খাওয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে এমন প্রমাণের অভাব নেই পৃথিবীতে।

কার কথা বলব? আমাদের হাদীছ শাস্ত্রের বরপুত্র ইমাম মুসলিমের মৃত্যুর উসীলা কী ছিল? না খেয়ে কোনো আলেম মারা গেছে তার প্রমাণ আপনি দিতে পারবেন না। আমি অধম প্রমাণ পেশ করতে পারব, অধিক খেয়ে মারা গেছে। আমি আরও উদাহরণ ও প্রমাণ পেশ করতে পারব, পি.এইচ.ডি করা ডক্টর। এম.বি.বি.এইচ ডাক্তার। এম.এ.এম.এইচ.সি করা কত-কত বান্দা যে এমন আছে ও ছিল, যাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, ক্ষুধা ও অনাহারে ক্লিষ্ট হয়ে কাতরাতে-কাতরাতে মরে গেছে। এমন উদাহরণের অভাব নেই। তাহলে বলো, রিযিক মূলত কোনো পথে?

এই ইল্‌মের পথেই তো রয়েছে রিযিকের সন্ধান। পার্থক্যটা তোমাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে এই যে, তোমরা দেখছ তোমাদের রিযিক অফিস আর ব্যবসার পথে আসছে। এটা দেখতে পাও না যে, আমাদের রিযিক খোদার তরফ থেকে আসছে।

এই যে আলেম সমাজ তারা তো সেই স্থান থেকে রিযিক ভক্ষণ করে, যেখান থেকে আম্বিয়া কেরাম রিযিক ভক্ষণ করেছিলেন সোনালী সেই অতীতকালে। কারণ, ওলামায়ে তো আম্বিয়া কেরামের ওয়ারিছ। সুতরাং রিযিকও তাঁরা ওয়ারিছ হিসেবেই প্রাপ্ত হয়। বেতন পাওয়ার তো নানা পদ্ধতি আছে। কোনো জায়গায় বেতন সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া হয়। আর কোনো জায়গায় সরাসরি হাতে হাতে দেয়। তেমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে রিযিকদানের ধারা নির্ধারণ করেছেন, সেভাবেই ওলামায়ে কেরামকে রিযিক দিয়ে থাকেন।

খোদাপূজা অন্য এক বিষয়

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! খাহেশাতের স্রোতে ভেসে যেয়ো না। খাহেশাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যে নিজের নফসের সঙ্গে এই মুআমালা করতে পারবে, ইল্‌মের দুয়ার তার জন্য খুলে যাবে। তাই তো হযরত বাইজিদ বোস্তামি (রহ.) বলতেন, জান্নাতে যাওয়ার পথ মাত্র দুই কদম। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, হযরত! এর অর্থ কী? উত্তর দিলেন, আরে ভাই! তোমার প্রথম কদম

যদি তোমার নফসের বিরুদ্ধে ওঠে, তাহলেই তোমার দ্বিতীয় কদম তোমার জান্নাতে চলে যাবে। আর যদি প্রথম কদম নফসের খাহেশাতের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে ইল্‌ম থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে হবে।

স্মরণ রেখো, রব্বে কারীমের পূজারি হওয়া ভিন্ন জিনিস। আত্মপূজা, রিপুপূজা, পুরুষপূজা, নারীপূজা সবই মূর্তিপূজার মতো। আর এসবই হারাম।

আমাদের রবপূজা শিখতে হবে। নিজের কাম-রিপুর পূজা না করা উচিত। আমাদের রব্বে কারীমের মর্জিমতো আমল করা আবশ্যক। এটি অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। যে তালিবুল ইল্‌ম তার নফসের লাগাম টেনে ধরতে পারবে, নিজের নফসের গলায় যে লোহার শিকল বেঁধে দিতে পারবে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার দানের দুয়ার, ইল্‌মের দুয়ার খুলে যাবে। যদি এই তিন জিনিস আমাদের হাসিল হয়ে যায়, তাহলে আমরা ইল্‌মে বড় হতে পারব, জ্ঞানে মহান হতে পারব। রাসেখ ফিল ইল্‌ম তথা গভীর ইল্‌ম ও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারব।

ভালো শিক্ষকের দুটি গুণ

এবার হযরত আসাতিযা কেরামের খেদমতে দুটি কথা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিবেদন করছি। একজন আদর্শবান ওস্তাদের মাঝে দুটি গুণ থাকা জরুরি।

১. ইখলাস বা নিষ্ঠা : প্রথম গুণটি হচ্ছে ইখলাস তথা নিষ্ঠা। পড়ানোর উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর তরেই হবে ওস্তাদের পাঠদান। ইখলাস যখন থাকে, তখন মানুষ ঝগড়া-ফাসাদের হাত থেকে নিরাপদ থাকে। দীনের কাজ তিনি তখন করে যেতে পারেন নীরবে। আমাদের মাশায়েখগণ ইখলাসের দিকে খুব বেশি লক্ষ রাখতেন।

হযরত আলী (রাযি.)-এর ইখলাস

যুদ্ধের ময়দান। হযরত আলী (রাযি.) এক পরাজিত কাফেরের বুকে চড়ে বসলেন। খঞ্জরটি এখন তার বুকে সেঁটে দিয়ে দেবেন। এমন সময় কাফের হযরত আলীর মুখে থুত মারল। সাথে-সাথে তিনি কাফেরকে ছেড়ে দিলেন। কাফের প্রাণ ফিরে পেয়ে বিনীত স্বরে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছ কেন? হযরত আলী অত্যন্ত শান্ত ভাষায় বললেন, আমি তো আল্লাহর পথের মুজাহিদ। তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা ছিল আমার আল্লাহর

জন্যে। তুমি যখন আমার মুখে-চোখে থুত মারলে, তখন তোমাকে মারার নেশা আমার সমস্ত অস্তিত্বকে চেপে ধরেছে। আমার রাগ দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে। ইখলাস ও আল্লাহর তরে একনিষ্ঠভাবে তোমাকে হত্যা করার বদলে প্রতিশোধই তখন আমার ইচ্ছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। আমার কাজ তো আমার আল্লাহর জন্য– আমার নিজের জন্য নয়।

দেখুন, এমন সঙ্গীন মুহূর্তেও আমাদের পূর্বসূরীগণ ইখলাস ও নিষ্ঠার কত সুন্দর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পেরেছেন।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর ইখলাস

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) পড়ালেখা শেষ করে শুরুতে যখন কানপুর নামক এলাকায় গেলেন, সেখানে কাছাকাছি এলাকায়ই কিছু বেদআতী লোকজন ছিল। হযরত একবার একটি সমাবেশ ডাকলেন। আপন ওস্তাদ হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)কে সেই সমাবেশে নিমন্ত্রণ জানালেন। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) আগমন করলেন। বয়ান শুরু করলেন। আল্লাহরই ইচ্ছে, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) যে-বিষয়ে বয়ান হোক বলে মনে-মনে কামনা করছিলেন, বয়ান সেই বিষয়েই শুরু হলো।

আর যখন সেই বিষয়ে বয়ান চলছিল, তখন বিদআতের প্রতি আকৃষ্ট আলেম মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ী এসে উপস্থিত হলো। আর তখন মজলিসের লোকেরা ভাবল, হুজুর তো বিদআতি সম্পর্কে বয়ান করছেন। আর ওই আলেম বিদআতের প্রতি আকৃষ্ট। এখনই বয়ানটার উপযুক্ত মুহূর্ত। আশ্চর্য কথা হলো, লোকটি এসে বসার সঙ্গে-সঙ্গে হযরত শাইখুল হিন্দ বয়ান সমাপ্ত করে وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ বলে বসে গেলেন।

এভাবে বয়ান বন্ধ হয়ে যাওয়া বড়ই আশ্চর্য বিষয় মনে হলো লোকদের চোখে। পরে খাবার গ্রহণের সময় মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব হযরত শাইখুল হিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, বয়ানের উপযুক্ত সময় তো তখনই ছিল যখন মাওলানা লুৎফুল্লাহ এল। অথচ আপনি লোকটা আসার সাথে-সাথেই বয়ান বন্ধ করে দিলেন। শাইখুল হিন্দ (রহ.) বললেন, লোকটি আসার সাথে-সাথে আমার মাথায় এল, আমার বয়ানটা এই লোকটাকেই শোনানো দরকার। এখন আমি তাকে শোনানোর জন্য কথাগুলো বলব। তো আগে আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কথা বলছিলাম। আর এখন আমার উদ্দেশ্য

পরিবর্তন হয়ে বান্দার উদ্দেশ্য চলে এসেছে। আমার ইখলাস উড়ে গেছে। তাই আমি বয়ান শেষ করে দিয়েছি। আমাদের তো প্রত্যেক কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য– বান্দার জন্য তো নয়।

বন্ধুগণ! দেখুন, এমন ইখলাসের সঙ্গে আমরা দীনের কাজ করলে তো কোনো দিনই আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে না।

ইখলাসের গুরুত্ব

ইখলাস এত জরুরি যে, ইল্‌মের কমতি আমল দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় আর আমলের কমতি ইখলাস দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু ইখলাসের কমতি কোনোভাবেই পূর্ণ হয় না।

এজন্যই তো ইরশাদ হয়েছে–

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে ইখলাসওয়ালা দীন গ্রহণযোগ্য ও যারা একেবারে আল্লাহর জন্য দীন মান্য করে।[১৫০]

খাঁদযুক্ত আমল আল্লাহর পছন্দ নয়

মুহতারাম হাজিরীন! খাঁদযুক্ত আমল, ত্রুটিযুক্ত কাজ, রিজেক্ট মাল তো দুনিয়াতেও কেউ পছন্দ করে না।

হাদীছ শরীফে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

যে প্রতারণা করল, সে আমার উম্মত নয়।

আমলের মধ্যে রিয়া বা লোকদেখানো মানসিকতা ইত্যাদি যুক্ত হওয়া তেমন অপছন্দনীয়, সোনার সঙ্গে ভেজাল মিশ্রিত হওয়া যেমন অপছন্দনীয়। তাই তো আল্লাহর ভাষ্য হলো, আমার সামনে যদি তোমরা নকল ও আসল মিশ্রিত আমল নিয়ে আস, তাহলে আমি তা বাতিল করে দেব।

হীরা ও ইখলাসের মূল্যে পার্থক্য

একবার একব্যক্তি আমাকে হীরা দেখাতে থাকল আর বলতে থাকল, কোনটার দাম কত। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম, এত ছোট হীরা অথচ

---

১৫০. সূরা যুমার : আয়াত ২-৩

এত দাম! লোকটি বলল, হীরা সর্বদা ছোটই হয়। কিন্তু মূল্য তার অনেক। তখন আমার স্মরণ হলো, দুনিয়াতে যারা নিখাঁদ ইখলাসের সঙ্গে কাজ করবে, তাদের আমল ছোট হলেও কেয়ামতের দিন সেই আমলের মূল্য হবে অনেক বেশি, যার কল্পনাও করতে মানুষ ব্যর্থ।

মুফতী মুহাম্মদ হাসান ও ইখলাস

মুফতী মুহাম্মদ হাসান, যিনি লাহোরে জামেয়া আশরাফিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথমে সেখানে ছোট একটি মসজিদ ছিল। ছোট একটি মাদরাসা ছিল। সেখানে একজন এমন আলেম ছিলেন, যিনি হযরত মাদানী (রহ.)-এর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। মাদানী স্টাইলে তিনি সভা-সমাবেশ করতেন, রাজনীতি করতেন। আর যিকিরের মেজাজ ছিল। বড় নেককার মানুষ ছিলেন তিনি। লোকটি চিন্তা করল এখানে এক সঙ্গে থাকার কারণে পরস্পরে মতানৈক্য হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি অন্যত্র একটি মসজিদে চলে গেলেন। সেখানে একটি মাদরাসা স্থাপন করলেন। তিনি নতুন মাদরাসা স্থাপনের কারণে লোকেরা ক্ষেপে গেল এবং বলতে লাগল জামেয়া বা মাদরাসা বানাতে হলে আরও দূরে অন্য কোনো জনবসতিতেও তো বানানো যেত। এতো কাছাকাছি স্থানে নতুন জামেয়া খোলার কী প্রয়োজন?

হযরত মুহাম্মাদ হাসান সাহেবের ছেলে এই মাদরাসা সম্পর্কে আমাকে নিজেই বলেছে, একদিন আমার বাবা আমাকে ডেকে বললেন, তোমাকে তো ইখলাস শিখতে হবে নতুন করে। আমি আব্বুর সামনে হাঁটু পেতে বসলাম। আব্বু বললেন, মনে করো তোমার মাথায় অত্যন্ত ভারী একটি বোঝা। এটি বহন করতে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। একব্যক্তি বলল, চলো ভাই! আমি তোমাকে সাহায্য করি। অর্ধেকটা বোঝা আমার কাছে দাও বাকি অর্ধেক তুমি নাও। তো এ ব্যক্তি তোমার বন্ধু, নাকি শত্রু? তুমি তাকে কী বলবে? আমি বললাম, ও তো আমার বন্ধু। আব্বু বললেন, শুনো, এই শহরে একটিমাত্র মাদরাসা ছিল। জনগণের কল্যাণ এবং মানুষের চাহিদা পূরনের ভার এই মাদরাসার ওপরই ছিল। আর এটি একটি ভারী বোঝা। এই মাদরাসা থেকে আমরা এই বোঝা বহন করতে পারছিলাম না। এখন দ্বিতীয় আরেকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের বোঝাটা কিছুটা হালকা হলো। বলো, আমাদের বোঝা যারা হালকা করল, তারা আমাদের বন্ধু, না শত্রু। আল্লাহু আকবার! সুবহানাল্লাহ! কত বড় সমস্যাকে কতই-না মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখলেন হযরত মুফতী হাসান সাহেব। এই তো আমাদের আকাবিরে কেরামের ইখলাস।

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)-এর ইখলাস

হযরত মাদানী (রহ.)কে আল্লাহ তা'আলা উম্মতের এমন দরদ ও দেশপ্রেম দান করেছেন যে, তিনি সর্বদাই চাইতেন বৃটিশ এ-দেশ থেকে উৎখাত হয়ে যাক আর মুসলিমরা নিজেদের দীন ও ঈমান নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে বসবাস করুক। এর জন্য তিনি অনেক আন্দোলন ও সংগ্রাম করেছেন। তার একটা অভ্যাস ছিল, তাঁর কাছে কোনো মেহমান এলে তিনি তাকে অত্যন্ত মহব্বতের সাথে মেহমানদারী করতেন এবং তার খুব খেদমত করতেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর তবিয়তে ইখলাসের বেশি প্রভাব ছিল। যে-ছাত্রই তাঁর কাছে আসত, তিনি অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে তার ইসলাহ করতেন।

হযরত মুরর্শিদে আলম বলতেন–

دب نہ ہو تو ادب پیدا نہیں ہوتا

ধমকি না হলে আদব আসে না।

তাই একটু কঠোরতা করতেই হয়। আমাদের মাশায়েখে কেরামের কঠোরতা তো আল্লাহরই জন্য ছিল। নিজের জন্য তো নয়। তাই কেউ হযরত থানভীর দরবারে এলে আগেই তাকে সব বলে দেওয়া হতো। না মান্য করলে তাকে বের করে দেওয়া হতো।

যেমন– হযরত খাজা মাজযূবের কোনো এক কাজের কারণে হযরত থানভী বলেছেন, তুমি বের হয়ে যাও। তিনি তো সত্যান্বেষী সাচ্চা তালেব ছিলেন। তিনি ভাবলেন, আমাকে তো মসজিদ থেকে বের হতে বলা হয়েছে। আমি তো মসজিদের বাইরে অবস্থান করে থাকতে পারি। তাই তিনি দরজার পাশেই বসে গেলেন। শায়খের যাতায়াতের সময় তিনি দেখা করতেন এবং সেস্থানেই বসে যেতেন। এভাবে কয়েকটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তিনি সেখান থেকে সরলেন না। এক দিন বড় হয়রান হয়ে গেলেন শায়খ। ভাবলেন, হায়রে! লোকটা এখানে পড়ে আছে! এক খাদেমকে হযরত বললেন, ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করো, ও কী চায়? হযরত মাজযূব তো কবি ছিলেন। জবাবে একটি কবিতা তিনি লিখে দিলেন–

ادھر تو در نہ کھولے گا اُدھر میں در نہ چھوڑوں گا

حکومت اپنی ہے اُدھر تیری اِدھر میری

আহ! এই পাশ থেকে তো দুয়ার খুলছে না। আর এ প্রান্ত থেকেও আমি দুয়ার ছাড়ছি না। এখানে রাজত্বটা নিজস্ব। ওই পাশে আপনার রাজত্ব। আর এ-পাশে আমার রাজত্ব।

হযরত কবিতাটা এতোই পছন্দ করলেন যে, তাকে ডাকলেন এবং ভুলটা মাফ করে দিলেন।

তো এক দিকে হযরত মাদানী মেহমানদের অত্যন্ত বেশি পরিমাণে মেহমানদারি করতেন, যত্ন নিতেন আর অন্য দিকে হযরত থানভী সুলুক অন্বেষীদের প্রতি কঠোরতা করতেন। এক লোক তার কাছে এল। তিনি তাকে খাওয়ালেন। সুন্দর বিছানায় ঘুমাতে দিলেন। তার পাশে বসালেন। লোকটির পা টিপে খেদমতও করতে লাগলেন। লোকটি বলল, হযরত! আপনার এখানে এলে আপনার আন্তরিকতা দেখলে তো মন চায় আপনার পায়ে কুরবান হয়ে যাই। আর হযরত থানভীর সামনে গেলে মনে হয় তিনি লাঠি নিয়ে বসে আছেন; এক্ষুণি মাথায় বাড়ি দেবেন, আঘাত করবেন। তিনি বড় কঠোরতা করেন।

আমরা এমন একথার সম্মুখীন হলে তো তেলের সাথে একটু গুড় মেশানোর চেষ্টা করতাম। আর আমাদের আকাবিরের অবস্থা তো ইখলাস ও নিষ্ঠার অবস্থা ছিল। লোকটির কথা শুনে হযরত মাদানী বললেন, আরে ভাই! তোমার কথাটা ঠিক নয়। তুমি আসল রহস্যটা বোঝনি।

দেখো! সার্জন, যারা মানুষের অপারেশন করে। অপারেশনের মাধ্যমে পেট থেকে সব রোগ কেটে ফেলে দেন। সে সময় বান্দার খুব কষ্ট হয়। রোগী খুব ব্যথা পায়। এবার ডাক্তারের সহকারী রোগীকে মালিশ করে। ওষুধ লাগিয়ে দেয়। ব্যান্ডেজ করে দেয়। বড় যত্নের সঙ্গে তাকে সেবা দান করে। হযরতের অবস্থাটা সার্জনের মতো। আর আমি হচ্ছি সেই মহা ডাক্তারের সহকারীর মতো। এই ইখলাস ছিল আমাদের আকাবেরে কেরামের মধ্যে।

আমাদের নষ্ট আমলের বিনিময়ে জান্নাত

আপনি বাজারে ফল কিনতে গেলে অল্প টাকায় যদি আপনাকে অনেকগুলো দাগি ফলও দেয়, তারপরও আপনি তা নিতে অস্বীকার করবেন। আমরা সামান্য টাকার বিনিময়ে দাগি ফল নেই না। নষ্ট ফল গ্রহণ করি না। তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা রিয়া ও লোকদেখানো নষ্ট

আমলের কোনো বিনিময় তো দেবেন না; বরং তা মীযানে মাপবেনও না। দুনিয়াতে যেমন আমরা পঁচা ফল কেনা তো দূরে কথা মাপতেও দেই না। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

তাদের আমল কেয়ামতের দিন ওজনই করা হবে না।[১৫১]

আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের নষ্ট আমলের বিনিময়ে তোমাদের কীভাবে জান্নাত দেব। আজ আমরা ভালো জিনিস যখন কিনব টাকা খরচ করে, তাহলে আমি উন্নতটাই কিনব। তেমনি আল্লাহ বলবেন, নেকির বিনিময়ে আমি যেহেতু জান্নাত দেবই, তাহলে আমল ও নেকিগুলোও হতে হবে নিখাঁদ একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ভ্রুতিযুক্ত সওদা

মনে রাখবেন, দুনিয়াতে মানুষের যে প্রশংসা করা হয়, ইজ্জত করা হয়। ইকরাম করা হয় এসব মানুষের আমলের বিনিময়ে হয়ে থাকে। একদিন আমরা সবাই বসে কথা বলছিলাম। ইতিমধ্যে আমার এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু কোনো বিপদে পড়ল তার জরুরি ভিত্তিতে কিছু টাকার প্রয়োজন হলো। সে বড়ই পেরেশান যে, তার নিকট এর কোনো ব্যবস্থা নাই। আর কাজ সম্পন্ন করা ও দরকার। তো এর মধ্যে হঠাৎ ক্যাশিয়ার তাকে ফোন করল, আপনি এসে টাকা নিয়ে যান। ফোন পেয়ে সে খুব খুশি হলো এবং আনন্দের সাথে ক্যাশিয়ারের কাছে গেল যে, যাহোক টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে; আমার কাজটাও হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখি সে অশ্রুসিক্ত চোখে ফেরত এল। আমরা জিজ্ঞাস করলাম, কি হলো? বলল, ক্যাশিয়ারের ভুল হয়ে গেছে। বলে ভাউচার তো ঠিকই আমার নামে ছিল, পেমেন্টও হয়ে গেছে; কিন্তু সিল লাগাতে ভুলে গেছে। সে যখন তারিখ মিলিয়ে দেখল, তো দেখা গেল যে এটা অনেক আগেই পরিশোধ হয়ে গেছে। সে বলল, যে এখন তো আর আমার কিছু করার নাই।

তার একথা শুনে সাথে-সাথে আমার মনে একটি কথা স্মরণ হলো যে, দেখো, এলোক খুব আশা নিয়ে গিয়েছিল যে ক্যাশিয়ার তাকে টাকা দেবে কিন্তু Paid Off তথা পরিশোধকৃত ভাউচারের কারণে সে কিছুই পেল না।

---

১৫১. সূরা কাহাফ : আয়াত ১০৫

বন্ধুগণ! একটা কথা মনে রাখবেন, আমরা যেসব আমল প্রসিদ্ধি বা লোকদেখানোর জন্য করি, এসব আমাদের অগ্রিম পরিশোধ ভাউচারের মতো। কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহর দরবারে বিনিময়ের জন্য দাঁড়াব তখন আল্লাহ বলবেন, হে আমার বান্দা! এসব তো পরিশোধ হয়ে গেছে। এসবের বিনিময় তো তুমি দুনিয়াতে পেয়ে গেছ। এখন আমার কাছে এর কোনো বিনিময় নেই।

চিন্তা করে দেখুন, তখন আমাদের কী অবস্থা হবে? কি কষ্টই-না তখন আমাদের ভোগ করতে হবে। আমরা যদি এই উদ্দেশ্যে কোনো আমল করি যে মানুষ আমাকে ভালো বলবে। বাহবা দেবে। তাহলে তো আমি বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম। আমার ক্রয়কৃত সওদাটা নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু আমরা যদি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতাম, তাহলে দুনিয়ার প্রতি আমাদের কোনো লিপ্সা থাকত না। কেয়ামতের দিন আমরা এর বিনিময় পেতাম। তখন আমরা বুঝতে পারতাম আল্লাহর নিকট এসব আমলের মূল্য কী।

রিয়ার কারণে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে হয়

একবার বাইজিদ বোস্তামি (রহ.) সূরা ত্বহা পাঠ করলেন। রাতে স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর আমলনামায় এই সূরাটির পাঠ সোনার হরফে লেখা হয়েছে। তিনি খুশি হলেন। ভাবলেন, আল্লাহ আমার তেলাওয়াত কবুল করেছেন। তিনি খুশি মনে নিজের আমলনামাটি দেখতে লাগলেন। পৃষ্ঠা উল্টিয়ে তিনি কিছু খালি স্থান দেখতে পেলেন। বড় আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। স্বপ্নের ঘোরেই মনে-মনে ভাবলেন, যখন আমি অমুক লাইন পাঠ করছিলাম তখন তো কাছ দিয়ে একটি লোক অতিক্রম করেছিল। তখন তো আমি মনে-মনে বলেছিলাম, লোকটি আমার তেলাওয়াত শুনে খুশি হবে। ভাববে, আমি কত সুন্দর করে তেলাওয়াত করতে পারি। মনের মধ্যে এই খেয়াল আসার কারণেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই-এই স্থানের ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন।

ভাই ও বন্ধুগণ! ইখলাস এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. ইখতিসাস তথা বিশেষজ্ঞতা : একজন শিক্ষকের ভেতর দ্বিতীয় যে-গুণটি থাকা আবশ্যক, তা হচ্ছে ইখতিসাস বা বিশেষজ্ঞতা। কারণ, শিক্ষকতার কাজ শুধু ইখলাসের দ্বারা হয় না। একজন মানুষ বড় মুখলিস ঠিক। কিন্তু তার ভান্ডারে ইল্‌ম বলতে কিছুই নেই। তাহলে এই শিক্ষক

ছাত্রকে কী ফায়দা দেবেন? ছাত্রকে তিনি কী উপকার দেবেন? তাই শিক্ষকের জন্য আবশ্যক হলো প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া। প্রত্যেকটি কিতাবে পূর্ণ দক্ষ হওয়া। তুমি যে কিতাব পড়াবে, তাতে তোমার জ্ঞান থাকতে হবে সর্বোচ্চ। যদি এমন যোগ্যতা আগে থেকে না থাকে, তাহলে দীর্ঘ অধ্যয়নের মাধ্যমে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। আমার প্রিয় ভাই! যখন একটি বিষয়ে মেহনত আপনি করছেন, তাহলে আপনি পূর্ণ হক আদায় করেই মেহনতটি করুন, যেন আপনি বিষয়টি পড়ানের ক্ষেত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন।

আমাদের আকাবের ওলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে এই গুণ দুটি বিদ্যমান ছিল। ইখলাসও ছিল এবং বিশেষজ্ঞতাও ছিল। তাদের সামনে যে বিষয়টি আসত, তাঁরা সে বিষয়টির ব্যাপারে সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ রূপ আত্মপ্রকাশ করতেন। সে বিষয়ে তারা হতেন বাদশাহ।

তালিবুল ইল্‌মদের যোগ্যতা তৈরির পদ্ধতি

দারুল উলূমের পক্ষ থেকে কাউকে শরহে তাহযীব পড়ানোর জন্য দিলে তিনি আগে قال اقول কিতাবটি পড়াতেন। তারপর ايساغوجى তারপর مرقات এভাবে ধারাক্রমে পড়াতেন। সবার শেষে شرح تهذيب পড়াতেন। এটা করতেন তাঁরা যোগ্যতা তৈরির জন্য। আজ তো আমাদের অবস্থা এমন যে যাকে শরহে তাহযীব পড়ানোর জন্য দেওয়া হয়, সারা বছরে তিনি কিতাবটিই খতম করতে পারেন না। আগে ওস্তাদের ইস্তে'দাদ থাকত মুসলিম পড়ানোর; তিনি পড়াতেন মেরকাত। আর এখন ইস্তেদাদ হলো মেরকাত পড়ানোর আর পড়ায় মুসলিম। আজ আমাদের মাঝে বিশেষজ্ঞতার বড়ই অভাব রয়েছে। ওয়াজ করে-করে আর নসীহত ঝেড়ে-ঝেড়েই আমরা ছাত্রদের তৃপ্ত করার অপচেষ্টা করছি। এটা সহজ তো সেই জন্যে। এটি আমানতের খেয়ানত হচ্ছে। আপনি আগে ছাত্রটাকে যোগ্য ও উপযুক্ত করুন। নসীহত সে তখন নিজেই পড়ে নিতে পারবে। যোগ্য ও বিশেষজ্ঞ আলেম তাকে যদি না বানিয়ে দেন, নসীহত পকেটে নিয়ে সে ঘুরবে আর পথভ্রষ্ট হবে। সাবধান!

হযরত শাইখুল হিন্দ এবং ইল্‌মে জ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা

একবার হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর কিতাবগুলো বের করে রোদে দিলেন। দেখা গেল একটি কিতাবের পৃষ্ঠা

একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ছাত্র বলল হুযুর! কিতাবটার তো এই পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেছে। শাইখুল হিন্দ (রহ.) বললেন, সেখানে কয়েকটা সাদা পৃষ্ঠা লাগিয়ে দাও। ছাত্র পৃষ্ঠা লাগাল এবং বলল, এবার যে-পড়াগুলো নষ্ট হয়ে গেছে তা লিখে দাও। ছাত্র বলল, হযরত! এসব স্থান তো আমার মুখস্থ নেই। আসল কপিও তো নেই। আমি তো অনেক বছর আগে কিতাবটি পড়েছি। এখন ভুলে গেছি; কীভাবে লিখব? হযরত শাইখুল হিন্দ বললেন, হায়! ভুলে গেলে? কোন কিতাবের কথা বলছ দেখি তো? ছাত্র বলল, মাইবুজী কিতাব। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, কোনো স্থান থেকে পৃষ্ঠা নেই? ছাত্র বলল, অমুক জায়গা থেকে। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) সেখানে বসে-বসেই এই ছয় পৃষ্ঠা এবারত মুখস্থ লিখে দিলেন। দেখুন, তাঁদের বিশেষজ্ঞতা এমন ছিল।

মাওলানা ইয়াহয়া এবং ইল্‌ম ও জ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা

হযরত মাওলানা তাসবীহর মতো ২শতবার মুসলিম শরীফ খতম দিয়েছেন। তাঁদের আসলে জীবনটাই কিতাবের মধ্যে কেটেছে। আগ্রহ ও উদ্দীপনা তাদের এমন ছিল যে, দিন-রাতের পার্থক্য তাদের ছিল না। পুরোটা সময় ব্যয় করতে চেষ্টা করতেন পড়াশোনার মধ্যে। ভাই! আপনিও এরকম বিশেষজ্ঞতা অর্জন করুন; আপনিও দেখতে পাবেন ইল্‌ম কাকে বলে।

মাওলানা নূর মুহাম্মদ পুন্টুবি এবং ইল্‌ম ও জ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা

তিনি হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর শাগরেদ। সুলতান শহর থেকে ৭০/৭৫ মাইল দূরে একটি শহরের নাম পুন্টা। শরহে মিয়াতে আমেল পুন্টবী আপনারা দেখেছেন হয়তো। ছাত্ররা তার কাছে গমন করতে প্রায় ২৩ মাইল পথ তো সামানা মাথায় নিয়ে হাঁটতে হতো। রাস্তা এমন ছিল। আর ছাত্ররা তো নিজে পড়ুক আর না পড়ুক কিন্তু যে মাদরাসায় পড়ালেখা ভালো হয়, সে মাদরাসায়ই তারা ভর্তি হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

আল্লামা শরীফ কাশ্মিরি খাইরুল মাদারিস থেকে যখন কাসেমুল উলূম চলে এলেন, তখন তার সঙ্গে এক ছাত্রও এই মাদরাসায় চলে এল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন এসেছ তুমি? তুমি তো মেরকাতের ছাত্র। আর উনি তো বোখারি পড়াবেন। ছাত্র বলল, যেখানে মেহনত করার জন্য বড় ওস্তাদ থাকে, সেখানে ছোট ওস্তাদরা নিজে-নিজেই মেহনতী হয়ে যায়।

আল্লামা নূর মোহাম্মাদ পুন্টুবীকে আল্লাহ মর্যাদার উঁচু মাকাম দান করেছিলেন। মাওলানা খায়র জলন্ধরী (রহ.) একবার মাদরাসার বার্ষিক জলসায় বহু আকাবিরের উপস্থিতিতে মাওলানা নূর মুহাম্মাদ পুন্টুবী সম্পর্কে বলেছেন, শামছুন নুহাত (নাহুবিদগণের সূর্য) এসেছে। কত বড় ব্যক্তি যে, তাকে নাহুবিদদের সূর্য বলে পরিচয় দেওয়া হলো। ইল্‌মে তিনি এত পূর্ণতাপ্রাপ্ত ছিলেন যে, যদি সারা দুনিয়া থেকে শরহে জামী কিতাব মিটিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কারও প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত নূর মুহাম্মাদ কিতাবটি আবারও মুখস্থ লিখে দিতে পারবেন।

তাঁকে দুজন শাগরেদ আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। উভয়ের নামই আব্দুল্লাহ। একজন আব্দুল্লাহ বাহলভী। তিনি বড় মুফাসসিরে কুরআন ছিলেন এবং তরিকতের শাইখ ছিলেন। হযরত নূর মুহাম্মাদ সাহেব যখন সুজাবাদ এলেন, তখন এই ছাত্র দারুল উলূমের সকল ছাত্রকে বলে দিয়েছেন হযরতের জুতা কেউ ধরবা না। আমি এই জুতা বহনের খেদমতটুকু করতে চাই। এই ছাত্র ওই মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। জুতা তিনিই বহন করলেন।

আরেক ছাত্রের নাম আব্দুল্লাহ দরখাস্তী। এই যে শাগরেদরা তাঁর জন্য পাগল ছিল এর পেছনে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর দু'আ ছিল। নূর মুহাম্মদ সাহেব যখন দাওরা পড়েন, তখন শাইখুল হিন্দ যেপথে দাওরার দরসে যেতেন, সেই পথ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে রাখতেন তাহাজ্জুদের সময়। এক রাতে পরিষ্কার করার অবস্থায় হযরত দেখে ফেললেন। হযরত তাকে অনেক দু'আ দিলেন। অনেক মহব্বত ও ভালোবাসা দিলেন। সেই দু'আ ও মহব্বত আজ কাজে লেগে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে 'শামছুন নুহাত' বানিয়ে দিয়েছেন। আজ ছাত্রদের উচিত এমন করে ওস্তাদের দু'আ নেওয়া।

ইল্‌মি কাজে মগ্ন থাকা

যখন ইখলাসও থাকবে আবার ইখতিসাস তথা বিশেষজ্ঞতাও থাকবে, তখন বান্দার মাঝে ইল্‌মের প্রতি একটা মগ্নতা আসবে। তার সামনে তখন ইল্‌মই হয়ে যাবে মুখ্য বিষয়। সে তখন এদিক-সেদিক তাকায় না। মাওলানা ইয়াহয়া একবার চিন্তা করলেন, পড়াশোনার ফাঁকে সুযোগ পেলে এক দিন আখ খাবেন। কিন্তু এরই মধ্যে দীর্ঘ বিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, তিনি সুযোগই পেলেন না। সর্বদা ইল্‌মের মধ্যে এতই মশগুল ছিলেন যে, কোনো সময় তিনি ফারেগ ছিলেন না।

তো যখন ব্যক্তির মাঝে ইখতিতাস আসে, বিশেষজ্ঞতা আসে, তখন সর্বদা কিতাব মোতালাআয় মগ্ন থাকতে মন চায়। এই কিতাবের জগতটাকে একটা পুষ্পিত মালঞ্চের মতো মনে হবে তখন বান্দার নিকট। আর নিজেকে তখন মনে হবে ফুলে-ফুলে উড়ন্ত মধুমক্ষিকা। মাদরাসাকেই তখন হবে নিজ মাতৃক্রোড় আর কিতাবের কাগজকে তখন মনে হবে এটিই যেন হয় আমার কাফন। যদি এমন অবস্থাটা নিজের মাঝে সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলেই এই একটি মাকসাদ অর্জনের জন্য এই একটি মগ্নতায় নিমগ্ন থাকতে ইচ্ছে হবে চির দিন।

ইসলামের খেমতের প্রেরণা ও উদ্যম

মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীকে একবার ইংরেজরা গ্রেফতার করল। জেলে এক লোককে তিনি কুরআন শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। কিছু দিন পর তার মুক্তির নোটিশ এসে গেল। জেলার যখন এসে বলল, আপনার কারাজীবনের সমাপ্তি হচ্ছে, তখন হযরত বললেন, আরে, আমি তো এখন ঘরে ফিরে যাব না। জিজ্ঞেস করা হলো, কেন? বললেল, আমি অমুক বন্দিকে কুরআন পড়াচ্ছি। শেষ না করা পর্যন্ত আমি কারাগার থেকে বের হব না।

এ ছিল আমাদের আকাবির ও আসলাফগণের জীবনধারা। এই তাদের নেশা। এভাবে যদি ইল্‌মের খেদমতের জযবা হয়, এমন উদ্যম যদি ধমনিতে প্রবাহিত থাকে আর সাথে যদি এখলাসের গুণ বিদ্যমান থাকে, নিজের মাঝে যদি নিজের বিষয়ের ওপর যোগ্যতা ও বিশেষজ্ঞতা থাকে, তাহলে দেখবেন, আপনার ছাত্ররা মৌমাছির মতোই আপনার চার পাশে ভিড় করবে। আপনার আশপাশকে গুঞ্জরিত রাখবে।

একটু চিন্তা করুন

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আজকের এই সময়ে যখন চার পাশে নীতি-নৈতিকতার অধঃপতন জাতিকে অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করছে, বিবস্ত্র সভ্যতা মানবতাকে গ্রাস করে নিচ্ছে, অশ্লীলতার আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের বিবেক। কী পশ্চিম, কী পূর্ব। সর্বত্রই লজ্জা মানবজীবন থেকে পুরোপুরি উপেক্ষিত। এই সময়টাতে দীনের কাজ করা দীনের মেহনত করা বড়ই কবুলিয়্যাতের বিষয়, বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।

অন্তরের মধ্যে ইতিহাস ধারণ করে রাখুন। হযরত ইবরাহীম (আ.)কে যখন আগুনে ফেলা হলো, তখন একটি চড়ুই তার ঠোঁট দ্বারা এক-দু ফোঁটা

করে পানি আনতে লাগল। আগুনের মধ্যে পানি দিতে লাগল। কোনো একটা পাখি তাকে বলল, আরে চড়ুই ভাই! তোমার দুফোঁটা পানিতে তো এই গনগনে আগুন নির্বাপিত হয়ে যাবে না। কী লাভ এভাবে কষ্ট করে? চড়ুই বলল, আমি সে কথা জানি। কিন্তু ইবরাহীম খলীলুল্লাহর জন্য আমার যে ভালোবাসা আছে তা প্রকাশ পাচ্ছে তো!

প্রিয় ভাইয়েরা! গুনাহের এই যে খনখনে আগুন পুরোপুরি নিভবে কিনা তা তো আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমরা যে নবীর গোলামি করতে রাজী, আল্লাহর বন্দেগি করতে রাজী তা তো প্রকাশ করতে হবে। এটা তো আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে আছে। আমরা তো এই কাজটুকু করতে পারি যে, সবর্দা কুরআন সুন্নাহমতো চলব। বাকিটার জন্য আল্লাহর রহমত চাইব ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রহমত দান করুন।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আজই মনে-মনে অঙ্গীকার করে নাও, গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করবে। এই যে গুনাহের আগুন, যে আগুন আমরা দেহে সর্বদা প্রজ্বালিত করছি। অঙ্গীকার করুন, আমরা আর এ আগুন জ্বালাব না। কারণ, গুনাহ মানুষ ও আল্লাহর মাঝে দূরত্ব তৈরি করে দেয়। মনে করুন, শয়তান আমাদের কোমরে অনেকগুলো রশি বেঁধে রেখেছে। শত-শত রশি বেঁধে রেখেছে। এখন যতটা গুনাহ আমরা ছাড়তে পারব, ততটা রশি আমাদের কোমর থেকে ছিঁড়ে যাবে। আর যেসব গুনাহ ছাড়তে পারিনি, সে পরিমাণ রশি দিয়ে আমাদের কোমর বাধা রয়ে গেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা আলহামদুলিল্লাহ মাদরাসার ভেতর অবস্থানকারী তালিবুল ইল্‌মদের জীবনের মধ্যে বেশি বড় গুনাহ হয় না এবং এর সুযোগটাও এখানে কম। প্রায় ৯৫% গুনাহ আমাদের থেকে এমনিতেই পরিত্যক্ত থাকে। বাকি যে ৫-৬% গুনাহের পথ আমাদের রয়েছে, মেহনতটা আমরা এর জন্য করলেই চলবে।

হয়তো আমাদের কারও দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে নেই।

কারও অন্তর নিয়ন্ত্রণে নেই।

কারও মুখ নিয়ন্ত্রণে নেই।

এমন কিছু ছাড়া আমাদের বাকি জীবনটা তো প্রায় দিনের মতো চালিত হয়। এখন আমরা এই অল্প কটি গুনাহ থেকেই যদি বিরত থাকতে পারি, তাহলে আমরা অতি সহজেই সফল হয়ে যেতে পারব। তাহলে ﴿اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ এই আয়াতের লক্ষ্য ব্যক্তি আমরা হতে পারব। মনে করুন, শয়তানের সেই ১০০ রশির ৯৮টাই আপনি ছিঁড়ে দিতে পারলেন। আর দুটি রশি ছিড়ে

দেওয়া কি খুব কঠিন? অথবা মনে করুন, আল্লাহর কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে একশত সিঁড়ি আমাকে পার হতে হবে। এখন ৯৮টাই পার হয়ে গেলাম। তো আর দুটা সিঁড়ি পার হয়ে আমি খোদ আল্লাহর মনোনীত হয়ে যাওয়া তো কঠিন কিছু নয়। একেবারেই সহজ ব্যাপার।

কবি বলেন–

حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر

جو تھک کر رہ گیا ہو منزل کے سامنے

ওই ক্লান্ত-ক্লিষ্ট মুসাফিরের জন্য আফসোস, যে মনযিলের একেবারে সম্মুখে এসে পড়েছে।

আজ আমরা খোদার মনযিলের কাছে আছি। দু-চারটা কদম পার হলেই তো সেই কাঙ্ক্ষিত মনযিল এইটুকু পার হওয়া কি কঠিন ব্যাপার?

আল্লাহর কাছে দু'আ তো করতে পারি। একটু চেষ্টা তো করতে পারি চড়ুই পাখির মতো। আল্লাহ যেন আমাদের হৃদয় ও আত্মাকে গুনাহমুক্ত করে দেন। দু'আ করলে আল্লাহ রহমত করবেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলতেন, কেয়ামতের দিন ওই বান্দাকে লক্ষ করে আল্লাহ বলবেন, তুমি কেন নেককার হওনি? লোকটি বলবে, আমি তো দু'আ করছিলাম হে আল্লাহ! যেন তুমি আমাকে নেক বানিয়ে দাও। তার আমলনামায় যদি দু'আ করাটাই পাওয়া যায়, তাহলে তার উসিলায় আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে মাফ করে দেবেন। আল্লাহ আমাদেরও নেককার ও ভালো মানুষ বানিয়ে দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তাক্ওয়া ও খোদাভীতি

'একবার হযরত হাসান বসরি (রহ.) এক কিশোরকে প্রশ্ন করলেন, বলো তো দীনের সারকথা কী? ছেলেটি জবাব দিল, সতর্কতার সঙ্গে দীনের ওপর আমল করা। হযরত হাসান বসরি আবার প্রশ্ন করলেন, দীনের মধ্যে মুসিবতের বিষয় কী? ছেলেটি জবাব দিল, এক হলো তমা' বা লালসা। ওরা' থেকে উত্তম দীনের সারকথা আর নেই। তমা' থেকে দীনের ক্ষেত্রে বড় মুসিবতের জিনিসও আর নেই।

হযরত বসরি (রাযি.) শুনে বলতে লাগলেন, আমি তোমার মতো জ্ঞানবান কোনো তরুণ দেখিনি। তুমি দুটি শব্দের মাধ্যমে দীনের পূর্ণ কথা বলে দিয়েছ।'

তাক্ওয়া ও খোদাভীতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ -

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مَقَامٍ اٰخَرَ : اِنَّ اَوْلِيَآؤُهٗ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ -

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ -

আল্লাহর নৈকট্য কীভাবে অর্জিত হয়?

কালিমা স্বীকারকারী প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের একটি সুপ্ত স্বপ্ন হচ্ছে যে, আমি যদি আল্লাহর ওলী হতে পারতাম। তার আমল, তার অবস্থা ও অবস্থান যেমনই হোক সে অবশ্যই এমন একটি তামান্না হৃদয়ে পোষণ করে, এমন স্বপ্ন মনেপ্রাণে লালন করে। ভাবে, আমার যদি ওলী হওয়ার ভাগ্য জুটে যেত!

বেলায়াত দু-প্রকার। একটিকে বলা হয়, বেলায়াতে আম্মাহ। অন্যটিকে বলা হয়, বেলায়াতে খাস্সাহ।

কালিমা পড়ার কারণেই মানুষ বেলায়াত পেতে পারে। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত যেমনটি ইরশাদ করেছেন,

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

যারা ঈমান আনয়ন করেছে, আল্লাহ তাদের ওলী।[১৫২]

এটিই বেলায়াতের প্রথম ধাপ। এই নেয়ামতটা শুধু কালিমা পড়ে নেয়ার দ্বারাই মানুষ অর্জন করে নিতে পারে।

---

১৫২. সূরা বাকারাহ : আয়াত ২৪৭

তবে ওয়ালায়াতে খাস্‌সাহ ওই বেলায়াতকে বলা হয়- যে ওলায়াতকে আমরা মূলত বেলায়াত বলি। ওই বেলায়াত পাবার জন্য মানুষকে তাক্‌ওয়া অর্জন করতে হয়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

মুত্তাকীরাই শুধু আল্লাহর ওলী হতে পারবে।[১৫৩]

আজ তো লোকদের মাঝে অনেক ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়ে পড়ছে। লোকেরা মনে করে, চুল-গোঁফ রেখে জট বাঁধিয়ে রাখলেই ওলী হয়ে যায়। সাধারণ জনতা তো এটাই বোঝে। তারা মনে করে, আধা উলঙ্গ আধা ওলি আর পুরা উলঙ্গ পুরা ওলি। ভাইয়েরা! এমনটি কখনও নয়। বেলায়াত তো কুরআন ও সুন্নাহর পূর্ণ আনুগত্যের নাম। কিন্তু নফস চায়, মনমতো কাজও করব, আবার ওলীও হব।

این خیال است محال است و جنون

এটা অলীক ধারণামাত্র। এটা অসম্ভব। এটা পাগলামি বই নয়।

এ কীভাবে সম্ভব যে, মানুষ কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকবে আবার সে ওলীও হবে? দোস্তি ও দুশমনি কখনও একত্র হয় না। একটা সময় মানুষ দোস্ত থাকবে আর অন্য সময়ে সে দুশমন হয়ে যাবে এটা সম্ভব। একই সময় উভয়টা সম্ভব নয়। আল্লাহর নাফরমানি করা, কবীরা গুনাহ করা এটা তো আল্লাহর সঙ্গে দুশমনি। যে চায় আল্লাহর ওলী হতে তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে সে শরীয়তের আওতায় থেকে তার জীবন পরিচালিত করবে, শরীয়ত অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করবে। আর আমল করবে খুব সতর্কতার সাথে।

এজন্য মানুষ যখন সতর্কতার সাথে কোনো একটি কাজ করে, তখন সেই কাজে কিন্তু সে রিস্কে পড়ে না। যেমন– আপনার হজের ফ্লাইট যদি ১০টায় হয়ে থাকে, তাহলে আপনি চিন্তা করেন নটা বা সাড়ে নটায় আপনাকে বিমানবন্দর পৌঁছতে হবে। আপনি এখানে সতর্কতার সাথে কাজ করেন, যেন ফ্লাইট মিস না হয়ে যায়। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে–

To be on the sefe side

যেকোনো কাজই সতর্ক হয়ে করবে।

---

১৫৩. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৪

দাওয়াতের আয়োজন করলেন। মানুষ যদি ১০০ হওয়ার কথা থাকে, রান্না করা হয় ১২০ জনের, যেন কোনো কারণে লজ্জায় পড়ে যেতে না হয়। দুনিয়ার কাজকর্মে যেমন আপনি সতর্কতা অবলম্বন করেন, তেমনিভাবে আখেরাতের ব্যাপারেও সতর্ক হোন।

وَرَعٌ (ওরা')-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

وَرَعٌ শব্দটি بَابُ ضَرَبَ থেকে ব্যবহার হয়। এর অর্থ গুনাহে কবীরার ভয়ে গুনাহ সগীরা ছেড়ে দেওয়া। আমরা যেমন বলি, যে ঘরে যাওয়া নিষেধ সে ঘরের পথে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। এটাই وَرَعٌ। বড় গুনাহের ভয়ে ছোট গুনাহও পরিত্যাগ করবে।

নেকির পরিচয়

ইসলাম একটি স্বাভাবজাত দীন। একটি স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থা। ইসলামকে বোঝা ও উপলব্ধি করা অতি সহজ। একজন মূর্খও সহজেই দীন বুঝতে পারে। কারণ, প্রতিটি মানুষের ভেতরই স্বভাবজাত বুঝশক্তি বিদ্যমান আছে। তার কাছে কিতাবি ও পুঁথিগত বিদ্যা না থাকতে পারে।

নাওয়াস ইবনে সামআন (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি নেক ও বদের পরিচয় দিলেন– তা এতটা সহজও সুন্দর যে আশ্চর্য হতে হয়। সুবহানাল্লাহ! একথাও বলেছেন, নেকি তো উত্তম আখলাকেরই অপর নাম। তাই প্রত্যেক বান্দা জানতে সক্ষম হয় ভালো আখলাক কী। উন্নত চরিত্র কী।

অন্যের সাথে ভালো আচরণ করা।

খায়েরখাহি করা।

হামদর্দি ও ভ্রাতৃত্ব ঠিক রাখা।

মুসিবতে মানুষের কল্যাণ করা।

নিজের ওপর অন্যকে প্রধান্য দেওয়া।

সাধারণ থেকে সাধারণ একজন মানুষ জানে, এসবগুলোই ভালো কাজ। এটা মানুষ স্বভাবগতভাবেই আজন্ম অবগত। সেজন্যই ইসলামকে دين فطرت তথা মানবস্বভাবের অনুকূল ধর্ম বলে নামকরণ করা হয়েছে। আপনি যেখানেই কাজ পাবেন, ধরে নেবেন এটাই নেক আমল। এটাই ইসলামের হুকুম।

আবার দেখুন–

মানুষের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা।

মানুষের দুঃখ-দুর্দশা গোছানোর চেষ্টা করা।

মানুষকে কষ্ট না দেওয়া।

মানুষের জান-মাল ও ইজ্জাত-আবরুর ওপর আক্রমণ না করা।

কে আছে এমন, যে জানে না এগুলো ভালো কাজ? সুতরাং যেসব কাজের ব্যাপারেই আপনার মন বলবে, এটি ভালো কাজ, তাকেই আপনি মনে করুন, এটিই নেক কাজ। এটিই ইসলামের বিধান।

আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী আছে–

গুনাহ ওই সব কাজকে বলা হয়, যেগুলোর ব্যাপারে তোমার হৃদয় বলবে এটা গুনাহ, এটা খারাপ। তোমার হৃদয়ে যেসব কাজের ব্যাপারে খটকা লাগবে তা-ই গুনাহ। অনেক সময় আমরা এমন কাজ করি, যেগুলোর ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করি, যেন আমার এ কাজটির কোনো সংবাদ ও খবর মানুষ জানতে না পারে।

আমাদের কাজ যখন এমন হবে যে, একে আমরা অন্যের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করি, তখন বুঝতে হবে, এটা গুনাহের কাজ। নবীজি বলেছেন, যে কাজ লোকে অন্যের কাছে গোপন থাকার কামনা করে, তা-ই গুনাহ। তাই বলা হচ্ছে, আপনার যদি এমন সুযোগ না হয় যে, কোনটা গুনাহ আর কোনটা নেকি তা আপনি কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করবেন, তাহলে আপনি আপনার আত্মার দিকে তাকান। আপনার হৃদয়কে আপনি জিজ্ঞেস করুন। আপনার বিবেককে আপনি প্রশ্ন করুন। যখন কোনো কাজ করে আপনি অন্তরে অস্থিরতা ও অশান্তি বোধ করেন, আপনি কাজটির ব্যাপার লোকদের থেকে গোপন করাকে কামনা করেন, তখন বুঝুন কাজটা হারাম। এটা গুনাহের কাজ।

বকরির রাখাল, যে সারা দিন উন্মুক্ত ময়দানেই থাকে। সে তো আলেমের দেখা সহজে পায় না। কিন্তু নেক ও বদের পরিচয় মনে-মনে সে স্বভাবজাতভাবেই জেনে যায়।

তিনটি অমূল্য কথা

হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন, যার তিনটি বিষয় অর্জিত হয়ে গেছে, সে বুঝে নেবে, তার দীনের সর্বপ্রকার নেয়ামত অর্জিত হয়ে গেছে।

প্রথম কথা : তার মাঝে এমন ورع তথা খোদাভীতি সৃষ্টি হবে, তাকে তার এই খোদাভীতি সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বিরত রাখবে। তার স্বভাবের মধ্যে এমন সতর্কতা এসে যাবে যে, সে হারাম কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। গুনাহের কাজে গেলে মন তাকে বাঁধা দেয়। তার হৃদয় তাকে বলে দেয়, আল্লাহর অবাধ্যতা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! এমন মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে যায়।

দ্বিতীয় বিষয় : তার মাঝে এমন আত্মসম্মানবোধ আসবে যে, এই বোধ তাকে তার মূর্খতা থেকে বাধা দেবে। মানুষের ভেতর একটা আত্মমর্যাদাবোধ আছে। এর কারণেই মানুষ অবৈধ ও অশোভন কাজ করে না। সে কষ্টে-দুঃখে জীবন যাপন করে; তবুও সে এমন কোনো কাজ করে না, যার কারণে তার সম্মান নষ্ট হয়, যা তার আত্মসম্মানের বিপরীত হয়। আমি অনেক লোককে দেখেছি, যাদের আমল ও দীনদারি তত উন্নত নয়। তবে তারা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন হয়ে থাকেন।

শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে, যদি কোনো হাফেযে কুরআনের সাথে কেউ কোনো মূর্খসুলভ কথাবার্তা শুরু করে, তাহলে তার উচিত চুপ হয়ে যাওয়া। কারণ فی جوفه کلام الله তার বুকে রয়েছে আল্লাহর কালাম। ইরশাদ হয়েছে–

مَا يَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اَنْ يَّجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهَلَ

কোনো কুরআনের ইল্‌মপ্রাপ্ত লোকের জন্য উচিত নয় কোনো অজ্ঞের সাথে অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করা।

তৃতীয় বিষয় : মানুষের মধ্যে এমন আখলাক থাকবে, যার দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁধা দেবে। সে কারও অন্তরে কষ্ট দিতে পারে না। সর্বদা সে খেয়াল রাখে, আমার কারণে যেন আল্লাহর কোনো বান্দার কষ্ট না হয়ে যায়। তাই অনেক সময় সে জমিনে পাটাও আস্তে রাখে যেন জমিনের কষ্ট না হয়। অথচ আমাদের অবস্থা এমন যে আমরা অন্যের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করতেও সামান্য কুণ্ঠিত হই না।

স্মরণ রাখুন, রোগসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হচ্ছে আত্মার ব্যাধি। আর আত্মার ব্যাধিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে অন্যের আত্মাকে কষ্ট দেওয়া।কবি বলেন,

مسجد ڈھاوے مندر ڈھاوے، ڈھاوے جو کچھ ڈھیندا اے

پر کسے را دل نہ ڈھاویں، رب ولاں وچ رہندا اے

'তুমি চাইলে ভেঙে ফেল মসজিদ-মন্দির আরও যা ভাঙা যায় সব কিছু।
তবু ভেঙো না কারও হৃদয়, কারও মনে তুমি দিও না আঘাত।'
সাধারণ সাধারণ বিষয়েও মানুষের মনে দুঃখ দেওয়া মুমিনের শান নয়।

উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং হুসনে আখলাকের গুরুত্ব

ইমাম তাবারানির বিখ্যাত গ্রন্থ মু'জামুল কাবীরে হযরত আবুযর গিফারি থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে, একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কথা ইরশাদ করলেন,

প্রথম কথা : তাদবীর তথা পরিকল্পনা, পদক্ষেপ, উদ্যোগ গ্রহণ করার চেয়ে উত্তম কোনো জ্ঞান নেই।

তাদবীর অর্থ প্লানিং, উদ্যোগ, পরিকল্পনা। অর্থাৎ– আমরা যেকোনো কাজ করব তো, এর একটা প্লান বা পরিকল্পনা আগে মাথায় নেব।

কিছু ইংরেজী শিক্ষিত ভাইয়েরা বলে, ইসলামে প্লানিং নেই। পরিকল্পনামতো পদক্ষেপ নেই। অথচ আল্লাহর প্রিয়তম মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন–

তাদবীর তথা প্লানিং পরিকল্পনা বা প্রকল্পের মতো উত্তম কোনো জ্ঞান নেই। জ্ঞানীজনরা সর্বদা ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে পদক্ষেপ নেয়। অপ্রস্তুতভাবে কোনো পদক্ষেপ জ্ঞানবান মানুষ গ্রহণ করে না।

দ্বিতীয় কথা : যা-তা করা থেকে বিরত থাকার চেয়ে ধর্মভীরুতা আর কিছু নেই। যে-ব্যক্তি পরহেগারির সঙ্গে আল্লাহ ও বান্দাদের হক আদায় করে, সে দুনিয়াতেও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করে আর আখেরাতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি তার নসীব হবে।

তৃতীয় কথা : তৃতীয় যে-কথাটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তা হচ্ছে, উত্তম চরিত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো বংশপরিচয় নেই।

যাকে আল্লাহ হুসনে আখলাক তথা উত্তম চরিত্রমাধুরি দান করেছেন, তার বুঝে নেওয়া উচিত, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত তাকে সর্বোত্তম বংশমর্যাদা দান করেছেন। বান্দার এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো পরিচয় নেই।

দুই শব্দে দীনের পূর্ণ কথা

একবার হযরত হাসান বসরি (রহ.) এক কিশোরকে প্রশ্ন করলেন, বলো তো দীনের সারকথা কী? ছেলেটি জবাব দিল, সতর্কতার সঙ্গে দীনের ওপর

আমল করা। হযরত হাসান বসরি আবার প্রশ্ন করলেন, দীনের মধ্যে মুসিবতের বিষয় কী? ছেলেটি জবাব দিল, এক হলো তমা' বা লালসা। ওরা' থেকে উত্তম দীনের সারকথা আর নেই। তমা' থেকে দীনের ক্ষেত্রে বড় মুসিবতের জিনিসও আর নেই।

হযরত বসরি (রাযি.) শুনে বলতে লাগলেন, আমি তোমার মতো জ্ঞানবান কোনো তরুণ দেখিনি। তুমি দুটি শব্দের মাধ্যমে দীনের পূর্ণ কথা বলে দিয়েছ।

ইলসামের সারাংশ

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.) বলেছেন, চারটি কথা হচ্ছে দীনে ইসলামের সারাংশ–

১. পরহেযগারি তথা সতর্কতার সঙ্গে আমল করা সকল কর্মের মূল।

২. বিনয় মুমিন বান্দার ইয্যতপ্রাপ্তির উপকরণ।

৩. স্বাচ্ছন্দময় জীবনে যে-শুকরিয়া আদায় করা হয়, এ-শুকরিয়া তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

৪. যে-ব্যক্তি দুঃখ-দুর্দশা ও দুরবস্থায় সবর করে এ-সবর তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে।

একজন মানবের মধ্যে চারটি সিফাত বিদ্যমান থাকা জরুরি। শরীয়তের ওপর চলার ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করবে। আর সাধারণ অবস্থায় ঈমানদারদের সঙ্গের তাওয়াযু' তথা বিনয় অবলম্বন করবে। স্বাচ্ছন্দ ও সুখী অবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করবে আর দুঃখ-কষ্টে সবর করবে।

তিনটি বিস্ময়কর বিষয়

ইউনুস ইবনে উবাইদ (রহ.) বলেছেন, আমাদের জীবনের তিনটি বিষয় বড় বিস্ময়কর–

১. আমার এক বন্ধুর নাম মুহাম্মদ ইবনে সীরিন। সুবিখ্যাত স্বপ্নের ব্যাখ্যাতা। এ-বিষয়ে তিনি তা'বীরুর রুয়া কিতাব লিখেছেন। কথা বলতে-বলতে আমার এই প্রিয় বন্ধু ইবনে সীরিন বললেন, দুনিয়ার কারণে আমি কখনও কারও সাথে হিংসা করিনি। একথা শুনে আমি বড় অবাক হলাম। এমন লোকও দুনিয়াতে আছে, যে দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে কারও সাথে হিংসা, বিদ্বেষ করেনি।

২. আমার আরেক বন্ধু হাসান ইবনে আবু সুনান। তিনি বলেন, পরহেযগারি তথা সতর্কতার সঙ্গে কর্মসম্পাদন বড় সহজ ব্যাপার। তা এভাবে যে, তোমার হৃদয়ে যখন কোনো কাজের ব্যাপারে খটকা লাগে, তখন তুমি সঙ্গে-সঙ্গে কাজটি ছেড়ে দাও। তাহলেই তুমি পরহেযগারির ওপর আমলকারী হয়ে যেতে পারবে।

মানুষ যদি সঠিকভাবে চিন্তা করে, তাহলে বুঝতে পারবে কথাটি শত ভাগ সত্য। সর্বদা লক্ষ রাখবে, কোন কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুকূলে আর কোনটি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীত। বান্দা যখন আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার মতো কাজ করে, তখনই সে ঘাবড়ে যায়। তখন সে ভীতু হয়ে যায়।

আমরা গোপনে-গোপনে সব গুনাহই করছি। অথচ আমাদের আকাবিরগণ সমস্ত নেক কাজ লুকিয়ে-লুকিয়ে করতেন। আর আমরা তো নেক কাজ করিই না। যা একটু করি তো ঢাক-ঢোল পিঠিয়ে সবাইকে জানিয়ে করি।

সতর্কতার স্তর

আমাদের আকাবিরে কেরাম লিখেছেন, ওরা' তথা সতর্কতার সঙ্গে আমল করার চারটি স্তর রয়েছে–

১. জনসাধারণের সতর্কতা। এটা হচ্ছে হারাম কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করা।

২. নেক বান্দাগণের সতর্কতা, সন্দিহান সকল কাজ থেকে বাঁচা।

৩. মুত্তাকীদের সতর্কতা। তা এই যে, হারামের ভয়ে হালাল কর্ম থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

৪. সিদ্দীকীনের সতর্কতা। তা হচ্ছে, যা কিছু আল্লাহর জন্য হবে না, তা-ই পরিত্যাগ করা।

সতর্কতার সঙ্গে আমল করার মর্ম

সাধারণত বাজারে যেসব খাবার তৈরি হয়, সেগুলোর ব্যাপারে জানা যায় না যে, প্রস্তুতকারকরা কি ভালো জিনিস তৈরি করেছে, না খারাপ জিনিস তৈরি করেছে। পাক-পবিত্রতার খেয়াল করেছে, কি-না তাও জানা থাকে না। বিশেষ করে রেস্টুরেন্টগুলোর ব্যাপারে তো কোনো কিছুই জানা যায় না। তারা খাবারের মধ্যে কী দিচ্ছে তা তো বোঝাও যায় না। ভয় হয় কোনো

হারাম জিনিস খাবারের মধ্যে দিয়ে দিল কি-না? যদি এসব সন্দেহের কারণে কোনো বান্দা রেস্টুরেন্টের খাবার পরিত্যাগ করে, তাহলে সেটা হবে সতর্কতা।

অবশ্য আমরা এসব জিনিসকে হারাম বলে ফাতাওয়া দিতে পারব না। কারণ, আমরা তো সুনিশ্চিতভাবে জানি না। তবে সতর্কতা হচ্ছে, এমন জিনিসকে স্পর্শ করবে না, খাবে না। সুলুকের তালেবগণ নিজের ঘরের ঈমানদার-আমলদার রমণীর পাকানো খাবারের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকবেন। তবে সফরে বা জরুরত হলে তো শরীয়ত সে ওযর গ্রহণ করেই। তবে বিরত থাকার মধ্যেই সতর্কতা।

কোনো মানুষ বাজার দিয়ে পথ অতিক্রম করছে। ওখানে তো নারীও আছে, পুরুষও আছে। নজর উপরের দিকে তুললেই নারী বা পুরুষ চোখে পড়বেই। হতে তো পারে নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাবে। তাই সতর্কতা হলো উপরের দিকে না তাকিয়ে অবনত দৃষ্টিতে পথ অতিক্রম করার মধ্যে।

সতর্ক জীবন কীভাবে?

একটি কথা ভালোভাবে মনে রাখবেন। যার হৃদয়ে দুনিয়ার মহব্বত থাকবে, তার দিলে কখনও তাক্ওয়া প্রবিষ্ট হবে না। মানুষ যখন সিদ্ধান্ত নেবে, আমি খোদাভীতির জিন্দেগি যাপন করব, তখনই তার জন্য তাক্ওয়া ও ওরা'-এর পথ সুগম হয়ে যায়। এটিই হলো বান্দার জাগ্রত রূপ। এই হিসেবে প্রায় সব মানুষই ঘুমের ঘোরে জীবন পার করছে। আয়েশে আছে। আরামে আছে। কিন্তু জাগ্রত জীবন তার নসীব হলো না।

এক ইংরেজ তার বইয়ে একটি চমৎকার কথা লিখেছে–

suddenly I realised that the days coming and doing are my life

হঠাৎ আমার অনুভব হলো, দিন আসছে এবং যাচ্ছে এটিই আমার জীবন।

বান্দার তো সব সময় এ চিন্তা করা উচিত যে, আমার রবকে নারাজ করা উচিত নয়। আজ আমাদের অবস্থা এমন যে, বিবাহ হচ্ছে তো বলি–

মামার মন রক্ষা করো।

চাচার মন রক্ষা করো।

ফুপির মন রক্ষা করো।

খালার মন রক্ষা করো।

বন্ধুর মন রক্ষা করো।

শ্যালিকার রাগ। বিবি বলে ওর মনটাও যে রক্ষা করতে হয়।

ড্রাইভার রাগ। ওর মনটা রক্ষা না করলে চলে না।

ঘরের বুয়া রাগ। ওকেও একটু তুষ্ট করতে হবে।

ঘরের কাজের বুয়াটির মনও রক্ষা করার প্রতি যত্নবান হয় বান্দা। অথচ আল্লাহকে রাজী করানোর, আল্লাহর মন রক্ষা করার চিন্তা তার মনে আসে না। বিয়ের আয়োজনটাই শুরু হয় আল্লাহর হুকুমের বাইরে গিয়ে। আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে। একটি বিবাহে আল্লাহর কত নাফরমানি চলে। ঘরের সবার মন তুষ্ট করা হলো ঠিক; কিন্তু আল্লাহকে তো নারাজ করা হলো। বলো যে বিবাহের শুরুটাই হয় আল্লাহর নারাজি দিয়ে ওই বিবাহের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুখ আসবে কী করে?

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির পথ পরিহার করুন

বন্ধুগণ! মনে রাখবেন, ওরা' ও সতর্কতার ক্ষেত্র তাক্ওয়া ও খোদাভীতির বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির পথ পরিহার করার মাধ্যমে হবে। মাঝে-মাঝে শয়তান সতর্কতার সঙ্গে আমলকারীকে কঠোর বানিয়ে দেয়। ফলে অনেক সময় সে মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে বসে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাযি.) এমন বান্দাকে وَرِعٌ مُظْلِمٌ অন্ধ তাক্ওয়াবান বলতেন। তাই এই বিষয়টি খেয়াল রাখবে। সব সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে।

তাক্ওয়ার শাব্দিক বিশ্লেষণ

তাক্ওয়া ও খোদাভীতি এ-দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ। কাছাকাছি অর্থই প্রদান করে এ শব্দ দুটি। تَقْوٰى শব্দটি মূল اِتَّقٰى থেকে اسم مصدر হয়েছে। তবে কেউ বলেন, تقوى হচ্ছে اسم مصدر। আর এর মূল মাসদার হচ্ছে- وِقَايَة। বোঝা গেল وقى থেকে শব্দটি গঠিত। و কে ت দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। تقوى হয়ে গেছে। যেমন تُرَاث বা تُخَمَة-এর মধ্যে و কে ت-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাক্ওয়া-এর অর্থ হচ্ছে আশ্রয় নেওয়া, আশ্রয় গ্রহণ করা। কাজী আব্বাস বলেন–

يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ

খেজুর বৃক্ষের ডালের আশ্রয় নেওয়া।

অর্থাৎ– নিজেকে নিজে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখাকেই মূলত তাক্ওয়া বলা হয়।

আমাদের আকাবিরে কেরাম তাক্ওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন বাণী পেশ করেছেন–

সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমর (রাযি.) বলেছেন, কোনো বান্দা তাক্ওয়ার মূল মর্মে ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ-না সে ওইসব জিনিস পরিত্যাগ করবে, যেসব জিনিসের ব্যাপারে তার হৃদয়ে খটকা লাগে।

তিনি একথাও বলেছেন, মুত্তাকী সেই ব্যক্তি, যে অন্য সকলকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করতেন।

হযরত বাইজিদ বুস্তামি (রহ.) বর্ণনা করেছেন, মুত্তাকী সেই ব্যক্তি, যে প্রত্যেক কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কার্যকর করে।

আবুল হাসান নূরী (রহ.) বলেছেন, মুত্তাকী সেই ব্যক্তি, যে অন্যের জন্য তা পছন্দ করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।

সাইয়্যেদুনা আলী (রাযি.) বলেছেন, মুত্তাকী সেই ব্যক্তি, যে গুনাহের ওপর বাড়াবাড়ি করে না। অর্থাৎ– যে বারবার গুনাহ না করে। আর যদি গুনাহ হয়েই যায়, তাহলে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা থেকে মাফ করিয়ে নেয়।

কাজেকর্মে তাক্ওয়া অবলম্বন

তাক্ওয়ার সম্পর্ক শুধুই পানাহারের সঙ্গে নয়। পানাহারের ক্ষেত্রে তাক্ওয়া অবলম্বন করা তো বড়ই সহজ। আর মুআমালায়? আল্লাহু আকবার! মুআমালা তো আমাদের এমন হওয়া উচিত যে, অন্যের হৃদয় যেন কখনও ব্যথিত না হয়। কারও হক যেন নষ্ট না হয়। মুআমালায় তাক্ওয়া অবলম্বন করা কঠিন কাজ বটে। ইমাম বাইহাকী (রহ.) হযরত ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, কোনো বান্দার শুধু নামায, রোযা দেখো না। বরং তার মুআমালাও দেখো। আমাদের আকাবিরে কেরাম মুআমালার ক্ষেত্রে বড়ই তাক্ওয়াবান ছিলেন। তাঁরা অনেক সতর্কতা অবলম্বন করে চলতেন। উদাহরণস্বরূপ–

ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.) যৌবন বয়সে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। একদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে তিনি দিনের বেলায়ই দোকান বন্ধ করে চলে গেছেন শুধু এজন্য যে, এই অন্ধকার পরিবেশে লোকেরা ভালো-

খারাপ চিনতে পারবে না। খারাপ কাপড়কে ভালো কাপড় মনে করে নিয়ে যেতে পারে।

তাঁর কাছে কাপড়ের এমন একটি থান এল, যার মধ্যে বুননে রিজেক্ট কিছু কাপড় ছিল। তিনি দোকানের কর্মচারীকে বললেন, তুমি এই থানটি বিক্রির সময়ে বলে দিয়ো এটাতে এই সমস্যা আছে। কর্মচারী বলল, ঠিক আছে। এক দিন ইমাম সাহেব সেই ত্রুটিযুক্ত থানটি দেখতে পেলেন না। কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলে বলল, বিক্রি হয়ে গেছে। ইমাম সাহেব বললেন, দোষের কথা বলে দিয়েছ? বলল, হুজুর! ভুলে গেছি। ইমাম সাহেব বললেন, এখন আমার জন্য এসব পয়সা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কারণ, সেই লোকটি ত্রুটিযুক্ত বস্তু আমার থেকে নিয়ে গেল। অথচ ত্রুটির কারণে মূল্য কম রাখা হলো না তার থেকে। লোকটিও জানে না ত্রুটি আছে।

এই হচ্ছে একজন মুমিনের লেনদেন। একজন মুত্তাকীর মুআমালা।

ইমাম আযম ত্রুটিযুক্ত কাপড়ের বিক্রির টাকাটা হাতে নিলেন। ক্রেতার পুরো বিবরণ, কেমন চেহারা, কেমন পোশাক, কতটুকু লম্বা সব জিজ্ঞেস করে লোকটির গমনের দিকে হাঁটা দিলেন এবং তাকে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে-খুঁজতে তিনি শহরের প্রান্তে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাকে পেয়ে গেলেন। বিষয়টি তাকে অবহিত করলেন। শুনে লোকটি বড়ই বিস্মিত হলো। লোকটি এবার বলল, ঠিক আছে আমার থেকে যে টাকা নিয়েছ, তা ফেরৎ দাও। ইমাম সাহেব ফেরৎ দিলেন। কাছেধারে একটি জলাশয় ছিল। লোকটি টাকাগুলো জলাশয়ে নিক্ষেপ করে ফেলে দিল। ইমাম সাহেব বড় হতবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ভাই কেন এমন করেছ? লোকটার চোখে অশ্রু জমা হয়ে গেল। বলতে লাগল, আমি মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার বদনিয়তে এসেছিলাম এবং ভেজাল মুদ্রা নিয়ে এসেছিলাম। এখন আমি অনুভব করলাম, আপনার ভেতর এই পরিমাণ তাক্ওয়া যে, সামান্য একটি বিষয় নিয়ে আপনি আমাকে এভাবে খুঁজতে-খুঁজতে শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসে গেছেন। আজ আমার হৃদয় আমাকে ভর্ৎসনা করছে। তাই আপনাকে এখন আমি নিখাঁদ পয়সা দেব।

আমাদের আকাবিরে কেরামের জীবনচরিত্রের মধ্যে এমন কথাও লেখা আছে যে, যখন মেয়ে বিয়ে দিতে চেয়েছেন, তখন নিজের মেয়েদের মধ্যে যদি কোনো দোষ বা ত্রুটি থাকত, সেটা সম্বন্ধ প্রত্যাশীদের বলে দিতেন যে, মেয়েটি একটু রাগী। ভালো করে কাজকাম করতে জানে না। আমার মেয়ের

মধ্যে এই সমস্যা আছে। তো তাঁরা কন্যার সমস্ত বিষয়ও বলে দিতেন। যেন পরে কোনো সমস্যা না হয়। যা হওয়ার আগেই যেন হয়ে যায়। ধোঁকা যেন দেওয়া না হয়।

এক লোক গাধা বিক্রি করছিল। খরীদদার জিজ্ঞেস করল, গাধাটা কেমন? লোকটি জবাব দিল, যদি গাধাটা আমার পছন্দের হতো, তাহলে তো এটা আমি বিক্রি করতাম না। সুবহানাল্লাহ!

আমাদের আকাবিরে কেরাম মানুষের হক নষ্ট করবে তো দূরের কথা জীবজন্তুর হকও তারা কখনও নষ্ট করতেন না। হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) সম্পর্কে এ-ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার তার উটনিকে খাবার দিচ্ছিলেন। খাবার দিতে দিতে বললেন, দেখো! আমি কখনও তোমার হিম্মতের বাইরে বেশি তোমার ওপর বোঝা চাপিয়ে দেইনি। তুমি কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে আমার সঙ্গে ঝগড়া করো না।

আল্লাহু আকবার কাবীরা!

একেই বলা হয় বেলায়াত। এঁরাই হচ্ছেন আউলিয়া। এঁরা ওই মানুষ, যাদের সীনা আল্লাহ তা'আলা বেলায়াত দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন।

গুনাহ্ পরিত্যাগ করার ফযিলত

তাক্ওয়ার মূল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সতর্কতার সঙ্গে আমল করবে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ

গুনাহ করা ছেড়ে দাও। গুনাহ পরিত্যাগ করো। তাহলেই তোমরা হয়ে যাবে সবচেয়ে বড় ইবাদাতগুজার, আল্লাহর প্রিয় বান্দা।

এক তো হলো বেশি-বেশি নফল ইবাদাত করা। তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি পড়া। নামায আদায় করা। এতো অনেক ভালো কথা। এর চেয়ে আরও ভালো কথা হলো মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর কোনো নাফরমানিই না হওয়া। এর ওপর বেশি-বেশি মেহনত করা উচিত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষ আল্লাহর সামনে সবচেয়ে উত্তম যে আমলটি নিয়ে উপস্থিত হবে, তা হচ্ছে গুনাহের স্বল্পতা।

এই উম্মতের মাঝে এমন লোকও অতীত হয়েছেন, যারা গুনাহই করেননি।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) এক নারীর আলোচনা উল্লেখ করেছেন–

اَلْمَرْأَةُ الْمُتَكَلِّمَةُ بِالْقُرْاٰنِ

ওই নারী, যে কুরআনের শব্দ ও আয়াতের মাধ্যমে কথা বলতো।

কুরআনের শব্দ ব্যতিত কোনো শব্দ দিয়ে সে কথা বলতো না শুধু এজন্য যে, কোনো মিথ্যা, গীবিত ও অনর্থক কথা যেন তার মুখ থেকে বের না হয়।

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) তাঁর কিতাবের মধ্যে লিখেছেন–

'এই উম্মতের মধ্যে এমন পূত-পবিত্র ব্যক্তিবর্গও অতীত হয়েছেন, যাদের গুনাহ লেখার ফেরেশতা বিশ-বিশটি বছর পর্যন্ত কোনো গুনাহ লিখতে পারেনি।

এর মানে কী? এর মানে তো কখনও এই নয় যে, ওই বান্দা ফেরেশতা ছিলেন। তিনি একজন মানুষই তো ছিলেন। কিন্তু তাঁরা গুনাহ করতেন না। তবে মানবসুলভ কোনো গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে তাওবা করে নিতেন।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন মানুষ থেকে কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তখন নেক কাজ লেখার ফেরেশতা বদকার লেখার ফেরেশতাকে বারণ করে। বলে, দাঁড়াও। দেখো! লোকটি কোনো নেক কাজ করে কিনা? হতে তো পারে, সে তাওবা করে নেবে। এক প্রহর পর্যন্ত এভাবে সে তাকে ঠেকিয়ে রাখে। তাই যেকোনো সময়ই মানুষের গুনাহ হয়ে গেলে তার জন্য উচিত হলো লজ্জিত হওয়া। গুনাহটা লেখার আগে-আগেই তাওবা করে নেওয়া। কতটা সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি, যার আমলনামা সুদীর্ঘ বিশটি বছর পর্যন্ত কোনোরূপ গুনাহ লেখা হয়নি। বরং বলা যায়, বদ লেখার ফেরেশতা তার নামে কোনো গুনাহ লেখার সুযোগ পায়নি। হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন,

مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْوَرَعِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفٍ مِّنَ الصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ

হাজারো নামায-রোযার চেয়ে অণুপরিমাণ গুনাহ ছেড়ে দেওয়া উত্তম।

বুযুর্গানে দীন বলেন, মানুষ পাঁচশতবার হজ করা অপেক্ষা উত্তম হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে একটি গুনাহ ছেড়ে দেওয়া।

আমাদের আকাবিরে কেরাম বলেন, এক প্রকার যিকির তো এই যে, মানুষ আল্লাহ-আল্লাহ জপ করবে। তবে উত্তম যিকির হলো, গুনাহ করার সময় আল্লাহর কথা মনে পড়া এবং সে কারণে গুনাহটা পরিত্যাগ করা।

মনে রাখুন! কোনো বান্দা আল্লাহর জন্য যদি কোনো কিছু পরিত্যাগ করে, তাহলে আল্লাহ তার সর্বোত্তম বদলা দান করেন। যেমন– এক বান্দা যদি গায়রে মাহরামের দিকে না থাকায়, তাহলে হাদীছের ভাষ্যমতে তাকে আল্লাহ ইবাদাতে সুমধুর স্বাদ দান করবেন, ঈমানের মজা দেবেন। এতে তো সে উত্তম জিনিসই পেয়ে গেল।

ইল্‌ম ও মাআরিফের বারিধারা

যে-বান্দাহ তাক্‌ওয়া ইখতিয়ার করে, আল্লাহ তাকে ইল্‌ম ও মারেফতের বারিধারায় সিক্ত করেন।

তলাবায়ে কেরাম যদি আল্লাহর মারেফত প্রাপ্ত হতে চান, তাদের জন্য মারেফত প্রাপ্তির এটিই সর্বোচ্চ সুন্দর পথ যে, তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ

আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তোমাদের ইল্‌ম দান করবেন।[১৫৪]

এই ইল্‌মটাই হচ্ছে ইল্‌মে লাদুন্নী।

তাক্‌ওয়ার কারণে বিনিময়ে প্রবৃদ্ধি বাড়ে

ইমাম বাইহাকী ও দাইলামী (রহ.) বর্ণনা করেন–

رَكْعَتَانِ مِنْ رَجُلٍ وَرِعٍ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ رَكْعَةٍ مِنْ مُخْلَطٍ۔

মুত্তাকী বান্দাহর দুই রাকাত গুনাহে লিপ্ত বান্দার হাজার রাকাত অপেক্ষা উত্তম।

সাধারণ বান্দা হাজার রাকাত পড়ে যে বিনিময় পাবে, তাক্‌ওয়া থাকার কারণে মুত্তাকী বান্দা দুই রাকাত পড়েও সেই পরিমাণ বিনিময় পাবে। এটিই তাক্‌ওয়ার বরকত। ইরশাদ হচ্ছে–

وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا

তোমাদের বিনিময়ে প্রবৃদ্ধি দান করা হবে।[১৫৫]

---

১৫৪. সূরা বাকারাহ : আয়াত ৩৮৩

১৫৫. সূরা তালাক : আয়াত ৫

দেখুন! এক মন মাটির ওজন তো এক মনই হয়।

আবার এক মন লোহার ওজন তো এক মনই হয়।

আবার এক মন সোনার ওজনও তো এক মনই হয়।

কিন্তু মাটির মূল্য লোহা অপেক্ষা কম। লোহার মূল্য সোনা অপেক্ষা কম। আর সোনার মূল্য সবচেয়ে বেশি। অথচ সবগুলোই তো সমান ওজনের– সবই এক মন।

হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন,

যে এতোটুকু তাকয়াবান হতে পারল না যে, গোপনে গুনাহ হতে বাঁচতে পারে, তাহলে তো তার আমলের ব্যাপারে আল্লাহ পরোয়াই করেন না। সে ভালো করলেও কী, খারাপ করলেও কী?

সারকথা

আজ আমরা তাক্ওয়াহীন জীবন যাপন করছি। এভাবে গুনাহ ও নেক মিশ্রিত জীবনে ভালো কিছু আশা করা যায় না। অন্তরে আল্লাহর মারেফত আসে না। বেয়ালায়াতের অন্তর অর্জিত হয় না। আল্লাহর অসন্তুষ্টি হয় এমন কাজ করার নিয়তও মনের মধ্যে না রাখা চাই। দুনিয়ার সফর শুরু করার জন্য মানুষ কত-না আয়োজন করে। বেলায়াতের এই দীর্ঘ সফরের জন্যও তো দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন। অনেক আলোচনা হলো। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) ফার্সি একটি কবিতার মাধ্যমে বলেছেন, যার মর্ম হলো–

'হে দোস্ত! আমি তোমাকে মনযিলের ঠিকানা বলে দিয়েছ। আমি মনযিলে পৌঁছতে পারিনি। হতে তো পারে আল্লাহ তোমাকে পৌঁছিয়ে দেবেন।

আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পূর্বেই আমাদের বেলায়াতের নূর ও জ্যোতি দান করুন। কেয়ামতের দিনে আমাদেরকে তার প্রিয় বান্দাদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সাফল্যের পাঁচ মূলনীতি

'আমাদের মাঝে অধিকাংশ সময়ই পাঁচটি ভুল ও দুর্বলতা পাওয়া যায়। এই পাঁচটি সমস্যাই আমাদের বুনিয়াদি সমস্যা। বুনিয়াদ ঠিক করে নিতে পারলে আমাদের জীবনটাই সুন্দর হয়ে যাবে। জীবনের মাঝে শৃঙ্খলা এসে যাবে।

আজকের তরুণ সমাজ এসে বলছে, আমাদের কিছু সংক্ষিপ্ত নসীহত করে দিন। তাই অন্তরে উদিত হলো- আজ পাঁচটি মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আপনাদের যদি কোথাও নসীহত করার সুযোগ আসে তাহলেও এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আশা করি জীবনের মূল মর্মই উপস্থাপিত হয়ে যায়।

সাফল্যের পাঁচ মূলনীতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ـ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

আল্লাহর ওয়াদা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ـ

যে সৎ কর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব, যা তারা করত।[১৫৬]

এই আয়াতের মধ্যে আমাদেরকে একটি মহা সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। স্বভাবতই সাফল্য অর্জনের জন্য প্রত্যেকটি মানুষই রাত-দিন কাজে মশগুল থাকে। বড় স্পষ্টভাবে সে কথাটিই বলে দিচ্ছেন আল্লাহ যে, যেকোনো ঈমানদার ব্যক্তি চাই সে নারী হোক বা পুরুষ হোক সে যদি নেক আমল করে, তাহলে অবশ্যই-অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে পবিত্র জীবন দান করবেন এবং তার বিনিময় তাকে দেবেন। এর দ্বারা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, আমাদের কামিয়াবি ও সফলতার মূল ভিত্তি হচ্ছে আমাদের আমল। আমল ভালো হলে জীবন সফল আর আমল মন্দ হলে জীবন বিফল।

---

১৫৬. সূরা নাহল : আয়াত ৯৭

জীবনের সারনির্যাস

অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে, হুযুর! আমরা কীভাবে পেরেশানি থেকে মুক্তি পেতে পারি? আমাদের মন্দত্ব কেন কেটে যাচ্ছে না? আমরা উঠে দাঁড়াতে পারছি না কেন? এমন আরও কত জিজ্ঞাসা আমাদের। সব কিছুর উত্তর এই– আমাদের পাঁচটা মৌলিক বিষয় আছে। সেগুলোর কারণে আমরা জীবনে বিফল ও ব্যর্থ হই। সেগুলোর কারণেই আমরা পেরেশান থাকি। সেই পাঁচটি বিষয় আজ আপনাদেরকে বলার ইচ্ছে করেছি। এগুলোকে মনে করবেন পুরো জীবনের সারনির্যাস।

আমরা যদি আমাদের ভেতরকার এই পাঁচ বিষয়ের সংশোধন করতে পারি, তাহলে আমরা কামিয়াব হতে পারব। এই পাঁচটি সমস্যাই আমাদের বুনিয়াদি সমস্যা। বুনিয়াদ ঠিক করে নিতে পারলে আমাদের জীবনটাই সুন্দর হয়ে যাবে।

আজকের তরুণরা বলছে, আমাদের কিছু সংক্ষিপ্ত নসীহত করে দিন। তাই অন্তরে উদিত হলো, আজ এই পাঁচটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করি। আপনাদের যদি নসীহত করার সুযোগ কোথাও আসে, তাহলেও এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। আশা করি, জীবনের মূল মর্মার্থই উপস্থাপিত হয়ে যাবে।

এক. ইল্‌ম অনুযায়ী আমল

আমাদের ভুলগুলোর মধ্যে থেকে মারাত্মক ও মহা ভুলটি হলো- আমরা ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করি না। আমাদের আজকের তারুণ্য তো ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করাকে ওলামায়ে কেরামের সাথে খাস করে নিয়েছে। এটি বড় ভুল। প্রত্যেকটা মানুষের কাছেই তো কিছু না কিছু ইল্‌ম আছে। ফলে সেইটুকুর ওপর আমল করাই তো তার জন্য আবশ্যক।

আমাদের অনেকে বুঝে নিয়েছে, ওলামায়ে কেরাম যদি তাদের ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করে, তাহলেই বিষয়টি মন্দ। কথাটা ঠিক নয়। বরং প্রত্যেক বান্দারই সামান্য হলেও ইল্‌ম আছে। সেই ইল্‌মটুকুর ওপর যদি বান্দা আমল না করে, তাহলেই সেটা তার জন্য মন্দ। ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করা সবার জন্য মন্দ।

কেয়ামতের দিন আলেম, সাধারণ সকলকেই এই প্রশ্ন করা হবে, তুমি তোমার ইল্‌মের ওপর কতটুকু আমল করেছ?

ইল্‌মের ওপর আমল না করাটা দুনিয়াবি ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। এর কিছু উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

ইল্‌ম আছে তবু ধৈর্যহারা

একলোক ডাবল এম. এ অর্জন করেছে। দুনিয়ার বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত সে। এখন সে গাড়ি নিয়ে পথ চলার সময় রেললাইন সামনে এল। রেললাইনে সিগনাল পড়ে আছে। রেলগাড়ি চলে গেলে সিগনাল উঠিয়ে নেওয়া হবে। লোকটি ট্রাফিকের এই প্রতিবন্ধকতার প্রত্যাখ্যান করে ডান পাশের বিপরীত দিয়ে আগ্রস হতে লাগল। বলুন তো, তার এই উচ্চশিক্ষা তার কী ফায়দা দিল? সে বোঝে না, জানে না এমন তো নয়। তবু মানুষ উল্টো পথে গাড়ি নিয়ে যায় এবং রেলগাড়ি যখন চলে যায় ও সিগনাল উঠিয়ে নেওয়া হয়, তখন দ্বিমুখী ভিড় লেগে যায়। একে অন্যের ওপর চড়াও হওয়ারও চেষ্টা করে। তো দেখুন, সবাই জানে, রেল ক্রসিং পার হতে হলে নিয়মনীতি মানতে হয়। রেলগাড়ির চলাচল অবস্থায় সাধারণ গাড়িকে কিছুক্ষণের জন্য থামতে হয়। রেল চলে গেলে ট্রাফিক ক্রসিং-এর ফটক খুলে দেয়। সবাই তখন যাবে। কিন্তু এতখানি ধৈর্যহারা হয়ে যায় মানুষ। এই যে নিয়মটা সে জানে; তবুও তার ওপর আমল করে না; বরং নিজের বামের রাস্তা রেখে ডানের রাস্তায় চলে যায় এবং খামোখা জ্যাম সৃষ্টি করে। দেখুন, জানার পরও মানা নেই, আনুগত্য নেই।

জানা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনার মধ্যে দুর্বলতা

আমাদের সবচেয়ে বড় ভুলটা হয় ড্রাইভিং-এ। একেকজন তার অফিসের প্রধান পরিচালক ও উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু লাল বাতির সিগনাল লঙ্ঘন করাকে কেউ খারাপ মনে করে না। অথচ ট্রাফিক আইন কিন্তু এজন্য তৈরি করা হয়েছে যে, মানুষ নিজেও শান্ত ও শৃঙ্খলার সঙ্গে চলবে, অন্যকেও চলতে দেবে। কিন্তু সবাই চেষ্টা করে নিজেই সড়ক দিয়ে গাড়ি চালাতে। সামনে লাল বাতির সিগনাল আছে; কেউ তা মান্য করতে চায় না। ট্রাফিক আইন সবাই জানে। আবার সবাই সেই নিয়ম লঙ্ঘন করে। ফলে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ ও তীব্র যানজট। তো আমাদের ইল্‌ম আছে আমল নেই। জানা আছে মানা নেই। এই কল্পনার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সকলেই নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন। কে কতটুকু আমল করছেন নিজ ইল্‌মের ওপর।

জানে তবু অন্য নারীতে চোখ তোলে

সব তরুণ, সব যুবক জানে, অন্য নারীর প্রতি তাকানো নিষেধ। সব নারীরই মর্যদা সুউচ্চ। আরও ভালো করে জানে যে, অন্য নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দিলে ওই নারী এবং তার আত্মীয়রাও সহ্য করে না। নিজের ঘরের নারীর প্রতি অন্য কেউ তাকালে তো নিজের কাছে খারাপ লাগে। কেউ তার বোনের দিকে, মায়ের দিকে, স্ত্রীর দিকে অন্য কোনো পুরুষ কুনজরে তাকানোকে সহ্য করে না, করতে পারে না। অথচ নিজে ঠিকই অন্য নারীর দিকে কুনজর দিচ্ছে। অন্য নারীকে দেখে– কারও বোন, কারও মা, কারও স্ত্রীর দিকে কুদৃষ্টি দিচ্ছে, উত্যক্ত করছে। তাকে উদ্দেশ করে শিস দিচ্ছে। টেলিফোন করছে। অন্য নারীর সাথে মোবাইলে সম্পর্ক গড়ছে। ম্যাসেজ দিচ্ছে। নিজেও জানে, এগুলো খারাপ কাজ তবুও সে করছে। অন্যের বোনকে উত্ত্যক্ত করতে বিবেকে বাঁধে না। নিজের বোনকে উত্ত্যক্ত করলে সহ্য করতে পারে না। আমরা সবাই সব কিছু জানি, বুঝি। কিন্তু কেউই মানি না। মানতে চেষ্টাও করি না।

তাই নিজের মতো করে, নিজের দিকে তাকিয়ে বিষয়গুলোর প্রতি একটু সচেতন তো হতে হবে।

মাতাপিতার অবমূল্যায়ন

আজ এমন কে আছে, যে মা-বাবার খেদমত করতে হবে এবং এটা যে আবশ্যক বিষয় সে কথাটা জানে না? মা-বাবার আনুগত্য করতে হয়। দুনিয়াতে তাদেরকে শান্তি দিতে হয়। তাদের খেদমত করতে হয়। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে হয় এ বিষয়টা সকলেই জানে এবং বোঝে। সকলেরই এ-বিষয়ে ইল্‌ম আছে। মা-বাবা যদি সন্তানকে কোনো কাজে বারণ করেন, তাহলে সেটা মা-বাবা সন্তানের কল্যাণে করেন, সন্তানের উপকারের জন্য করেন। অথচ আমাদের চোখ তো অন্ধ। চোখে পর্দা দেওয়া। তাই আমরা ভাবি, আরে, আমি আমার বন্ধুর সাথে মটরবাইক দিয়ে ছুটে বেড়াব। বাবা হয়তো সেটা নিষেধ করেছেন। কিন্তু বাবার কথা এক কান দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছে। আমরা তারপরও ওই বখাটে বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে যাই। এটি আমাদের অনেক বড় ভুল।

পানির অপচয়

কে না জানে, আল্লাহর নেয়ামতকে বিনষ্ট করা উচিত নয়। এ দিকে কিন্তু কেউই লক্ষ রাখে না। আমরা টেপ চালু করে রেখে ধৌতের কাজ করতে থাকি, ঘষামাজা করতে থাকি। এর ফাঁকে কত পানি অযথাই পড়তে থাকে। এগুলো কোন কাজে ব্যয় হয়? এটা কি আমরা চিন্তা করি! অনেক সময়ই করি না। এ-ব্যাপারে গাফেল থাকি। পানি আল্লাহর বড় একটি নেয়ামত। উচিত ছিল আমরা সকলেই এমন হওয়া।

Use it, ob do abuse it

ব্যবহার করো নষ্ট করো না।

আমরা মেসওয়াক করতে থাকি, ব্রাশ করতে থাকি আর নল দিয়ে পানি পড়তে থাকে। টেপটা বন্ধ করি না। এই তো আমাদের হালত। কাজটা কত ছোট। নিজেকে সর্বদা প্রশ্ন করা উচিত, আমরা আমাদের ইল্‌ম, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে কতটুকুর ওপর আমল করি। আমরা কেয়ামতের দিন রব্বে কারীমের সামনে কী জবাব দেব?

জেনেশুনে মিথ্যে বলা

কে না জানে, মিথ্যা বলা উচিত নয়। সত্যের ওপর সর্বদা অটল-অবিচল থাকার চেষ্টা করা আবশ্যক। আজকের যুগের অবস্থা হয়ে গেছে এমন যে, শতকরা দু-চারজন মানুষ হয়তো সত্য বলে। আজকের মিথ্যে কথা বলা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় তো মিথ্যাকে মিথ্যাই মনে হয় না। শয়তান আমাদেরকে এমনভাবে প্রতারিত করছে যে, আজকে মিথ্যাকে নাম দেওয়া হয়েছে ফান। নাম দেওয়া হয়েছে কৌশল।

বিবি, বাচ্চা, বন্ধুবান্ধব একে অন্যের সাথে মিথ্যা কথা বলেই হাসি তামাশায় মেতে ওঠে আর বলে ফান করলাম। আসলে এসবই তো মিথ্যে। এসবই তো পাপ। জেনেশুনে আজ মানুষ মিথ্যে বলছে। জেনেশুনেই তো আজ এমন জঘন্য পাপ করা হচ্ছে। সবাই ভাবে, আমার সঙ্গে মানুষ খায়েরখাহি করুক। আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করুক। আমার কল্যাণে কাজ করুক। কিন্তু ভাবে না, আমি অপরের কতটুকু কল্যাণ করলাম। আমি অপরের সঙ্গে কতটুকু সত্য বললাম।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

সেই পূর্ব যুগের কথা। এক যুবক কাজ করতে একটি শহরে গেল। একদিন ছুটিতে সে শিকারে বের হলো। একটা পাখি দেখে যুবক তির নিক্ষেপ করল পাখিটাকে লক্ষ করে। কিন্তু পাখির গায়ে না লেগে তিরটা পতিত হলো এক খৃষ্টান শিশুর গায়ে। সাথে-সাথে শিশুটা মারা গেল। যুবক তাকে উঠানোর জন্য দৌড়ে গেল। ইতিমধ্যে ওই শিশুর মা-বাবা এসে সেখানে উপস্থিত হলো। সে তাদের বলল, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করিনি। আমি একটা পাখিকে লক্ষ করে তির নিক্ষেপ করছিলাম। কিন্তু লক্ষভ্রম হয়ে তিরটা এই বাচ্চার গায়ে এসে লেগে গেল। তো ওই বাচ্চার আত্মীয়-স্বজন তার পিতা-মাতাকে বলল, আমরা তো আর স্বচক্ষে দেখিনি বা বুঝতেও পারব না বাস্তবেই কি সে ইচ্ছাকৃতভাবে তির মেরেছে, না ভুলে লেগে গেছে। আমাদের কাজী সাহেব মুসলমান। অতএব আমরা আশাবাদী, কাজীর নিকট গেলে এর বাস্তবতা জানা যাবে এবং আমরা ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা পাব।

তার বিরুদ্ধে কাজীর দরবারে মামলা দায়ের করা হলো। তাকে কাজীর সামনে উপস্থিত করা হলে কাজী তাকে জিজ্ঞাসা করল, ঘটনা কি এমনই? উত্তরে সে বলল, জি এমনই। তখন কাজী তাকে বলল, দুই রাস্তার কোনো একটা তোমাকে অবলম্বন করতে হবে। হয়তো বাচ্চার আত্মীয়-স্বজনদের রাজি করাতে হবে আর যদি তারা রাজি না হয়, তাহলে কুরআনের বিধান 'জানের বদলায় জান'-এর ভিত্তিতে তোমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। তো সে শিশু বাচ্চার মা-বাবাকে রাজি করার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা কোনোভাবেই রাজি হচ্ছে না।

কাজী ফাঁসির সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন যে, তাকে জেলে পাঠানো হোক এবং আগামী জুমায় ফাঁসি কার্যকর করা হবে। যুবক তো পেরেশান হয়ে গেল। তাকে জেলে পাঠানো হলো। সেখানের জেলার ছিল খৃষ্টান। যুবকটি খৃষ্টানকে বিস্তারিত অবস্থা বলল। খৃষ্টান জেলার বড় দয়াবান ছিল। যুবক বলল, সাহেব! আমার পরিবার-পরিজন আছে। আত্মীয়-স্বজন, মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান আছে। তারা জানে না, এখানে আমার কী অবস্থা হচ্ছে। আপনি দয়া করে আমাকে একটু সুযোগ দিন। আমি আপনাকে অঙ্গীকার দিচ্ছি– আমি আগামী জুমার আগে অবশ্যই ফিরে আসব। আমার বাবা-মায়ের মুখ একটিবার আমি দেখে আসি।

জেলারের মনে দয়া হলো। সে নিজ দায়িত্বে যুবককে ছেড়ে দিল। যুবক চলে গেল। যুবক তো আসে না। জুমার দিন বিচারক বিচারকার্য শুরু করলেন। কিন্তু যুবক এল না। অন্য সকলের মামলাও শেষ। তবুও এল না। বিচারক জেলারকে ডাকলেন। বললেন, তুমি তোমার জিম্মায় তাকে ছেড়েছ। সে না এলে তোমাকে হদ লাগানো হবে। ওই যুবকের শাস্তি তোমার ওপর প্রয়োগ করা হবে। সবাই আতঙ্কিত হয়ে গেল, পেরেশান হয়ে গেল। কিন্তু খৃস্টান জেলার নির্ভীক। সবাই বলল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হোক। দেখা যাক যুবক আসে কি-না?

এরই মধ্যে একজন এসে সংবাদ দিল দূর থেকে কোনো একজন ব্যক্তি আগমন করতে দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সকলে চকিত হয়ে লক্ষ করল, সেই মুসলিম যুবক উপস্থিত! দেরি হওয়ার কারণে সর্বপ্রথম সে খৃস্টান জেলারের কাছে ক্ষমা চাইল। বলল, পথে একটি নদী অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। নদীতে নৌকা ছিল না। আমি সাঁতার জানি না। অপেক্ষা করতে-করতে দেরি হয়ে গেল। চলুন আমাকে কাজী তথা বিচারকের সামনে নিয়ে চলুন। সকলেই অবাক হলো। মৃত শিশুর মা-বাবা তো বিস্ময়ে থমকে গেল। বিচারকের সামনে জেলার, শিশুর মা-বাবা ও যুবক উপস্থিত। যুবকের এই অঙ্গীকার পূর্ণ করার দৃষ্টান্ত তাদের অভিভূত করল। শিশুর আত্মীয়রা বলতে লাগল, মুহতারাম কাজী সাহেব! মহামান্য বিচারক! এই যুবক অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিরাট এক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। আমরা আপনাকে দুটি কথা বলতে চাই–

এক. আমাদের সন্তান হত্যা মামলা আমরা তুলে নিলাম।

দুই. আমরা ঘোষণা দিচ্ছি, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম।

চিন্তা করুন, ভাইয়েরা! এমন একটা সময় ছিল, কাফেররা আমাদের আমল দেখেই মুসলমান হয়ে যেত। তারা মুসলমানদের বাস্তবিক অর্থেই মুসলমান মনে করত। আর আজ আমাদের দেখে মনে করা হয়, আমরা মুসলিম নামের কলঙ্ক।

ইল্‌মে ওপর আমল না করার কারণ

আজ আমাদের বড় সমস্যা হলো, আমরা নিজেদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে সঠিক বিষয়কে মেনে নিই না। এ-কারণে নিজেরাই কোণঠাসা হয়ে পড়ছি। আমরা অন্যদের মসিবত হয়ে দাঁড়িয়েছি। সত্য কথা এই যে, আজ

আমরা আল্লাহর গজবের কারণ হয়ে গেছি। আমরা সবই বুঝি ও জানি। কিন্তু শুধু নিজেদের নফসানিয়্যাত ও অবাধ্যতার কারণে নিজেদের খাহেশাত ও হটধর্মিতার কারণে আমল করতে পারি না। অহংকারের কারণে অন্যের কথা মান্য করতে পারি না।

আমরা জেনেবুঝেই অনেক সময় অন্যকে কষ্ট দিই। নারীরা তো নিজেরাই বলে আহ! ঝগড়ার সময় আমি শেষে এমন কথা বলে দিয়েছি যে, সারা দিন জ্বলতে থাকবে। অন্যের মনে আঘাত দিয়ে কথা বলা তার ওপর আবার খুশী হওয়া কত মারাত্মক ব্যাপার। অন্যকে সুখ দেবে, অন্যকে খুশী রাখব এটা না করে আমরা উল্টো দুঃখ দিই, কষ্ট দিই।

আবর্জনা যদি মানুষের উপকার করত, তাহলে ...

একবার আমি এক গ্রামে গেলাম। আমার বয়স তখন ৭/৮ বছর। তখনও আমি জানতাম না, গম গাছে ধরে, না ক্ষেতে চাষ হয়। দাওয়াতটা সে সময় আমার এক বন্ধুর পক্ষ থেকে হয়েছিল। সে আমাকে গ্রাম দেখানোর দাওয়াত দিয়েছিল।

গ্রামে আমরা সবুজ বিস্তৃত ক্ষেত দেখলাম। দেখলাম, উর্বরতা শক্তি বাড়ানোর জন্য জমিনে গোবর ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে-ওখানে গোবর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমরা তো গোবরের এই উপকারিতার ব্যাপারে অবগত ছিলাম না। তাই অবাক হয়ে আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, চলো কৃষাণকে জিজ্ঞেস করি। গিয়ে এক কৃষাণকে বললাম, এই যে চাচা, নাপাক আবর্জনা গোবর এ দিয়ে কী হয়? কৃষক হেসে বলল, বাবু! তোমরা শহুরে ছেলে, তোমাদের দৃষ্টিতে এটা গোবর, দুর্গন্ধ। এটা তোমাদের দৃষ্টিতে নাপাক। তবে আমাদের দৃষ্টিতে এটা উত্তম জিনিস। এটা সার। ক্ষেতে ব্যবহার করা হয় ক্ষেতে ফলন ও ফসল ভালো হওয়ার জন্য।

সে সময়টা তো ছিল শৈশব। দুরন্তপনার কাল। তখন ওই কৃষাণের কথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়নি আর ভালো করে বুঝিওনি। কিন্তু এখন বুঝি। মাঝে-মাঝে আজও চিন্তা করি, হে মানবকুল! আমরা যেটাকে অপবিত্র, দুর্গন্ধ ও নাপাক মনে করি এই জিনিসটাই ক্ষেতের মধ্যে দেওয়া হয় তো ক্ষেতের বড় উপকার করে এই গোবর। আর একজন মুসলমান হয়ে যদি নিজের আশপাশের লোকদের কোনো উপকার করতে না পারি, তাহলে তো আমরা নাপাক গোবর থেকেও অধম।

বন্ধুগণ! বাস্তবতা বুঝতে শিখুন।

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম প্রশ্ন হবে, তুমি তোমার ইল্‌মের ওপর কতটুকু আমল করেছ? এই প্রশ্নের জন্য তো আলেম হওয়া জরুরি নয়। আপনি যতটুকু জানেন, আপনাকে ততটুকুর ওপর আমল হয়েছে কি-না সে কথা জিজ্ঞেস করা হবে। নারী-পুরুষ সকলকেই তো প্রশ্নটা করা হবে। তাই চিন্তা করুন। ভাবুন, নিজে নিজে যা জানেন তার ওপরই আমল করার চেষ্টা করুন। নিজের দিকে তাকান। কতটুকু আমল আপনি নিজ ইল্‌ম অনুযায়ী করেছেন এর খবর নিন। আপনার হৃদয়কে, আপনার আত্মাকে আপনি এ প্রশ্নটি করুন। কুরআনের ভাষায়–

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ

বরং মানুষ নিজেই তার নিজের ব্যাপারে চক্ষুষ্মান। যদিও সে তার অপারগতা পেশ করতে চাইবে।[১৫৭]

আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল, আজ আমাদের এই অধঃপতনের কারণ হচ্ছে, আমরা যতটুকুই জানি সেই অনুযায়ী আমল করি না। এখানে একটা মূলনীতি বলা যায়, জীবনে সফল হতে হলে প্রথমে নিজের ইল্‌মের ওপর আমল করা অবশ্যক।

দুই. বড়দের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়া

আমাদের আরেকটা ভুল হচ্ছে, আমরা আমাদের বড়দের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে শিক্ষা নেই না এবং তাঁদের নসীহতের উপর আমল করি না।

নসীহতের মর্মকথা

স্মরণ রাখুন, মাতাপিতার উপদেশ, পীর ও মুরুব্বীর উপদেশ মূলত তাদের জিন্দেগির অভিজ্ঞতাগুলোর ফলাফল। ইংরেজিতে বলা হয়।

There is no shortcut to expemince

অভিজ্ঞতার বিষয়ে শর্টকার্টের কোনো ব্যাপার নেই।

আজ আমরা আমাদের হাতে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকে নষ্ট করে দিচ্ছি। নষ্ট হওয়ার পরেই আমরা বুঝি, আহা, আমার তো এমন করা উচিত হয়নি। তখন বুঝে আসে, বড় ও মুরুব্বীর কথার ওপর আমল করা দরকার ছিল।

---

১৫৭. সূরা কিয়ামাহ : আয়াত ১৪-১৫

অভিজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি মানে, জীবনে তিনি বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং সেগুলোর সমাধান কী তাও তার অবগতিতে আছে।

মানুষ কাজ শিখলে তার দুটি দিক থাকে।

What to do?

কী করা উচিত?

What not do?

আমার কী না করা উচিত?

তো থিওরি অনুযায়ী সহজেই তো মানুষটি বুঝে ফেলে তার কী করা উচিত। কিন্তু কি না করা উচিত এটা জানতে পারে মানুষ ধাক্কা খেয়ে পরে। আর অভিজ্ঞ বান্দা জানে, আমার এই-এই কাজ করা অনুচিত। কারণ, এর মধ্যে ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার নেই। এভাবে আমাদের বড়রা, মুরুব্বীরা আমাদের যে উপদেশ প্রদান করেন, তা আমরা সানন্দে মান্য করার চেষ্টা করব।

তরুণ যুবকদের অবাধ্য আচরণ

এখনকার তরুণ এবং যুবকরা তো এমন হয়ে গেছে যে, তারা কারও কথা-ই শুনতে চায় না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের একটি আলামত এ-ও বলেছেন যে, কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তরুণরা তাদের বন্ধুদেরই নিজের সবচেয়ে ঘনিষ্ট মনে করবে। পিতা-মাতা থেকে দূরে সরে পড়বে। কোথাও তো এমন হয়েছে যে, যুবকরা তাদের বাপকে পাপের মতো ঘৃণা করে। আগের যুগের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক এ-যুগে কল্পনা করাও দুষ্কর।

দুই যুবক আপসে কথা বলছে–

প্রথমজন : তোমার আব্বু তো শুনলাম দুবার-তিনবার হার্টএটাক করেছেন; এখন তার কী খবর?

দ্বিতীয়জন : হ্যাঁ, কয়েকবারই করেছে। মরে না, সুস্থ হয়ে যায়। এই তো আজও এটাক করেছে। হয়তো এবার মরবে।

চিন্তা করুন, বাবার ব্যাপারে সন্তানের এমন কথা!

এই ছেলেমেয়েরাই তো বাবা-মায়ের সোনার হরফে লিখে রাখার মতো উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে চলে। আসলে সত্যি বলতে কী! আমাদের ঘরের পরিবেশ বড়ই নষ্ট। শুধু মসজিদের মিম্বরে ওলামায়ে কেরামের বয়ান শুনলেই

তো পরিবার ঠিক হয়ে যায় না। পরিবারকে বলেন, তোমার এই কাজ করা উচিত আর ওই কাজ করা উচিত নয়। স্বামীরাও এমন করে বলে না স্ত্রীদের। বাবা-মা বলে না ছেলে-সন্তানকে। ছেলে-সন্তানরা বলে না বাবা মাকে। ভাই-বোনও পরস্পরে হীন কাজ থেকে বিরত থাকবার কথা বলে না। পরিবেশটাকে কেউ বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ থাকতে দেয় না বা রাখার চেষ্টা করে না। ফলে সামাজিক অস্থিরতা এখন আমাদের জাতীয় রোগে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া জরুরি, যেন আমরা ব্যক্তিগত জীবনে বড়দের অভিজ্ঞতা, বড়দের গুণ ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগাতে পারি। তাহলে আমাদের জীবনের সর্বত্রই সৌন্দর্য বিরাজমান থাকবে। সকলে তখন মসজিদে আসবে। জুমার দিন আগে-আগে উপস্থিত হবে। মাতাপিতার কথা মান্য করবে। প্রত্যেকের মধ্যে অন্যের কথা গ্রহণের মেজাজ তৈরি হবে। সবার মাঝে উন্নত বোধ ও সুন্দর রুচিশীলতা সৃষ্টি হবে। আজকের যুবকদের অবস্থাটা এমন, যেন এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে। ইংরেজীতে একটা কথা প্রচলিত আছে–

Young leoding the young is like a blind leading the blindthey can both falt into the ditch.

'কোনো তরুণ অন্য তরুণকে নির্দেশনা দেওয়া কোনো অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখানোর মতো। উভয়েই গর্তে পতিত হবে।'

আমাদের তরুণ সমাজ এক কঠিন উম্মাদনার স্বর্গে বসবাস করছে। কোনো একস্থানে কোনো একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক হলেই তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে যায়। বাবা-মাকে বলে দেয় অমুক মেয়েকে বিয়ে না করতে পারলে আমি মরে যাব। বাবা-মা ছেলেকে কত বোঝায় মেয়েটা উচ্চ বংশের নয়, মেয়েটা উচ্চ শিক্ষিত নয়। কিন্তু বাবা-মায়ের বুঝ সে মানে না। একপর্যায়ে হয়তো বাবা-মাকে বাধ্য করে বা নিজে নিজে কোর্টে গিয়ে বিবাহ করে ফেলে। পরে সারাটা জীবন আফসোস করে আর কাঁদে। তখন দুঃখ আর আফসোস উপশমের কোনো উপকরণ সে খুঁজে পায় না।

তাই বলছি, শোনো যুবকরা! বড়দের নসীহত, তাদের উপদেশবাণী, মা-বাবার নির্দেশ প্রথমে হয়তো তিক্ত ও অসহ্য মনে হবে। কিন্তু এর যথার্থতা এবং এই উপদেশের মর্ম ও অন্তর্নিহিত রহস্য পরে বুঝে আসে। এমন সময়ে বুঝে আসে, যখন আর কোনো কিছু করার থাকে না। তাই বুঝো হে যুবক! তোমার দৃষ্টি তো বর্তমান সময়ের ওপর। তোমার চিন্তা তো শুধু ক্ষণিকের

ওপর। কিন্তু তোমার বাবা-মায়ের দৃষ্টি অনেক দূর পর্যন্ত। তোমার মা-বাবার দৃষ্টি সুন্দর আগামীর প্রতি এবং দীর্ঘস্থায়ী। তাই তাদের আদেশমতো জীবন গড়ো। তাদের উপদেশমতো চলো।

অনেক সময় তো তরুণরা উপদেশমূলক কথা কানেই নেয় না। যদিওবা শোনে তবে এর ওপর আমল করে না। অথচ আমাদের তো বলে দেওয়া হয়েছে–

كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ

প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো সম্পদ।

তাই এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখান থেকেই তা গ্রহণ করার অবশ্যক। আগে তো মা-বাবারা তাদের সন্তানদের উপদেশ দিতেন। সন্তানরাও তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করত। আজ তো সন্তানকে উপদেশ দেওয়ার কাজটাও করতে দেখা যায় না। কয়জন পুরুষ আছে যারা ঘরে তাদের স্ত্রী, সন্তানদের প্রজ্ঞাপূর্ণ নসীহত, উপদেশবাণী খুলে-খুলে বোঝায়। কজন আছে ঘরে সন্তানদের সৎ ও আদর্শ পথে চলবার জন্য উপদেশ দেয়?

স্মরণ রাখবেন, যে-ঘরের কর্তা তার পরিবার-পরিজনের সামনে সত্য, ন্যায় কথা, সততা, আদর্শ এবং উন্নত চরিত্র ও আখলাকের কথা না বলবে বা নির্দেশ না দেবে, সেই ঘর আর মৃত ঘরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সব পুরুষের যিম্মাদারি হচ্ছে নিজ-নিজ ঘরে উত্তম ও কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করা। তাই বলেছি, মানবজীবনে সাফল্য অর্জনের দ্বিতীয় মূলনীতিটি হচ্ছে বড়দের অভিজ্ঞতা এবং তাদের গুণ ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে ছোটদের উপকৃত হওয়া, পথনির্দেশ লাভ করা।

তিন. গুনাহের কারণে ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা

আমাদের তৃতীয় ভুলটা হলো, আমরা গুনাহ করি। মানুষ হিসেবে আমাদের থেকে গুনাহ হতেই পারে। তবে গুনাহের পরে ক্ষমা প্রার্থনা, ইস্তিগফার ইত্যাদি আমাদের থেকে প্রকাশ পায় না। গুনাহ করি; কিন্তু গুনাহের পরে যে-পরিমাণ ইস্তিগফার করার প্রয়োজন, তা আমরা করি না। এ-কারণে আমাদের জন্য রহমতের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

হাদীছে পাকে বর্ণিত হয়েছে–

طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِىْ صَحِيْفَتِهٖ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا

'সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য, যে কেয়ামতের দিন তার আমলনামায় সকল আমল থেকেও ইস্তিগফারের সংখ্যা বেশি পাবে।'

সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা

একবার হযরত হাসান বসরি (রহ.) বসে আছেন। এমন সময় তাঁর কাছে একব্যক্তি এসে বলল, হযরত! আমি বড় গুনাহগার; আমাকে কোনো আমলের কথা বলে দিন। হযরত হাসান বসরি বললেন, বেশি-বেশি ইস্তিগফার করো। ক্ষমা প্রার্থনা করো।

এবার আরেক ব্যক্তি আগমন করল। সে বলল, হযরত! বৃষ্টি হচ্ছে না। (ফসল আসছে না) কোনো একটি অজিফা বলে দিন, যার কারণে আল্লাহ বৃষ্টি দান করবেন। হযরত বললেন, ইস্তিগফার করো। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, হযরত! আমি অত্যন্ত দরিদ্র। এমন কোনো আমল বলে দিন, যার কারণে আল্লাহ আমার দরিদ্রতা বিমোচন করে দেবেন। হযরত একেও বললেন, ইস্তিগফার করো।

আরেকজন এসে বলল, হযরত! আমার সন্তানসন্ততি নেই। আপনি আমাকে এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যার উসীলায় সন্তান হবে। তিনি একেও বললেন, ইস্তিগফার করো। তার পাশে এক ব্যক্তি বসা ছিল। এসব দেখে সে বড় আশ্চর্য হলো। বিস্ময়ের সাথে বলল, হযরত! এ কী হলো? প্রত্যেককেই বললেন, ইস্তিগফার করো, ইস্তিগফার করো। হযরত জবাব দিলেন, আমি লোকগুলোকে আমার নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলিনি। বরং কুরআন অনুযায়ী দিকনির্দেশনা দিয়েছি। কুরআনে আছে–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا

আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করো, ক্ষমা প্রার্থনা করো; আল্লাহই গুনাহ মাফকারী।[১৫৮]

হাসান বসরি (রহ.) বলেন, প্রথম মানুষটি গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার জন্য আমলের কথা জিজ্ঞেস করেছে। তাকে বললাম, ইস্তাগফার করো। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রর্থনা কর।

---

১৫৮. সূরা নূহ : আয়াত ১০

এবার শুনো আয়াত–

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করো, ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তোমাদের ওপর বৃষ্টিবর্ষণ করবেন।[১৫৯]

আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি আমাকে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আমলের কথা জিজ্ঞেস করেছে। তাই তাকেও ইস্তেফগারের কথা বলেছি।

আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতের পরে বলেছেন–

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ

আল্লাহ তোমাদের সম্পদের মাধ্যমে সাহায্য করবেন (যদি ইস্তিগফার করো)।

তাই দরিদ্রতা দূরীভূত হওয়ার অযিফা যে চেয়েছে, তাকেও আমি ইস্তিগফারের আমল দিলাম। আরও আছে, وَبَنِيْنَ অর্থাৎ বাচ্চা ও সন্তানের মাধ্যমে আমি তোমাদের সাহায্য করব। তাই যে লোকটি সন্তান প্রাপ্তির আমল জানতে চেয়েছে, তাকেও আমি ইস্তিগফার করার পরামর্শ দিয়েছি। আয়াতটিতে আরও আছে–

وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ

এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বাগানের ফল দান করবেন।[১৬০]

আয়াতের এই অংশের দিকে তাকিয়ে আমি বাগানের বিষয়ে আমল প্রত্যাশীকে ইস্তিগফার করতে বলেছি। পরবর্তী আয়াতটিতেই বর্ণিত হয়েছে–

وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا

আর তোমাদের জন্য জমিন থেকে ঝরনাধারা ও নদ-নদী প্রবাহিত করে দেওয়া হবে।[১৬১]

তাই আমি জমিনে নদ-নদী ও পানি প্রবাহিত হওয়ার জন্য আমল প্রত্যাশীকে ইস্তিগফার পড়তে বলেছি। এবার দেখুন, এক ইস্তিগফারের আমলের মাঝে কত ফায়দা ও উপকারিতা রয়েছে।

---

১৫৯. সূরা নূহ : আয়াত ১১
১৬০. সূরা নূহ : আয়াত ১২
১৬১. সূরা নূহ : আয়াত ১৩

আজ আমেলদের দুয়ারে মানুষ

দেখুন! মানুষ তার উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে আমেলদের দুয়ারে-দুয়ারে ছুটছে। এতে তারা নিজেদের ঈমান নষ্ট করছে। এর কী প্রয়োজন? ইস্তিগফার করুন। সাথে-সাথেই আপনার মনের নেক উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে। মনে রাখবেন, এই আমেলরা বড়ই ভীতু। বড়ই কাপুরুষ ও হীনবল। কাউকে দেখলেই বলে দেয়, কেউ তাবিজ করেছে হয়তো। হিস্ট্রি তৈরি করে রাখে আমেল আগে থেকেই।

বিবি বলেন, দেখো তোমাকে কোনো কিছু করেছে। স্বামী বলে আমার মনে হয় অমুক লোক কিছু করেছে। ফলে নিকটতম আত্মীয়রা ভেতরে-ভেতরে একে অন্যের কঠিনতম দুশমনে পরিণত হচ্ছে।

ওইসব আমেল ও তাবিজের আলেমদের কাছে একেবারেই না যাওয়া চাই। এগুলো টাকা ছিনতাইকারী। এরা পেশাদার আমেল। এরা যদি অন্যের বিপদ ও পেরেশানি দূর করতে পারত, তাহলে নিজের পেরেশানি ও বিপদ কেন দূর করতে পারে না? তারা তো সর্বদা এই অপেক্ষায় থাকে যে, কেউ একটা মুরগি নিয়ে আসবে আমার দরবারে তারপরই তাদের চুলায় রান্না হবে। তারা তো এই অপেক্ষায় থাকে যে, কেউ কোনো একটা রোগ বা বিপদাপদ নিয়ে আসবে, তবেই তার থেকে কিছু টাকা হাতিয়ে নেওয়া যাবে। আর এতে তার গাড়ির চাকা ঘুরবে। আরে ভাই! যাদের গাড়ির চাকা আপনারা তাদের কাছে যাওয়ার কারণে ঘোরে ও চলে, তারা আপনাদের গাড়ির চাকা ঘুরিয়ে দেবেন কী করে? তারা আপনাদের বিপদ দূর করবেন কী করে? লোকেরা খামোখাই তাদের কাছে যায়। কোনো-কোনো মানুষ তো তাদের ছোট খোদা বানিয়ে নেয়। খোদার মতো তাদের বিশ্বাস করে। আর বলে, হযরত! মনে হয় কেউ আমাদের ওপর 'বান' মেরেছে। কেউ আমাদের তাবিজ করেছে। আমাদের কাজ কারবারে কেউ বান মেরেছে। দেখুন, একটা মানুষ মুসলমান। আর তার মুখ থেকে এমন শির্‌কি কথা বের হচ্ছে। কত জঘন্য ব্যাপার। আরে ভাই! তোমার সব কিছু তো আল্লাহর হাতে। তোমাকে রিযিক দেবেন আল্লাহ।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

জমিনে যত প্রাণী আছে সবগুলোর রিযিক আল্লাহরই যিম্মায়।[১৬২]

---

১৬২. সূরা হুদ : আয়াত ৬

রিযিক তো আল্লাহ দেবেন। আর আমরা বলছি, কেউ মনে হয় রিযিকের পথে বান মেরেছে। কেমন যেন মানুষকে আমরা ছোট খোদা বানিয়ে নিয়েছি। এমনও বলে থাকি, কেউ মনে হয় আমার মেয়ের বিবাহে 'বান' মেরে রেখেছে। বিবাহ বন্ধ করে রেখেছে। তাবিজ করে রেখেছে। স্মরণ রাখবেন, কেউ কোনো কিছু 'বন্ধ' রাখতে পারে না। কেউ কোনো বান মারতে পারে না। সব কাজ আল্লাহই করেন। আল্লাহর 'ইযিনে' সব কাজ হয়ে থাকে। আমরা আল্লাহকে খুশি করে নেব; তাহলে তার পক্ষ থেকেই আমাদের জন্য 'খাইর' তথা সব কল্যাণের আয়োজন সম্পন্ন হয়ে যাবে। সর্বপ্রকার পেরেশানি ও বিপদ দূর হয়ে যাবে। আর এই মোক্ষম মাধ্যমই হচ্ছে ইস্তিগফার।

মুসিবত থেকে আত্মরক্ষা পাওয়ার পথনির্দেশ

এই ইস্তিগফারের কারণেই আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে মুসিবত, আযাব-গযব ও বিপদ থেকে রক্ষা করেন, বাঁচিয়ে দেন। কুরআনের মহান বার্তা শুনুন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

আপনি যতক্ষণ তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবেন, ততক্ষণ তাদের ওপর আযাব দেওয়া হবে না।[১৬৩]

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

আল্লাহ তাদেরকে ওই সময় পর্যন্ত আযাব দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইস্তিগফার করতে থাকবে।[১৬৪]

কন্যার বিয়ে না হওয়া বড় মুসিবত ও আযাব। যুবকের চাকুরি না হওয়া বড় মুসিবত ও আযাব। ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস নামা বড় মুসিবত ও আযাব। কিন্তু স্মরণ তো রাখবে, যতক্ষণ আমরা ইস্তিগফার করতে থাকব, ততক্ষণ পর্যন্ত আযাব ও গজব থেকে সুরক্ষিত থাকব। আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে আমরা ইস্তিগফার করি না। করতেও জানি না।

১৬৩, সূরা আনফাল : আয়াত ৩৩

১৬৪. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৩

ইস্তিগফার করবে সব সময়

বেশি-বেশি ইস্তিগফার করা উচিত। প্রথমত সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুটি পাঠ করবে–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

এটি পূর্ণ ইস্তিগফার। আমরা যদি চলতে ফিরতে استغفر الله-استغفر الله পড়তে থাকি, তাহলে এটিও ইস্তিগফার হবে। লোকেরা এসে বলে, হুজুর! কোনো একটা আমলের কথা বলুন। আরে ভাই! এর চেয়ে উত্তম আমল আর কী আছে? এই আমলের সাক্ষ্য তো আল্লাহর কুরআনেই ঘোষণা করছে যে, সর্বপ্রকার নেয়ামতই ইস্তিগফারের বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভুল না হলেও ইস্তেফগার করবে

আমাদের তো উচিত, ভুল না হলেও ইস্তিগফার করা। এজন্য যে, ভুল ও অন্যায় না হলেও ইস্তিগফার করার দ্বারা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনে করুন, কোনো একটা সময় আপনার সন্তান এসে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে। বলছে, আব্বু! আমার ভুল হয়ে গেলে মাফ করে দেবেন। আব্বু! আমার কোনো অন্যায় হয়ে গেলে মাফ করে দেবেন। এমন যদি অবস্থা হয় যে, সন্তান কোনো অন্যায় করেনি, তাহলে বলুন, তার প্রতি আপনার ভালোবাসা ও মহব্বত কত শত গুণ বেড়ে যাবে। আল্লাহর দরবারে ইস্তিগফারের বিষয়টিও এমনই। তাই সব সময়েই ইস্তিগফার করতে থাকা আমাদের জীবনের মূল কাজ হয়ে যাওয়া চাই।

চার. নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা

আমাদের ভুলসমূহের মধ্যে চার নম্বর ভুলটা হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত যে নেয়ামত আমাদের দান করেছেন, তার জন্য সঠিকভাবে শুকরিয়া আদায় না করা। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার কথা স্মরণ আসে আমাদের তখনই, যখন নেয়ামত শেষ হয়ে যায়। কেউ একজন তো বলেছেন, নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের জন্য নেয়ামত ছুটে যাওয়ার অপেক্ষা করো না।

নেয়ামত ছুটে যাওয়ার পর তার শুকরিয়া আদায় করে কী লাভ? তাই নেয়ামত থাকতেই তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

সুস্থতা একটি নেয়ামত।

অবসর সময় পাওয়া একটি নেয়ামত।

সম্পদ একটি নেয়ামত।

যৌবন একটি নেয়ামত।

নিজের ওস্তাদ ও পীরও নেয়ামত।

আমরা এই নেয়ামতগুলোর কী কদর করি? কতটুকু মূল্যায়ন করি? আল্লাহর কতটুকু শুকরিয়া আমরা আদায় করি? আমাদের অবস্থা এমন যে, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধনসম্পদ বেশি দিয়েছেন, সে তত বেশি নাশোকরি করে। কাউকে আল্লাহ এতো সম্পদ দিয়েছেন যে, তার পরিবারসহ চল্লিশ পরিবারকে সে খাওয়াতে পারবে অথচ তাকে আপনি জিজ্ঞেস করুন, ভাই! কাজকাম কেমন চলছে, সে বলবে, যাচ্ছে কোনো রকম। বলুন, এত দেওয়ার পরও যদি আমরা বলি, যাচ্ছে কোনো রকম, তাহলে আল্লাহর রাগ আসবে না? তার গোস্বা আসবে না? অবশ্যই আসবে।

মনে করুন, একজন স্বামী তার স্ত্রীর ওপর সাধ্যপরিমাণ খরচ করে। তার স্ত্রীকে উন্নত ব্যবস্থাপনায় পালন করে। অথচ স্ত্রী তার মা-বাবার কাছে গিয়ে বলে, চলছে কোনো রকম। বলুন তো, একথা স্বামী শুনলে রাগ হবে না? আমাদের অবস্থা তো আজ তেমনি হয়ে গেছে। আল্লাহর বেশুমার নেয়ামত আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে, তার অগণিত অনুগ্রহ আমাদের ঢেকে রেখেছে। এমতাবস্থায় আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করে বলি, চলছে কোনো রকম। আহ! জানি না, কেন যে আমাদের মুখ এভাবে মিথ্যে বলে। আমাদের তো উচিত ছিল এভাবে বলা যে, শুকরিয়া, আল্লাহ তা'আলা আমাকে অনেক দিয়েছেন। এত দিয়েছেন যে, সারাটা জীবন যদি আমি সেজদায় পড়ে থাকি, তবুও এর শুকরিয়া আদায় হবে না। আল্লাহ আমাকে আমার আশা ও যোগ্যতার চেয়েও অনেক বেশি দিয়েছেন।

শুকরিয়া বিষয়ে তিন ব্যক্তির ঘটনা

তরজমানুস সুন্নাহ কিতাবে হযরত মাওলানা বদরুল আলম (রহ.) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন–

বনি ইসরাঈলে একব্যক্তি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল। তার চেহরার মধ্যেও এক রকম ভয়ানক অবস্থা বিরাজ করত। লোকজন তার কাছে যেত না, যদ্দরুন তার কাজকাম সব বন্ধ হয়ে গেছে।

একদিন একব্যক্তি এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, ভাই কী অবস্থা? কেমন আছ? সে বলল, কী আর বলব! রোগের কারণে লোকজনের কাছে যেতে পারি না। কেউ আমাকে কাছেধারে বসতে দেয় না। সকলে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এজন্য কোনো কাজকামও পাই না। বহু কষ্টে দিন গুজরাচ্ছি। এসব শুনে লোকটি তার জন্য দু'আ করল, আল্লাহ তোমার রোগ ভালো করে দিন এবং তোমাকে রিযিকের প্রশস্ততা দান করুন। সাথে-সাথে আল্লাহ তা'আলা তার রোগ ভালো করে দিলেন এবং তাকে একটি উটনি দান করলেন। ওই উটনি থেকে এত বাল-বাচ্চা হলো যে, এর দ্বারা সে অনেক ধনসম্পদের মালিক হয়ে গেল। এখন সে বড় স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করছে।

এমনিভাবে ওই লোকটি আরেক ব্যক্তির কাছে গেল, যে টাক রোগে আক্রান্ত ছিল। তার মাথায় চুল নেই। এজন্য তার কাজকাম বন্ধ হয়ে গেছে। তাকেও জিজ্ঞেস করল, ভাই কেমন আছ? দিনকাল কেমন যাচ্ছে? উত্তরে ওই ব্যক্তি বলল, আরে ভাই! দুঃখের কথা কি বলব যেখানেই যাই লোকজন শুধু আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। কোনো কাজকামও পাই না। বড় দুর্বিষহ জীবন যাপন করছি। আগন্তুক লোকটি তার জন্যও দু'আ করল। তার দু'আর বরকতে আল্লাহ তাকে অত্যন্ত সুন্দর চুল দান করলেন। এখন থেকে দেখতে শুনতে খুব সুন্দর দেখা যায়। আল্লাহ তাকে একটি গাভি দান করলেন। এই গাভি থেকে অনেক বাছুর হলো। এগুলোর আয়-উৎস দিয়ে তার দিনকাল ভালোই যাচ্ছিল।

এমনিভাবে সে লোক তৃতীয় আরেক ব্যক্তির নিকট গেল। সে ছিল অন্ধ। তাকেও জিজ্ঞেস করল, ভাই! কেমন আছ, কী অবস্থা তোমার? দিন-কাল কেমন যাচ্ছে? বলল, কী বলব দুঃখের কথা ভাই! মানুষের কাছ থেকে খুঁজে-বিছারে খাই। সারা দিন মানুষের দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়াই। একেকজন একেক কথা বলে। মানুষের জন্য শুধু রাতেই অন্ধকার থাকে। আর আমার রাত-দিন সবই সমান অন্ধকার। আমার মা-বাবাকে জীবনে কখনও দেখার সুযোগ হয়নি। কোনো কাজকামও করতে পারি না।

ওই লোকটি তার জন্য দু'আ করল। আল্লাহ তা'আলা তাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং সাথে-সাথে একটা বকরি দান করলেন। এ বকরিরও অনেক বাল-বাচ্চা হলো। এর দ্বারা সে অনেক ধনসম্পদের মালিক হয়ে গেল।

এরা তিনজনই বড় ধনাঢ্য হয়ে গেল। যখন টাকা-পয়সা হয়ে যায় তখন বড়-বড় অট্টালিকা, প্রাসাদের মালিক হলো। অনেক রূপসি সুন্দরি বিবি মিলে গেল। অনেক চাকর-নকর হলো। সব মিলিয়ে বড় আলিশান জীবন যাপন করছে। বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই। কয়েক বছর তাদের এভাবে কেটে গেল।

পরিশেষে ওই ফেরেশতাকে পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা নিলেন। আশ্চর্য বিষয় হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া নেয়ামতের মাধ্যমে লোকগুলো ধনাঢ্য হলো, সুস্থ-সবল হলো। অথচ কিছুকাল পর তারা ভুলেই গেল এক সময় তারা বড় কষ্টে ছিল। তারা রোগাক্রান্ত ছিল। তারা ভুলে গেল যে, তারা হতদরিদ্র ছিল। একজন শুধু ভুলল না।

তার কাছে গিয়ে তাকে বলল, ভাই! আমি একজন অভাবী মানুষ। আল্লাহ তো আপনাকে অনেক কিছু সম্পদ দিয়েছেন। আপনি যদি দয়া করে আমাকে কিছু দিতেন। এক সময় তো আপনার এসব কিছুই ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আজকে আপনাকে কত কিছু দিলেন। একথা শুনে ওই ব্যক্তি ক্ষেপে গেল। রেগে গেল।

প্রথম কুষ্ঠ রোগী যে ছিল তার কাছে ছদ্মবেশে ফেরেশতা গেলেন পরীক্ষা করতে। ফেরেশতা এবার টাকওয়ালা যে ছিল তার কাছে গেলেন। সেও ওই কুষ্ট রোগীর মতোই ব্যবহার করল। না! আমি তো কখনও দরিদ্র ছিলাম না। আমি তো টাকওয়ালা ছিলাম না। আমি তো রোগাক্রান্ত ছিলাম না।

এবার তৃতীয়জনের কাছে গেলেন ফেরেশতা। তাকেও বলল, ভাই! আমি অনেক অভাবী; আপনার নিকট এলাম। এক সময় তো আপনার এসব কিছুই ছিল না। আল্লাহ পাক আপনাকে এখন অনেক কিছু দিয়েছেন। সে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাই! আপনি সত্যই বলেছেন। এক সময় আমি অন্ধ ছিলাম। এই সুন্দর পৃথিবী, আকাশমণ্ডলী, মাটি, পানি, গাছপালা, সবুজ-শ্যামল কিছুই দেখতে পেতাম না। আল্লাহ আমাকে সুস্থ করেছেন। নাও আমার এই বকরির পাল থেকে তোমার যত খুশি নাও। আল্লাহর ওয়াস্তে নাও। এই দুই পাহাড়ের মাঝে যত সবুজ, যত শ্যামল আর তার মাঝে বিচরণকারী যত বকরি সবই আমার আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। তোমার যা ইচ্ছে নিয়ে যাও।

এবার পরীক্ষাকারী ফেরেশতা জবাব দিলেন, তোমার জন্য মোবারকবাদ। আমি ফেরেশতা। আমাকে আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। দুজন তাদের পূর্বের সময়টা ভুলে

গেছে। পূর্বের অবস্থা তাদের এখন আর মনে নেই। তাই তাদের নেয়ামতগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের রোগ আবার ফিরে এসেছে। আর তুমি তোমার পূর্বে কথা ভুলনি। তুমি আল্লাহকে ভুলে যাওনি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে আরও নেয়ামত দেবেন। তোমার সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেবেন।

এ কথা বলে ফেরেশতা চলে গেলেন। আল্লাহ্ এই লোকটির সম্পদ আরও বাড়িয়ে দিলেন।

নেয়ামত বেশুমার : দান অগণিত

আল্লাহর নেয়ামতের যত শুকরিয়া আদায় করা উচিত তা আমরা কোনো দিন আদায় করতে পারব না। তাই আমাদের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর শুকরিয়ায় মশগুল থাকা উচিত।

আল্লাহর নেয়ামতের বিস্তারিত ফিরিস্তি তো সীমাহীন, অগণিত এবং সুবিস্তৃত। তবুও অন্তত স্মরণ রাখব,

আল্লাহ্ আমাদের ঘর দিয়েছেন,

সন্তানসন্ততি দিয়েছেন,

ভালো বিবি দিয়েছেন,

সুস্থতা দিয়েছেন,

সম্মান দিয়েছেন,

আমাদের অপরাধগুলো গোপন রেখেছেন,

আমাদের অপমান থেকে বাঁচিয়েছেন।

আরও কত শত কিছু দিয়েছেন। এসবই তো আল্লাহর নেয়ামত। কোনো নেয়ামতের শুকরিয়া আমরা আদায় করতে সক্ষম হয়েছি বা হচ্ছি?

একে অন্যের মূল্যায়ন করবে

বাস্তব কথা হলো, আমরা নেয়ামত থাকতে তার মূল্যায়ন করি না, কদর করি না। আজকের অবস্থা এমন হয়েছে যে, বিবিকে স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার সাথে-সাথেই এক শ্বাসে কয়েকটা দোষ বলে দেবে। একইভাবে স্বামীকে স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, এক শ্বাসে স্ত্রীর কয়েকটা দোষ বলে দেবে।

দেখুন! যদি এই স্বামীটাই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে এই স্ত্রীই বসে-বসে কাঁদবে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কেন কাঁদছ? তুমিই তো বলতে, লোকটা আমাকে খুব কষ্টে রেখেছে? মুসিবতে রেখেছে, এখন তো কষ্ট ও দুঃখ শেষ হওয়ার পালা। সে মরে গেছে। এখন কেন কাঁদছ? এবার সেই স্ত্রীই বলবে, আরে না! না! মানুষটা তো আমার সন্তানগুলোর বাবা ছিল। অভিভাবক ছিল। আমাকে সম্মান দিত। লোকটা থাকা অবস্থায় তো আমার কোনো টেনশন ছিল না। আমাকে কোনো কিছু করতে হতো না।

এখন তো আমার মাথার ওপর থেকে ছায়া সরে গেছে। আমার আশ্রয়টা হারিয়ে গেছে। আমি নিরাশ্রয় হয়ে গেছি।

এখন স্বামীর মূল্য বুঝে এসেছে। এখন স্বামীর ভালো ভালো গুণগুলোর অনুভব তৈরি হয়েছে। আবার যদি বিবি মারা যায়, তো স্বামীর অশ্রু ঝরবে। তাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, আরে ভাই! এই বউয়ের কত বদনামই-না তুমি করেছ। এই বউয়ের দোষের কথা বলেছ। এখন তো সে মৃত্যুবরণ করে তোমাকে মুসিবত থেকে রক্ষা করেছে। তুমি কাঁদছ কেন? সে বলবে, ও তো আমার সন্তানসন্ততির মা। আমি কাজে-কামে চলে যেতাম। ছেলে মেয়েগুলোর জন্য কোনো টেনশন আমার হতো না। ওদের মা ওদেরকে আদর যত্ন করে রাখত। আমার বউটা আমাকে বড় সম্মান দিত। আমার ঘরসংসার গুছিয়ে রাখত।

তো দেখুন! বিবির কল্যাণ, বিবির উপকারিতা ও সৌন্দর্য স্বামীর এখন বুঝে এসেছে।

আমার কথা হলো, এই ভাবনাটা আমাদের আগে কেন আসে না। জীবদ্দশায় কেন আমরা এভাবে চিন্তা করি না এবং মূল্যায়ন করি না। জীবন থাকতেই তো অন্যকে মূল্যায়ন করা উচিত।

ইংরেজদের একটি নীতি

ইংরেজদের নীতি হলো, কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার জন্য ফুলের বড়-বড় তোড়া নিয়ে যাওয়া হয়। শত-শত ফুল তার কবরে অর্পণ করা হয়। একটি কবিতার লাইন–

Why do we wait till a persondie?

আমরা পুষ্প অর্পণের তরে কেন তার অপেক্ষা করি?

আহ! তার জীবদ্দশায়ই যদি আমরা তাকে পুষ্প অর্পণ করতে পারতাম। তাহলে তো সেও খুশি হতো, আমরা ও খুশি হতে পারতাম।

পাঁচ. মৃত মানুষ থেকে শিক্ষা নেয়া

আমাদের আরেকটি বড় ভুল হচ্ছে, আমরা নিজহাতে মৃতদের কাফন পরাই, তার জানাযা পড়ি। তারপর গোরস্তানে দাফন করে আসি। তুবও আমরা এর থেকে শিক্ষা নিই না। আমাদের হুঁশ ফিরে আসে না। তবু আমরা সতর্ক হই না। আমরাও তো একদিন এ-পথের যাত্রী হব। এভাবে আমাদেরও তো কেউ না কেউ শুইয়ে দেবে। কত লাশ, কত মৃত মানুষ, আমরা কাঁধে বহন করেছি। কিন্তু আমাদের অবস্থা রয়ে গেছে আগেরই মতো। আমরা রয়ে গেছি গুনাহে মত্ত। দুনিয়া-দুনিয়া করছি। লাশ কবরে রেখে এসে গোরস্তানটা পার না হতেই আবার দুনিয়া নিয়ে মেতে উঠি।

মায়ের মৃত্যুও আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হয় না

আমার এক বন্ধু বলল, আমার ঘরের সামনের ঘরে বসবাসকারী আমার এক পড়শীর মা মারা গেছে। আমি আমার ছেলেমেয়েকে বোঝলাম, দেখো কত বড় একটি ঘটনা ঘটেছে। ৪০ দিন টেলিভিশন চালানো যাবে না। আমার ছেলেমেয়েরা আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। বন্ধু বলল, ৩ দিন না যেতেই আমার পড়শীর ঘর থেকেই আগে টিভির আওয়াজ ভেসে এল। ব্যস! আবার সেই তামাশার জীবন শুরু হয়ে গেল।

বকরির মায়ের কল্যাণ কামনা

যে-যুবক নিজ হাতে নিজের পিতাকে কবরে শুইয়ে এল। কিন্তু তারপরও সে সতর্ক হলো না, শিক্ষা নিল না, তার থেকে বদবখত আর কে আছে? মাকে নিজের হাতে দাফন করে আসে, অথচ নিজের জীবনের রূপটা বদলায় না। পরিবর্তন হয় না। বোঝে না, আমাকেও একদিন এভাবে মাটির নিচে শুতে হবে। মস্তিতে মেতে আছে। আনন্দ-উল্লাসে মত্ত আছে। আল্লাহ সম্পদ দিয়েছে। সন্তানসন্ততি দিয়েছে। বেশ। আল্লাহ নেয়ামতের মাঝে এখন মস্তি করছে। নিজের কাম-রিপুর তাড়নায় দিশাহারা হয়ে আছে। আরে ভাই! বকরির মা কদিন কল্যাণ করে? আমাদের আমল যেন এমন না হয়ে যায় যে, ভুল ও গুনাহ করলাম সামান্য– এক মুহূর্ত। আর শাস্তি হলো হাজারো বছরের এমনটা যেন না হয়। আজ সামান্য কয়েক দিনের ঢেউয়ে ভাসছ। কাল কেয়ামতের দিনে জবাবও দেওয়া যাবে না। অথচ জবাব দিতেই হবে।

আমরা যদি উক্ত পাঁচ নসীহত ও পাঁচ বিষয়ের ওপর আমল করতে পারি, তাহলে জীবনের ধারা বদলে যাবে। তখন দেখবেন, আমাদের ভেতরগত যে

ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে, তা অতি স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন হয়ে যাবে। ভুলগুলো দূর হয়ে যাবে। জিন্দেগি বদলে যাবে। কথাগুলো বললাম। সকলেই ইয়াদ করে নেবেন। আপনি যদি ঘরে সবার বড় হন বা আপনার পরিচিত কেউ যদি বলে, ভাই একটু নসীহত করো, তাহলে এই কটি কথা শুনিয়ে দেবেন। অনেক ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দোরঙা আচরণ ছেড়ে দাও

'আমরা যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করি, আমাদের উচিত নিজেদেরকে নিজেরা প্রশ্ন করি যে, আমাদের কোন অঙ্গটা মুসলমান? একটু চিন্তা করি। আমার চোখ কি মুসলমান হয়েছে? কারণ, যে-চোখ মুসলমান, সে চোখ কখনও গায়রে মাহরাম তথা ভিন নারী-পুরুষের প্রতি কুদৃষ্টি দিতে পারে না।

আমার কান কি মুসলমান হয়েছে? মুসলমান কান তো দীন ও সুন্নাতের খেলাফ কথা শুনতে পারে না।

আমার জিহ্বা ও মুখ কি মুসলমান হয়েছে? মুসলমান মুখ থেকে তো খেলাফে সুন্নাত ও খেলাফে শরীয়ত কোনো কথা নির্গত হতে পারে না। আমার হাত কি মুসলমান হয়েছে? মুসলমান হলে তো অন্যের জান মাল ইয্যাত-আব্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। আমার পা কি মুসলমান হয়েছে? মুসলমান পা তো কোনোভাবে গুনাহের পথে অগ্রসর হতে পারে না। আমাদের আমল ও চলন যদি পরিশুদ্ধ না-ই হয়, তাহলে বলুন আমাদের কোন অঙ্গটি মুসলমান আছে?

দোরঙা আচরণ ছেড়ে দাও

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে اٰمِنُوْا শব্দ

আল্লাহ তাআলার বাণী –

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

হে ঈমানদারগণ! হে মান্যকারীগণ! হে ওই সকল লোক, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুম মান্য করবে বলে অঙ্গীকার করেছ।[১৬৫]

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। বিশ্বাস স্থাপন করো।[১৬৬]

কুরআন পাকের এই আয়াতটি পাঠ করে অনেকেই হয়রান ও পেরেশান হয়ে যায়। কারণ, আয়াতে আহ্বান করা হয়েছে ঈমানদারদের। বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

হে ঈমানদারগণ!

---

১৬৫. সূরা নিসা : আয়াত ১৩৬

১৬৬. সূরা নিসা : আয়াত ১৩৬

কাফেরদের আহ্বান করা হয়নি।

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

হে কাফেররা! এভাবে বলা হয়নি।

আবার মুনাফিকদেরও আহ্বান করা হয়নি।

এভাবে বলা হয়নি–

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

হে মুনাফিকরা! এমন পরস্পরে আহ্বান করা হয়নি। ঈমানদারদের ডেকে তাদের হুকুম দেওয়া হচ্ছে–

اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনয়ন করো। ঈমানদারদের ঈমান আনয়ন করার নির্দেশ এবং اٰمِنُوْا শব্দের মর্ম ও তার মূল উদ্দেশ্য কী সে বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

কেউ-কেউ বলেছেন– اٰمِنُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য اِتَّقُوْا। অর্থাৎ তোমরা তাক্ওয়া ও খোদাভীরুতা অর্জই করো।

কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা যবানে স্বীকারকারীদের অন্তর থেকে স্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ– হে যবানে স্বীকারকারী মুমিন বান্দারা, অন্তর থেকেও তোমরা কালিমাকে, ঈমানকে স্বীকার করে নাও।

আবার কেউ-কেউ বলেছেন, নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য দূর করো।

কেউ-কেউ বলেছেন, নিজের কথা ও কাজের দূরত্ব দূর করো। কথাকে কাজে পরিণত করো।

কেউ-কেউ বলেছেন, দ্বৈত নীতি ও দ্বিমুখী আচরণ ছেড়ে দাও।

اٰمِنُوْا-এর কঠিনতা

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও।[১৬৭]

---

১৬৭. সূরা বাকারাহ : আয়াত ১০৮

অর্থাৎ– মাথার চুল থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত আপাদমস্তক মুসলমান হও। স্মরণ রেখো! মুসলমান হওয়া কোনোভাবেই সহজ কোনো ব্যাপার নয়।

یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماں ناہونا

বড়ই ভালোবাসায় এই সাক্ষ্য গৃহে কদম রাখে লোকে।

ভাবে বড় আসান ও সহজ বুঝি মুসলমান হওয়া।

আরে! বরং মুসলমান হওয়ার জন্য মেহনত চাই।

چومی گویم مسلمانم بہ لرزم

کہ دانم مشکلات لا الہ را

যখন আমি বলি, আমি মুসলমান, তখন আমি কম্পিত হয়ে উঠি।

কারণ, আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর কঠিনতা সম্পর্কে ওকিফহাল আছি।

বলা তো সহজ; কিন্তু কাজে পরিণত করা বড়ই কঠিন। দুনিয়া আগমন করা সহজ। তবে সহীহ অর্থে মানুষ হওয়া বড় কঠিন। যে মানুষের মতো মানুষ হতে চায়, সে বোঝে, সে টের পায়। যখন মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্য মুজাহাদা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুরু করবেন, তখন বুঝবেন মানুষ হওয়া কত কঠিন ব্যাপার।

مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم

سینے بیٹھے تو بہت کام رفو کا نکلا

আমি তো বুঝেছিলাম হয়তো কোনো যখম হবে।

কিন্তু দেখি সেলাই করতে বসে রিফু করা ও তালি দেওয়ার মতো বহু কাম আছে।

বাস্তবতার আয়নায় আমাদের স্বরূপ

আমরা যারা নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করি। আমাদের উচিত, নিজেরা নিজেদের প্রশ্ন করা যে, আমাদের কোন অঙ্গটা প্রকৃত মুসলমান? একটু চিন্তা করি। আমার চোখ কি মুসলমান? মুসলমান চোখ তো কখনও গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের প্রতি কুদৃষ্টি দিতে পারে না।

আমার কান কি মুসলমান? মুসলমান কান তো দীন ও সুন্নাতের খেলাফ কোনো কথা শুনতে পারে না।

আমার জিহ্বা ও মুখ কি মুসলমান? মুসলমান মুখ থেকে তো সুন্নাত ও শরীয়তের খেলাফ কোনো কথা নির্গত হতে পারে না।

আমার হাত কি মুসলমান? মুসলমান হাত তো অন্যের জান-মাল ইজ্জত-আব্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না।

আমার পা কি মুসলমান? মুসলমান পা তো অন্যায়ের পথে অগ্রসর হতে পারে না। আমাদের অবস্থাটা যদি এমন না হয় তাহলে বলুন, আমাদের শরীরের কোন অঙ্গটি প্রকৃত মুসলমান। যে অঙ্গের দোহাই দিয়ে আমরা নিজেকে মুসলমান দাবি করব।

হৃদয় আছে; কিন্তু তা অন্যের ভালোবাসায় মত্ত।

যিহান আছে; কিন্তু এটা কাম-রিপুর ভাবনায় মত্ত।

চোখ আছে; কিন্তু তা কুদৃষ্টিতে অভ্যস্ত।

হারাম-হালালের ভেদাভেদ নেই।

তাহলে বলুন, মুসলমানি কোন জিনিসটার নাম।

زبان سے کہہ بھی دیا لاالٰہ تو کیا حاصل؟

যবানে বলে দিলাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। কিন্তু এর অর্জন কী?

دل و نگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

হৃদয় ও দৃষ্টি মুসলমান নয় তো তুমি কিছুই নও।

আমাদের তো উচিত আমরা আমাদের আমলের মাধ্যমে প্রমাণ করব, আমরা মুসলমান।

আল্লামা ইবকাল বড় আশ্চর্য কবিতা লিখেছেন–

تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لاالٰہ الّا

لغت غریب جب تک ترا دل نہ دے گواہی

তুমি আরব হও আর আজম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু–

তোমার কাছে অপরিচিত শব্দ, যদি হৃদয় তোমার এই কালিমার সাক্ষ্য না দেয়।

হৃদয় যতক্ষণ সাক্ষ্য না দেবে, ততক্ষণ এই لا اله الا الله আমাদের কাছে, অজানা, অচেনা ও অপরিচিত ভাষার শব্দই থেকে যাবে। আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে এমন যে, আমাদের চক্ষু খোলা। গর্দান লম্বা হয়ে আছে। অন্যের চেহারায় আমরা দৃষ্টি ফেলি, অন্যের দোষ তালাশ করে ফিরি। আহ যদি এই গর্দান ঝুঁকে নমিত হয়ে যেত। যদি এই চোখ বন্ধ হয়ে যেত। এই দৃষ্টি যদি নিজের সীনা ও নিজের আত্মার দিকে পড়ত, নিজের দোষ তালাশে যদি নিজে ব্যস্ত থাকতে পারত।

منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں

جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلماں بھول گئے

মুখ তো দেখে নিয়েছে দর্পণে। কিন্তু আত্মায় যে দাগ লেগে আছে তা তো দেখা হলো না।

এমন দাগ লাগিয়ে দিয়েছি অন্তরের মধ্যে। মৃত্যুর সময় নিজেকে মুসলমান তাই ভুলে গেছি।

تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور!

جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے

এখনও তো সেই তাকবীরধ্বনি হয়। শোনা যায় আযান। মসজিদও হয়েছে বেশ সুন্দর।

যে প্রহারে হৃদয়টা কেঁপে উঠার কথা ওই প্রহার তো মানুষ আজ ভুলেই গেছে।

একটা সময় ছিল, এই মুমিন, এই যুবক রাতের শেষ প্রহরে, ঘুম ছেড়ে উঠে যেত, لا اله الا الله-এর যিকিরে মশগুল হতো। সে ধাক্কা দিত যিকিরে-ফিকিরে, তার হৃদয়টা কেঁপে উঠত।

تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے

کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ

তোমার দৃষ্টি দ্বারা বুকের ভেতরে হৃদয় কাঁপে।

কিন্তু আজ তোমায় জাগাবে সেই প্রেরণটুকুও হারিয়ে গেছে।

সেই জযবা, সেই প্রেরণা আর সেই উদ্যম আজ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে আমা হতে।

تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے
شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے

চলে গেছে তোমার মাহফিল, চলে গেছে সেই দর্শকও।
রাতের অভিসারীরা ভেগেছে। ভেগেছে প্রভাতের বিলাপকারীরাও।

এই যে যুবকদল; ওই যে তরুণীরা যারা রাতের গভীরে উঠে যেত, হেঁচকি মেরে-মেরে কাঁদত, রব্বে কারীমকে জয় করে নিত; তাদের দাঁড়ি তাদের আঁচল চোখের অশ্রুতে ভিজে যেত; আজ সেই চেহারাগুলো দেখা যায় না। কারণ, আজ আমাদের রক্তকণিকা মরে গেছে। আমাদের খুন শীতল হয়ে গেছে।

محبت کا جنوں باقی نہیں ہے
وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے

মহব্বতের সেই মজনুরা আজ আর নেই।
সেই হৃদয়, সেই প্রত্যাশাও আজ আর নেই।

نماز وروزہ و قربانی وحج
یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے

নামায রোযা, কুরবানি ও হজ।
এসবই আছে; কিন্তু সেই আমলের রূপ নেই।

আমাদের ভেতরের মূল মানবটা কোথাও হারিয়ে গেছে।

কোথাও আমাদের ব্যক্তি সত্তার মানুষ খোয়া গেছে। কোথাও আমাদের ভেতরের আত্মাটা ঘুমিয়ে গেছে। এই আত্মাটাকে, ভেতরের মানুষটাকে জাগাতে হবে।

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے؟ راہرو منزل ہی نہیں

আমরা তো করুণার প্রতি আকৃষ্ট; কিন্তু প্রত্যাশী তো নেই কেউ।
কীভাবে পথ দেখাব? গন্তব্য যা হবে তা-ই তো আর নেই বাকি।

আমাদের হৃদয়রাজ্যটা সজ্জিত করতে হবে। মনোজগতটা তৈরি করতে হবে। নিজে আমলের ওপর মেহনত করতে হবে। আমাদের আমলের অবস্থা এমন অগভীর হয়ে গেছে যে, কোনো মসজিদে ইমাম সাহেব নামাযে সালাম ফিরিয়ে বললেন, ভাই! আমি কি নামায দু-রাকাত পড়লাম, না চার রাকাতই পড়েছি। গোটা মসজিদের একজন মানুষও জবাব দিতে পারল না, নামায আসলে কত রাকাত হয়েছে। এটি কেয়ামতের পূর্ব আলামত।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা দেখবে, পুরো মসজিদটা নামাযীতে পূর্ণ থাকবে, কিন্তু তাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে খালি হবে। আজ হৃদয়গুলোর মাঝে আল্লাহর স্মরণ নেই। আল্লাহর উপস্থিতির ভাবনা নেই। আজ নিজেরা আল্লাহর দরবারে হাজির হয়েছি। কিন্তু আল্লাহকে নিজের হৃদয়ে হাজির করতে পারলাম না। তো আমরা আল্লাহর কাছে হৃদয়ে আল্লাহর বিদ্যমানতা প্রার্থনা করব। আল্লাহর কাছে এই দু'আও করব যে, আল্লাহ যেন আমাদের অভ্যন্তরকে আলোকিত করে দেন।

حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی
لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب
وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یکتا امانت میں فرد
عجم کے خیالات میں کھو گیا وہ سالک مقامات میں کھو گیا
بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلماں نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے

আজ বাস্তবতা ও মূল মর্ম অসত্যের আড়ালে হারিয়ে গেছে।
এই উম্মত হারিয়ে গেছে রেওয়াতের আড়ালে।
হৃদয়কে উত্থিত করে বয়ানে-ভাষণে বক্তা সাহেব।
কিন্তু সেই প্রেমের সুমিষ্ট স্বাদ আজ থেকে থাকলাম বেনসীব।
ওই যে সূফী সাধক! যিনি হক তা'আলার ইবাদতে খেদমতে মত্ত ছিলেন।
মহব্বত ও ইশকের জগতে তিনি ছিলেন একক মহান।
তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

আজ সেই আজমের ভিন দেশীদের নানা রকম কু-ধারণায় নিচু ভাবনায় হারিয়ে গেছেন।

সেই আধ্যাত্মিক পুরুষ আজ পদমর্যাদার আড়ালে হারিয়ে গেছেন।

ইশ্‌ক ও প্রেমের আগুন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, নিভে গেছে।

আজ সেই মুসলমান নেই। আছে শুধু ছাইয়ের স্তূপ।

ইশ্‌কে ইলাহীর ওই অগ্নি আবারও জ্বালানো উচিত, যেন আমাদের আমলে প্রাণের সঞ্চার হয়। কবি বলেন–

سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے

دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشۂ سیماب

আমি সেই আযান না ফিলিস্তানে শুনেছি, না মিশরে শুনেছি।

যে আযান শুনে পাহাড়গুলোও পারদের মতো প্রকম্পিত হবে। হেলে উঠবে।

وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی

اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

সেই যে সেজদা, জমিনের রূহও যার কারণে কেঁপে ওঠে।

তার জন্য বেদনায় কাতর আজ মিম্বর ও মেহরাব।

আজকের এই যমানায় আল্লাহর জমিনও তালাশ করছে নিষ্ঠার সাথে সেজদা করত যে, জমিনের আত্মাও কেঁপে উঠত। আমাদের অবস্থাটা এমন যে, আমাদের লক্ষ করেই যেন বলা হচ্ছে–

میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا

تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں!؟

আমি যে সেজদা করি, কখনও অনুভব করি, জমিন থেকে আসছে ধ্বনি, বাজছে সুর।

তোমার হৃদয় তো মূর্তিতে নিবেদিত। নামাযে তুমি আর কী-ইবা পাবে?

আজ হৃদয় নিয়ে, দিল নিয়ে, আত্মা নিয়ে মেহনত করা উচিত। আমাদের হৃদয় আজ হৃদয় নেই। এই হৃদয়ের প্রাণ নেই। এই হৃদয় শক্ত পাথর হয়ে গেছে। মোমের মতো বিগলিত করতে হবে এ হৃদয়কে।

বাহ্যিক অবস্থা এ-রকম। দিলের অবস্থা অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভিন্ন রকম। এই যে দুমুখো স্বভাব এটা পরিত্যাগ করতে হবে।

دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا

দুমুখো স্বভাব ছেড়ে দাও; একরঙা হয়ে যাও।

হয়তো একেবারে মোম হয়ে যাও, না হয় পাথর হয়ে যাও।

আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরামের আপাদমস্তক আমলে ঢাকা ছিল। আজ আমাদের কাছে শুধু কথা আছে, আমাদের মুখে লম্বা-লম্বা বক্তৃতা আছে। কিন্তু আমল নেই।

کبھی اے نوجواں مسلم! تدبر بھی کیا تو نے؟

وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہو اتارا؟

হে মুসলিম যুবক! তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছ?

ওটা কোন আকাশ, যে আকাশের ছিন্ন তারকা তুমি?

تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں

کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرداراں

তোমাকে ওই গোত্র লালনপালন করেছে মহব্বত ও ভালোবাসার কোলে-পিঠে।

এমন কিছু তোমাকে দেওয়া হয়েছে, যা তোমার পায়ের সামনে রেখে দিয়েছে রাজমুকুট।

تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی

کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ

তোমার পিতৃবংশের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক হতে পারেনি।

যে বোঝা যাবে তুমি কথা বলবে আর সে কাজ করবে। তুমি অবিচল থাকবে আর সে থাকবে চলমান গাড়ির মতো।

বাস্তবেই আমাদের জীবনটা বড় চক্রের মতো ঘুরে যাচ্ছে। মুখে আজ আমরা নিজেকে মুসলমান বলি। অথচ আমাদের প্রতিটি কাজ চলছে আমাদের মন ও মর্জি অনুসারে।

এই অবস্থাটা দূর করার জন্যই চাই শায়খের সংশ্রব। চাই আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে সম্পর্ক। তা হলেই মানুষের ভেতরকার মানবটা জাগ্রত হবে। মানুষ দীনের রূহ প্রাপ্ত হবে। আজ যুবকরা এসে বলে, হযরত! দু'আ করুন, আমার মেজাজটা অনেক গরম থাকে। আসলে আমি জানি না, আমাদের আজকালকের তরুণ ও যুবক শ্রেণির পেরেশানিটা কোথায়? তারা সর্বদা টেনশনে থাকে। তাহলে তারা স্বাভাবিক থাকে কখন? একজন বলতে লাগল, হযরত! বেশ গোস্বায় পড়ে তো তালাক দিয়ে দিয়েছি। আমি তাকে বললাম, একটু বলো তো শুনি, কেউ কি খুশী অবস্থায়ও বউকে তালাক দেয়? নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কারণ, তোমার আত্মায় ব্যাধি আছে। তুমি আত্মাসংশোধনের জন্য সাধনা করনি। বরং যে দুটা পয়সা পেয়ে যায়, সে-ই সরকারি হালের বলদ হয়ে যায়। কোনো রূপ পরোয়া তার থাকে না। আল্লাহর বান্দাদের তখন সে আর আল্লাহর বান্দা মনে করে না।

সবচেয়ে খারাপ রোগ

প্রিয় ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন, রোগ-ব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে আত্মার ব্যাধি। আর আত্মার ব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া। হৃদয়ে আঘাত হানা। অন্যের মনকে ব্যথিত করা। আর আমাদের অবস্থাটা এমন যে, অতি সাধারণ কারণেই আমরা অন্যের হৃদয়ে আঘাত হানি। অন্যের হৃদয়কে ব্যথিত করি। অন্যকে কষ্ট দিই। মুমিন বান্দার জীবনটা কী রকম হওয়া উচিত তা শিক্ষা করার জন্য বুযুর্গগণের সোহবতে থাকতে হয়। শায়খের খেদমতে সময় কাটাতে হয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

অর্থাৎ– অন্য ভাইয়ের জান-মাল, ইয্যত-আব্রু সবকিছু নিরাপদ থাকে। এমন মানুষকেই মুসলমান বলা যায়।

আমরা একটু নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, এই মাপকাঠি অনুযায়ী এবং এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা মুসলমানের সীমারেখায় আছি কি-না? আরে, আমরা তো আল্লাহর বান্দাদের পেরেশান ও অস্থির করে ফেলছি।

স্বামী তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয়।

স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়।

বউ শাশুড়ির মাঝে ঝগড়া চলে।

ভাবি ও ননদের মাঝে ঝগড়া চলে।

পাড়া-পড়শির পরস্পরের মাঝে ঝগড়া চলে।

দুই ভাই, এক ভাই আরেক ভাইয়ের চেহারা দেখতে পারে না।

দেখুন! ইসলাম আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয়। আর আমরা কী করি? আমাদের জীবন আমরা কীভাবে চালাই?

খায়ের খাহীর নামই দীন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

দীন হচ্ছে নিখাঁদ খায়েরখাহী এবং কল্যাণকামিতার নাম।

এর মানে কী? এক মুমিন অন্য মুমিনের খায়েরখাহ হবে। এক মুমিন অন্য মুমিনের কল্যাণ কামনা করবে। স্মরণ রাখবেন, যেখানেই এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ক্ষতিকারী দেখতে পাবেন, বুঝবেন সেখানে দীন উপেক্ষিত।

অন্যকে নিজের ওপর প্রধান্যদান

ইসলাম আমাদের ঈসার তথা অন্যকে নিজের ওপর প্রধান্যদানের সুমহান শিক্ষা প্রদান করেছে? সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের জীবনে এর অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এক মুজাহিদ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে আছেন। এখনই পাড়ি দেবেন জান্নাতে। এমন সময় বলে উঠলেন, পানি, পানি! তাঁর সহকর্মী তাঁর কাছে পানির পাত্র নিয়ে ছুটে গেলেন। পানির পাত্রটা আহতের ঠোঁটে লাগাল। এমন সময় অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ শোনা গেল। পানি, পানি। শুনে এই আহত সাহাবি তার মুখ বন্ধ করে নিলেন। অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করে বললেন, ওই দিকে যাও। পানি বহনকারী সাহাবি ছুটলেন দ্বিতীয়জনের কাছে। তার অধরে পানপাত্র ধরা হলো। এমন সময় চিৎকার এল অপর কণ্ঠ থেকে পানি পানি। শুনে এই আহতও আগেরজনের মতোই মুখ বন্ধ করে নিলেন। ইশারা করে বলে দিলেন, ওই দিকে যাও। পানি বহনকারী সাহাবি তড়িৎগতিতে ছুটলেন সেদিকে। তৃতীয় আহতের সামনে গিয়ে পানি

বহনকারী সাহাবি দেখেন তিনি শাহাদাতের দুয়ার অতিক্রম চলে গেছেন জান্নাতে। পানির আর প্রয়োজন নেই তার।

পানি বহনকারী সাহাবি ছুটে এলেন দ্বিতীয় আহতের কাছে। দেখলেন, তিনি চলে গেছেন জান্নাতে। এবার সাহাবি ছুটলেন প্রথমজনের কাছে। এসে দেখলেন, এই জনেরও দুনিয়াবি পানির প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। ইনিও জান্নাতের অনন্ত সুধায় মুখ দিয়েছেন। ইনিও শাহাদাতের দুয়ার দিয়ে জান্নাতে চলে গেছেন। এই হলো জীবন। এখানেই অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রেম আর মহব্বত উপচে পড়ে দারুণ উল্লাসে। এখানে প্রাণে-প্রাণে থাকে গভীর প্রণয়। এ প্রণয় দীনের। এ প্রণয় ইসলামের। মিথ্যের সকল বালির বাঁধ ভেঙে দিয় এখানে নির্মিত হয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস। আমাদের সাবাহায়ে কেরামের ত্যাগ, কুরবানি, অন্যের কল্যাণ, সাহায্য-সহায়তা এবং অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্যদানের দৃষ্টান্ত এখানে জ্বলজ্বল করে উত্তেজিত সূর্যের মতো। কুরআন এই চিত্রকে ঐশী নূরের ছোঁয়ায় এঁকে দিয়েছে এভাবে–

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদের অগ্রাধিকার দান করে।[১৬৮]

আবুল হাসান নূরীকে সে সময়ের বাদশাহ তার মর্জি মোতাবেক কোনো ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তিনি তার মর্জিমতো ফাতাওয়া দানে অস্বীকৃতি জানালেন। বাদশাহ তখন তিনজন আলেমকে গ্রেফতার করল। বাদশাহ তাদের শায়েস্তা করতে চাইল। ক্ষুব্ধ হয়ে সে তাদের হত্যা করার হুকুম জারি করল।

জল্লাদ তাদের হত্যা করতে উদ্যত হলো। বাদশাহ দেখল, সবার সামনে দাঁড়ানো আবুল হাসান নূরী। বাদশাহর সাথে তার আত্মীয়তাও ছিল। তাই বাদশাহ চাইল, বাকি দুজনকে হত্যা করে দেওয়া হোক। আর নূরীকে তিনি কোনো ছুতোয় বাঁচিয়ে নেবেন। বাহানা করে বাদশাহ বললেন, এই জায়গায় নয়, তাদেরকে ওই পেছনের জায়গাটায় হত্যা করো। বাদশাহ ভাবলেন, ওই দিকে নিতে গেলে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যাবে। আগের দুজনকে মেরে ফেলে নূরীকে বাঁচিয়ে দেওয়া সহজ হবে। কিন্তু সেখানে গিয়েও নূরী সবার আগে মৃত্যুর জন্য দাঁড়ালেন বুকটা টান করে। দেখে বাদশাহ হয়রান হয়ে গেল। নূরীকে কাছে ডাকল। বলল, ছুতো করে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিতে চাচ্ছি।

---

১৬৮. সূরা হাশর : আয়াত ৯

প্রথমে অন্যদের মেরে ফেলা হোক। কিন্তু সবসময় তো আপনিই আগে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। কারণটা কি? নূরী বললেন, আমার মনে এই খেয়াল এল যে, আমি যদি আগে মরি, তাহলে আমাকে মারতে গিয়ে যতটুকু সময় জল্লাদের লাগবে ওই সময়টুকু আমার অপর দুই ভাই জীবিত থাকতে পারবেন। তারা আমার থেকে সামান্য হলেও বেশি জীবিত থাকার সুযোগ পেয়ে যাবেন। বন্ধুগণ! এই আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরাম। আর এ-যুগের আমাদের অবস্থা তো খুবই করুণ।

আমরা যখন সত্যিকার মুসলমান ছিলাম

একটা সময় ছিল, যখন মুসলমানের কাছে পড়শীর বড় মূল্য ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের পড়শীদের মধ্যে একজন ইহুদি লোক ছিল। লোকটি ঘর বিক্রি করতে চাইল। একজন খরিদ্দার এল। জিজ্ঞেস করল, কত টাকায় বিক্রি করতে চাও এই ঘর? ইহুদি বলল, দুই হাজার দিনার। খরিদ্দার বললেন, এই এলাকায় তো এমন বাড়ির মূল্য এক হাজার দিনার। আর তুমি আমার কাছে দুই হাজার দিনার চাচ্ছ। ইহুদি বলতে লাগল, হ্যাঁ; এক হাজার দিনার আমার ঘর ও বাড়ির মূল্য তা তো ঠিক। আর আরেক হাজার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের পড়শী হতে পারার মূল্য।

বাস্তবতা হলো, তখন আমাদের আখলাক এমন হতো যে, প্রত্যেকেই অপরের কল্যাণ কামনা করত এবং পড়শীর ঘরের মূল্যও বেড়ে যেত। লোকেরা আমাদের আমল দেখে মুসলমান হয়ে যেত।

মুসলমানদের চালচলনে খায়েরখাহীর নিদর্শন

সময়টা অনেক আগের। বাগদাদ তখন মুসলিম শাসনের রাজধানী। কাফেররা মুসলমানদের জীবনাচার, গতিবিধি এবং পৃথিবীময় রাজত্ব করার মূল শক্তি কী এসব যাচাইয়ের জন্য বাগদাদে এক যুবককে পাঠাল। অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় লোকটি বাগদাদ পৌঁছল। খাবার গ্রহণের জন্য যুবক একটি হোটেলে প্রবেশ করল। খাবার খাওয়া অবস্থায় যুবক লক্ষ করল, কোনো একজন লোক তাকে গভীরভাবে দেখছে? খাবার শেষে বিল পরিশোধ করতে গিয়ে দেখল, কেউ একজন তার বিল পরিশোধ করে দিয়েছে। কাউন্টার থেকে বলল, আপনার সামনে একজন মুসলমান বসা ছিল। তিনি আপনাকে মুসাফির দেখে নিজের টাকাও দিলেন এবং আপনার টাকাও শোধ করে দিলেন। বলে গেছেন, এই ভাইটি আজ আমার মেহমান তার হাতে সময় কম তাই আপনার সঙ্গে বিস্তারিত কিছু বলে যেতে পারেননি।

শুনে এই যুবক বড় হয়রান হয়ে গেল। ভাবল, মুসলমানরা এমন? যুবক সামনে অগ্রসর হলো। এক দোকানে তার কিছু ক্রয় করবার প্রয়োজন ছিল। সে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, ভাই! আপনার কাছে অমুক জিনিসটা আছে কি? লোকটি বলল, আছে এবং জিনিসটার মূল্য এত। তবে ভাই! আপনার কাছে অনুরোধ, দয়া করে আমার সামনের দোকান থেকে আপনি ওই জিনিসটি ক্রয় করুন। এই দামই রাখবে। লোকটি সেই দোকানে গিয়ে একই দামে জিনিসটা ক্রয় করল ঠিক; কিন্তু তার মনে প্রশ্ন জাগল। এসে প্রথম দোকানদারকে বলল, ভাই আসলে কি জিনিসটা আপনার কাছে ছিল? কেন আপনি আপনার দোকান থেকে না দিয়ে সামনের দোকানে পাঠিয়ে দিলেন? প্রথম দোকানদার বলল, ভাই! আজ আমার দোকানে এ পরিমাণ গ্রাহক এসেছে এবং এত ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে যে পরিবার নিয়ে আমার সুখে-শান্তিতে দিন কাটবে। কিন্তু আমার অমুক ভাইটির দোকানে গ্রাহক কম এসেছে। সেজন্য আপনাকে আমি তার দোকানে পাঠিয়েছি যেন সেও এই পরিমাণ রোজগার করতে পারে, যার দ্বারা তার স্ত্রী পুত্র নিয়ে আজকের দিনটা ভালোভাবে কাটাতে পারে।

একটা সময় এমন ছিল, যখন দোকানদারও একজন আরেকজনের এমন খায়েরখাহ ছিল। এমন কল্যাণকামী ছিল।

ইসলামের সমুন্নতি

ইন্ডিয়ার একটি বড় এলাকার নাম কান্ধলা। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সেখানে যাওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এটা হিন্দুস্তান বিভক্তির অনেক আগের কথা। সেখানে একটি জমিন নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে বিরোধ দেখা দিল। মুসলমান বলে, এটা আমার জমিন। হিন্দুও বলে এটা আমার জমিন। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে মুসলমান লোকটি বলে দিল, জমিনটা যদি আমি পেয়ে যাই, তাহলে আমি তাতে মসজদি বানিয়ে দেব। এবার হিন্দু লোকটি বলে দিল, যদি আমি পেয়ে যাই, তাহলে আমি সেখানে মন্দির বানিয়ে দেব। দেখুন, কথা ছিল সামান্য। কিন্তু চলে গেল ধর্মীয় বিরোধের পর্যায়ে।

এদিকে মুসলমান এসে বলতে লাগল, আমরা মসজিদ বানাব। আর হিন্দুরা বলতে লাগল আমরা মন্দির বানাব। এভাবে বিরোধের আগুন পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ল। সে যুগের ইংরেজ বিচারক এই মুকাদ্দামা নিয়ে পেরেশানিতে পড়ল। সামান্য অসতর্ক সিদ্ধান্ত দিলেই গোটা শহরে রক্তের

বন্যা বয়ে যাবে এবং এটা হয়ে যাবে এক নতুন মসিবত। ইংরেজ বিচারক মুসলমান ও হিন্দু দুই জনগোষ্ঠির ব্যাপকসংখ্যক লোককে আদালতে ডাকল।

ইংরেজ জজ জিজ্ঞেস করল, কোনো সন্ধির সূরত হতে পারে কি? আমরা যেন আপসে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

হিন্দু বলল, এই সুরত হতে পারে যে, আমরা একজন মুসলমান ব্যক্তির নাম বলছি, আপনারা তাকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, যদি তিনি বলেন, এই জমি মুসলমানদের, তাহলে আপনারা জমিন মুসলমানদের দিয়ে দিন; আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আর যদি তিনি বলেন, জমিন হিন্দুর, তাহলে আপনারা হিন্দুকে দিয়ে দিন।

যাহোক, দিন ধার্য করা হলো এই বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য। দিন গড়িয়ে নির্ধারিত দিন উপস্থিত হলো। লোকেরা একজন মুসলিম শায়খকে নিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি হচ্ছেন মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলভী (রহ.)। জজ মুফতী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, মুফতি সাহেব আপনি বলুন, জমিনটি কার? মুফতী সাহেব ঠান্ডা গলায় বললেন, জমিটি হিন্দু ভাইয়ের । জজ জিজ্ঞেস করলেন, জমিনটাতে কি হিন্দুরা মন্দির বানাতে পারে? মুফতী সাহেব বললেন, যেহেতু জমিনের মালিক তারা; তাই তাদের এই অধিকার আছে। তারা চাইলে মন্দির বানাবে, না হয় তাদের ঘর বানাবে। তাতে তো কোনো সমস্যা নেই।

মুফতী সাহেব এ জবাব প্রদান করলে মুসলমানদের অন্তর কেঁপে উঠল। এবার ইংরেজ বিচারক ফয়সালা শোনাল। সেই যুগান্তরকারী ঐতিহাসিক ফয়সালায় ইংরেজ জর্জের বক্তব্য ছিল, 'আজ মুসলমান তো হেরে গেছে; কিন্তু ইসলাম জিতে গেছে।'

হিন্দুরা জজ সাহেবের ফয়সালা শুনে বলল, জজ সাহেব। আপনি এবার আমাদের ফয়সালা শুনুন। যেহেতু ইসলাম জিতে গেছে এবং যে ইসলাম এত সুন্দর নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত আমরাও কালিমা পড়ে সেই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলাম। আমরাই এই স্থানে আমাদের হাতে মসজিদ বানিয়ে নেব।

তো দেখুন, একটা সময় এমন ছিল যে আমাদের কথা কাজ, আচার-ব্যবহার এবং চালচলন দেখে কাফেররা মুসলমান হয়ে যেত। অথচ আজ আমাদের জীবনটা কেমন যেন হয়ে গেছে। আজ মুসলমানিত্বের লাজটুকুও আমরা রক্ষা করতে পারছি না। অথচ এর বড়ই প্রয়োজন এখন।

বহুরূপী মানুষটি আমাদের চেয়েও উত্তম

বাদশাহ আওরঙ্গজেব ঘোষণা করলেন, যে-ব্যক্তি এমন বেশ ধারণ করতে পারবে যে, আমি তাকে চিনতে পারব না, তাহলে এর বিনিময়ে আমি তাকে পুরস্কৃত করব। বহুরূপ ধারণ করতে পারে এমন এক ব্যক্তি এল তার আসল রূপ একেবারে পরিবর্তন করে। বাদশাহ আলমগির তাকে চিনে ফেললেন। ফলে লোকটি পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত হলো না। ব্যর্থ হয়ে সে নতুন কৌশল ঠিক করল। ভাবল, বাদশাহ আমলগীর আওরঙ্গজেব তো আল্লাহওয়ালা বুযুর্গগণকে ভালোবাসেন। তাই সেই বহুরূপী মানুষটি শহরের বাইরে একস্থানে যিকিরে মশগুল হলো। দিনে-দিনে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল একজন বুজুর্গের কথা। সংবাদ পৌঁছল বাদশাহের দরবারেও। বাদশাহর অভ্যাস ছিল, কোথাও কোনো বুযুর্গের সন্ধান পাওয়া গেলে সশরীরে তার কাছে গিয়ে হাজির হয়ে তার থেকে দু'আ নেওয়া। অভ্যাস অনুযায়ী বাদশাহ আওরঙ্গজেব উপস্থিত হলেন ওই কথিত বুযুর্গ (বহুরূপী)-এর দরবারে।

লোকটির সামনে বাদশাহ হাদিয়া পেশ করলেন। কিন্তু লোকটি এই বলে হাদিয়া গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল যে, তোমার এসব সম্পদের প্রয়োজন আমার নেই। যাও দুনিয়ারদারদের জন্য এসব খরচ করো। আমাকে যিকির করতে দাও। বাদশাহ ভাবলেন, বুযুর্গ তো দুনিয়াবিমুখ, লোভ-লালসাহীন। তাই হাদিয়া ফিরিয়ে নিলেন এবং তিনি নিজ গন্তব্যে ফিরে এলেন। যখন তিনি তাঁর রাজদরবারে উপস্থিত হলেন অমনি, সেই কথিত বুযুর্গ এসে রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, বাদশাহ সালামত!

আস্‌সালামু আলাইকুম।

বাদশাহ : ওয়ালাইকুমুস্ সালাম।

বহুরূপী : বাদশাহ সাহেব! আপনার কল্যাণ হোক; পুরস্কারটা দিন।

বাদশাহ : কোন বিষয়ে?

বহুরুপি : বাদশাহ সাহেব! আপনি আমাকে চিনতে পারেননি।

বাদশাহ : ব্যাপারটা বলুন?

বহুরূপী : আপনি এইমাত্র যে বুযুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন সে কে?

বাদশাহ : সে তো এক আল্লাহওয়ালা।

বহুরুপি : না! বাদশাহ সাহেব! আমিই ছিলাম সেই লোক।

বাদশাহ অবাক ও বিস্মিত হলেন। লোকটাকে পুরস্কার দিলেন। অবশ্য পুরস্কার ছিল তুলনামূলক কম।

বহুরূপী : পুরস্কার তো অনেক কম হলো।

বাদশাহ : আরে! তখন থলিভর্তি দিনার দিয়েছিলাম। কেন তখন রাখলে না? তাহলে তো বেশিই পেতে। এখন কেন পুরস্কার কম বলে অভিযোগ করছ?

বহুরূপী : বাদশাহ সাহেব, এমন খেয়াল আমারও হয়েছিল তখন। কিন্তু আমি ভাবলাম, যদিও আমি বহুরূপী; কিন্তু এখন তো আমি আল্লাহওয়ালার বেশ গ্রহণ করেছি। যদি অর্থের থলিটি তখন রেখে দিতাম, তাহলে আল্লাহওয়ালাদের বদনাম হয়ে যেত। তাই আমি বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহওয়ালাদের আচরণবিধির অনুসরণ করেছি।

দেখুন, আমাদের চেয়ে সেই বহুরূপী উত্তম। সে নিজে বহুরূপী হওয়া সত্ত্বেও বুযুর্গের সুরত যেহেতু ধরেছিল, সেজন্য বুযুর্গদের সম্মান ও তাদের আচার-বিধির প্রতি লক্ষ রেখেছে। আবার নিজে যে বহুরূপী, তার প্রতিও লক্ষ রেখেছি। আল্লাহওয়ালাদের শানের খেলাফ কোনো কাজ করেনি। আমরা তো কালিমা পড়েছি। নিজেদের মুসলমান দাবি করছি। আমরা কেন এমন কাজ করছি, যা একজন মুসলমানের শানের খেলাফ হয়? মুসলমানের আচার-বিধির খেলাফ হয়?

নেসবতে মুহাম্মাদীর ফিকির

দিল্লির জামে মসজিদের আঙিনায় ভিক্ষুকরা ভিক্ষা করার জন্য বসে। একবার এক ইংরেজ এল। মসজিদের ডিজাইন দেখতে চাইল। এ-সময় এক ফকির তার কাছে এসে কিছু চাইল। ইংরেজ তাকে কিছু পয়সা দিল। মসজিদের ডিজাইন তার পছন্দ হলো। ফলে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে পরের সপ্তাহে ডিজাইন পরিদর্শনের লক্ষ্যে আসবে বলে ঠিক করল। কিন্তু সে অনুভব করল, যে ছোট বাক্সটি থেকে সে ফকিরকে কিছু পয়সা দিয়েছিল, সেই বাক্সটি তার পকেটে নেই। হয়তো রাস্তায় কোথাও পড়ে গেছে।

পরের সপ্তাহে স্ত্রীকে নিয়ে এল এবং মসজিদের আঙিনা হয়ে মূল ভবনের দিকে অগ্রসর হলো। এমন সময় ওই দিনের সেই ফকির দৌড়ে এল। থলি থেকে বাক্সটি বের করে বলল, জনাব! আপনার এই টাকার বাক্সটি গত সপ্তাহে এখানে পড়ে গিয়েছিল। আপনাকে আমি খুঁজেছিলাম। কিন্তু ততক্ষণে

আপনি চলে গিয়েছিলেন। ইংরেজ বাক্সটি হাতে নিয়ে দেখল, তাতে তার পুরো টাকাগুলোই আছে। কোনোরূপ পরিবর্তন আসেনি তাতে। ইংরেজ বিস্মিত হলো। ভিক্ষুক তো পেলেই খুশী হয়। নিজে সারা দিন ভিক্ষা করে। কিন্তু এতগুলো টাকার বাক্সটা পাওয়ার পরও সে এখান থেকে এক টাকাও ধরেনি। সপ্তাহ ধরে আমার অপেক্ষা করছে। আমার বাক্সটা হেফাজত করছে।

ইংরেজ জিজ্ঞেস করল, কী কারণে তুমি বাক্সটার টাকা খরচ করনি?

ফকির বলল, আমার মন চেয়েছিল টাকাটা খরচ করতে। কিন্তু সাথে-সাথে আমার স্মরণ হলো, আমি মুসলমান আর আপনি খৃষ্টান। আমি ভাবলাম, এমন যেন না হয় যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে মোকদ্দামা পেশ করা হলো, আপনার নবী হযরত ঈসা (আ.) আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিযোগ জানালেন, আপনার উম্মত আমার উম্মতের টাকা নিয়ে গেছে। এই বিষয়টা স্মরণ হওয়ার পর আমি আর আপনার টাকাটা খরচ করিনি। নিন আপনার টাকা ও এই আমানত আমি আপনাকে পৌঁছে দিলাম।

সত্য কথা তো হলো এই যে, আমাদের চেয়ে ফকির অনেক উত্তম। সেই ফকিরও মুহাম্মাদের উম্মত; নবীর এ-লাজটুকু রক্ষা করেছে। আমাদেরও উচিত নবীর লাজ রক্ষা করা।

মাফ চাওয়ার আগেই মাফ করে দিল

এক বুযুর্গ হজে গেলেন। তার টাকার ব্যাগটি তার হাতে ছিল। এক যুবক এসে তার থলিটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সামান্য অগ্রসর হতেই যুবকটির চোখ-মুখ অন্ধকারে ছেয়ে গেল এবং সে অন্ধ হয়ে গেল। যুবকটি এবার কান্না শুরু করে দিল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তোমার? যুবক বলল, আমি অমুক স্থানে এক বুড়ো ব্যক্তির টাকার থলে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। লোকটা মনে হয় আল্লাহর মকবুল বান্দা। আমার চোখে তো আমি এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। আমি তার কাছে মাফ চাইব।

যুবককে সেই স্থানে নেওয়া হলো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বের করা হলো বুড়ো বুযুর্গকে। যুবক তাকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতে লাগল। নিজের ভুল স্বীকার করল। মাফ করে দিতে বলল। বুযুর্গ বললেন, আরে! আমি তো তোমাকে আগেই মাফ করে দিয়েছি।

বারবার যুবক মাফ চাইল আর বুযুর্গ বারবারই বললেন, আমি তো তোমাকে আগেই মাফ করে দিয়েছি। লোকেরা বিস্মিত হয়ে বুযুর্গকে প্রশ্ন করলেন, হুজুর! সে আপনার থলে ছিনিয়ে নিলেন আর আপনি বলছেন, আপনি আগেই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, ব্যাপারটা আমাদের বুঝে এল না। বযুর্গ জবাব দিলেন, আমি ওলামায়ে কেরামের কাছে মাসআলা শুনেছি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে হিসাব-কিতাবের জন্য পেশ করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মাতের সকলের হিসাব শেষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি জান্নাতে পা রাখব না। তো আমার হৃদয়ে উদিত হলো, আমার টাকার থলি তো ছিনিয়ে নিয়ে গেছেই।

আমি যদি লোকটাকে মাফ করে না দিই, তাহলে তাকে কেয়ামতের আদালতে পেশ করা হবে। এই মুকদ্দামার ফয়সালা দিতে যতটুকু সময় লাগবে, আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাতে যেতে ততটুকু সময় দেরি হয়ে যাবে। তাই আমি মাফ করে দিয়েছি যেন আমার মুকদ্দামা আল্লাহর দরবারে উপস্থাপিত না হয় আর দেরিও যেন না হয়ে যায়।

আহ! আমরাও যদি আজ এমন চিন্তাচেতনার অধিকারী হতে পারতাম! আমরা যদি আমাদের সকল ঝগড়া-ফাসাদের অবসান ঘটাতে পারতাম।

তোমার নেসবত থাকুক সালামাতে

প্রিয় ও আদরের তালিবুল ইল্‌ম ভাইয়েরা!

আমাদের কাছে তো দীনের নেসবত ও দীনের সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো নেসবত-সম্পর্ক নেই।

عمل کی اپنے اساس کیا ہے
بجز ندامت کے پاس کیا ہے
رہے سلامت تمہاری نسبت
مرا تو بس آسرا یہی ہے

আমলের মূল ভিত্তিটা কী?

আমাদের কাছে নাদামাত ও লজ্জা-শরম ছাড়া তো নেই কিছু।

নেসবত থাকুক সালামাত ও অটুট ।তোমার

আমার তো আশা ও আকাঙ্ক্ষা ওইটুকুই শুধু।

আল্লাহ তা'আলা এই ছেঁড়া চাটাইয়ে বসে হাদীছ ও তাফসীরের কিতাব পড়া এবং পড়ানোর যে নেসবত আমাদের দান করেছেন, তা অত্যন্ত বড় ও উঁচা নেসবত।

এই নেসবত ও সৌভাগ্যটুকুর লাজ রক্ষা করা চাই। এমন যেন না হয় যে, কেয়ামতের দিন আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে যে, তারা তো সাধারণ লোক ছিল। তারা না হয় দীন ও ইসলাম মতো চললো না। কিন্তু তোমরা তো ছিলে আলেম। কুরআন-হাদীছে অভিজ্ঞ। তোমরা কেন ইসলাম মতো চললে না? তোমরা কেন দীন মতো জীন পরিচালনা করলে না? তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আল্লাহর সামনে আমরা কী জবাব দেব?

কোনো একজন বলেছেন-

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر

گر تو بینی حسابم ناگزیر

از نگاہ مصطفے پنہاں بگیر

হে আল্লাহ! উভয় জগতে আপনিই ধনী আর আমি ফকির।

হে আল্লাহ! যদি আপনি ফয়সালা করে নেন, আমার হিসাব নেওয়া আবশ্যক।

হে আল্লাহ! তাহলে আমার হিসাবটা আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টির আড়ালে রেখে নিন।

যেন প্রিয়তম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে লজ্জিত না হতে হয়। যেন নবীজি বলে না দেন, তুমি আমার চোখের অশ্রুকে মূল্যায়ন করনি। আমি তো রাতে-রাতে কেঁদে-কেঁদে উম্মতের মাগফেরাতের জন্য দু'আ করছিলাম। তুমি আমার ওয়ারিস কী করে হয়েছ? তুমি পড়াশোনা করার পরও তোমার জীবনকে বদলে নাওনি।

আজ আমাদের উচিত আমরা আমাদের জীবনকে ইসলাম অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া, পেছনের গুনাহ থেকে সত্যিকারের তাওবা করা। দিলে-দিলে এরাদা করা উচিত যেন সামনের জীবনটা হয় আমাদের ঈমানি, ইসলামি ও কুরআনি।

আল্লাহ আমাদের কামিয়াব করুন। কেয়ামতের দিন অপমান ও লজ্জা থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ আমাদের ভেতরের মানবতাবোধকে জাগিয়ে দিন। আমাদের সঠিক অর্থেই মুসলমান বানিয়ে দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

গাছে লুকায়িত রহস্যাবলি

'চন্দন কাঠের গাছ ওই কুড়ালকে সুগন্ধযুক্ত করে দেয়, যে কুড়ালটি দ্বারা চন্দন কাঠের গাছ কাটা হয়। যেন ক্ষতির জবাব উপকারের মাধ্যমে প্রদান করে চন্দনের কাঠ। আমাদেরও এমন হয়ে যাওয়া উচিত। প্রকৃতি আমাদের এই শিক্ষা প্রদান করে যে, আমরাও মন্দের জবাব দেব ভালো দ্বারা। কিছু মানুষ বলে আমরা ইটের জবাবে পাথর ছুড়ে দেব এটি উন্নত আখলাক ও চরিত্র নয়। পাথরের জবাবে ফুল ছুড়ে দেওয়া উন্নত স্বভাব ও আখলাক।'

গাছে লুকায়িত রহস্যাবলি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا ۔ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۔ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ تَبْصِرَةً وَّ ذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ۔

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

স্বাধীন মানুষের অবসর নেই

মানুষ তো বৃক্ষ নয় যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে। পাথরও নয় যে, পড়ে থাকবে। মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত তথা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিজীব। মানুষের উচিৎ আল্লাহর স্মরণে ডুবে থাকা। আমাদের জিন্দেগির মাকসাদ আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করা। আর আমাদের হায়াতের মাকসাদ হলো আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকা। মানবদেহ একটা চাক্কির মতো। চাক্কি যদি ঘুরতে থাকে এবং পিষতে থাকে, তাহলেই তার উপকার দেখা যায়। আর যদি চাক্কি বন্ধ থাকে, তাহলে তার কোনো ফায়দা নেই। এমনিভাবে মানুষের দেহ থেকে যখন নেক আমল প্রকাশ পায়, তাহলে এই দেহের ফায়দা দেখা যায় এবং ফায়দাটা অর্জিত হয়ে যায়। আমরা সূর্যকে চলমান দেখি। আকাশের চাঁদ-তারকাকে চলমান দেখি, একটি নীরব বার্তা ও উপদেশ রয়েছে এই চাঁদ-তারকা আর সূর্যের আবর্তনের মধ্যে। এগুলো আমাদের বলছে, হে মানবকূল! তোমারও উচিত নিজ জীবনকে সচল রাখা।

ملی ہے فرصت فقط غلاموں کو

جہاں میں بندۂ حر کے لیے نہیں ہے فراغ

ফুরসত পেয়েছ। সময় পেয়েছ। সুযোগ পেয়েছ শুধু আনুগত্যের তরে। গোলামরাই শুধু পায় সুযোগ।

এখানে বান্দা তো স্বাধীন থাকবার জন্য নয়; বরং আনুগত্যের জন্য। স্বাধীন মানুষ তো কোনো সময় অবসর পায় না।

প্রাকৃতিক পাঠশালা

এই বিশ্বটা আমাদের পাঠশালা। যদি আমরা আমাদের চার পাশকে দেখি, তাহলে দেখতে পাব প্রকৃতিকভাবে হাজারো শিক্ষাপোকরণ ছড়িয়ে আছে আমাদের আশপাশে। সবাই আমাদের শিক্ষা দেয়। হে মানব! তুমি দুনিয়াতে একটি উদ্দেশ্যের আওতাধীন করে তুমি তোমার জীবন পরিচালনা করো, তাহলেই তুমি কামিয়াব হবে। সফল হবে।

গাছে লুকানো রহস্যাবলি

গাছে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। অনেক আশ্চর্য আর দুলর্ভ তথ্য লুকিয়েছে আছে গাছের মধ্যে।

গাছ কেন মাটিতেই অঙ্কুরিত হয়?

আপনি হয়তো দেখে থাকবেন, গাছ সর্বদা মাটিতেই উদ্গত হয়, অঙ্কুরিত হয়। সোনা-চাঁদির প্লেটে গাছ হয় না। এর দ্বারা যেন বোঝানো হয় যে, হে মানুষ! যদি তুমি সফলতা চাও, তাহলে এই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মানবসমাজের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে হবে। তাহলেই তুমি সঠিকভাবে প্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। যদি জঙ্গলে আর পাহাড়ের গুহায় গিয়ে উন্নতি করতে চাও, তাহলে তুমি সফল হতে পারবে না।

মাটিতে বীজ বপণ করার রহস্য

যে-বীজ মাটিতে বপণ করা হয়, সেটাই একদিন বৃক্ষে পরিণত হয়। বীজ যখন নিজেকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে, তখনই সে বৃক্ষ হতে পারে। তখনই আল্লাহ তাকে বিশাল বৃক্ষের রূপ দান করেন। তার মধ্যে ফুল আসে, ফল আসে। একটি মাত্র বীজ নিজেকে মাটিতে বিলীন করে জন্ম দেয় হাজারও বীজ।

এমনিভাবে মানুষ যখন নিজের আমিত্বকে মিটিয়ে দেয়, তখনই আল্লাহ তাকে এমন এক মাকাম ও মর্যাদা দান করেন, যার কারণে সে হাজার এবং লাখো মানুষের প্রকৃত মানুষ হওয়ার মাধ্যম ও উসীলা হতে পারে।

একটি বীজের আত্মত্যাগে মানবের জন্য পয়গাম

একটি বীজ নিজের আত্মাকে ত্যাগ করেছে। কুরবানি করেছে। ফলে সেটা বৃক্ষ হয়েছে। মানব ও পশু-পাখিকে সেই বৃক্ষ ছায়া দান করেছে। এমনিভাবে যে মানুষটি নিজের নফস ও আত্মাকে কুরবান করবে, নফসকে শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত করবে, আল্লাহ তাকে উপকারী বৃক্ষটির মতো অন্য সব মানবকূলের জন্যে উপকারী বানিয়ে দেবেন। তিনি তখন একজন মানব হবেন; কিন্তু তিনি ছায়া দেবেন হাজার মানবকে।

এক দেশে আমি একটি বাগান দেখেছি। সেখানে এলাচি গাছ দেখেছি, যা মুখে দেওয়ার সাথে-সাথেই সুগন্ধি বেরিয়ে আসে। লোকেরা আমাকে বলল, যে হুজুর! এ গাছ কখনও উন্মুক্ত বা খালি জায়গায় হয় না বরং অন্য আরেকটি বড় গাছের ছায়ায় এ-গাছের জন্ম, বেড়ে উঠা এবং ফল-ফুল দেওয়া সব কিছু হয়ে থাকে। তার কথা শুনে আমি মনে-মনে বললাম, মানুষকে তার বড়দের সামনে বিলুপ্ত হয়ে থাকতে হয়। তাহলেই সে এই এলাচি গাছের মতো খুশবুদার ফল দিতে পারে। আল্লাহ যেমন এই এলাচি গাছকে খুশবুদার ফলে ধন্য করেছেন, ঠিক তেমনি মানুষ যদি শায়খের ছায়ায় থাকে, তাহলে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সুগন্ধযুক্ত খুশবুদার আমল দান করেন। আমাদের উচিত আমরা সর্বদা নেক কাজের বীজ বপণ করতে থাকা। একদিন এমন হবে যে, একটি-একটি করতে-করতে হাজার গাছের বাগানের মতো নেকের বাগান হয়ে যাবে।

گل سادی اے میلہ گھڑی دا اے
رتاں آندیاں جاندیاں رہندیاں نیں
کرماں والیاں اوہ جیہڑیاں
رُکھ لاکے مُڑ چھانویں بیہندیان نیں

যে বান্দা আজ গাছ লাগায়, তারপর এক সময়

সেই গাছের শীতল ছায়ায় সে বসে আরাম করতে পারে, সে বড়ই সৌভাগ্যবান।

আমরাও আজ নেকির গাছ বপণ করেছি এবং

কাল কেয়ামতের দিন তপ্ত গরমে সেই নেকির কারণে আরশের ছায়াতলে আরাম করব।

গাছ হবে– গুল্ম নয়

উদ্ভিদ দুই প্রকার। ১. গুল্ম ২. গাছ বা বৃক্ষ। উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। গাছ বা বৃক্ষ বড় হয় ধীরে-ধীরে সময় নিয়ে কয়েক বছরে। আর গুল্ম, লতা গাছ অতি দ্রুত বাড়তে থাকে। পক্ষান্তরে গাছ বা বৃক্ষ দীর্ঘায়ু পায়। কোনো-কোনো গাছ তো শত বছরও জীবিত থাকে। এক দেশে একটি গাছ দেখেছি। বয়স শত বছরেরও অধিক। গাছটা দেখার জন্য অন্য দেশ থেকে পর্যটকও আসে। গাছটার ফুলও ছিল, ফলও ছিল।

আবার কয়েক শত বছর বয়স হয়েছে এমন বৃক্ষও আছে। আমেরিকার অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় এমন এক বৃক্ষ আছে, যার বয়স কয়েক শতাব্দি অতিক্রম করেছে। আশ্চর্য হলো, গাছগুলো এমন বড় যে, এর গোড়ার দিকে কেটে বাস চলা চলের সড়ক বানানো হয়েছে। উপরে গাছ। নিচে গাছের দেহ ছেদ করে তৈরি করা হয়েছে বড় সড়ক। তো গাছ উদ্গত হতে এবং বেড়ে উঠতে বছরের-পর-বছর সময় লাগে। আবার সে বেঁচে থাকেও বহু বছর।

আর লতাগুল্ম তার বিপরীত। লতা কয়েক দিনে চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে। অল্প দিনে চার পাশে ঝোপ তৈরি করে ফেলে। কিন্তু কয়েকটা দিন পরেই আবার তার লতা-পাতা নেতিয়ে পড়ে। অতি দ্রুত তার জীবন নাশ হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়। দারুণ শ্যামলিমায় সজীব দেখা যায়। দুদিন পরে হয়ে যায় নির্জীব। তাই বলছি, আমাদেরকে গাছের মতো হতে হবে– লতাগুল্মের মতো নয়।

গাছের শেকড় বহু নিচে প্রোথিত থাকে

গাছের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, এর যতটুকু অংশ জমিনের উপরে থাকে, শেকড় হিসেবে জমিনের নিচেও ততটুকু থাকে; বরং আরও বেশি থাকে। তেমনিভাবে মানুষের মধ্যে যে মহান ব্যক্তিত্ব, তার গভীরতা বেশি থাকে। তার আমল লোকদের সামনে যতটুকু প্রকাশিত হয়, তার চেয়ে বেশি লোকদের দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে যায়।

দিনে ও রাতে গাছের বর্ধন

দিনের আলোতে গাছের শাখা-প্রশাখা ও কাণ্ডগুলো বাড়তে থাকে। আর রাতের আঁধারে বাড়ে গাছের শেকড়। মানুষও তেমনি। দিনে তার প্রকাশ্য-প্রশাখা বাড়তে থাকে। সে দাওয়াতের কাজ করে। আর রাতে তার গোপন অভিসার শুরু হয়। সে তাহাজ্জুদ পড়ে। আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। ফলে আল্লাহর সাথে তাঁর

বন্ধনের গোপন শেকড় বাড়তে থাকে। আজ তো আমরা তাহাজ্জুদে ওঠার চেষ্টাই করি না। আজ আমরা শেকড়হীন গাছের মতো ঘুরছি। রাতের বেলা অন্ধকারে যে ইবাদাত বেশি করবে, দীনের সাথে, আল্লাহর সাথে তার শেকড় তত বেশি গভীরে প্রোথিত হবে, তত বেশি মজবুত হবে। যে গাছের শেকড় নেই, সেই গাছের স্থায়িত্ব নেই।

ঢাকনা ভেঙে গাছ উদগত হয়

আপনি দেখে থাকবেন, একটি গাছকে ঢেকে রাখলে গাছ ওই ঢাকনা ভেঙে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এর মধ্যেও আমাদের জন্য এক মহান শিক্ষা রয়েছে। তা হলো, মাঝে-মাঝে আমাদের ওপর নানা রকম প্রতিবন্ধকতার বোঝা এসে যেতে পারে। অবস্থা মাঝে-মাঝে প্রতিকূল হয়ে যেতে পারে। হিংসুক ও নিন্দুকরা বাধা দিতে পারে। গাছ যেমন বাধা ভেঙে উদ্গত হয়, মুমিন বান্দাকেও তেমনি বাধা ডিঙ্গিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

গুনাহ তো শূন্য লতার মতো

আপনারা শূন্যলতা দেখেছেন হয়তো! গুনাহ হচ্ছে সেই শূন্যলতার মতো। এগুলোর কোনো গাছের ওপর উঠতে পারলে পুরো গাছকে ঘিরে ফেলে, ঢেকে ফেলে। গুনাহও সুযোগ পেলেই বান্দাকে পুরো চার পাশ থেকে ঢেকে ফেলে। ফলে অন্ধকার মানুষটিকে ছেয়ে ফেলে। সে তার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

শেকড়ের দৃষ্টান্ত তাহাজ্জুদের সাথে

আগেই বলেছি, গাছের উপরের অংশ এবং নিচের অংশ এই দুই অংশ থাকে। উপরের অংশ শাখা-প্রশাখা। ডাল-পালা আর নিচের অংশ শেকড়। মানুষেরও তেমিন দুটি অংশ। এক. সবার সামনের প্রকাশ্য জীবন। দুই. আল্লাহর সামনের জীবন। আল্লাহর সামনে জীবনটা হচ্ছে গাছের শেকড়ের মতো। গাছের শেকড় যত গভীরে যায় তার আয়ু তত বেশি হয়। তেমনি মানুষ আল্লাহর সাথে যত বেশি গোপন অভিসারে যাবে, যত বেশি তাহাজ্জুদ পড়বে, আল্লাহর সামনের জীবনটা তার তত বেশি সমৃদ্ধশীল হবে, মজবুত হবে। তার শেকড় তত বেশি গভীরে যাবে। আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক তত বেশি নিবিড় হবে।

গাছের আগায় সাপ ঝোলা

গাছের ডালে-ডালে, আগায়-পাতায় যদি সাপ ঝোলে। তবুও গাছ সেদিকে তাকায় না। বড় হতে থাকে। ফল দিতে থাকে। বাড়তে থাকে। মুমিনের জীবনও তেমনি হওয়া উচিত। প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি তাকে সাপের মতো জড়িয়ে ধরবে; কিন্তু সে এর কারণে প্রভাবিত হবে না। আমল ছেড়ে দেবে না। নিজকাজে, নিজ আমলে সদা মশগুল থাকবে। ইল্‌মে, আমলে, দীনের দাওয়াতে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়ানোর কাজে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখবে।

গাছের মধ্যে তরুণ যুবকের জন্য রয়েছে বিশেষ বার্তা

গাছের মধ্যে একটি সৌন্দর্য থাকে যে, সে তার চার পাশ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে।

জমিন থেকে পানি শুষে নেয়।

বাতাস থেকে গ্যাস নেয়।

আলো থেকে পাওয়ার নেয়।

তারপরই সে বেড়ে উঠে।

কিন্তু গাছ যে তার চার পাশ থেকে শুধু গ্রহণ করে তা-ই নয়; বরং সে কিছু দেয়ও।

গাছ ছায়া দেয়।

গাছ ফল দেয়।

গাছ ফুল দেয়।

গাছ মরেও উপকার করে। লাকড়ি বানানো যায়।

গাছ চার পাশ থেকে কিছু নেয়, আবার দেয়ও।

এখান থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আমরা এ দুনিয়ায় জীবন যাপনের সময় আমাদের সংসারের বড়দের থেকে অনেক কিছু নিই। অনেক কিছু আমরা পাই।

মা আমাদের আদর-সোহাগ ও ভালোবাসা দেন। বাবাও তেমনি মায়া-মহব্বত ও ভালোবাসা দেন।

ভাইও তেমনিভাবে ভালোবাসা ও সৌহার্দ দান করেন।

বোনও একইভাবে ভালোবাসা, মহব্বত এবং দু'আ দেয়।

আরও কত কিছু আমরা আমাদের চার পাশ থেকে পাই। এর মাধ্যমেই আমরা বেড়ে উঠি। উন্নতি লাভ করি। তাই আমরা গাছের মতো আমাদের চার পাশকে কিছু দানও করা উচিত।

আমরা সংসারের সদস্যদের জন্য রহমত ও সৌভাগ্যের মাধ্যম হব, আল্লাহওয়ালা হব, আমাদের সামাজিক কাজে সহযোগী হব। মা-বাবাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেব। স্ত্রী-পরিজনকে প্রেম ও মহব্বত দেব। সন্তানদের আদর-সোহাগ ও শাসন দেব। যখন যাকে পারি উপকার করব।

আহ! আজকের যুবকরা চায়, ভালো খাবার, ভালো পোশাক, ভালো গাড়ি, ভালো বাড়ি। মা-বাবা বলেন, বাবা পড়াশোনা করো। ছেলে বলে, পড়াশোনার কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা থাকলে বলো। যুবকদের যা ফরজ তা করতে আজ তাদের হৃদয় প্রস্তুত নয়। তারা যেন চাচ্ছে, আমাকে সর্বপ্রকার উপকরণ দাও। কিন্তু আমার কাছে কিছু চেও না। আজকের অবস্থা তো এই যে, বাবা যদি তার ছেলেকে শাসন করে, তাহলে ছেলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলে দেয়, আমি ঘর চেড়ে চললাম। এই বাবা-মাই তো তাকে পেলে-পুষে বড় করেছে। অথচ সামান্য কথার এদিক-সেদিকের কারণে সেই মা-বাবাকে বলে দেয়, আমি ঘর ছেড়ে চলে যাব। কত জঘন্য ব্যাপার! এটি স্বাভাবিক নিয়মবহির্ভুত কাজ।

যদি গাছের কোনো একটি ডাল একথা চিন্তা করে যে, আমাকে শুধু-শুধু গাছের সাথে যুক্ত হয়ে থাকতে হয়। স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে থাকতে পারি না। আমি গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। নিজে-নিজে আমি নিজের মতো করে থাকব। নিজের মতো করে জীবন যাপন করব। স্মরণ রাখবেন, এমন চিন্তা যে ডাল করবে, তার কপালে মৃত্যু অবধারিত। তার সজীবতা নষ্ট হয়ে যাবে। তার ফল ঝরে যাবে। ফুলগুলো হারিয়ে যাবে। সে মরে শুকিয়ে যাবে।

আজকালের যুবক-যুবতিরা চিন্তা করে, এখানে পরিবারেরর সাথে আমি পরাধীন। নিজের মতো করে থাকতে পারি না, ঘুরতে পারি না। আমি আলাদা নিজের মতো করে থাকব, বসবাস করব। ওই যুবক-যুবতিদের ভাগ্য এই স্বাধীনতাকামী ডালের মতো হবে। দুনিয়ার শত রকম আয়োজনে ডুবেও তারা জাহান্নামে বসবাসের স্বাদ পাবে। দুনিয়াটাই তাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত হবে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে দুনিয়া তো নষ্ট হবেই; আখেরাতও বরবাদ হয়ে যাবে। কেয়ামতের দিন জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে।

একজন মানুষের হাত বা পা যদি এই ডালের মতো বলে যে, আমি শুধু-শুধু মানুষটার সাথে বাঁধা। আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা জীবন যাপন করব, তাহলে ওই অঙ্গটির কী অবস্থা হবে? কী দশা হবে?

হে যুবক! বুঝে নাও, ভালো করে বুঝে নাও। মা-বাবা যদি শাসন করেনও, তাহলে সেটা তোমার কল্যাণের জন্যই তোমার সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য করেন। তারা তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সুন্দর ও সুখময় জীবন দেখতে চান। কুপথে যেতে দেন না। পাপাচার করতে দেন না। তারা ভালো করে জানেন কোন পথে তোমার কল্যাণ। তোমাকে তারা সেই কল্যাণের পথেই পরিচালিত করতে চান। তাদের দেখানো পথে চললে সত্যি তুমি কামিয়াব হবে। মা-বাবার শাসন ও তাদের দিকনির্দেশনাকে নিজের জন্য রহমত মনে করো।

সস্তা জিনিস নিয়ে দামীটা দান করা

গাছ জমিন থেকে কম দামী জিনিস নেয়। কিন্তু দামী জিনিস দান করে। জমিন থেকে গাছ নাইড্রোজেন সংগ্রহ করে, ক্যালসিয়াম সংগ্রহ করে, ফসফরাস সংগ্রহ করে, পানি এবং আরও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করে। যেগুলোর খুব বেশি মূল্য আমাদের কাছে নেই। অথচ গাছ দান করে সুন্দর ফুল, দামী ফল এবং মহামূল্যবান কাঠ। ভালো মানুষদেরও উচিত, সে তার চার পাশ থেকে মূল্যহীন ও কম মূল্যের জিনিস সংগ্রহ করবে। আর সে দামী ও মহামূল্যের জিনিস চার পাশকে দান করবে।

হেমন্তের দিনে গাছগাছালির পয়গাম

শীতের সময়টায় তুষারপ্রধান এলাকাগুলোতে গাছের অবস্থা বড়ই করুণ হয়ে যায়। পত্রপল্লবহীন শুধু শূন্য বৃক্ষরা দাঁড়িয়ে থাকে। ফলও থাকে না, ফুলও থাকে না। গাছে তখন তুমুলভাবে বরফ পতিত হয়। তবু গাছেরা বড় সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে সবর করে। শীতের প্রকোপ সহ্য করে। পরিবেশ প্রতিকূল তবু গাছেরা ভাবে হীমশীতল এই দিন স্থায়ী হবে না; কেটে যাবে। কুয়াশা ও তুষারের কাল কেটে যাবে। ফলে কষ্টের সঙ্গে দু-তিনটা মাস গাছেরা অবস্থা করে। একদিন শীত কেটে গিয়ে হেমন্ত আসে। বড় তীব্র প্রতিকূল থেকে রক্ষা পেয়ে গাছেরা নিঃশ্বাস ফেলে। একসময় হেমন্তের বিদায় হয়। আসে বসন্ত। ঋতুরাজ বসন্ত। গাছেরা যেন প্রাণ ফিরে পায়। জেগে ওঠে। জেগে ওঠে নতুন দ্যোতনায়। বড় সুন্দর করে সাজে বৃক্ষরাজি। ফুল আসে, ফল আসে। পত্রপল্লব গজায়। চার পাশ হয় স্নিগ্ধ, মোহিত।

এই যে আবর্তন ও পরিবর্তন; এর মাঝে আমাদের জন্য রয়েছে বড় ধরনের শিক্ষা। আমাদের জীবনেও এমন প্রতিকূলতা আসে। শীত আসে, হেমন্ত আসে, জীবন বড় কষ্ট ও যাতনায় কাটে। বড় ধৈর্যের পরীক্ষা চায় প্রকৃতি। সেই সময়টাতে সবর করে থাকতে হয়। গাছের মতো নিজেকে রাখতে হয়। ঠিক গাছের মতোই একদিন আঁধার রাত কেটে যায়। আসে আলোর প্রভাত। কুয়াশার বাদল কেটে যায়। আসে বসন্তের দিন। জীবন তখন নেচে উঠে। জীবন তখন হেসে উঠে। তাই গাছ থেকে শিক্ষা নিতে হয় ধৈর্যের, সবরের।

لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے

দুশ্চিন্তার সন্ধ্যাটা বড় দীর্ঘ। তবে সন্ধ্যার এক দিন অবসান হবেই। এটা সবরের পরীক্ষার সময়। তারপরই আল্লাহ বসন্ত ফিরিয়ে দেবেন।

একেক ফলের একেক দাম; কী রহস্য তাতে?

গাছের একেক ফলের দাম একেক রকম। তেমনি পরিবারের একেক সদস্যের দাম একেক রকম। তাই আমাদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের যার যা মূল্য তাকে সেভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে। ইট, বালি, সিমেন্ট একেকটার একেক দাম। কিন্তু সব মিলিয়ে তো হয় দেওয়াল। তেমনি সব সদস্যকে যখন এক সাথে সন্ধিবন্ধ করা হবে, তখনই তৈরি হবে সুখের সংসার। কাউকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। আল্লাহই তো জানেন একটি পরিবারের নারী ও পুরুষের মধ্যে আল্লাহর কাছে কে কত দামী।

তাই প্রত্যেক মুমিন বান্দাকেই মহব্বতের নজরে দেখবে। প্রত্যেককেই সম্মান দেবে। নবী আলাইহিস সালাম বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। বাইতুল্লাহর দিকে দৃষ্টি পতিত হলে তিনি বললেন, বাইতুল্লাহ সম্মান ও মর্যাদা দানের মাকাম ও স্থান। কিন্তু–

حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ اَرْجَعُ مِنْ حُرْمَةِ الْكَعْبَةِ

আল্লাহর নিকট তো মুমিন বান্দার সম্মান কা'বার সম্মানের চেয়ে বেশি।

আহ! আমরা তো বাইতুল্লাহ শরীফের গেলাফ ধরে-ধরে কাঁদি, দু'আ করি। অথচ মুমিন বান্দার কলার চেপে ধরার চেষ্টা করি। টুঁটি চেপে ধরে মেরে ফেলতে যাই। কখনও কি কোনো মুমিন বান্দার সম্মান ও ইহতেরাম এজন্য করেছি যে,

লোকটি আল্লাহতে বিশ্বাসী।

লোকটি আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী।

লোকটি রিসালাতকে স্বীকারকারী।

গাছ পুড়ে-পুড়ে নীরবে কী বার্তা শোনায়?

যেমনিভাবে আগুনের একটি মাত্র অঙ্গার পুরো একটি গাছ জ্বালিয়ে ছাই করে দিতে পারে, তেমনিভাবে মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া একটি কটু বাক্য বা শব্দ জান্নাতের স্থলে জাহান্নামে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে যেতে পারে। যেমন–

কুফরি একটা কথা বলে দেওয়া।

ইসলামের বিপরীত একটি কথা বলে দেওয়া।

ঈমানদারদের বিপরীত কিছু বলে দেওয়া।

সুন্নাতকে খাটো ও তুচ্ছ মনে করা।

এসব তো একেবারে ঈমানহারা করে দেয়।

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) কুফরি কালেমাসমূহের বর্ণনায় লিখেছেন, যদি এমন হয় যে, দুজন বান্দা কথাবার্তা বলছে। তাদের মধ্যে একজন একথা বলল, ভাই! এটা শরীয়তের কথা। দ্বিতীয়জন বলল, আরে রাখো তোমার শরীয়ত। তাহলে সাথে-সাথে সে কাফের হয়ে যাবে। ঈমান বড় নাজুক জিনিস। সামান্যতেই কুফরি হয়ে যেতে পারে। তাই ঈমানকে হেফাযত করতে হয় বড়ই সতর্কভাবে।

অসতর্কতাবশত মানুষ অনেক সময় কুফরি শব্দ বলে ফেলে; ঈমানের ফিকির পর্যন্ত করে না।

বৃষ্টির দ্বারা গাছ সজীব হওয়ার মাঝে আমাদের শিক্ষা

বৃষ্টি বর্ষিত হয়। দু-চার দিনের মাথায় গাছেরা শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। চার দিকে সজীবতা ছড়িয়ে পড়ে। গাছের মতোই মানুষের মাঝে যখন ইল্‌ম ও মারেফাতের বারিধারা বর্ষিত হয়, তখন মানুষটির মাঝে এক অকৃত্রিম রূহানী শক্তি আসে। মানুষটি ভেতরগতভাবে সবুজ ও সজীব হয়ে ওঠে। তাই বেশি-বেশি ওলামায়ে কেরামের সোহবতে অবস্থান করা উচিত। নবীজি ইরশাদ করেছেন–

عَلَيْكُمْ بِمَجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتِمَاعِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ

তোমাদের জন্য ওলামায়ে কেরামের মজলিস এবং জ্ঞানীদের বয়ান শ্রবণ করা অপরিহার্য।

এই বয়ান বৃষ্টির মতোই ঈমানের বৃক্ষকে সজীবতায় প্রাণবন্ত করে দেবে।

ফুল ও গুনাহের ওজনে সাদৃশ্য

গাছের জন্য তার ফুল খুব ভারী মনে হয় না। তেমনি মানুষ নিজের গুনাহকে বেশি ভারী মনে করে না। অথচ অন্য ব্যক্তি সামান্য ছোট একটি ভুল করলেই সেটা খুব নজরে পড়ে। এটা ঠিক নয়।

স্বজন্মা গাছ

নিজে-নিজে জন্ম নেয় এমন গাছও আছে। এমন গাছের পরিচর্যাও কেউ করে না। এমন গাছ, ফুল বা ফলও ভালো জাতের দেয় না। আরেক প্রকারের গাছ আছে, যেগুলোর জন্য মালি রাখা হয়। মানুষ সেগুলোর যত্ন নেয়। এসব গাছ মানুষকে ভালো ফুল দেয় অথবা ভালো ফল দেয় অথবা ভালো কাঠ দেয়।

এমনিভাবে কিছু মানুষ আছে, যারা বড় জ্ঞানী-গুণী ও ওলামায়ে কেরামের পরিচর্যা পেয়েছে। তারা গাছের মতোই মানুষের কল্যাণেও উপকারে লাগে। আরেক প্রকারের মানুষ আছে না মানুষ এদের পরিচর্যা নেয়। আর না এরা মানুষকে ফায়দা দেয়।

গাছের সাথে কথোপকথন

আমাদের উচিত নেক কাজে অটল ও অবিচল থাকা। হযরত সিররি সাকাতি (রহ.) বলেন, একবার সফরে ক্লান্ত হয়ে আমি একটি ছায়াদার গাছের নিচে আরাম করছিলাম। আমি গাছের আওয়াজ শুনতে পেলাম– (আল্লাহওয়ালাগণকে আল্লাহ এমন ক্ষমতা দেন যে মাঝে মাঝে তারা শ্রবণে বা দর্শনে কাশফ শক্তি প্রাপ্ত হন)

يَا سِرِّيُّ كُنْ مِثْلِيْ

হে সিররি! তুমি আমার মতো হও।

সিররি বলেন, আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম-

كَيْفَ اَكُوْنُ مِثْلَكَ

কীভাবে আমি তোমার মতো হব?

গাছ বলল–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَنِىْ بِالْاَحْجَارِ فَاَرْمُوْهُمْ بِالْاَثْمَارِ

আমাকে যে পাথর ছুড়ে মারে, আমি তাকে ফল ছুড়ে দেই।

তুমি আমার মতো হয়ে যাও। লোকেরা তোমার ক্ষতি করলে তুমি তাদের উপকার করো।

সিররি বলেন, তার উপদেশ শুনে আমি ভাবলাম, গাছ যদি এতো ভালোই হয়, গাছকে কেন আল্লাহ আগুনের ইন্ধন ও আগুনের খাদ্য বানালেন। ফলে আমি প্রশ্ন করলাম–

فَكَيْفَ مَسِيْرُكَ اِلَى النَّارِ

হে বৃক্ষ! তোমাকে কেন আল্লাহ তা'আলা আগুনের খাদ্য বানালেন?

প্রশ্নটির জবাবে শীতল শ্বাস ফেলে গাছ বলল–

ও হে সিররি! আমার গুণটা বড় সুন্দর। লোকে আমাকে পাথর মারলে আমি তাকে ফল ছুড়ে দিই। কিন্তু আমার মাঝে একটা দোষও আছে মারাত্মক। এই দোষটা আমার সকল গুণাবলির ফলাফল শেষ করে দিয়েছে।

গাছ বলল–

فَاَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هٰكَذَا

যে দিকে বাতাস প্রবাহিত হয় আমি সে দিকেই ঝুঁকে যাই।

সিররি আমার এই দোষটিই আমাকে শেষ করে দিয়েছে। এ দোষ আমার আল্লাহ এত অপছন্দ করেছেন যে, আমার শত সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও আমাকে আগুনের ইন্ধন বানিয়েছেন।

শরীয়ত ও সুন্নাহের অনুসারী হয়েই বেঁচে থাকুন

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা! শরীয়ত ও সুন্নাতের ওপর অটল ও অবিচল থাকো। নিজেকে সুন্নাতের রঙে সজ্জিত করো। অশ্লীল, হীন, নীচু, পাপাচার ও নির্লজ্জ কাজের কাছেধারেও যাবে না। আমরা যদি দীনের আহকামের ওপর আমল

করি, তাহলেই আমাদের ওপর আমাদের আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার বারিধারা বর্ষিত হবে। তরুণরা বলে, হুজুর! দৃষ্টিকে হেফাযত করা তো বড়ই কঠিন। আমি বলি, ভাই! যে কাজটা যত মুশকিল, যে গুনাহ পরিত্যাগ করা যত কঠিন, তার ছাওয়াবও তত বেশি। তাই হিম্মত ও সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করুন। লোকেরা আজকের যুগে নিজে-নিজে বড়াই করা ছেড়ে দেয়নি। আমরা কেন নেক আমল ছেড়ে দেব। নেক আমলই তো আমার গর্ব ও অহংকার। নেক কাজ, সভ্য-শালীন বিষয় এবং সম্ভ্রান্ত কর্মে নিজেকে ব্যাপ্ত রাখবে, অটল ও অবিচল রাখবে।

নফস ও শয়তান তো আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। শয়তানের ধোঁকায় পা না বাড়িয়ে আল্লাহর হুকুম মান্য করার দিকে পা বাড়ানো চাই।

চন্দনের সুগন্ধ কাঠের বার্তা

চন্দন কাঠের গাছ ওই কুড়ালকে সুগন্ধযুক্ত করে দেয়, যে কুড়ালটি দ্বারা চন্দন কাঠের গাছ কাটা হয়। যেন ক্ষতির জবাব উপকারের মাধ্যমে প্রদান করে চন্দন কাঠ। আমাদেরও এমন হয়ে যাওয়া উচিত। প্রকৃতি আমাদেরকে এ শিক্ষা-ই প্রদান করে। আমরাও যেন মন্দের জবাব দেই ভালো দ্বারা। কিছু মানুষ বলে, আমরা ইটের জবাবে পাথর ছুড়ে মারব। এটি উন্নত সভ্যতা ও আখলাক নয়। পাথরের জবাবে ফুল ছুড়ে দেওয়া উন্নত স্বভাব, সভ্যতা আখলাক ও রুচিবান চরিত্র।

কুরআনের ঘোষণা–

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

তোমরা খারাপকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো।

প্রিয় ভাইয়েরা! বলুন, যদি নাপাক ও অপবিত্র কাপড় পবিত্র করতে চান, তাহলে আপনি তা করতে পারবেন পবিত্র পানি দ্বারা। তেমনিভাবে আপনি যখনি অভ্যন্তরীণ খারাপতাকে পরিষ্কার করতে চাইবেন, তখন ভালো ও উত্তম কাজের দ্বারা তা করতে হবে। আমরা যদি ভালো হয়ে যাই, তাহলে অন্যদেরও আল্লাহ তা'আলা ভালো বানিয়ে দেবেন। আমরা তো আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে, ততটুকুই করব। আল্লাহ পরবর্তীটুকু তাঁর শান মোতাবেক করে দেবেন।

ফুলের পাঁপড়িগুলো পিষে যাওয়ার মাঝে বার্তা

ফুলের পাঁপড়িগুলোতে হাতের ঘর্ষণ লাগে। সে হাতকে সে খুশবুদার এবং সুগন্ধময় করে দেয়। তো আমরা কি তার থেকে অবুঝ? আমাদেরও উচিতৎ খারাপের বদলা ভালো দিয়ে দেওয়ার নীতি বানিয়ে নেওয়া। তখন দেখবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা কেমন রহমতপ্রাপ্ত হই।

একে অন্যের মূল্যায়ন করবে

আমরা দেখে থাকি, অনেক সময় কাছাকাছি থেকেও মানুষ একে অন্যের মূল্যায়ন করে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে এক সাথে থাকে; কিন্তু কেউ কাউকে মূল্যায়ন করে না। স্বামী বিবির বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ তোলে। আর বিবি ও স্বামীর বিরুদ্ধে হাজারটা পাল্টা অভিযোগ তোলে। কিন্তু যখন উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তখন বিবিও অশ্রু ঝরায়। জিজ্ঞেস করলে বলে কি আরে স্বামীই তো ছিল। এখন তো মরে গেল। আমার এই সন্তানগুলোর বাবাই তো ছিল এখন তো হারিয়ে গেল। আমার মাথার উপরের ছায়া ছিল কত সম্মানে ছিলাম মানুষটা যখন ছিল। লোকেরা আমাকে কিছু বলতে পারত না। আমার উপরে কেউ কথা বলতে পারত না। কেউ আমার দিকে তাকাতে পারত না।

দেখুন! স্বামী হারিয়ে যাওয়ার পর এখন তার গুরুত্ব বুঝে এসেছে। আবার যে স্বামী এত দিন স্ত্রীর বিরুদ্ধে হাজারো-লাখো অভিযোগ তুলত, যখন স্ত্রী হঠাৎ মারা যায় বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন স্বামীর কান্নার রোল পড়ে। জিজ্ঞেস করলে বলে, আরে ভাই! শত হোক আমার স্ত্রী-ই তো ছিল। আমার প্রেম ও ভালোবাসা ছিল। আমার সন্তানের মা। আমার প্রিয়তম সঙ্গিনী। ছেলেমেয়েগুলোকে কত কষ্ট করে গুছিয়ে রাখত সে। ঘরটা তখন আবাদ ছিল। আমি বাইরে চলে যেতাম; বিবি আমার সর্বপ্রকার জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করত। এখন তো বিবির মূল্য বিবি হারানোর পর বুঝে আসে। নেয়ামত যখন হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন তার মূল্য বুঝে আসে।

ইংরেজদের অভ্যাস হলো, কেউ মারা গেলে তার ঘরে পুষ্পস্তবক উৎসর্গ করে। ইংরেজ কবি বলেন–

Why we woit till a person die?

আমরা ফুল নিবেদনের জন্য কেন কোনো মানুষের মৃত্যুর অপেক্ষা করি, যখন জীবিত ছিল, প্রাণ ছিল তখন তো এই ফুল প্রদান করলে উত্তম হতো। লোকটাও খুশি হতো। ফুলদাতার ফুলও সার্থক হতো।

ফুলের সাথে কাঁটা থাকবে : তবে কেন অভিযোগ

গত বছর কিছু ছাত্র গোলাপ বাগানে ডাল-পালা কাটছিল। একটা ছেলের হাতে কাটা বিঁধল। আমাকে এসে তার কষ্টের কথা বলতে লাগল, হযরত! ফুলের সাথে কাটা এ কেমন ব্যাপার? আমি বললাম, তুমি নিজেই বুঝো– যেখানে ফুল আছে, সেখানে কাঁটা যেহেতু আছে, তাহলে যেখানে কাটা আছে সেখানে তো ফুলও আছে। এভাবেও তো বিষয়টা তুমি চিন্তা করতে পার। এবার ছেলেটা খানিক সান্ত্বনা পেল। যেখানে কাঁটা আছে, সেখানে ফুলও আছে। এমনিভাবে যদি পরিবারে বসবাসের সময় নিজের ভেতর আমরা ইতিবাচক ভাবনা ও কল্পনা ধারণ করে নিতে পারি, চিন্তা-চেতনায় ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমাদের সংসার জান্নাত হয়ে যাবে। আমাদের ঘরে অবধারিত রহমত বর্ষিত হবে।

একটি মূল্যবান বাণী

একব্যক্তি খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার কাছে এসে বলল, হযরত! অমুক ব্যক্তি আমার বিরোধী। আমাকে সে কষ্ট দেয়। হযরতের কাছে এজাযতনামা চাচ্ছিল। হযরত যদি আমাকে অনুমতি দেন, তো লোকটাকে মজা দেখাব। তাই লোকটা আরও বলল, হযরত! সে আমাকে খারাপ বলে, আমার পথে কাঁটা বিছায়। হযরতজি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন। আল্লাহওয়ালাগণ তো বড় বুঝমান, জ্ঞানী, গুণী ও সচেতন হয়ে থাকেন। হযরত একটি বড় চমৎকার ও আশ্চর্য জবাব দিলেন। সোনার হরফে লেখে রাখা উচিত সেই জবাবটি।

হযরত বললেন,

দোস্ত! যদি কেউ তোমার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেয়, তুমি তার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতে যেও না। অন্যথায় সমগ্র পৃথিবী কাঁটায়-কাঁটায় ভরে যাবে।

আমাদের উচিত এ মূলনীতিটি ধারণ করা। আমাদের সাথে যদি কেউ খারাপ করে, তাহলে আমরা তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করব। কেউ আমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করলে, আমরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করব।

গাছের ফলদানে উত্তম আখলাকের সবক

বন্ধুগণ! স্মরণ রাখুন, গাছের পরিচয় ফল দ্বারা। মানুষের পরিচয় তার উত্তম আখলাক দ্বারা। যে গাছের ফল ভালো, লোকে সেই গাছকে পছন্দ

করে। যে-মানুষের আখলাক ভালো, মানুষ তাকে ভালোবাসে। আল্লাহ্ তাকে মহব্বত করেন। তাই ঈমানের পরে মানুষের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে উত্তম আখলাক, সুন্দর চরিত্র। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদরেকে উত্তম আখলাক ও উন্নত চরিত্র দান করুন। সুন্দর ও বর্ণিল জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন।

আমরা–

যদি সন্তান হই, তাহলে সর্বোত্তম সন্তান যেন হতে পারি।

যদি ভাই হই, তাহলে সর্বোত্তম ভাই যেন হতে পারি।

যদি স্বামী হই, তাহলে সর্বোত্তম স্বামী যেন হতে পারি।

যদি বাবা হই, তাহলে সর্বোত্তম বাবা যেন হতে পারি।

যদি রাজা হই, তাহলে সর্বোত্তম রাজা যেন হতে পারি।

যদি মুমিন বান্দা হই, তাহলে সর্বোত্তম মুমিন বান্দা যেন হতে পারি।

আমরা আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করছি। তাই উচিত আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দা হয়ে দেখানো, নিজেকে আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা বানানো।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নেকিতে ভরপুর জিন্দেগি নসীব করুন। এই তালিবুল ইল্‌ম ও ছাত্রদের ইয্‌যাত ও সম্মানের জিন্দেগি দান করুন। এদেরকে এদের মাতাপিতার চক্ষু শীতলকারী এবং নয়নজুড়ানো সন্তান হিসেবে কবুল করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

[খুতুবাতে যুলফিকার ষোড়শ খণ্ড সমাপ্ত]